রুদ্র ভৈরব — শিল্পী ঃ শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩০শ বর্ষ
১৩৫২ :
ইং ১৯৪৫

প্রবর্ত্তক

বৈশাখ :
(এপ্রিল)
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

ধর্ম্ম বনাম রাষ্ট্র

ভারতের সংস্কৃতি শুধু ধর্ম্মের জন্য নয়, ধর্ম্মরাষ্ট্রের জন্য, এ কথার অকাট্য প্রমাণ আছে।

রাষ্ট্র নাই যার, ধর্ম্ম নাই তার। ভারতের আর্ত্ত কণ্ঠে রাষ্ট্র-স্বাধীনতার ঘোষণা দীর্ঘদিন পূর্ব্ব হইতেই উঠিয়াছে; যতদিন যাইবে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারত ধর্ম্মের জন্যই রাষ্ট্র-স্বাধীনতার দাবী লইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। ধর্ম্ম যে রাষ্ট্রহীনের জন্য নহে!

কিন্তু স্বাধীনতার মুখ্য কারণ যে ধর্ম্ম, একথা কয়জন বুঝে? স্বাধীনতার গৌণ ফল যে মানুষের ভোগ ও অধিকারবাদ, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা স্বাধীনতার দাবী করিতে শিখিয়াছি। স্বাধীনতা কিন্তু এ জাতি স্বার্থপূর্ত্তির জন্য চাহে না। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত চায় বিশ্বমানবজাতিকে সত্য ও শান্তি দিতে। স্বাধীনতার সাধনায় অসংখ্য প্রকার কর্ম্মস্রোতঃ খুবই স্বাভাবিক। আমরা তাহার কোন একটীরও প্রতিবাদ না করিয়া স্বাধীনতার মুখ্য লক্ষ্য যে ধর্ম্ম, তাহাতেই জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, ভারত-ধর্ম্মপরায়ণ লোকের বিরাট্ সংহতি চাই, আর সেই সংহতিকেই জাতির সত্যকে আবিষ্কার করিয়া রাষ্ট্র-স্বাধীনতার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে দেখিলেই সুখী হইব।

ধর্ম্ম-বস্তুটা অসংখ্য প্রকার প্রকৃতিপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে একপ্রকার হারাইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এদেশে ধর্ম্মের পশ্চাতে রাষ্ট্র নাই। দণ্ড না থাকিলে, প্রকৃতির স্বেচ্ছাচার দমন করা যায় না। দণ্ডই প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সমধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতে পারে এবং এই তুল্য ধর্ম্মের সুবিস্তৃতিতে বিশাল জাতি সমধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শক্তিশালী হয়।

ধর্ম্মের আচারভেদ খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু লক্ষ্যভেদ বাঞ্ছনীয় নহে। মানুষ নানাবিধ খাদ্যগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু উদরপূর্ত্তি হইবে, ইহা সকলেরই লক্ষ্য। আমরা তান্ত্রিক হই, শৈব হই, বৈষ্ণব হই, এমন কি ইসলামধর্ম্মী, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ যাহাই হই, ধর্ম্মের আচারপার্থক্য প্রকৃতিবৈচিত্র্য হেতু থাকিবেই। কিন্তু ধর্ম্মের লক্ষ্যকে অন্যান্য দেশ জীবনের ভিত্তি করিয়া রাখিতে চাহে না। সেই সকল দেশের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু ভারতের রক্তের ইতিহাসে ধর্ম্মই নিহিত আছে। ধর্ম্মহীন হইয়া আমরা বাঁচিব না, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছি। অন্য দেশও বাঁচিবে না। তাহাদেরও রাষ্ট্রের আড়ম্বর অনন্তকালের তুলনায় খুবই সাময়িক। কেহ যদি প্রশ্ন করেন, ধর্ম্মপ্রাণ ভারত ধর্ম্মহীন হয় কেন? তাহার উত্তর, ধর্ম্ম বাহ্য বস্তুর ন্যায় সুলভ নহে। ধর্ম্মের আবিষ্কার করিতে করিতেই আমরা বহুবার বহু রাষ্ট্র গড়িয়াছি, ভাঙ্গিয়াছি। ধর্ম্মের যে মৌলিক প্রতিজ্ঞা, তাহাকে পাওয়ার পথেই স্বাধীনতা আসিয়াছে, আবার গিয়াছে। স্বাধীনতার যুগে ধর্ম্ম চাহিয়াছি, পরাধীনতার যুগেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য কি? তাহার একমাত্র উত্তর সত্য। শাস্ত্রেরই কথা। 'ধর্ম্মস্যোপনিষৎ সত্যম্'। আচার-অনুষ্ঠান সাধনার আবর্ত্ত সৃজন করে; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা সত্যকেই আবিষ্কার করিবে। সেই সত্য বর্ণনার বস্তু নহে। সত্যই অনন্ত জ্ঞান। সত্যপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, ভারতের স্বাধীনতা নাই। পরাধীনতার মধ্যে আমরা ধর্ম্মলাভ করিতে পারিতেছি না। প্রশ্ন উঠিয়াছে—আগে ধর্ম্ম, না আগে স্বাধীনতা? ইহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। যাঁহাদের ধারণা—আগে স্বাধীনতা, তাঁহাদের তদনুযায়ী পথ বিধেয়। আর যাঁহারা মনে করেন—ধর্ম্মের ভিত্তি ধরিয়াই

জাতিগঠনের কাজ সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে এবং এই জাতিই স্বাধীনতা আনিবে, তাঁহাদের তদনুযায়ী পথে চলিতে হইবে। স্বাধীনতাকে লক্ষ্যে রাখিয়া রাষ্ট্র-সংহতি লক্ষ্যে পড়ে। এই সংহতির মধ্যেই আবার কোথাও কোথাও এই ধারণা জন্মিতেছে যে, জাতিসংগঠনের ভিত্তি দৃঢ় না হইলে যদিও স্বাধীনতার ন্যায় কিছু পাওয়া যায়, তাহার মূল্য কাণা কড়ির ন্যায় তুচ্ছ হইবে। রাষ্ট্রসংহতির সহিত সংগঠনে বিশ্বাসী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে বেশ গোলযোগ বাধিয়াছে। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, মনীষিরা বুঝিয়া লইবেন।

সংগঠন ধর্ম্মের ভিত্তিতেই হইবে। ধর্ম্মের নাম লইয়াই এই সংগঠন হয় না। ইহার জন্য নানা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। আসলে সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান হইতে যদি ধর্ম্মামৃত পরিবেশিত না হয়, তাহা হইলে সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এইবার পূর্ব্বের কথার অনুবৃত্তি করিয়া বলি—জনবল ও অর্থবল ইহার জন্য বড় সহায় নয়। রাষ্ট্র করিতে গিয়া সংগঠনের প্রয়োজন বোধ হওয়ার ন্যায় জনবল ও অর্থবলের উপর নির্ভর করিয়া যে সংগঠন, তাহাতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আবার দেখা যাইবে যে, ইহার জন্য অর্থ ও জনসংখ্যা ব্যতীত অন্য কিছু প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের কথাটাই বলিব।

দণ্ড না থাকিলে, ধর্ম্মের লক্ষ্য স্থির রাখা সম্ভব নহে। অথচ দণ্ডও নাই, এই অবস্থায় সংগঠন যদি অনিবার্য্য বোধ হয়, কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে? ব্যাপকভাবে এই অবস্থায় সংগঠন কার্য্যকরী হইবে না। কিন্তু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য জন্মগত অধিকার লইয়া একদল মানুষের ইহার জন্য আবির্ভাব চাই। দণ্ড এই সকল পুরুষের নিয়ামক না হইলেও, আত্মবিধৃত প্রেরণাশক্তিতেই ইহারা সত্যাবিষ্কারের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে পারে। মানুষ ও অর্থের মোহ দণ্ডের দ্বারা নিরাকৃত করার প্রয়োজন এইখানে হয় না; যাহা জাতির মুখ্য লক্ষ্য, তাহার প্রেরণা লইয়াই ইহাদের জন্ম। এই শ্রেণীর মানুষ স্বতঃই সংহতিবদ্ধ হয়। এই সংহতিই সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এই সম্প্রদায়ই অপূর্ব্ব অধ্যাত্মানুভূতির শাসনে আত্মস্থ হইয়া জাতির জীবনে ছড়াইয়া পড়ে। তারপর জাতির দাবী পূর্ণ করার জন্য যে আত্মদান চলিতে থাকে, তাহার বিনিময়ে জাতির ভাগ্যদেবী তাহাকে জয়যুক্ত করে।

আমাদের দেশে এতখানি গোড়া বাঁধিয়া এইরূপ কর্ম্মছন্দঃ প্রকাশ পায় নাই বটে; কিন্তু এই নীতিই স্বাধীনতার আন্দোলনে অনুস্যূত হইয়াছে। নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার্জ্জনের পর এইবার গোড়া বাঁধিয়া মুক্তিপথে চলার আয়োজন বিস্তৃত আকারে লক্ষ্যে পড়ে। কিন্তু জনবল ও অর্থ এই পথের সবখানি সহায় নহে। একটা অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন সমষ্টির নবজন্মের উপরই ভারতের সৌভাগ্যানয়ন নির্ভর করিতেছে। বাংলায় সেই কর্ম্ম সুরু হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য প্রকার বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে সেই উদীয়মান জাতির অকালমৃত্যু যাহাতে না হয় সেই দিকে সতর্ক হইয়া যদি আমরা চলিতে পারি, বাংলাই জাতি-গঠন যজ্ঞের পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইবে। শুদ্ধির পর যে মুক্তি, বাংলার সে সুযোগ অতি সম্মুখে। আসক্তি বা কামনা থাকিতে মুক্তি আসে না, বন্ধনই ঘটে। শোধনের উপায়—তপস্যার দুঃখ-সাধনা। বাংলা কি ইহাতে দীক্ষা পায় নাই? সে কি আজ মুক্তির নিশান লইয়া ভারতের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে না? আমরা বাঙ্গালীকেই ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নবজাতি সংগঠন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর দেখার আশা করি। বাঙ্গালী, উত্তিষ্ঠ।
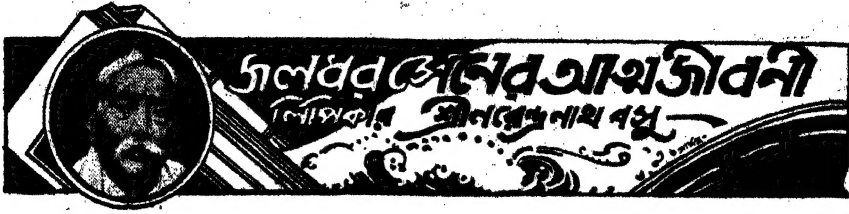
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার গোয়ালন্দে অবস্থান-কালে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—আমার প্রবাসভবনে কাঙাল হরিনাথের পদধূলি-দান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার "কাঙাল হরিনাথ" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়েছি। ঐ গ্রন্থ থেকেই তার বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

আমি তখন গোয়ালন্দে থাকি। কাঙাল আমাকে পত্র লিখলেন যে, তিনি দল লইয়া ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনীতে গান করিতে যাইতেছেন। আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে হইবে। তখন বড়দিনের ছুটী ছিল। আমি প্রস্তুত হইলাম। তাঁহারা শেষরাত্রির গাড়ীতে গোয়ালন্দ পৌছিলেন। আমি প্রস্তুত হইয়া ষ্টেসনেই ছিলাম। এক সঙ্গে ষ্টীমারে চড়িয়া ফরিদপুরে গেলাম। আমাদের গ্রামবাসী এক্ষণে পরলোকগত প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় ফরিদপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি কাঙালের ছাত্র এবং আমাদের মাষ্টার। আমরা তাঁহার বাসায় উঠিলাম। সেদিন আর গান হইল না। তাহার পরদিন মেলা-কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়া গেলেন যে, সেইদিন অপরাহ্নকালে মেলার মণ্ডপে ফিকিরচাঁদের গান হইবে।

আমরা ফরিদপুরে যাইয়াই শুনিলাম যে, প্রসিদ্ধ পাগ্‌লা কানাই ফরিদপুরে গান করিতে আসিয়াছে। পাগ্‌লা কানাইয়ের নাম কলিকাতা অঞ্চলের লোক না জানিতে পারেন; কিন্তু এক সময়ে পাগ্‌লা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশ-বিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগ্‌লা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য এক এক সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান একস্থানে সমবেত হইত। একদিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগ্‌লা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাগ্‌লা কানাই বৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার গলায় এমন আওয়াজ ছিল যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিলেও, সকলে তাহার গান শুনিতে পাইত। আমরা ফরিদপুরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, আমাদের যে সময়ে গান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন বারটার সময় পাগ্‌লা কানাইয়ের গান আরম্ভ হইবে। কাঙাল বলিলেন, "তোরা ত সে গান শুনিস্ নাই, কানাইয়ের গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়!"

আমরা বেলা ১২টার সময়ে মেলার মাঠে গিয়া দেখি, সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! অনুমান ত্রিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। একটু পরেই মাথায় লম্বা-লম্বা চুলওয়ালা দশ বার জন লোক কানাইকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। জন-সংঘের মধ্যে হিন্দুগণ "হরিবোল" এবং মুসলমানগণ "আল্লা-আল্লা" ধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিল। সে যে কি আনন্দ, সে যে কি উন্মাদনা, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। যাহারা গান করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের জন্য একটী কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারই উপর দাঁড়াইয়া গান না করিলে, কানাইকে কেহ দেখিতে পাইবে না বুঝিয়াই মেলার কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কানাই ও তাহার দলের লোকেরা মঞ্চের উপর আরোহণ করিল; প্রত্যেকের হস্তে একখানি করিয়া খঞ্জনী; আর কোন বাদ্যযন্ত্র নাই। একটু পরেই তাহারা গান আরম্ভ করিল। এই যে ত্রিশ হাজার লোক, ইহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনিতে লাগিল। তাহারা যে কয়টী গান গাহিল, সমস্তই অনিত্যতা সম্বন্ধে। আমরা অবাক্ হইয়া এই দশটী লোক ও বৃদ্ধ কানাইয়ের সুররাজি, সুরের খেলা শুনিতে লাগিলাম। ধন্য আওয়াজ! ধন্য শিক্ষা! আমি সে গানের বর্ণনা করিতে পারিলাম না; যাঁহারা পাগ্‌লা কানাইয়ের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

পাগ্‌লা কানাইয়ের গান চারিটা পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার পরেই ফিকিরচাঁদের গান আরম্ভ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা এই, তাহাদিগকে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গান করিতে হইবে না; তাহা হইলে আমি যোগ দিতেই পারিতাম না। মেলার জন্য যে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই মণ্ডপেই ফিকিরচাঁদের গান হইবে; সহরের ভদ্রলোক, সাহেব-বিবি ও মফঃস্বলের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ সেইখানেই সমবেত হইবেন।

তিনটা বাজিয়া গেল, তখন আমরা আর পাগ্‌লা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য সেখানে থাকিলাম না। মেলার মধ্যেই একটি ঘরে আমাদের দলের সাজসরঞ্জাম রক্ষিত হইয়াছিল। কাঙালের ত আর সাজের প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার ফকিরেরই বেশ! আর সকলে ফকির সাজিবার জন্য ঘরের মধ্যে গেল। কাঙাল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস; তিনি কি যেন ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি একটু পরে বলিলেন, "কানাইয়ের গান শুন্‌লি ত! এর পরে কি তোদের গান জম্‌বে, তোরা কি পার্‌বি? আমি তাই ভাব্‌ছি।" এ কথার আর কি উত্তর দিব! আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই তিনি বলিলেন, "তোর কাছে কাগজ-পেন্সিল আছে?" আমি বলিলাম, "আছে।" তিনি বলিলেন, "এই যে জনসমুদ্র দেখ্‌ছিস্, ইহাদের মধ্যে আজ মায়ের নাম ছড়াইয়া দিতে হইবে। তুই কাগজ ধর, নূতন গান দিই। সেই গান নিয়ে প্রথমে আসরে যেতে হবে।" এই বলিয়া তিনি গান বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। গানটী এই—

আমার আজ এই নিবেদন, লজ্জাবারণ, কর মা লজ্জারূপিণী।
মা, তোমার যে নাম জপে, হৃদয়-কূপে নিরজনে যোগী-মুনি;
সেই নাম আজ জনসমাজে, ফকির সাজে, গাইতে এলাম ও জননি!
মা, আমার হ'তেছে ভয়, কাঁপে হৃদয়, হৃদে এস বীণাপাণি!
মা, তুমি আপনি বাজাও, আপনি গাও, আপনার নাম আমি শুনি।
মা, তুমি মা নাম দিয়ে, জাগাইয়ে, জাগলে কুলকুণ্ডলিনী;
এ হৃদয়-বাঁধ ছুটিয়ে, ঢেউ উঠিয়ে, ভাবে নাচায় ভাবরূপিণী।
কাঙ্গালের গেছে লজ্জা, লোকলজ্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী,
নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক, দেখিস্ অনন্তরূপিণী।

দেখিতে দেখিতে উপরিলিখিত গান প্রস্তুত হইয়া গেল। কাঙাল তখন বলিলেন, "এ গান লাগবেই, তোদের ভয় নাই।" আমি গান লইয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। প্রফুল্ল, নগেন্দ্র সকলেই গান দেখিল।

প্রফুল্ল বলিল, "হাঁ, ঠিক হয়েছে। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। দেখ্‌, আজ মা হারে কি পুত্র হারে!" প্রফুল্লের কথা শুনিয়া আজ সকলেই প্রফুল্ল হইল, সকলেরই হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। প্রফুল্ল বলিল, "আজ আর অন্য যন্ত্রে হবে না। সবাই একখানা করিয়া খঞ্জনী হাতে লও।

কে একজন বলিল, "আমাদের এত খঞ্জনী নাই।" উকিল প্রসন্নদাদা সেখানে ছিলেন, তিনি বলিলেন, "তাহার জন্য ভাবনা নাই। কানাইয়ের দলের নিকট হইতে খঞ্জনী আনিয়া দিব।" প্রসন্নদাদার সেদিন আনন্দ দেখে কে? তিনি শুধু বলিতেছেন, "দেখিস্ প্রফুল্ল, আজ আমাদের গ্রামের নাম রাখিস্, আজ কাঙালের নাম রাখিস্।"

কানাইয়ের গান ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদিগের আসরে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিল। কাঙাল তখনও তৃণাসনে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম, "এখন গাইতে যেতে হবে।" তিনি চকিত হইয়া বলিলেন, "বেশ, চল।" আমরা কাঙাল হরিনাথকে দলের সম্মুখে প্রথম সারির মাঝখানে লইয়া সকলে মণ্ডপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাঙাল বলিলেন, "এখান হইতেই গান ধর।"

তখন একসঙ্গে পনরখানি খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল, পনর জনের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া গান আরম্ভ হইল—

"আমার আজ এই নিবেদন…"

চারিদিক্ হইতে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমরা তখন সত্যসত্যই কি এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গান ধরিয়াছিলাম। মণ্ডপের দ্বারে পৌঁছিতেই গান জমিয়া গেল, সুরের একটা জমাট বাঁধিয়া গেল। আমরা ধীরে ধীরে মণ্ডপের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম। তখন আর আমাদের জ্ঞান ছিল না। আমরা প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে লাগিলাম। মণ্ডপের মধ্যে প্রায় দুই-তিন হাজার লোক। সকলে নিঃশব্দে গান শুনিতে লাগিল। যখন শেষের অন্তরা আমরা ধরিলাম, তখন কাঙাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখন নৃত্য আরম্ভ হইল। তখন আর দল বে-দল থাকিল না। মণ্ডপের মধ্যস্থ লোকেরাও

আসিয়া গানে যোগ দিলেন। বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ভেদ থাকিল না। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমার ত মনে হইতে লাগিল—চারিদিক্ হইতে সহস্র কণ্ঠ গাহিতেছে—

"নামে না হয় কলঙ্ক—
মা নামে না হয় কলঙ্ক"—

প্রায় তিন কোয়ার্টার এই একটী গানই হইল। তাহার পরই ফকিরের দল মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়িয়া গেল। কত জন আসিয়া কাঙালের পদধূলি লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারী আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, সেদিন যেন আমাদিগকে আর গান করিবার জন্য আহ্বান করা না হয়। পরের দিনও গান হইয়াছিল। সেদিনও ঐ ব্যাপার। তাহার পরের দিনই আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি।

(ক্রমশঃ)

বর্ষফল

শ্রীমতিলাল রায়

ভারত-সংস্কৃতিতে জ্যোতিবিদ্যা বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া আছে। গ্রহ-সংস্থাপনের সহিত ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভাগ্য, প্রকৃতি ও শুভাশুভ অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু যথাযথ ফলের বিচার নির্ভর করে ঠিক ঠিক গ্রহ-সংস্থাননির্ণয়ের উপর। এ বিষয়ে পঞ্জিকাবিভ্রাট আছে। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গ্রহ-সংস্থান লইয়াই এখানে বিচার করা হইল। অন্যান্য পঞ্জিকায় বুধ ও শুক্র মীনের ২৭ অংশে অবস্থিত। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র মেষ রাশির প্রথমাংশে সমবেত হইয়াছেন। এই বৎসর ৩০শে চৈত্র শুক্রবার ১টা ২৪ মিঃ ৫২ সেকেণ্ডে গ্রহরাজ অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে প্রতিপৎ তিথি-যোগে নববর্ষ সুরু করিয়াছেন। এই সময়ে অশ্বিনী নক্ষত্র পার্শ্বমুখগণ মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, শক্তিহীন হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্র-তন্ত্রে শুভফলের দ্যোতনা করে না। নক্ষত্রটী পার্শ্বমুখ হওয়ায়, রাষ্ট্রশাসন-সৌকর্য্য অপেক্ষা শত্রুজয়ের জন্য এই ক্ষেত্রটী অস্ত্রাদি-নির্ম্মাণের প্রধান ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এইজন্য ভারতের কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইবে।

ভারতের লগ্ন দুইটী পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে। ইহাতে লোকক্ষয়, মহামারী ও নানাপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ভারতে ভূমিকম্পও হইতে পারে।

বিষুব সংক্রান্তিতে ভারতের কেন্দ্রস্থানে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশমাধিপতি এক হইয়াছেন। পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দশমাধিপতি শুক্র, বুধ ও চন্দ্র ভারতের শুভকারী গ্রহরূপে রাজযোগ সৃষ্টি করিলেও, রবিগ্রহ উহার সহিত সম্মিলিত থাকিয়া উহার অনেকখানি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তবুও ভারতের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও প্রীতির ভাব পরিলক্ষিত হইবে। বহু কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকের প্রতিভা এই বছর বহু পরিমাণে প্রকাশ পাইবে। ভারতের কোন প্রসিদ্ধ রাজপুরুষ বা নেতার জীবনহানির সম্ভাবনা আছে।

তার পর দেখা যায়—ভারতের লগ্নপতি রাহুগ্রস্ত হইয়া ষষ্ঠস্থানে অবস্থান করিতেছেন। রাহু শনিরাজের মিত্রগ্রহ; এই দুইটী প্রবল গ্রহ ৬ অংশে ও ৭ অংশে অতি সন্নিহিত থাকায়, ভারতে রোগ, বিপদ্, বিবাদ বহু প্রকার শত্রুতাভাব পরিলক্ষিত হয়। শনি ও রাহু যতদিন পরস্পর হইতে দূরে অপসৃত না হন, ততদিন অনর্থের মাত্রা বাড়িতেই থাকিবে।

৬ই আশ্বিন শনি কর্কট রাশিতে সঞ্চার করিবেন। ইহার বহু পূর্ব্বে হইতেই ভারতবিরুদ্ধভাব অনেকখানি বিনষ্ট হইবে। শনির শেষ শুভকর। অতএব ভারতের পক্ষে দুঃখ-কষ্ট যতই হউক—অবশেষে প্রতিরোধী শক্তিকে নিরস্ত করিয়া ভারতবাসী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। এখানে ভারতের কথাই হইতেছে। শনি-রাহুর সমাবেশে ভারতে দুঃখ-কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ইহার ফলে পাশ্চাত্যের ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে।

এবার বৃহস্পতি বক্রী হইয়া সিংহরাশিতে অবস্থান করিতেছেন। বৃহস্পতি ৩১শে বৈশাখ মার্গী হইবেন। অতএব এই সময় হইতে ভারতের ভাগ্যে কিঞ্চিৎ শুভ ফল পরিলক্ষিত হয়। ২রা শ্রাবণ বৃহস্পতি কন্যারাশিতে গমন করিবেন। ইহার পর ৪ঠা পৌষ তিনি অতি দ্রুত গতিতে তুলায় গমন করিলে, ভারতের অনেক ক্ষেত্রে মিত্র-বন্ধন শিথিল হইতে পারে।

২৭শে মাঘ বৃহস্পতি বক্রী হইয়া ২৫শে চৈত্র পুনরায় কন্যারাশিতে আসিবেন। ভারতের লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে মঙ্গলগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতির দৃষ্টি এই ক্ষেত্রে আছে। ইহা শুভকর নহে। মঙ্গলগ্রহ যদিও ভারতের কেন্দ্রস্থানের অধিপতি এবং একাদশাধিপতি, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে থাকিয়া তিনি ভারতের সৌভাগ্যানয়নের চেষ্টা ফলবতী করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়স্থান উত্তম হইলেও, উহা শনির ক্ষেত্র এবং অষ্টম স্থান হইতে বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়িতেছে। বৃহস্পতি ভারতের শুভকরী গ্রহ নহে। এই হেতু ভারতকে অর্থনীতিক বহুক্ষেত্রে নিরাশ হইতে হইবে। বিশেষতঃ ১৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল গ্রহ বক্রী হইয়া ৩০শে পৌষ মিথুনে পৌছিতেছেন। তিনি ১০ ফাল্গুন মার্গী হইবেন। অতএব এই সময়টী ভারতের পক্ষে শুভ নহে। শত্রু অকস্মাৎ মিত্রে পরিণত হইবে এবং মিত্র শত্রু হওয়ায়, হঠাৎ অশান্তির অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতে পারে। ভারতের ভাগ্যও ইহার সহিত বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শনি-মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি ভারতের প্রতি থাকায়, অন্নকষ্ট ও দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই দুর্দ্দশার অন্তে ভারতবর্ষ অনেকখানি স্বরাজলাভের আশা করিতে পারিবে বলিয়াই মনে হয়। কেননা, শনি যেমন ভারতের লগ্নপতি, তথা মঙ্গল কেন্দ্রস্থানের অধিপতি। তিনি বিরুদ্ধ গ্রহ হইলেও, ভারতের ভাগ্যবিধানের পরিপন্থী কিছু করিতে পারেন না, এবং প্রায় সময়ে বৃহস্পতিও ভারতের লগ্নের দিকে পূর্ণদৃষ্টি রাখিয়া অতিদ্রুত গতিতে তুলারাশিতে গমন করিবেন। এই সময়ে রাষ্ট্রগত উন্নতি ও স্ত্রীজাতির প্রাধান্য এবং সাম্যবাদের বিস্তৃতি লক্ষ্যে পড়ে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ নানারূপ আবর্ত্ত ভেদ করিয়া কিছু উন্নতির আশা করিতে পারে। দ্বাদশস্থ কেতু ভারতের ক্ষতির কারণ হইবে। কিন্তু অন্যান্য গ্রহগুলির সংস্থান যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে ১৩৫১ সালের শেষ ভাগে ভারতের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া যে আলোকরশ্মি দেখা যাইতেছে, তাহা ১৩৫২ সালের শেষভাগে স্ফুটতর হইবে। ভারতবাসীকে দুঃখ বরণ করিতে হইবে। দুঃখের ভিতর দিয়াই শুভ সূচনার সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। অতএব অমোঘ লক্ষ্যে ভারতবাসীর পক্ষে তপস্যারত থাকা বাঞ্ছনীয়।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনান্তের শেষে আজও বাতায়ন পানে চেয়ে দেখি
রুদ্ধশ্বাস ধরণীর ব্যথা-ভরা অন্তিম চাহনি—
উদ্ধতের পদাঘাতে ;—জয়োন্মাদে আজও হাসে মেকী
মিথ্যা আজও ছড়াইছে সর্ব্বগ্রাসী অনল দাহনী।

নাগিনীর বিষাক্ত-নিঃশ্বাসে জর জর সুন্দরের কায়
কেবা গা'বে জয়গান, কোথা আজি সত্যের পূজারী?
শিব দেখি শব হয়ে করালীর চরণে লুটায়
আজও কেহ জাগে নাই জাগিবে না কেহ ভয়হারী।

বাঁশী নাকি অসি হয়ে উঠেছিল বিদায়ের বেলা
কোথা সে সাধক যার কুসুমেতে বজ্রের পরাণ,
আজি আসিয়াছে ক্ষণ ছাড়িবে কি এপারের ভেলা
মূর্ত্ত হয়ে উঠিবে কি ধরণীতে যুগান্ত স্বপন!

পঁচিশে বৈশাখ পুনঃ আঁকিবে কি নব তুলিকায়
অসীমের সীমা রেখা,—নব রবি দিগন্তের গা'য়!

(তৃতীয় খণ্ড : ২৪শ পরিচ্ছেদ)

অক্ষয়তৃতীয়ার পরিকল্পনা স্থির করিলাম। সকলেরই মনঃপূত হইল। দক্ষিণেশ্বর হইতে ত্রিবেণী-তীর্থ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয়তীরে যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহা জাতির অতুলনীয় সম্পদ্। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গালী জাতি আত্মগঠনের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে।

"একদিকে যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মিলনতত্ত্বের দিব্য চিত্র থাকিবে, অন্যদিকে থাকিবে এই তীর্থমহিমার বিজয়ঘোষণা বেলুড় মঠের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এইরূপ যথাক্রমে ভাগীরথীর উভয় কূলের ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানের স্মৃতিচিত্রগুলি ধারাবাহিকরূপে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। পানিহাটী, খড়দহ, নবদ্বীপের স্মৃতিচিহ্ন, সেওড়াফুলীর নিমাই তীর্থ, শ্রীরামপুরের মার্সম্যান-কেরির জীবনবৃত্তান্ত কিছুই বাদ পড়িবে না। মূলাজোড়ের কালীমন্দিরের ইতিহাস, সংস্কৃত কলেজের বৃত্তান্ত। অপর দিকে গরুটীর ফরাসী গভর্ণর ও লর্ড ক্লাইভের ভগ্নাবশেষ দুর্গ। চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কীর্ত্তি দেবমন্দির। ভারতচন্দ্র রায়ের স্মৃতিরেখা। গোন্দলপাড়া ও বোড়ো, এই দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী লালবাগানে সপ্তগ্রাম হইতে তন্তুবায়কুলের আগমনবৃত্তান্ত। চন্দননগর গড়িয়া উঠার প্রাচীন ইতিহাস। শ্রীমন্ত সওদাগরের বোড়তে বোড়াইচণ্ডীর প্রতিষ্ঠা। চুঁচুড়ায় পর্ত্তুগীজদিগের আধিপত্য। হুগলী কলেজ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও ভূদেবমুখোপাধ্যায়ের কাহিনী। পর্ত্তুগীজদিগের ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ। অপর তীরে ভট্টপল্লীর সংস্কৃত সাহিত্যরক্ষার মহা প্রয়াস। বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরীর মন্দির। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনেত্রে আনন্দমঠের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কাহিনী। হালিসহরের রামপ্রসাদ। গরিফার কেশবচন্দ্র। ত্রিবেণীর চক্রহাটির তীর্থ-কাহিনী: ঘোষপাড়ার সহজিয়া সাধনার কথা। বাংলায় শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাপ্রচারের পর রাজা রামমোহনের প্রভাব।"

ভাগীরথী কূলের সাংস্কৃতিক কাহিনীপূর্ণ এই চিত্রশালা অক্ষয় তৃতীয়ার যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইল। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে সাড়া পড়িয়া গেল। কেহ ছুটিল দক্ষিণেশ্বর, পঞ্চবটীর শাখা ভাঙ্গিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মৃণ্মূর্ত্তির পাশে তাহা রোপন করিয়া দিল। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামীজীর শিরস্ত্রাণ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুকম্পায় বেলুড় তীর্থের উচ্চাসনে শোভা পাইল। কেহ মার্সম্যান-কেরির প্রথম মুদ্রণকার্য্যের নমুনা লইয়া আসিল। কেহ ছুটিল আলোক-যন্ত্র (Camera) লইয়া দিকে দিকে ভাগীরথীর উভয় তীরে যত প্রসিদ্ধ স্থান, সবগুলির ছবি লইয়া ভাগীরথীচিত্রশালা সাজাইয়া তুলিতে। কত পুঁথি, কত হস্তাক্ষর, কত প্রাচীন কীর্ত্তিমন্দিরের ভগ্ন ইষ্টকাদি 'ভাগীরথী চিত্রশালার' শোভা বৃদ্ধি করিল, তাহা বর্ণনায় শেষ হইবে না। হালিসহরের পঞ্চবটীর মাটী আনিয়া কেহ তাহার উপর পঞ্চবটী বৃক্ষের শাখা রোপণ করিল। কেহ বেণীমাধবের ধ্বজা আনিয়া ত্রিবেণী-তীর্থ সাজাইল। ভাগীরথী চিত্রশালা শোভা পাইল অসংখ্য চিত্রে, পটো-ছবিতে, পবিত্র দ্রব্যসম্ভারে; তাহার উপর কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পীর হস্তে বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের মৃণ্ময় মূর্ত্তি দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। হালিসহরের গঙ্গাবক্ষে নবাব সিরাজদৌলার তরণীতে রামপ্রসাদের মূর্ত্তির সম্মুখে সঙ্গীতমুগ্ধ সিরাজদৌলার মৃন্ময় মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা ভুলিতে পারিবেন না। মাঝি-মোল্লারের সকৌতুক দৃষ্টির দিকে চাহিয়া অনেকেই বার বার 'ভাগীরথী চিত্রশালা'র সেই দৃশ্য দেখিতে আগমন করিয়াছেন। কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমস্মৃতি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল "আনন্দমঠের" "মা যা হইয়াছেন" দৃশ্যে। ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদের নিকট হইতে সতীমার দীক্ষা-চিত্রটী অনেকের স্মৃতিতে আঁকিয়া গিয়াছিল। ঘোষপাড়া হইতে আনীত মাধবী-লতায় স্থানটীকে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথের 'শ্রীগৌরাঙ্গের চতুষ্পাঠী' চিত্রটী হুবহু মূর্ত্তিসহযোগে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহার পাশেই যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি। প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শনীতে যে তীর্থ রচিত হইয়াছিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ায়, তাহা অনুসরণ করিয়া আজিও অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবতীর্থ মহিমারূপে আদৃত হইয়া থাকে।

আচার্য্য বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, ভারতের সংস্কৃতি-রক্ষার জন্ম এখন আছে সংগোপনে সংস্কৃতিপরায়ণ শক্তিশালী অধ্যাত্মসংহতি। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সেদিন 'ভাগীরথী চিত্রশালা' রচনা করিয়া তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।

কিন্তু প্রকৃতির সহিত চির-সংগ্রাম করিয়াই আমাদের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। আয়োজন যখন সম্পূর্ণপ্রায়, অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। পশ্চিমের আকাশে যে কালমেঘ উঠিল, তাহা সারা আকাশ ছাইয়া প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিল। অক্ষয়তৃতীয়ার মণ্ডপ, চিত্রশালা ও বিপণি-শ্রেণীর গৃহাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটীর বুকে গড়া-গড়ি দিতে লাগিল। সে প্রলয়-ঝড় ঠেকাইয়া রাখার সাধ্য হইল না। তারপর আসিল মুশলধারে বৃষ্টি। আমরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সবই দেখিলাম। নৈরাশ্যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখের সীমা রহিল না। তারপর রাত্রি এক প্রহরে আকাশে তারা ফুটিল। প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধরিল। সঙ্ঘপ্রাণ কর্ম্মীরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনকার অবস্থা দেখিলে নিজেদের নিরুপায় ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা যায় না। কিন্তু বিপদের পর বিপদ্ যতই আসুক, কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়, তারপর কোথা হইতে অসাধারণ শক্তির আবির্ভাবে অসীম উৎসাহে বুক ভরিয়া যায়। তখন গলা ছাড়িয়া গাহিতে ইচ্ছা করে "হোক না বাধা আকাশ-জোড়া, প্রাণ যে ছুটে চলেছে।" এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। প্রকৃতির আঘাতে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের এই ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া আমাদের কর্ম্ম সুরু হইল। সারারাত্রি অসংখ্য কর্ম্মীর শ্রমে আবার উৎসবক্ষেত্র যে ভাবে ঝড়ের পূর্ব্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তদনুরূপ শ্রী ধারণ করিল। সন্ধ্যায় যাঁহারা নিরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নবসৃষ্টি দেখিয়া তাঁহারা সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, একরাত্রিতে যাহা হইয়াছে, তাহা মানুষের সাধ্যে সম্ভব নহে। সত্যই ইহারা দেবতার বরদূত!

অক্ষয়তৃতীয়ার দিন অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় উৎসবের কোন কর্ম্মই অসম্পূর্ণ রহিল না। দলে দলে সঙ্ঘমন্দিরে উপনীত হইলাম। সেখানে প্রস্তুত ছিলেন মহাদেবী অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধরিয়া। আমাদের পান-ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে অন্নক্ষেত্র তিনি স্বহস্তে রচনা করিয়াছিলেন, দশ বৎসরে তাহা অধিকতর সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। অন্নথালি হাতে সঙ্ঘতনয়ারা শত শত নর-নারীর পাতে অন্ন পরিবেশন করিল। সে জয়স্মৃতি চির জাগরূক থাকিবে। ভোজনসমাপ্তি হইবামাত্র গৃহদেবী স্মরণ করাইয়া দিলেন, আচার্য্য রায়ের আসিবার সময় হইয়াছে—তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া চমক হইল। প্রকৃতির প্রলয়-ঝঞ্ঝায় আমরা যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই দিক্‌টা মনেই ছিল না। তাড়াতাড়ি লোক পাঠাইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এই উৎসবের প্রাণসূত্রটী যেখানে বিধৃত রহিয়াছে, সেখানে আমি সচেতন নহি। কিন্তু তাহার জন্য এত বড় যজ্ঞ পূর্ণ করার আকূতি ও কর্ত্তব্য-বোধ একটুও ম্লান নহে। তাঁর স্থির প্রসন্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

অক্ষয়তৃতীয়ার উৎসবে যোগ দিতে কলিকাতা হইতে বহু লোক আসিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যোগ্য সমাদর দিতে পারি নাই। কালবৈশাখীর লীলা-তাণ্ডবে আমরা কিছু বিপর্যস্ত হইয়াছিলাম। নিরভিমান উদারচেতা প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের পরম সুহৃৎ সত্যানন্দ বসু ও যতীন্দ্রনাথ বসু এবং রায় বাহাদুর ফণীন্দ্রলাল দে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হইলে, ডাঃ রায় বলিলেন "তুমি একা মানুষ কত দিক্ করিবে? আমরা তোমাদেরই লোক। আমার জন্য তোমাদের আড়ম্বরপূর্ণ আহ্বানের প্রয়োজন নাই। চল, উৎসবসভায় যাই।"

আচার্য্যদেব উৎসবক্ষেত্রের সব দিক্ দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। সভাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"বাংলার অনেক আশ্রম তিনি দেখিয়াছেন, সঙ্ঘের অনেক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথাও অনেকে জানেন, কিন্তু শতাধিক তরুণকে এক-পরিবারভুক্ত হইয়া একনিষ্ঠ দেশসাধনার ব্রতী হইতে তিনি কোথাও দেখেন নাই। এই সকল তরুণেরা স্বাবলম্বী হইয়া আজীবন দেশসেবায়

জীবন উৎসর্গ করিবে। এই উৎসর্গের শক্তি কালবৈশাখীর ঝড় উপেক্ষা করিয়া এমন অপূর্ব্ব উৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ জানাইয়াছে। আমাদের সহানুভূতি সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হউক।"

উৎসব চলিল। ২৯শে বৈশাখ মেলার শেষ দিন ধার্য্য ছিল। সাধারণের আগ্রহাতিশয্যে আরও এক সপ্তাহ ইহার আয়ুর্বৃদ্ধি হইল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু অর্থব্যয়ে খদ্দরপ্রচারার্থে যে ম্যাজিক-লণ্ঠন লেক্‌চারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাহার প্রথম বক্তৃতা এইখানেই দেওয়া হয়। এই বৎসরে আমাদের পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মেলার শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ দিলীপ রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া এই উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন। কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী এই উৎসবে যোগ দিতে সম্মতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিতে অসমর্থ হওয়ায়, চন্দননগরের জননেতা ৺চারুচন্দ্র রায় সমাপ্তিসভার সভাপতি হইয়া যে কয়টী কথা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম আজিও আমাদের স্মরণে আছে:

> প্রবর্ত্তকসঙ্ঘ সম্বন্ধে তাঁর ও দেশের জনসাধারণের সম্প্রদায়-জ্ঞানে যে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধ ভাব ছিল আজিকার এই মেলা উপলক্ষে তাদের সহিত পরিচয়ে তাহার নিরসন হইল। সঙ্ঘ সত্যই জাতির কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—তাদের কর্ম্ম স্পষ্ট, উদ্দেশ্য স্পষ্ট; তাদের পরিচয় তাদের জীবনের কর্ম্মেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।"

অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নীরব সাধনা যে পথ ধরিয়া জাতির প্রাণে নব প্রেরণা সঞ্চার করিতে চাহে, এই বৎসরের উৎসবে তাহা সত্যই সার্থক হইয়াছিল। অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব সঙ্ঘের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে।

উৎসবসমাপ্তির পর স্বভাবতঃই দৃষ্টিটা বিস্তৃত দেশের দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আত্মসাধনার আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া কিছু সময় এইরূপ বাহিরের কাজে চিত্তকে ছাড়িয়া দিতে হয়, নতুবা আপনার মধ্যে সতত নিবিষ্ট হইলে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠে—আমি এই সময় সাধ্যমত অন্তরের রূপান্তর সাধনের যে কঠোর তপস্যা, তাহা হইতে কিছুটা মুক্ত হইতেই চাহিতাম। আমার চিন্তাজগতে ছিল মহাত্মাজীর রাষ্ট্রসাধনার অপরূপ ভঙ্গী। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁর চেতনার ছন্দটী যেভাবে লীলায়িত হইত, তাহাতে আমি বেশ পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম।

এই সময়ে আহ্মেদাবাদে জননেতারা সমবেত হইয়াছিলেন। গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল-প্রবেশ সমস্যা লইয়া মহাত্মার সহিত এক শ্রেণীর লোকের যে মতবিরোধ হয়, দিল্লীতে তাহা জোড়াতাড়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কোকোনদ কংগ্রেসেও বিষয়টা তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আহ্মাদাবাদে মহাত্মাজী নিজেকে পরাজিত ঘোষণা করিয়া, তদানীন্তন স্বরাজ্যদলের নেতা চিত্তরঞ্জনকে জয়গৌরবে ভূষিত করেন। মহাত্মাজী কাউন্সিলপ্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চরকা আশ্রয় করিয়া চাহিয়াছিলেন একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রচক্র নির্ম্মাণ করিতে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "We want a definite nation with an iron will, we shall have to enforce upon us discipline." তিনি এক বজ্রশক্তিসম্পন্ন সুনির্দ্দিষ্ট জাতি-সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, যে জাতি তপঃপূত হইয়া জাতির মুক্তিপথ প্রশস্ত করিবে। ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষ বলিতেন, চরকা-তাঁতশালা গঠন করিয়া খদ্দরবয়নে ও পরিধানে, সমাজশুদ্ধিতে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনে দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নহে। পরতন্ত্রের সহিত নিয়ত সংঘর্ষ ও ঘাতপ্রতিঘাত জাতিকে বীর্য্য দিবে। সেই বীর্য্যই সদা-বিজীগীষু ও উদ্দাম-চঞ্চল হইয়া স্বরাজলাভের পথ প্রশস্ত করিবে। মহাত্মাজী এই সংঘর্ষমূলক নীতিকে আমলে আনিতেন না। তিনি অধ্যাত্মতপঃপ্রয়োগে ঐক্য ও মুক্তিধর্ম্মী অখণ্ডজাতিনির্ম্মাণের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি যে কর্ম্মসূত্র জাতিকে ধরাইতে চাহিতেছিলেন সে সূত্র—একটী ঐকান্তিক সমষ্টি। কংগ্রেসের কর্ম্মচক্র তিনি একদল অখণ্ডবিশ্বাসী তপঃপরায়ণ কর্ম্মীর হাতেই সমর্পণ করিতে চাহিতেন। তাঁহার মতে 'homogeneous body' না হইয়া 'heterogeneous body' লইয়া কার্য্যে উদ্যত হইলে ভারতের মুক্তিযজ্ঞ ব্যর্থ হইবে। আহ্মেদাবাদের মহামিলনে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তিনি চক্ষের জল দুই হস্তে মুছিয়া স্বরাজ্যদলের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন। কটিবাস-

পরিহিত ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সন্ন্যাসী ঐক্যবদ্ধ সমষ্টির সাধনায় সংগঠনকার্য্যে স্বতন্ত্র হইয়া রহিলেন। তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্য আজিও হয়তো সিদ্ধ হয় নাই।

মহাত্মাজীর প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের মধ্যে গভীরভাবেই আলোচনা চলিত। সঙ্ঘের ইতিহাস যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সুরু হইয়াছে, সে লক্ষ্যের সহিত বৃহৎ ব্যাপক ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর কর্ম্ম তুল্যই মনে হইত। সঙ্ঘ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি লইয়া একত্র হইতে চাহে নাই—অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ একদল তরুণের জীবন লইয়া ঐক্যবদ্ধ সমষ্টিরচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, প্রত্যেকেরই জীবনের ক্ষুদ্র পরিধিক্ষেত্রে অপ্রচুর শক্তির আশ্রয়ে প্রত্যেককেই শক্তিশালী করিবার তপস্যাই ছিল সঙ্ঘের লক্ষ্য। একান্ত অখ্যাত ও অশক্ত জীবন আত্মসমর্পণের মন্ত্রে জ্ঞান ও শক্তিসমন্বিত হইয়া উঠিবে এবং একত্র সাধনরত থাকার ফলে পরস্পর প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনে সমষ্টিবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনে ছড়াইয়া পড়িবে, এই প্রেরণায় আমি উদ্বুদ্ধ থাকিতাম। প্রত্যেক তরুণ ও তরুণীর পশ্চাতে তাহাদের সামর্থ্যের সীমাকে অস্বীকার করিয়া অনন্ত বীর্য্যের আধার তাহারাই, এই প্রেরণায় তাহাদের সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিতাম। সময় ও শক্তির অপচয় বোধ হইত না। এই বিষয়ে আমার ঔদাসীন্য ছিল নিজের স্ত্রীর প্রতি। তাহার হেতু সেদিন খুঁজিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজ তাহার একটা যুক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেছে তাঁহাকে আমি আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতাম না। অথচ এই অখণ্ড আত্মানুভূতির পরিচয় দিবার মত ঘটনা সৃষ্টি করিতে পারিতাম না। এই বোধ জাগ্রত রাখার সুযোগও আমি পাই নাই। এইখানেই মারাত্মক ব্যবধানে উভয়ের মধ্যে যে অন্ধকার জমিয়া উঠিত, তাহাতেই আমরা মাঝে মাঝে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতাম। কিন্তু সত্তার ধর্ম্ম শাশ্বত অমৃত, তাহাই পুনঃ পুনঃ আমাদের মধ্যে ব্যবধানের মাত্রা হ্রাস করিত। জীবনসঙ্গিনীর কাহিনীতে এই তত্ত্বই নিহিত আছে।

দিন চলিতেছিল ভালই। সে ভাল সতর্কতার ছন্দঃ ব্যতীত কিছু নহে। সাবলীল চেতনার ছন্দে ভাল যদি রূপ না লয়, বিধাতা সে ভাল চিরস্থায়ী করেন না। আবার এক দুর্ঘটনায় আমায় বাহিরের দিক্ হইতে অসমাপ্ত অন্তরসাধনায় মুখ ফিরাইতে হইল।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম—একটী তরুণী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাদের মধ্যে সাধনার আবর্ত্ত ছিল বটে, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে আমরা দূরেই ছিলাম। আমরা যে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারি অথবা আমাদের মধ্যে কাহারও অকালমৃত্যু ঘটিতে পারে, এই ধারণা আমাদের মধ্যে স্থান পাইত না। মেয়েটীর নাম করুণা। শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর পঞ্চদশবর্ষীয়া এক ভগিনী। তাহাকে লইয়া আমরা সকলেই বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ মেয়েদের পিতৃত্ব ও প্রভুত্বের আমিই ছিলাম একমাত্র আশ্রয়। আশ্রিতাকে রক্ষা করার গুরুতর দায়িত্ব আমারই ছিল। আমাকে ব্যস্ত দেখিয়া নির্ম্মলচন্দ্র বলিল "আপনি এই বিষয়ের সমস্ত ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হউন।" তারপর আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, নির্ম্মলচন্দ্র এই কিশোরীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মলমূত্র-পরিষ্কারের সকল ভারই সে গ্রহণ করিল। সঙ্ঘের মেয়েদের সহিত ছেলেদের যে অপার্থিব ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধের পরিচয় সেদিন পাইয়াছি, তাহা চিরস্থায়ী হইলে আশ্রমের সাধনা যে সিদ্ধ হইবেই, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

নির্ম্মলচন্দ্রকে অকপটে এই কালব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া, নির্ম্মলা দেবীকে তাহার সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করিলাম। তারপর চিন্তা আসিল, এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে সকলকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি আহারাদির ব্যাপার এ বাড়ীতে একেবারে বন্ধ করার আয়োজন করিলাম। আমার স্ত্রী তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন "এই বৃহৎ বাড়ীর এক পার্শ্বে রোগিণী থাকিবে। রন্ধনশালা এখান হইতে বহু দূরে। তোমার সব কাজেই বাড়াবাড়ি ভাল নহে।"

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখনই তিনি দাঁড়াইয়াছেন, তখনই বিরোধের আগুন জ্বলিয়াছে—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। আমি আমার ভক্ত বন্ধু অরুণচন্দ্র সোমের নিকট

গিয়া জানাইলাম—তাহার বাড়ীতেই এক সপ্তাহ সঙ্ঘের ভোজনাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পত্নী আমার প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন, তিনি বলিলেন "ঠাকুর, আপনার এইটুকু কাজের ভার আমি বহিতে পারিব।" তারপর সঙ্ঘের মেয়েদের লইয়া তিনি কর্ম্মতৎপর হইলেন। অরুণচন্দ্রের বাড়ী সন্ন্যসন্তানদের কণ্ঠরবে মুখরিত হইল। সঙ্ঘের ইতিহাসে এই ভক্ত-পরিবারটী অক্ষয় স্মৃতি হইয়া থাকিবে। শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা অরুণ সোমের সাধ্বী পত্নী। তিনি জানিতেন—ঠাকুরকে খাওয়াইতে হইলে, আমার সহধর্ম্মিণীর সম্মতি লইতে হইবে। এই সৌজন্যবোধের শালীনতা তাঁহার স্বভাব আভিজাত্যে অনুস্যূত ছিল, তিনি তদনুযায়ী কাজও করিতেন। গৃহদেবী ইঁহার প্রতি চিরদিনই স্নেহপরায়ণা ছিলেন। কাজেই তাঁহার কথার উত্তরে 'না' করিতে পারিলেন না।

বাহিরের সৌষ্ঠব বজায় করার সঙ্গে অন্তরের দাবী যদি বিরোধী হয়, সে সমস্যার সমাধান সহজে সম্ভব নহে। আমাদের উভয় পক্ষেই এইরূপ দায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সত্য সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, সমস্যা যতই জটিল হউক তাহা নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু আমার সত্তার ধর্ম্ম সবখানি মনের বিষয় ছিল। দৈনন্দিন ঘটনার সামঞ্জস্য-বিধানে মনের খানিকটা অংশ সর্ব্বদাই ছাড়িয়া চলিতে হয়, নতুবা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং ইহাতে লক্ষ্যসিদ্ধিরও অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটে। এত ভাবিয়া চলার দিন সে সময়ে ছিল না। আমি একরোখা হইয়া নিজের লক্ষ্যকেই সবখানি করিয়া দেখিতাম। অন্যের, বিশেষতঃ যাঁহাকে চিরসঙ্গিনী করিয়া লইতে হইবে, তাঁহারও যে কিছুটা অংশ আছে, সেটুকু আমলে না আনিয়া চলার স্বভাব আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। আমি মধ্যাহ্ন স্নান সারিয়া শ্রীঅরুণচন্দ্রের বাড়ীর দিকে ভোজনের জন্য পা বাড়াইতেই, গৃহলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সমস্ত হৃদয়খানি দিয়াই অনুরোধ জানাইলেন, একবার আমায় রন্ধনশালার দিকে যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া দেখিলাম, তিনি রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া আমার আসন বিছাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন "দুটী ভাত মুখে দিয়া যাইতে হইবে।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"তোমার আক্কেল কি? শ্রীমতী বিদ্যুল্লতাকে বলিয়াছ আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে, তাহার অন্যথা কর কি প্রকারে?"

তিনি বলিলেন—"তুমি দুটী ভাত মুখে দিয়া স্বচ্ছন্দে সেখানে আহার সমাপ্ত করিও।"

কথাটা আমার ভাল লাগিল না। মধ্যাহ্নভোজন দুইবার করার যুক্তি অসঙ্গত মনে করিয়া, আমি তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলাম "তোমার কাজের মাথামুণ্ড নাই, যাহা খুশী করিয়া চল। তোমার কথা আমি শুনিব না।"

আমি সটান বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অরুণচন্দ্রের বাড়ী ভোজনাদির ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। পরম উৎসাহে ভোজন সাঙ্গ করিয়া আশ্রমে গিয়া বিশ্রাম করিলাম। সান্ধ্যোপাসনার পর পুনরায় অরুণচন্দ্রের বাড়ী সকলে উপস্থিত হইয়া ভোজন সমাপ্ত করা হইল। বিসূচিকারোগাক্রান্ত মেয়েটীর শুশ্রূষায় ত্রুটি হইল না। সন্ধ্যার পর তাহার অবস্থা ভাল মনে হইল না। ডাক্তার ও ঔষধের অভাব হয় নাই। কিন্তু রোগিণীকে যেন আর বাঁচান যায় না। ডাক্তারেরা স্যালাইন ইন্‌জেক্‌শান করিলে রোগিণী কিছু সুস্থ হইল। আমি শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা। গৃহদেবী একটী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া আছেন। মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটী ভারী-ভারী। মধ্যাহ্নে কি এমন অপ্রিয় ব্যবহার করিয়াছি, যাহার জন্য তাঁহার এইরূপ অভিমান হইতে পারে! আমার মনে হইল—তিনি উপবাসেই আছেন। আমার মধ্যম শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সমর্থনও পাইলাম। আমার চারিদিকেই যেন অস্বস্তির আগুন ছড়াইয়া আছে। চলিতে ফিরিতে দগ্ধ হই। হৃদয় লইয়া এমন নিষ্ঠুরতা বিধাতা কেন করেন? একদিক্ দেখিতে যাই, অন্য দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠে। আমি অস্থির হইয়া বলিলাম "তুমি আমায় পাগল করিবে নাকি? বাড়ীতে কঠিন ব্যায়রাম, অন্যের বাড়ীতে খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গাম, ঘরে আসিয়া শান্তির মুখ দেখিতে পাই না! আমায় কি পাগল করিতে চাও?"

তিনি কথার উত্তর দিলেন না। এইরূপ স্তব্ধতা অধিক মারাত্মক। কথার উপর কথা চলিলে, ক্রোধের

মাত্রাটা কিছু কমে। কিন্তু বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যদি নীরব থাকে, অন্যকে কিরূপ উৎপীড়িত হইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী বুঝিবে। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম "তুমি সারাদিন উপবাসে থাকিয়া এই দুর্দ্দিনে আমায় উদ্ব্যস্ত করার কি হেতু আছে? চুপ করিয়া থাকিও না, জবাব দাও, নতুবা আমায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

বিরক্ত হইলেই আমার মনে হইত—কোথাও চলিয়া যাই। কিন্তু যাওয়ার দৌড় ছিল শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত।

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। আমার দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আমাকে তুমি হত্যা কর, আমি তোমার সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে পারি না। তোমাকেও কষ্ট দিই, নিজেও কষ্ট পাই। এই দুঃখ আর সহিতে পারি না।"

নিজের লক্ষ্যে আমার সুকঠোর যাত্রা; সেখানে কোন বাধা স্বীকার করিতে পারি না। জীবনটা যখন নিজের জন্য এক বিন্দু নহে, তখন আমায় ঠেকাইবে কে? এইরূপ একটা স্পর্দ্ধিত মনোভাবে প্রেরণার পর প্রেরণার আকর্ষণে ছুটিয়া চলি। কিন্তু আমার এই নিষ্ঠুর যাত্রা তখনই স্তম্ভিত হয়, যখন প্রিয়জনের চক্ষে ব্যথার অশ্রু ঝরিতে দেখি—ভাবিতে হয় অন্যের অবস্থার কথা। আমি তাঁর কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলাম "অতি সামান্য ঘটনা লইয়া পদে পদে নিজেও বিরক্ত হই, তোমাকেও বিরক্ত করি। আমি নিজেই বুঝিতে পারি না যে, কেমন করিয়া তোমাকে খুশী রাখিব। আজিকার ঘটনা বস্তুতঃ কিছুই নহে, তবুও তোমার এত দুঃখ, আমি এ অবস্থায় কি করিতে পারি বল।"

তিনি আমায় কাছে বসিতে বলিলেন এবং পরে কহিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা করিয়া যাও, সেখানে আমার আর প্রতিবাদ নাই। কিন্তু যেটুকু কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত রাখ, সেখানে আমায় নিজেই আঘাত দিয়া ব্যথা দাও। এই সব ইচ্ছা করিয়া কর অথবা আপনাকে ভুলিয়া অন্যকে ব্যথা দাও, বুঝিতে পারি না।"

আমি তাঁর কথার গভীরতা অনুভব করিলাম। কিন্তু কি তিনি বলিতে চাহেন, জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম। তিনি বলিলেন "তুমি যাহা চাহ, তাহাই আমার চাওয়া হোক—এই সাধনাই করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু একবার তোমার চাওয়া বলিয়া যাহা ধরি, তাহাই যদি দুই দিন পরে তোমার চাওয়া নহে, আচারে আচরণে বুঝাইয়া দাও, কি উপায় করি বলতো?"

কি বলিতে চাহেন তিনি! জীবনের সঙ্গিনী—কি পথ তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, যাহা আমারই পথ অথচ আমি আজ তাহা অস্বীকার করিতেছি? আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "কোথায় তোমার বাধা হইয়াছি বলতো?"

তিনি বেশ শক্ত হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন "আমি কি চাহিয়াছিলাম তোমার জন্য স্বতন্ত্র রন্ধনশালা? তোমার সঙ্কেতেই কি নূতন চুল্লীতে রন্ধনের আগুন জ্বালাই নাই? এ ধর্ম্ম কি তোমারই দেওয়া নহে? সেই ধর্ম্মরক্ষা কি আমার জন্য? তোমার পাতে অন্ন দেওয়ার অধিকার হইতে আমি যেদিন বঞ্চিত হইব, সেদিন আমায় অভুক্ত থাকিতে হইবে, ইহা কি তুমি জান না?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "তুমি এমন করিয়া জিনিষটা গ্রহণ করিয়াছ, এরূপ ধারণা আমার ছিল না।"

তিনি বলিলেন "তুমি সবই ভুলিয়া যাও। মেজদিদির বাড়ী দুর্গাপূজার সময়ে তোমার মধ্যাহ্নভোজনের বিরোধী হওয়ার কারণ কি লক্ষ্যে পড়ে নাই?"

আমার মনে পড়িল বটে—মেজ বৌয়ের নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিতে দেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার যে এতখানি সাধননিষ্ঠা আছে, তাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কি বলিব আমি! ইহা তো কিছুর প্রভাব নহে। কোন প্রকার অনুকরণের দায়েও তো তাঁহার এই আচরণ নয়। জন্মগত অধিকার লইয়া গুরু ও শিষ্যের প্রকাশ হয়, এই সম্বন্ধ উপমেয় হয় সখ্য, শান্ত প্রভৃতি পঞ্চ প্রকারে। কিন্তু এই পার্থিব সম্বন্ধ শুধু উপমার জন্য, নতুবা পৃথিবীর সম্বন্ধ এইখানে উভয়কেই প্রভাবিত করিতে পারে। আমি এক মুহূর্তের মধ্যে এই অপ্রাকৃত প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিলাম। প্রেম সত্যই ইন্দ্রিয়াদিভোগের কত ঊর্দ্ধে! এই নারীর আত্মদানের মহিমা আজিও উপলব্ধির সীমায় পাওয়া যায় না। সে একজন, যার জন্য বহুজন এমনই অসাধারণ আনুগত্যের সাধনায় অতি তুচ্ছ

কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নিষ্ঠার সাধনা করে। দেবি! তোমার পাকশালায় যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা মানবের মধ্যে যে অপ্রাকৃত সত্তা তাহারই উদ্দেশ্যে। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মর্ম্ম কে বুঝিবে? আমার চক্ষে জল আসিল। সে রাত্রিতে আমার উদরপূর্ত্তি হইয়াছিল, তিনি অনশনে রহিলেন। পরদিন হইতে আর আমার অন্যত্র ভোজন সম্ভব হইল না। রন্ধনশালার সম্মুখে আসন পাতিয়া তাঁর পূজার অর্ঘ্য প্রতিদিন লইতে হইল। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীতে এই যে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ, সেখানে স্বার্থের লেলিহান রসনা পৌঁছায় না, যেখানে নিজেকে অসহায়া মনে করিয়া হাত বাড়াইবার প্রয়াস নাই—এই অক্ষয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। সত্যই সে একজন, যাহার মধ্য হইতে স্বভাবের আকর্ষণ চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছিল। সেই আমার পূত আশ্রয়—যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যোগজীবনের ভিত্তিরচনায় আমি উন্মুখ। দেবি! এই প্রেমই অমৃত। এখানে যে স্বার্থ নাই, কামনা নাই, তোমার জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাই সাহস করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছি যুগের মানুষ। তোমাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে প্রেম লাভ করুক। তবেই সজ্ঘ। তবেই নব জাতি। (ক্রমশঃ)

বিশ্বের আহ্বান

শ্রীকালিদাস রায়

সকাল হ'তেই মনটা কেমন ভাবছি ব'সে তাই,
অনেক পুণ্যে পেলাম আমি এই দুনিয়ায় ঠাঁই।
দিলেন বিধি বিরাট জগৎ, বিশাল নীলাকাশ,
তার মাঝারে বানিয়ে খাঁচা করছি তাতেই বাস।
কাহার পরিহাস?
দানটা তাঁহার বিরাট বটে, কেমন ক'রে লই?
আমার যে হায় নেইক পুঁজি ক্ষুদ্র মুঠি বই।
বিরাট সাগর তার মাঝারে রত্ন দামী দামী,
লোণা জলই ভাগ্যে ঘটে, ক্ষুদ্র কলস আমি
যতই উঠি নামি।
বিধির জগৎ বিরাট বটে, হায়রে আসল কথা,
আমার জগৎ মুষ্টিমের বিরাট শুধু ব্যথা।
এই দুনিয়ার কতটুকু ভূগোল ছাড়া জানি,
জুড়ালো চোখ এই প্রকৃতির হায়রে কতখানি,
দেয় সে যে হাতছানি।

বিশ্বভরি রূপে রসে এতই সমারোহ,
কতটুকুর ভাগ পেয়েছি? কোথা সে আগ্রহ?
দুয়ার গোড়ায় যা আসে হায় তাও করেছি হেলা,
ক'জন সাথী নিয়ে আমার এই দুনিয়ার খেলা।
ফুরায়ে যায় বেলা।

সূর্য্য ওঠে সূর্য্য ডোবে, দিনের পরে দিন,
ঋতুর চাকা আসছে ঘুরে রীতির পরাধীন।
পরমায়ুর বেশির ভাগই একটি ঘরে থেকে
যাচ্ছে কেটে জানলা দিয়ে একই ছবি দেখে,
কপোলে হাত রেখে।
এই কি ধাতার অভিপ্রেত? তাই যদি হয় তবে,
জগৎখানা তাঁহার এত মস্ত কেন হবে।
পা দিল কে, জগৎ জুড়ে দেয়নি সে কি পথ?
চোখ দিল যে, সে বলে কি দেখো না জগৎ?
দেয়নি বটে রথ।
আজকে আমার প্রাণ কেঁদেছে বিশ্ব ভুবন লাগি'
ঘরের কোণে হায় প্রবাসী বিরহ রাত জাগি।
সাধ জাগে আজ সবার সনে করতে পরিচয়,
রথীর না হোক, দীন পদাতির তাইত দিগ্বিজয়,
বীরের অভিনয়।

একটি জোড়া পাখা পেলে সাধ মিটিত তবে?
এ চোখ পায়ের যে দশা হায় পাখারও তাই হবে।
খাঁচায় ঢোকা স্বভাব যাহার একান্ত প্রবল
খাঁচার মাঝে পাখা পাওয়ায় হায়রে কিবা ফল?
যন্ত্রণা কেবল।

জলকল্লোল

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রীদামের সঙ্গে গিয়ে বসতুম বাগবাজারের ওই ষ্টীমারঘাটের পাশে। ওখানকার ঢালুর পাড়ে বটের নীচে একটা নালার মুখ ছিল সিমেন্ট্-বাঁধানো—সেইটি ছিল আমাদের সন্ধ্যার আসন। ওইখানে ব'সে আমরা ধূমপান করতুম। আমাদের ধূমপান ছিল সকল সংস্কারমুক্ত। রসসাহিত্যে শ্রীদামের প্রগাঢ় আসক্তি দেখতে পেতুম। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল তার। ছোট, বড়, মাঝারি—সকল কবি ও উপন্যাসিকের সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ ছিল তা'র নখদর্পণে; অপরের রচনার অংশ অনর্গল সে মুখস্থ ব'লে যেতে পারতো। কিন্তু মুস্কিল এই, যাকে ইংরেজিতে বলে, টলারেশন্—সেটি শ্রীদামের ছিল কম। তাকে যে বিদ্রূপ করেছে, কিম্বা তাকে আনন্দ দিতে 'যে পারেনি, অথবা কৃত্রিম প্রচারকার্য্যের সাহায্যে যারা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে চলেছে,—শ্রীদাম এমন ব্যক্তিকে কোনও প্রকারেই বরদাস্ত করতে পারতো না। যারা জাত-লিখিয়ে, যারা ঘষে-মেজে লিখতে শিখেছে, যে সকল অপদার্থ কেবল মক্স করার অভ্যাস আর অনুশীলন থেকে লেখকপদবাচ্য হয়ে উঠেছে,—অথবা ভালো লেখক হয়েও যারা প্রতিকূল অবস্থার থেকে মাথা তুলতে পারছে না,—এমন প্রত্যেক লেখককে সে চিনে বার করতো। হয় তাদের সে ভালোবাসতো অন্ধের মতন, নয়তো ঘৃণা করতো উন্মাদের মতন। অনেক সময় আমি তাকে সামলে রাখতে পারতুম না।

তাকে প্রশ্ন করতুম, ভালো সাহিত্য-সমালোচক তুমি কা'কে বলো?

শ্রীদাম বলতো, রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচারে যে-ব্যক্তি তা'র রচনাশক্তি আর প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছে, তা'কেই ভালো সমালোচক বলবো। বাদবাকি সব ঝুটো, মেকি, অপদার্থ! বঙ্কিমচন্দ্রের গোয়ালে জাবর কেটে দু'একজন খিস্তিবাজ লোক নতুন লেখকদের গাল্ দিয়ে সমালোচক হচ্ছে, কিন্তু তারা না এ-যুগের, না-সে যুগের। তারা ত্রিশঙ্কু!

শ্রীদামের ব্যক্তিগত আক্রমণ ভারি কর্কশ ছিল। আমি ওটার আনন্দ পেতুম না, একথা সে জানতো। একসময় রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা তুলে সে প্রায়শ্চিত্ত করতো।

ওই পল্লীটি ছিল শ্রমিকপ্রধান, সুতরাং আমরা বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম না। সেটা আমাদের আয়োজন আর আহরণের কাল, আমরা ঘুরি ঘাটে ঘাটে, শ্মশানে-মশানে—আমাদের জীবনযাত্রা ছিল লোকচক্ষের অন্তরালে, গতিবিধি থাকতো গোপন। হয়তো এক সময় শ্রীদাম দুই চোখ রাঙা ক'রে প্রশ্ন তুলতো, যে-জীবনে দায়িত্ববোধ জন্মালো না, সে-জীবনটা কেমন?

প্রশ্নটা যেন ছুঁয়ে থাকতো গঙ্গার নৌকায়-নৌকায়, আর পশ্চিমের পাণ্ডুর বর্ণরেখায়। সে বলতো, কোন্‌টায় সাড়া ওঠে তোমার মনে? মানুষের আনন্দলোক, না জীবনমূল্যের দুঃখবাদ? কিন্তু একি সত্যি নয় যে, সকল সাহিত্যের জন্ম বেদনা-বোধ আর বিয়োগান্ত থেকে?

শ্রীদাম অস্থির হয়ে বেড়াতো। নিজের ভিতরে ছিল তা'র প্রচণ্ড বিরক্তি আর অস্বস্তি; সে কারও মান রেখে অথবা মুখ চেয়ে কথা বলতো না। সত্যকার পদার্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য এক এক সময়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো—বহু অপদার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতো। তারপর একদিন ফিরে আসতো ক্লান্ত হয়ে, যেন বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্য সঙ্গে নিয়ে সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো ছোট-বড় সবাইকে। ফিরে এসে সে বলতো, মানুষ যে দেবতা নয়, এটা কবে শিখবো বলোতো? এত ছোট ওরা? দূরের থেকে মনে হয় মহতোমহীয়ান্, কাছে গিয়ে দেখি কীটানুকীট!

শ্রীদাম তাদেরই একজন, যারা কোনোকালে সামাজিক মানুষ হ'তে চাইলো না,—যারা নিঃস্বের দলে আর বঞ্চিতের পাড়ায় ঘুরে ঘুরে নিজেকে খরচ করলো। শ্রীদামের চোখে চশমা ছিল, তা'র একদিকের ডাঁটিভাঙা, অন্য ডাঁটির এক অংশ সুতোবাঁধা। ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া আর ময়লা কাপড়-জামা নিয়ে শ্রীদাম কোনোদিন লজ্জাবোধ করেনি। পথে পথে খেয়েছে চা, আর মাঝরাত্রে উপোস ক'রে বিছানা নিয়েছে। যে-দিন তা'র পকেটে আনা দুই পয়সা, সেদিন তা'র মস্ত উৎসব। সে বলতো, মা গঙ্গা সাক্ষী, আমি যেন কোনোদিন রোজগার না করি।

বলতুম, তোমার চলবে কি ক'রে?

শ্রীদাম জবাব দিত, কাক-চিল-শকুনি এদের চলে, আমার চলবে না ?

শিক্ষিত সমাজে তা'র আদর ছিল তার অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য। কিন্তু প্রত্যেকটি লোককে সে ঘৃণা করতো মনে মনে। অনেক সময়ে দেখতুম শ্রীদাম তলিয়ে গেল অনেক নীচেকার নোংরায়—ভাঁড়, চাটুকার, ফড়ে, দালাল, ভাটিখানার লোক, জুয়াড়ী, গাড়োয়ান, হোটেলের চাকর, পানওয়ালা,—এদের মধ্যে ঢুকে নেশা ক'রে সে বুঁদ হয়ে থাকতো; আবার সে উঠে আসতো ভদ্রসমাজে ওর অসামান্য বিদ্যানুরাগ নিয়ে। শ্রীদামকে দেখে মাঝে মাঝে বিস্মিত হতুম।

এতকাল পরে শুনছি শ্রীদাম নেই! শ্রীদাম একেবারেই নিরুদ্দেশ।

পরম্পরায় তার সম্বন্ধে যা' শুনতে পেলুম, তা' এই। সবাইকে এতকাল ধ'রে সে ঘৃণা ক'রে এসেছে। কিন্তু একদিন রাত্রে আকণ্ঠ মদ্যপান ক'রে সহসা সে উপলব্ধি করলো, সে নিজে সকলের কাছে ঘৃণ্য এবং উপেক্ষিত। এই চিন্তা তা'কে আর স্থির থাকতে দিল না। শেষ রাত্রের দিকে তা'র ডাঁটিভাঙ্গা চশমা-জোড়া খুলে রেখে একখানি ধুতি পরণে জড়িয়ে খালি পায়ে পথে বেরিয়ে কোথায় যেন সে চ'লে গেছে। দু'বছর হ'তে চললো তা'র সন্ধান মেলেনি। একজন বিশিষ্ট বন্ধু জানালো, গঙ্গা থেকে তা'র বাড়ী বেশী দূর নয়, রাত তিনটে নাগাৎ গিয়ে সে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছে!

শ্রীদাম যদি কোনোদিন ফিরে আসে, আমার এই লেখা সেদিন পরিবর্তন ক'রে দেবো। কিন্তু মনে হয়, গঙ্গায় ডুবেই সে তা'র চিরজর্জর দেহের বিনাশ সাধন ক'রে গেছে। গঙ্গা ছিল তার বড় প্রিয়। ওই ষ্টীমার-ঘাটের পাশে সিমেন্ট-বাঁধানো আসনে ব'সে দেখেছি তা'র কণ্ঠে মহাকবির কবিতা জ্ব'লে উঠত—

"ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর থাক পড়ে তীরে—
তাকাসনে ফিরে।
সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"

মথুরার বিশ্রাম-ঘাট, আর বৃন্দাবনের কালীয়দমনের সেই ভাঙ্গা ঘাট। সেই যে আমরা হেঁটে গিয়েছিলুম—আমি আর সাধু। হেমন্তের মধ্যাহ্ন মনে পড়ছে, আমি আর সাধু। কিছু চড়া রোদ, কিছু বট আর মহুয়ার ছায়া, ভাঙ্গা পাথরের ঘাটে কিছু পৌরাণিক প্রাচীনের স্বাক্ষর; তা'র সঙ্গে ধীরসমীর আর বংশীবটের কত কালের স্মৃতি ধুলোয় ধুলোয় ঘুরে বেড়ায়। বালু-প্রান্তরের কোলে বিস্তীর্ণ যমুনা, ওপারে কত বন, কত বনান্তর—এপারে কত উত্থান-পতনের কাহিনী পাথর আর মৃত্তিকার স্তরে স্তরে। কী নির্জন, কী নিস্তব্ধ ঘাট, কী একাকিনী যমুনা, কী নিঃসঙ্গ ধূলিধূসর প্রান্তর! যেন কথা আছে বিপুল, যেন সমুদ্রপরিমাণ অতীত কাহিনী বায়ুতরঙ্গের দোলায় দোলায়। সাধু একান্ত একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে একসময়ে ব'লে বসতো, তুমি ফিরে যাও, আমি যাবো না!

সাধু গিয়ে বসলো কনখলে দক্ষরাজার ঘাটে। সেখানে বটের ছায়ার নীচে উপলমুখরিত গঙ্গার ধারা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে কল-উল্লোলে ছুটে চলেছে। অদূরে গঙ্গার অসংখ্য ধারার কোলে কোলে বাবলার বন, ওপাশে চণ্ডীর পাহাড়, এধারে হৃষীকেশের পথ। সাধু দেখে শুনে বললে, আমাকে আর পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে যেয়ো না। এখানকার গঙ্গায় আমি ঘুরে বেড়াবো, থাকব ওই মুনিদের আশ্রমে।

সাধু চললো গঙ্গার ধার দিয়ে গুরুকুলের পথে। সেইখানে নিরিবিলি এক ঘাটের ধারে ব'সে সে গান ধরলো—

"বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে-যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে;
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না?

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেম্‌নি ক'রে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?"

হরিদ্বারের ধর্ম্মশালায় প'ড়ে বারান্দায় শীতে কুঁকড়ে আছি হয়ত কম্বলের মধ্যে। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বারান্দায়, নীচে শুনছি গঙ্গার জলের শব্দ, পাথরে পাথরে উচ্ছ্বাস-কল্লোল। ওপারের বনময় পাহাড় থেকে হয়ত রাতজাগা কোনো পাখীর ডাক, কিম্বা নামহারা কোনো জানোয়ারের কণ্ঠস্বর, কিম্বা অড়হরের ক্ষেতের ভিতর থেকে আরণ্যক হরিণের আওয়াজ। এমন সময় হয়ত আমারই মতো জেগে রয়েছে সাধু। রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে ভুলে গিয়ে আর সকলের ঘুমের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সে হয়ত গান গেয়ে উঠলো, "চিত্ত মনমে তেরে ধরতি উ, সদা সাধু সেবা করতি হুঁ—প্রভু, আও, আও, আও! মীরাকো প্রভু সাচ্চি দাসী বানাও।"

সে কী যন্ত্রণা তা'র কণ্ঠে, কী আতুর, কী কাতর সে! লোকলজ্জা—কিছুই সে মানতোনা, এক সময় উঠে এসে সে ধ'রে বসে, চলো ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে গিয়ে বসি!

রাগ ক'রে বলতুম, তোমার ওই শ্মশান-বৈরাগ্য রাখো, ঘাটে গেলে এখনি পুলিশে ধরবে! যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়োগে।

কম্বলখানা জড়িয়ে আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়তুম, ইচ্ছে ক'রে নাক ডাকতুম—পাছে সে আবার অনুরোধ করে। কিন্তু অনেক দিন ভোরে উঠে দেখ্‌ছি, সাধুর দুই স্বপ্নাতুর চোখের উপর দিয়ে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে গেছে।

সাধু আমাকে না ব'লে বেরিয়ে পড়তো যেখানে সেখানে। আমিও তা'র সঙ্গ নিতুম না। খোঁজ পেতুম সে গিয়ে ব'সে থাকতো লালতারাবাগে মহারাজজির আশ্রমে, কিম্বা সেই বৃক্ষচ্ছায়াময় ভাঙা ঘাটের পৈঠায়। নানা উদ্ভট প্রশ্নে সে সন্ন্যাসীদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো। এক একদিন দেখতুম সে গঙ্গার ধারা বেয়ে গিয়ে ভীমগোড়ার পথের ধারে মস্ত বড় পাথরখানার উপরে বসেছে, আর কয়েকটা বানরকে ডেকে খাওয়াচ্ছে ছোলা আর দানা,—ওইতেই তা'র আনন্দ। ব্রহ্মকুণ্ডের ওই সাঁকোটায় দাঁড়িয়ে প্রায়ই সে আটার গুলি খাওয়াতো হাজার হাজার মাছকে। সন্ধ্যার দিকে সে যখন যেতো কোনো মন্দিরে, কিম্বা কোনো বিভূতিভূষণ সন্ন্যাসীর ধুনির আসরে, আমি তখন কুশাবর্ত্তের সিঁড়ির ধারে ধূমপানে তন্ময় থাকতুম। সাধু দূরে স'রে যেতো, অনেক দূরে—আমার নাগালের বাইরে, বহু চেষ্টাতেও আমি যেন তা'র নাগাল পেতুম না। অনেক সময় দেখতুম, তা'র চারদিকে কয়েকজন মেয়েপুরুষ জড়ো হয়েছে, আর সে গান ধরেছে মধুর কণ্ঠে। গানে সে পাগল, রসের আনন্দে সে বিহ্বল।

সাধুর জন্ম বাংলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে, একটি নদীর তটের ধারে ছিল তাদের ভদ্রাসন,—নদীর ভাঙনে সেই ভদ্রাসন লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সাধুর বাল্যকাল কাটলো ওই নদীতে। নদীর খরস্রোত তা'র চোখে মুখে কেমন এক প্রকার বন্যতা এনে দিয়েছিল, তা'র প্রকৃতিতে এনেছিল অস্থিরতা, চঞ্চল আর উদ্দাম জীবনে সে ছিল অত্যন্ত।

একবার দিন দুই তাকে পথে ঘাটে আর দেখছিনে। একটু সন্ত্রস্ত হয়ে আমি গঙ্গার তীর ধ'রে বেরিয়ে পড়লুম। লছমনঝুলার ধারে লক্ষ্মণের মন্দিরে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। দুদিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে ঋষিকুলের আশ্রমে আশ্রমে। যা খাবার নয় তাই সে খেয়েছে, যেখানে থাকার নয় সেখানে থেকেছে। আজ সকালে জন পনেরো সাধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের হাতে পরিবেষণ ক'রে তাদের পুরী, দই আর মুগের লাড্ডু খাইয়েছে। বললুম, পয়সা কড়ি পেলে কোথায়, সাধু?

সাধু মুখভরা আর বুকভরা আনন্দের হাসি হাসলো। বললুম, এবার ফিরে চলো?

সাধু বললে, না।

নীলধারার উঁচু পাড়ে একটি সুন্দর নূতন বাড়ী রয়েছে, তা'র বারান্দার নীচে—অনেক অগাধ নীচে আত্মহারা গঙ্গা,—তারই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সাধু বললে,—

"বারে বারে চাইবো না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার করা পিছন পানে।

বাসা বাঁধার বাঁধনখানা যাক্ না টুটে',
অবাধ পথের শূন্যে আমি চলবো ছুটে।
শূন্যভরা তোমার বাঁশীর সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পুরে।"

সেবার হরিদ্বার থেকে সাধুকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তারপরে সাধু আমার সঙ্গে গিয়েছিল শুক্লপক্ষের শেষে তাজমহল দেখতে। সে কথা পরে বলবো।

সকল প্রকার ভ্রমণের মাঝখানে আবার কাশী গিয়েই দশাশ্বমেধের পাশে ঘোড়াঘাটে গিয়ে বসতুম। ওখানে সন্ধ্যার পরে আলো থাকতো কম, মাঝিমাল্লারা নৌকার মধ্যে আলো জ্বালিয়ে বিশ্রাম নিতো, ভজন আলাপ করতো। এপাশে-ওপাশে চুণার থেকে আনা পাথর স্তূপাকার হয়ে থাকতো। আর তারই একপাশে অন্ধকারে নিরিবিলি আমাদের সঙ্গোপন ধূমপানের আসর জমে উঠতো। আমরা সংসারহারা জীবনবৈরাগীর দল, এই ঘোড়াঘাট আর দশাশ্বমেধ ম্বারভাঙাঘাট ছাড়া জীবনের আর কোনো ঘাটেই আমাদের ঠাঁই হয়নি। ছায়ারা কেঁপে বেড়ায় গঙ্গার অন্ধকারে,—কত ভুল, কত ভ্রূকুটি, কত মূঢ় প্রশ্ন, কত অবাস্তর পরিকল্পনা, কত থইহারা আর কূলহারা স্বপন। কে আগে কথা কইবে? কেউ না,—সবাই নীরব; আমাদের ধূমপানের আভাটাকে অন্ধকারে মনে হোতো, মণিকর্ণিকার চিতাগ্নির অবশেষ। যেন সব পুড়ে ছাই হচ্ছে ওই বৈতরণীর তীরে,—আশা, বিশ্বাস, আদর্শ, প্রচলন-নীতি! আমরা কিছু মানিনে, কিছু রাখিনে। কেমন যেন মনে হয়, কাশীর ওই ঘাট-গুলোর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কত নৈরাশ্যের দাগ, কত আনন্দের শেষ অবশেষ, কত বেদনার কণ্ঠরোধ-করা স্মৃতি, কত জীবনের নিষ্ফল নিত্যক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। ওখানে মাথা ঠুকেছি পাথরে পাথরে, ওখান থেকে জাল ফেলেছি অসীমের দরিয়ায়, ওখান থেকে শুনেছি কত বাঁশীর কত ডাক, ওখানকার কত মাটি তুলে নিয়েছি কপালে, কত প্রতিজ্ঞা মেনে নিয়েছি জীবনের, ওখানে ব'সে আমরা কত মানুষের উত্থান-পতন বিচার ক'রে দেখেছি। যাদের সঙ্গে বসতুম ওখানকার অন্ধকার ঘাটে ঘাটে, তাদের মাঝে মাঝে মনে হোতো, তারা এ পৃথিবীর নয়—তারা যেন কোন্ গ্রহলোকের,—তাদের চিনতে পারতুম না। কেউ ছিল মহৎ জীবনের একটা বিপুল ভগ্নাবশেষ, কেউ প্রেতাত্মা, কেউ বা ছায়াচারী। আমাদের ধূমপানের আগুনটাকে মাঝে মাঝে মনে হোতো, এটা যেন যজ্ঞহুতাগ্নি—আমরা যেন ঘিরে বসেছি তপোবনের ঋত্বিকের দল। আমরা মানবসভ্যতাকে, মনুষ্যত্বকে, স্বভাবধর্মকে, জীবনোত্তীর্ণ কোনো বিরাট আদর্শ কল্পনাকে বিচার করতে ব'সে গেছি!

সেই ঘাটগুলি আজো আছে, কাশীর সেই গঙ্গাও। আমরাও সেই ঘাটের ধারে আজো গিয়ে দাঁড়াই। তবু আমরা সেখানে যেন আর নেই, কে যেন আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের অনেক ভেঙেছে, অনেক ছাঁচ বদলে গেছে, অনেক হারিয়েছে। ওই গঙ্গার আবর্ত আজো পাথরে পাথরে ঘুরে ঘুরে চ'লে যায়, আজো তা'র তীরে ব'সে সন্ন্যাসী আর ভৈরবীরা জপ করে, সন্ধ্যায় কথকতার আসর বসে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবেরা কীর্তনের পালা গায়,—আছে সব, আছে সবাই,—কিন্তু আমরা আর নেই। আমাদের পায়ের দাগের ওপর পড়েছে কত সহস্র পদচিহ্ন, ওখানকার পাথরের ফাটলে আমাদের পুঞ্জীভূত নিশ্বাস কত নিশ্বাসের ছোঁয়ায় মিলিয়ে গেছে!

যোগীনদাকে মনে পড়ছে! শীতের সকালে গোড়েন-ঘাটের মধুর রৌদ্রে ব'সে তিনি বললেন, কীর্তিনাশ কা'কে বলে জানো?

আমরা সবাই চুপ ক'রে রইলুম। যোগীনদা বললেন, মহৎ আদর্শের অপমৃত্যু, কী যন্ত্রণা যে তা'র! বিষ আকণ্ঠ হয়ে উঠলো, সব ম'রে গেল একে একে!

সেই শক্তিকে আহরণ করতে হবে সূর্যের হৃদপিণ্ড থেকে—যার মৃত্যু নেই, জরা-ব্যাধি নেই, বিকার নেই,—সেই দুরন্ত শক্তি! দেহে, মনে, মস্তিষ্কে সেই শক্তি সঞ্চালন করা দরকার,—এ জাত সেইদিনই বাঁচবে; সেই-দিন সকল বিরূপকে বিনাশ করতে পারবো!

যোগীনদাকে জানতুম, আগেকার কালে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লববাদী নেতা। তিনি চেঁচিয়ে বলতেন, সকলের আগে চাই উদ্ধার,—পাপ, চিত্তগ্লানি, ঈর্ষা, সন্দেহ, কলহ,—এদের থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তি! আমাদের গঙ্গায় কেন এত পুণ্যধারা? হোমের আগুনে কেন এমন শুচিতা? এর অর্থ আছে বৈকি, সেটি পরমার্থ! আমি গ্রহণ করবো সকলের আগে সূর্যকে, গ্রাস করবো সূর্যের আলো, পান করবো সূর্যের রশ্মি!

যোগীনদা অনেক সময় একা একা গঙ্গায় ঘুরতেন। কী রহস্য দিয়ে তিনি ঘেরা, কী অজ্ঞাত অতীত তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাসে। তিনি কারাজীবন যাপন করেছেন বহুদিন, রাজবন্দী ছিলেন কয়েক বছর—লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেছেন অনেক। অনেক নেতা পুঁড়ে পুঁড়ে খাঁটি হন্, অনেক নেতা পুঁড়ে পুঁড়ে হন্ অঙ্গার। যোগীনদা ছিলেন শেষের দলে। রাজনীতিক ছিলেন না তিনি, তিনি ছিলেন বিপ্লববাদী। তিনি বলতেন, কীর্তিকে চিনে নেবো কাশীর এই পাথরের কষ্টিপাথরে, নিজেকে বিচার ক'রে নেবো গঙ্গায় ধুয়ে! আমি চাইলুম প্রকাণ্ড বিপ্লব, কিন্তু কী মিথ্যে, কী ব্যর্থ!

সেই যোগীনদা হঠাৎ একদিন আমাদের সংস্রব ত্যাগ করলেন। তিনি ঘাটে ঘোরেন একা একা। কোনো জনহীন ঘাটে একা এক পাথরের কোটরে ব'সে তিনি চেয়ে থাকেন ঊর্ধ্বে—দুই চোখ মেলে থাকেন সূর্যের দিকে স্থির হয়ে। সূর্যের গোলকটি আপন চক্ষুতারকায় প্রতিবিম্বিত করেন। একদিন দেখি যোগীনদা আশ্রয় নিয়েছেন, দশাশ্বমেধের রাস্তার কোণে বিশ্বনাথের গলির সামনে ওই উঁচু রোয়াকে—সেই বুড়ো সন্ন্যাসীর পায়ের তলায়। যোগীনদা সারাদিন উপবাস ক'রে প'ড়ে থাকেন। তিনি যে ভিখারী নন্, পাগল নন্, তিনি যে ওই সন্ন্যাসীর সাধারণ চেলা নন্—এ শুধু আমরাই জানতুম। কিন্তু এ কথা জানতুম না কোন্ রসে তিনি মগ্ন, কোন্ তপস্যায় তিনি আত্মভোলা, কোন্ খাদ্যের অভাবে তিনি নিত্য উপবাসী! শুধু দেখতুম মাঝে মাঝে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কী যেন মন্ত্র তিনি পাঠ করছেন। আমরা কাছে যেতে ভরসা পেতুম না।

বহুকাল পরে খড়্গপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে একদা রাত তিনটে নাগাৎ সহসা আচমকা তন্দ্রার ঘোরে দেখেছিলুম, সামনে দাঁড়িয়ে এক পাগল—কদাকার, বীভৎস, জটাজটিল, ছিন্নজীর্ণবাস,—আমার দিকে চেয়ে সেই পাগল হাসিমুখে বললে, পয়সা দে!

চিনতে না পেরে ভয় পেয়ে ওয়েটিং রুম্ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তখনই চিনলুম—সে যোগীনদা! আমি পায়ের ধুলো নিলুম, কিন্তু যোগীনদা আমাকে চিনতে পারলেন না। আপন মনে কী যেন প্রলাপ বলতে বলতে তিনি স্টেশন থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কোন্ দিকে চ'লে গেলেন।

কাশীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আজ মনে পড়ে তাদের, যারা জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পেলো না। যারা চ'লে গেল সকল ঘাট ছেড়ে, যারা তলিয়ে গেল কোন্ অজানায়। কেউ ঘট ভ'রে নিয়ে গেল, কেউ ঘট ভেঙে রেখে চ'লে গেল। কেউ ওই গঙ্গার জলে দিয়ে গেল সব, নিয়ে গেল না কিছু। ওই জলকল্লোলে কারো হাসির কলকণ্ঠ শুনি, কেউ আজো কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ওখানকার সকল ঘাটের জলের উপরে লেখা রয়েছে আমাদের মর্মান্তিক ইতিহাস, আমাদের সমগ্র যৌবনকালের চূর্ণ ভগ্ন স্বপনের দল আজো গঙ্গার ঘূর্ণীজলে আবর্তিত। ওখানে জীবনের জুয়া নিয়ে বসেছিল প্রসন্ন। সেই উদার মহৎপ্রাণ যুবক। কোনো ঘাটে স্থির হয়ে সে দাঁড়াতে পারলো না, কোনো বাঁধনকে সে স্বীকার করলো না, সংসারের কোনো আদর্শে, কোনো নীতিতে সে আস্থাবান থাকলো না,—সমস্তটাকে সে তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দিল। সেই ঈশ্বরবিদ্বেষী, গৃহবিদ্বেষী, ইংরাজবিদ্বেষী প্রসন্ন! তা'র সেই বিদ্যানুরাগ, তা'র সেই মননশীলতা, প্রখর পাণ্ডিত্য, উচ্চ রাজনীতিক আদর্শ, মূঢ় মূক জনসাধারণের প্রতি তা'র হৃদয়ের সেই একাগ্র নিষ্ঠা! কিন্তু প্রসন্ন ঘৃণা ক'রে গেছে, সকল প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা'কে, আর স্বার্থপ্রণোদিত শৃঙ্খলারক্ষাকে। —তা'র চারিদিকের দুর্নীতি আর ভীরুতা, অন্যায় আর অপমান, উৎপীড়ন আর অনাচার,—একদিন প্রসন্ন আর বরদাস্ত করলো না। নীলকণ্ঠের মতো সে বিষপান

করলো, মহাতপস্যায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। স্বেচ্ছায় প্রসন্ন মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিল।

কাপুরুষ তা'কে বলবো না কোনোদিন,—স্বেচ্ছামৃত্যু কাপুরুষতা নয়। যা'র মহৎ আদর্শ পদে পদে মার খায়, যার নিঃস্বার্থ জীবনানুরাগ পদে পদে চারিদিকের শয়তান-শক্তির দ্বারা অপদস্থ হয়, যার সত্যকার প্রতিভা অশোভন আত্মপ্রচারে কোনোকালে নিজেকে হীন করলো না, করতে পারলো না,—নিঃশব্দ স্বেচ্ছামৃত্যু ছাড়া তা'র সান্ত্বনা কোথায়? আত্মহত্যা আর আত্মোৎসর্গ—এ দুটোর মধ্যে অনেক প্রভেদ! প্রসন্ন চরম মুক্তি বরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

আর পুড়ে গেছে আমার সেই দিদি ওই মণিকর্ণিকার ঘাটে।

অমার কাশীর বড় আশ্রয় ছিল ওই দিদি। প্রভাতে প্রতিদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখতুম দিদিকে—সদ্যস্নাতা, চৌষট্টি যোগিনীর জল তখনও দিদির এলোকেশ বেয়ে ঝরে পড়ছে, পরণে রাঙাপাড় তসরের সাড়ী, কপালের ঠিক মাঝখানে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। দুর্গাপ্রতিমাকে আমার মনে প'ড়ে যেতো। দিদির হাতে থাকতো একটি তামার ঘটি, একটি কুশি, আর কোঁচড়ে ভিজা আতপ চাল। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান সেরে দিদি পথের দু'ধারে অসংখ্য শিবের মাথায় জলের ছিটে আর আতপ চাল চিমটি ক'রে ফেলে ঘুরতো—ওতে নাকি পুণ্য হয়। দিদির মুখে শিবের মন্ত্র লেগে থাকতো। অপরাহ্নের দিকে দিদি যেতো গঙ্গায় একখানা গরদের চাদর গায়ে জড়িয়ে। সেখানে মেয়েরা দিদিকে ঘিরে বসতো,—দিদি হিন্দুস্থানী ভাষায় গল্প বলতে পারতো। গঙ্গার ঘাটে দিদির মস্ত সমাজ, সেখানে মস্ত আসর।—

সেই দিদি একে একে চারটি সন্তান হারালো, এবং তা'র স্বামীরও মৃত্যু হোলো একদিন। একদিন দিদির মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল। বৈশাখের রৌদ্রে জলে পুড়ে যাচ্ছে কাশীর পাথরের ঘাট,—আর দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছে হাঁটুজলে। শীতের রাত্রের তুহিন আবছায়ায় দিদিকে দেখছি গঙ্গায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বলছে, মা, আমার চোখের সব জল তুমি টেনে নাও মা! শ্রাবণের বর্ষায় দেখছি ঘাটগুলো সব ভেসে গেল, জল উঠে এলো প্রায় পথের উপর,—আর দিদি ওই দশাশ্বমেধের অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে সেই সন্ন্যাসিনীর আসনের পাশে একমনে ব'সে রয়েছে—তা'র মাথায় ঝ'রে পড়ছে শ্রাবণের ধারা। আনন্দময়ী দিদি সংসারে আর কোথাও আনন্দের স্বাদ পেলোনা। একদিন এমন অবস্থা দাঁড়ালো, প্রিয়জনরা দিদিকে কোথাও দেখলে ভয়ে ভয়ে স'রে যেতো। সেই দিদির শেষ অবশেষ গেল মণিকর্ণিকায়। চোখের সামনে পুড়ে পুড়ে দিদি ছাই হয়ে গেল!—

ঠিক এমনি সময়টায় একখানা ঠিকানা-কাটা চিঠি ঘুরতে ঘুরতে আমার হাতে এলো। হাতের লেখা দেখেই চিনলুম, এ চিঠি টুনুর। সে লিখছে—

"কলকতায় চললুম, সঙ্গে যাচ্ছেন রায় বাহাদুর। পৌষ সংক্রান্তিতে আমরা কয়েকজন গঙ্গাসাগর যাবো, স্থির হয়েছে। আগামী ১৩ই জানুয়ারী সকালে তুমি গঙ্গাসাগরে উপস্থিত থাকবে, সেখানে আমাকে খুঁজে নিয়ো। কলকাতায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেনা। নিশ্চয় সাগরে তুমি যাবে, তোমাকে দেখিনি অনেকদিন।"

* * *

বেশ মনে পড়ছে সেই সময়ে আমার স্রোতটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল—ভাঁটা দেখা দিয়েছিল, বালুচর উঠে পড়েছিল, লগি ঠেলতে পারছিলুম না। টুনুর চিঠিখানায় জোয়ার এল যেন। হাতে আর চার-পাঁচ দিন মাত্র সময়। সুতরাং পরের দিনই কলকাতা রওনা হলুম। টুনুর চিঠি,—আমাকে যেতেই হবে!

[আগামীবারে সমাপ্য]

ব্যথিত নকড়ি

(কাহিনী)

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

"আর শীঘ্র ফিরিব না"—এই 'দিব্যি' করি'
মাসীবাড়ী চলে' গেল ব্যথিত নকড়ি।
"এ দেশে মানুষ থাকে ?" কহিল সে ক্রোধে
"সারা দেশ পরিপূর্ণ বজ্জাতে নির্ব্বোধে ;
মরে' সব শেষ হ'য়ে আবার গজালে'
তবে যদি ভালো হয় ! এ-সব জঞ্জালে
আগুনে পুড়িয়ে কেউ করে যদি ছাই
তা' হলেই দুঃখ ঘোচে ঘুচিয়া বালাই"।
এতেক ভাবিয়া মনে রেলের গাড়ীতে
নকড়ি চলিয়া গেল মাসীর বাড়ীতে।
রাগিল সে কেন, কেন ছেড়ে' গেল দেশ—
কেন এ-আক্রোশ ? তার কারণটি বেশ।

নকড়ি করেছে বিয়ে মাস পাঁচ ছয়—
স্ত্রীর সাথে নকড়ির অত্যন্ত প্রণয় ;
মুগ্ধ সে পত্নীর রূপে, দৈহিক সৌষ্ঠবে ;
বয়স ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ হবে···
সুতরাং নিশিতার যৌবন নিবিড়,
আপাদমস্তক তার পুলক-অধীর···
তদুপরি চক্ষু দু'টি রসে ঢল ঢল—
কি চাহনি অপরূপ স্তিমিত কোমল ;
যত কিছু সুস্বপন্, তাহারি বিগ্রহ
খঞ্জন নয়নযুগে নাচে অহরহ।
গভীর গহন স্বচ্ছ ছায়ার পিধানে
আনন্দ মূর্চ্ছিত যেন অনন্তের ধ্যানে···
লাবণ্য পুঞ্জিত চারু পল্লব-আধারে—
মোটেই মেটে না আশা দেখি বারে বারে।
তাহা ছাড়া দু'জনারি প্রেম সুগভীর—
প্রেম-নিবেদনে ক্লান্তি নাহি নকড়ির ;
নকড়ি পায় না ভেবে', ভাবে সে হামেশা :
সে-বিষয়টা কি যাহা ধরাইছে নেশা !—
পায় না সে দিশা, এ কি যাদু অজনার !—
টানিছে নিকটে ; টান এ কি দুর্নিবার !

জীবন অমৃতময়, ফূর্ত্তিও প্রচুর—
অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ, মিলন মধুর···
নকড়ির মনে হয়, স্বর্গীয় আরাম
ইহাকেই বলে, উহা ইহারই নাম ;
কিন্তু কিছু চাই যেন বাড়া'তে আমেজ—
উল্লাসে অধিকতর করিতে সতেজ···
আরো মনে হয়, কিছু রহে নাকো বাকি,
ঢুলু ঢুলু হয় যদি ঢলঢল আঁখি।
পদ্মনেত্র হয় যদি পলাশ বরণ—
মুহূর্ত্তে করিতে পারে জয় ত্রিভুবন।
ঐ চক্ষু হয় যদি আরও প্রফুল্ল
আরো উপভোগ্য হবে, অধিক অমূল্য।

রোগচিকিৎসক বিজ্ঞ মধু কবিরাজ—
মোদক বেচিয়া তার ঢের টাকা আজ ;
অতিরিক্ত কথা কয় বহু শব্দ করি'—
তাহারি শরণাপন্ন হইল নকড়ি ;
আসিল 'ঔষধালয়ে' সন্ধ্যার সময়,
কহিল : "অক্ষুধা অম্ল আর নাহি সয় ;
কিচ্ছু খিদে পায় নাকো ; কি করি বলুন !—
খাই খাই করে' আগে হইতাম খুন"।
শুনি' বৈদ্য কহে : "আছে ঔষধ বিস্তর
মন্দীভূত ক্ষুধাগ্নিরে করিতে প্রখর—
ভাস্কর লবণ আদি ; তা'ই নিয়ে যান্,
অক্ষুধা করিতে দূর উহাই প্রধান"।
নকড়ি কহিল : "উঁ হুঁ ; মোদক আছে না ?
তা'ই দিন্ দু'আনার—তা'-ই যা'ক্ কেনা।"
অভিজ্ঞ চতুর মধু চেনে খরিদ্দার—
মৃদু হাস্যরেখা মুখে দেখা দিল তার ;
কহিল : "তা' আরো ভালো ; সদ্য সদ্য ফল-
দেহকে সবল করে ক্ষুধাকে প্রবল।"

দু'আনায় দুই গুলি মোদক লইয়া
নকড়ি আসিল বাড়ী প্রফুল্লিত হিয়া।
নিজে খেল' এক গুলি। হাসি' মিটিমিটি
নিশিতারে দেখাইল দ্বিতীয় গুলিটি…
কহিল: "ওষুদ খাও"।—"কিসের ওষুদ"?
"শিবের এ আবিষ্কার অতীব অদ্ভুত।
মাঝে মাঝে তোমার ত' পেট ফাঁপে শুনি"!
"ফেঁপেছিল একদিন খাইয়া বেগুনী"।
"আর ফাঁপিবে না খেলে' ওষুদের গুলি"…
বলিয়া নকড়ি তার হাতে দিল তুলি'।
বেচারী জানে না কিছু, কাহারে কি বলে—
কি দ্রব্যের কি প্রভাব, কি ভাবে তা' ফলে!
নিশিতা তা' মুখে দিয়ে দেখিল, তা' মিঠে—
গন্ধও সুন্দর। হাত রেখে' তার পিঠে
কহিল নকড়ি: "বেশ; ফেলেছ ত' গিলে?
খাসা বউ পাইয়াছি। তাকালে হাসিলে
কি সুন্দর হও তুমি বলিতে না পারি—
তৃষ্ণাপহারিণী তুমি পিয়ারী হামারি"।
মুগ্ধ চক্ষে চেয়ে আর সর্ব্বাঙ্গে শিহরি'
ঘরের বাহিরে এল সন্তুষ্ট নকড়ি।

বাহির-অঙ্গনে পাতি' দু'টি কাষ্ঠাসন
করিছেন বায়ুভোগ চিত্তবিনোদন—
করিছেন নানাবিধ সদালাপ, আর
আলোচনা আধুনিক ভ্রষ্ট লোকাচার
দুই ভাই, ষষ্ঠীদাস শীতলাপ্রসাদ—
উভয়ে সম্প্রীতি বড্ডো, নাহি বিসম্বাদ।
শীতলা 'কড়ি'র জ্যাঠা ষষ্ঠী তার বাবা।
এদিকে বসিয়া গেছে পেতে' নিয়ে দাবা
অশ্বিনী লাহিড়ী আর 'খোঁড়া-পা' কার্ত্তিক-
দাবা খেলা দু'জনারি অত্যন্ত বাতিক।
বসেছে মাদুরে তারা করে' আয়োজন,
উভয়ের মাঝখানে জ্বলিছে লণ্ঠন।

নকড়ি বসিয়া আছে তাদের অদূরে—
কিন্তু তার মাথা যেন উঠিতেছে ঘুরে'
মাঝে মাঝে; মাঝে মাঝে শূন্য বোধ করি'
টলিয়া যাইছে যেন সর্ব্বাঙ্গে নকড়ি…
ঢলঢল চক্ষু দু'টী ঢুলু ঢুলু হ'লে
কেমন মিশ্রণ হয় মধুরে তরলে
তা' দেখার কথা তার মনে নাই কিছু—
জিহ্বা শুষ্ক; বসে' আছে মাথা করি' নীচু।
'তামাক' আনিয়া দিল ভৃত্য মহেশ্বর—
হাতে হুঁকো নিয়েছেন জ্যেষ্ঠ সহোদর··
উদ্ধরণ কষ্টসাধ্য বিপন্ন রাজার,
কার্ত্তিক দুশ্চিন্তামগ্ন বেজায় বেজার…
ঘটিল ঘটনা এক এমন সময়—
মার্জ্জিত সমাজে যাহা বলিবার নয়।
হি-হি-হি হি-হি-হি হাসি, সুতীক্ষ্ণ নিনাদ,
বাড়ীর লোকের কাণে এল অকস্মাৎ।
কে হাসে অমন করে', হিড়িম্বার মতো?
নকড়ির বাবা জ্যাঠা হ'লেন বিব্রত···
শুনা গেল হাসি, যেন স্ত্রীলোকের গলা!
বাড়ীতে নাই ত' কেউ এ-হেন চপলা!
উভয়ে বিস্মিত হ'য়ে এলেন ভিতরে···
ওদিকে ছিলেন দু'জা দূরে রান্নাঘরে—
তাঁরাও এলেন, দেখা হইল উঠোনে,
তাঁদেরো বিস্ময় চোখে, শঙ্কা যেন মনে···
"কে হাসিল ও-রকম উচ্চ শব্দ করি"?—
বলিতে বলিতে পুনঃ উঠিল লহরী!
বউমাই বটে; সবে যেয়ে দ্রুতগতি
দেখিল যা' সেই দৃশ্য অসামান্য অতি—
নিশিতা বসিয়া আছে খাটে, পা ঝুলা'য়ে,
দুলিতেছে অবিরাম ডাইনে ও বাঁয়ে।
গিন্নীদের ভয় হ'ল নিশিতারে ছুঁতে'—
মনে হ'ল, পেয়েছে কি পেত্নীতে না ভূতে!
কিন্তু এ-ব্যাপার শক্ত, তাহে নাহি ভুল—
চক্ষু দু'টি রক্তবর্ণ, যেন জবাফুল;

দেখিয়া ওঁদেরে বউ পড়িল গড়া'য়ে
শয্যায় ; তখনি উঠে' হাত পা ছড়া'য়ে
মেঝেয় লুটায়ে প'ল ; তারপর উঠি'
ঘোমটা টানিয়া হ'ল হেসে' কুটিকুটি ··
অত্যন্ত বিভ্রান্ত হ'ল ষষ্ঠী ও শীতলা—
বউমা যে ভারি মৃদু, নিতান্ত অবোলা !
"কি হ'ল, বউমা" ?—প্রশ্ন করিল সবাই—
তারপর জিজ্ঞাসিল ষষ্ঠী. ছোট ভাই,
"হিষ্টিরিয়া নাকি" ?—বধূ কহিল উত্তরে :
"মাথা গেল, বুক গেল ; কি খাওয়াল' ওরে !
কালো গুলি, মিষ্টি খুব, দিয়েছে আমারে"...
"কোথা' গেল সেই বেটা" ? প্রচণ্ড হুঙ্কারে
নকড়ির খোঁজ করি' করিল জিজ্ঞাসা
বাবা তার। লোক এল দেখিতে তামাশা।
ব্যাপার হইল স্পষ্ট ; নহে পেত্নী ভূত,
হিষ্টিরিয়া নহে ; কাণ্ড মোদকে প্রস্তুত।
"জল ঢালো, জল ঢালো, ঢালো অনিবার
মাথায় ; উহাই পন্থা নেশা ছুটাবার"।
আদেশ করিয়া ষষ্ঠী আসিল বাহিরে—
ডানা ধরে' টেনে' সেই সুপ্ত নকড়িরে
কহিল : "হারামজাদা, দুষ্ট. কুলাঙ্গার,
মুখে দিলি চুণ কালি" ?—কিন্তু কথা তার
কে শুনিবে ! নকড়ির হুঁশ নাই মোটে—
ঘটিতেছে এত কাণ্ড অত্যন্ত নিকটে ··
নকড়িরে তুলে' জুতো খুলে' নিল ; ঠিক্
মারিতই ষষ্ঠী ; মানা করিল কার্ত্তিক—
বলিল : "বুঝেছি সব ; মারিলে এখন
তব পুত্র নকড়ির নিশ্চিত্ মরণ।
মের' না ; শুইয়ে দাও ; ঘুমের ওষুদ
বউমাকে দাও। এ কি কেচ্ছা মর্ম্মন্তুদ" !

রাষ্ট্র হ'ল কথা ; হ'ল অত্যন্ত বিকৃত—
শুনে' যা' দেশের লোক হ'ল কণ্টকিত :
নকড়ির পত্নী, ভদ্র গৃহস্থের নারী,
নেশা করে' করিয়াছে 'আচ্ছা কেলেঙ্কারি' ;
অসংখ্য অশ্লীল কথা হেসে' হেসে' ক'য়ে
নেচেছে উঠানময় আলুথালু হ'য়ে ;
শাশুড়ীকে মেরেছে সে ছুঁড়ে' দিয়ে বাটি—
প্রতিবাদ করিতেই খেয়েছেন লাথি
শ্বশুর স্বয়ং। আর, জ্যাঠাশ্বশুরের
গালেতে মেরেছে চড় ; পাঁচ্ আঙুলের
দাগ আছে গালে তার ; বৌয়ের চীৎকার
কাণে গেছে ও-পাড়ার শশী দারোগার !
"মোদক সে পেলে কোথা' ?"—"ভৃত্য মহেশ্বর
দিয়েছিল কিনে' এনে' ; সবারি গোচর
স্বীকার করেছে তাহা" ।—"অভ্যাস ছিলই—
না জেনে' বিবাহ দিলে হয় ফল ঐ" ।...
ক্রমান্বয়ে কথাগুলি হ'লো আরো বড়ো,
জটলা করিল বহু হ'য়ে লোক জড়ো...
হাসিল বিস্তর, আর, করিল ইঙ্গিত—
ভদ্রতা হিসাবে যাহা করা অনুচিত।

কহিল রাঙা'য়ে চক্ষু নকড়ির জ্যাঠা :
"তুমি বাপু ঘটা'য়েছ কেলেঙ্কারি, ল্যাঠা ;
কিছুদিন দূরে থাকো চোখের আড়ালে—
সহিতে নারিব আর যন্ত্রণা বাড়া'লে,
তোমারে করিব খুন, কিম্বা হ'ব নিজে—
জানি না দশাটা আর ভবিষ্যৎ কি যে !
লজ্জায় মরিয়া যাই, হাসাইলে মুখ ;
বউমা আছেন বলে' মারিনি' চাবুক"।
ষষ্ঠীও কহিল কিছু ; কহিল সে রুখে' :
"এখনো এখানে তুমি আজ কোন্ মুখে" ?

শুনিয়া 'জঘন্য কথা' বহু বহুতর—
পথে ঘাটে জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর
দিতে দিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নকড়ি—
"আর শীঘ্র ফিরিব না", এই 'দিব্যি' করি',
আর, খুব রাগ করি' রেতের গাড়ীতে
ব্যথা নিয়ে চলে' গেল মাসীর বাড়ীতে।

জন্মান্তরসৌহৃদানি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাতাবিলেবুর গাছটি আমারই বাতায়নটির কাছে
শয়নগৃহের দক্ষিণে আজও তেমনই দাঁড়ায়ে আছে।
বহু বৎসর করি এই ঘর; নিত্য দিবসরাতি
দেখা পাই তার,—সে যেন আমার হয়েছে জীবনসাথী!
গুটি দুই শাখা বাড়িয়া উঠিয়া পরশে গরাদেগুলি,—
সমবেদনায় বুঝি-বা জানায় হৃদয়ের কোলাকুলি!

একই সাথে কেটে চলে এ জীবন—কত-না দিবসে-রাতে,
মন বুঝিবার মূঢ় অভিনয়ে হয়তো-বা দুজনাতে!
মধুফাল্গুনে সৌরভে মোরে করি অভিনন্দিত
অন্তর বেড়ি ফুলদল বুঝি হয় তার স্পন্দিত:
স্নেহ-উপহার হাতে লভিবার বড় লোভ অন্তরে,
তুলিবারে ফুল তবু এ ব্যাকুল পরাণ কেমন করে!

পুছি মনে-মনে, পূর্ব্বজনমে কে আমার তুমি ছিলে—
ফিরে' আজি মোর সঙ্গ লয়েছে এ জনমে—এ নিখিলে?
সুহৃদ স্বজন, গৃহপরিজন—বন্ধু বলিতে যত,
এত জানাশোনা, তবু তো হয় না এমন মনের মত!
এ সকল মাঝে কি করি আসিলে হে মোর অনাত্মীয়—
সুদূর পথিক পরবাসী হয়ে প্রিয়তম হ'তে প্রিয়?

মধুর গন্ধে মধুর পরশে প্রাণ কেন কেঁদে উঠে?
সুখসাধ যত তোর মাঝে যেন ফুল হয়ে মোর ফুটে!
দখিণা হাওয়ায় যখন দুলায় ঐ তব পল্লব,
মনে হয়, যেন পরশে আমার পরাণের বল্লভ!
মধু-তৎপর অলি মধুকর গুঞ্জরে যবে দ্বারে,
সে যেন আমারি স্তুতি-আহ্বান, কাণে শুনি বারে বারে।

হৃদয়-দেবতা, এ কি রহস্য অনুভব করি নিতি?
পাগল বলিয়া ডাকে মোরে সবে,—সে কি আদরের রীতি!
সত্য হইলে সেই ডাকই মোর সত্যের পরিচয়,
যেমন করিয়া ঘর করি আমি, সে বুঝি সত্য নয়।
অন্তরযামী, তোমারে যেমন ভুলে যাই পলে-পলে,
তোমারেও ভুলে' থাকি বুঝি ফুল, ভাবি বসে' আঁখিজলে।

বাংলা সাহিত্যের শারীরক ভাষ্য

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

বাংলা সাহিত্যের শক্তি ও সুষমার দিকে দেশের সজাগ দৃষ্টি ফিরেছে অতি আধুনিক কালে। নানা অনিবার্য্য কারণ এই অঘটন ঘটন করেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে। কিছুকাল পূর্ব্বেও এ সাহিত্য ছিল কৃপার পাত্র। এর জন্য যখন একটা যাদুঘরের প্রস্তাব হ'ল তখন তাকে একজন কৃতী পুরুষ নিজের বগলের নীচেই রাখ্‌লেন। তারপর মাথা রাখবার দু' তিন কাঠা জমির জন্য হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির ফলে ক্রমশঃ একটা আখেড়াও গড়ে উঠল। কিন্তু এর আদিম পাপ অর্থাৎ এ সাহিত্যের ব্রাত্যপদবী কিছুতেই দূর করা গেলনা। কাজেই ইংরাজী শিক্ষার দরবার হ'তে সহজেই এ বস্তুটি যক্ষের মত নির্ব্বাসিত হ'ল এবং এখনও তা নির্ব্বাসিত অবস্থায় মেঘের রাজ্যেই ঘুরছে!

রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ডে যাওয়া, নিজের কবিতা অনুবাদ করা এবং বহু আয়াসে সেখানকার রসবিদ্‌গণের আনুকূল্য লাভ করার ইতিহাস বেশীদিনের কথা নয়। বিদেশকে বন্দনা করে' অবশেষে তিনি যখন নোবল সার্টিফিকেট পেলেন, তখন এদেশে একটা সাড়া দেখা গেল। বাংলার ইতিহাসের দাসযুগের পরিপুষ্ট দ্বিতীয় অধ্যায় ইদানীং চল্‌ছে। এজন্য ইউরোপের করতালি বা পদক না পেলে দেশের আত্মপ্রত্যয়ই জন্মেনা। দাসযুগের প্রথম অধ্যায় সুরু হয় পাল ও সেনযুগের আমলে, যখন বিদ্যাপতি পাঠান-বিজেতার অনুমোদন পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করেছে, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ উপাধির লোভে আত্মসমর্পণ করেছে এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা প্রসঙ্গেও পাঠান প্রভুর নিকট করজোড় হয়েছে। এ ছাড়া পদানত দাসত্বের আত্মবিশ্বাস কখনও জন্মেনি।

এ যুগে ইংরাজের প্রগল্‌ভ দাপটে পলাশীপ্রাঙ্গন শুধু মুখরিত হয়নি, নব্য আগন্তুক ইংরাজী সাহিত্যের তোড়জোড় ও ভুক্তসিদ্ধিতে সঙ্কুচিত, ভীত ও লজ্জিত বাংলা সাহিত্যের স্থান নির্দ্দেশ হয়েছিল অর্দ্ধ অন্ধকারে কুলুঙ্গীর ভিতর। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট দেখে সাহস ও ভরসা করে' তাকে বাইরে নিয়ে আসা হ'ল শোভাযাত্রা করে' উচ্চ করতালির মধ্যে। সকলেরই প্রতীতি হ'ল কবির "কড়ি ও কোমল" রণনে 'মিঠে ও কড়া' ছাড়া আরও গভীর শ্রুতিপর্য্যায় আছে। বলতে হয়, নব্য সাহিত্যের এই উগ্র জয়জয়কার প্রাচীন সাহিত্যকে যে খুব অধিক মর্য্যাদা দান করেছিল তা' নয়। প্রত্নতত্ত্বের মালমশলা, অর্দ্ধভগ্ন ঘটপট বা ভাঙাচোরা প্রস্তরশাসনের মত সেকেলে বাংলা সাহিত্যও আজগবী দেবদেবীদের 'মঙ্গল' ও 'বিজয়ে'র কাংস্য বাদ্যের সঞ্চয়ে জমাট যাদুঘরের মতই একটু অতিরিক্ত কৌতুহল মাত্র জাগ্রত করেছিল, তার বেশী কিছু নয়। ইংরাজী-সভ্যতাপুষ্ট নব্য বাঙালী জাতির কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক আন্দোলন বা বিপ্লবের সহিত অতীত সাহিত্যের কোন যোগ কোথাও কল্পিত বা স্থাপিত হ'লনা। জাতিগত রক্ত-ধারার উগ্র প্রেরণা ও আবেশে শিহরিত কোন অনির্ব্বচনীয় সুলিখিত অজানা হৃদয়-লিপি বাংলা সাহিত্যের পুঞ্জীভূত ভূর্জ্জপত্রের মত সুকুমার পুঁথি সঞ্চয়ের পাঠোদ্ধার হ'ল না।

সাহিত্যের ভিতর লক্ষ্য করা হয়েছিল কুসুমায়ুধের লঘু কেলিমাত্র এবং মঙ্গল কাব্যাদির তরল কলহ ও কোন্দল! বাংলার সাহিত্য কি সত্যই এরকম ভঙ্গুর ও লঘু আড়ম্বরে ভরপুর? এ প্রশ্ন তখনই ঘনীভূত হয় যখন অজ্ঞ বিবৃতি-কারেরা দেখেন চর্য্যাপদের গোলক ধাঁধায় আছে রাগ-রাগিণীর কসরৎ মাত্র বা বৈষ্ণবকবিদের যাদুসৃষ্টির ভিতর খঞ্জনী ও মন্দিরার নিপুণ কালোয়াতি ও বোলচাল মাত্র। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আনন্দঘন দেবযানপথে আর কিছু এ পর্য্যন্ত ধরা পড়তে দেখা গেল না। সুদীর্ঘ বহু শতাব্দীর নৈশ প্রয়াণে শিবরাত্রির সল্‌তের মত এযুগে রবীন্দ্রনাথই আজ যেন একটিমাত্র আশার প্রতীকের মত পরপদানত দেশের চোখে পড়ল আর সব কিছু রইল ধোঁয়ার রাজ্যে। তাই ভরসা করে একথা বলা হল—পরকে বোঝাতে না হোক্, নিজেকে আশ্বস্ত করতে—যে রবীন্দ্রনাথ যেমন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, তেমনি এ সাহিত্যও জগতের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য! ভানুমতীর ভেলকির মত এমনি করে' একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস এ সাহিত্যকে এক নূতন মর্য্যাদা দিল! কথা হচ্ছে, এ রকম প্রশস্তিলাভের অধিকার যুগাগত এ সাহিত্যের আছে কি?

চর্য্যাপদের কবি মীননাথের কথা মনে হয় :

"কমল বিকশিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবি ধোনে ন ভমরা।"

অর্থাৎ পদ্ম ফুটলে শামুক আওয়াজ করে না অথচ গুঞ্জনমুখর ভ্রমর সে মধুপানে কখনও ভুল করে না। সে যুগের এই মুগ্ধ ঋষির এই বিশ্বাস ছিল যে, বাঙালী চিরকালই রসিক—তার কাছে রসের নিবেদন ব্যর্থ হয় না। আট শতাব্দী পরে আরও এক কবি—কবি আলাওল (১৬৫৮ খৃঃ)—যথার্থ বাঙালীরই মত "পদ্মাবতী"তে ঠিক এরকমেরই একটা উক্তি করেছে—

"কাব্যকথা সকল সুগন্ধি ভরপুর
দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর!
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ
নিকটে থাকিয়া ভেক না জানয়ে রস॥"

এতে প্রতীতি হয়, কবিতার রসমাধুর্য্য সঞ্চার ও উপভোগে বাংলার একটা বিশিষ্ট অধিকার ছিল প্রাচীন-কালেও। সেকালের বাঙালীর নিকট বাংলা কাব্যের ঐশ্বর্য্য যে ব্যর্থ হয়নি, এ রকমের রচনাই হচ্ছে তার প্রমাণ। বাংলার কবিরা ভবভূতির মত 'নিরবধি' কালের জন্য এবং 'বিপুল পৃথ্বীর' ভবিষ্য রসিকদের জন্য হাহুতাশ করেনি। তারা সমসাময়িক জনগণের উষ্ণ হৃদ্যতায় সিক্ত হয়েছিল। আধুনিক যুগের সম্বন্ধে এরকম আশা পোষণ করা হয়ত এসব কবিদের ভুল হ'ত, কারণ এ যুগ দেশের ইতিহাস হ'তে ভ্রষ্ট। বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও শীলতার ধারা হ'তে আধুনিক চিন্তা কক্ষচ্যুত হয়েছে শুধু এই একটি মাত্র উদ্‌ভ্রান্ত শতাব্দীর ভিতর। এদেশ নিজের কৃতিত্বের প্রভাতোরণ নিজে ভুলে গেছে এবং নিজের রসসৃষ্টির সারস্বত ও ভৌম দিক ও দেশ কোথা, তা' মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করে না। ইংরাজ আমলে বাঙালী রসবত্তায় বামপন্থী হয়ে' পড়েছে এবং বিরূপ রূপের মোহে আত্মসমর্পণ করেছে। এজন্য যশঃ-চয়ন করতে হয়েছে পশ্চিমে—প্রতীচ্যের আরক্ত অস্তশিখর হ'তে—প্রাচ্যের প্রাক্‌ভেদী রক্ত মেঘ-পুঞ্জের নবীন বাস্তবতা হ'তে নয়!

অথচ বাংলা সাহিত্যের জন্মকথার যথার্থ শীলতাগত (cultural) বিচার নব নব ভাবের দ্বারমুক্ত করতে বাধ্য। এ সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি বৈশাখী ঝড়ের মত নূতনতর দিক্‌দিগন্ত উন্মুক্ত করে' ঐশ্বর্য্যবান হয়েছে। একসময়ে বাংলার সভ্যতা ও মনন চারিদিকে যে ভৌম প্রভাব বিস্তার করে, তারই সঙ্গে সঙ্গত করেই এ সাহিত্যের বিচার প্রয়োজন। হাটে-মাঠে যুথভ্রষ্ট হারান মেষশাবকদের মত এখানে-ওখানে নানা কাব্য-কবিতা খুঁজে পাওয়া গেছে সত্যি। নেপালেও কিছু ধরা পড়েছে একরকমের হারান কাব্যশাবক। তাই বলে' কি এদের জড় করে বন্দী করা হবে দেশকালের অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতার জীবন্ত আবেষ্টন হতে চ্যুত করে'? এদের কি কোথাও একটা তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিত নেই? জাগ্রত জীবনের প্রখর সীমান্তের ভিতর দিয়া এ সাহিত্যকে কি দেখা প্রয়োজন নয়? শুধু এরকমের দেশকালগত দৃষ্টি ও স্পর্শই প্রস্তরীভূত সাহিত্যলক্ষ্মীর কঙ্কালকে অহল্যা পাষাণীর মত জাগাতে পারে। তখন হয়ত দেখা যাবে, কৃত্রিম ঘনঘটা ছাড়াও এসব কাব্য ও কবিতা জগতের ইতিহাসে হয়ত কোন কোন দিকে অতুলনীয়। বর্ত্তমানে বিপর্য্যস্ত এ যুগের অরসিকদের ভিতর সংক্রামিত হয়েই হয়ত এসব রত্নকদম্ব মলিন ও নির্য্যাতিত হয়েছে।

বিরাট বৌদ্ধতত্ত্বের হীনযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি বহুমুখী সাধনসম্পদ এবং দিগ্বিজয়ী পাল সাম্রাজ্যের দৃপ্ত কলাকলাপ ও কীর্ত্তিসঞ্চয়ের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগ গভীর ও অন্তরঙ্গ। এর কোনটিই সামান্য ব্যাপার ছিল না। সব ক'টিই এশিয়ার গগনে এনেছিল তুমুল ঝটিকা ও উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুদ্‌জ্বালা। কাজেই এ সাহিত্যকে কিছুতেই নিরীহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাহিত আত্মকল্পিত কাষ্ঠস্তূপের সহিত তুলনা করা চলে না। বাংলা সাহিত্য ছিল যথার্থ অঙ্গার-সংগ্রহ ও গলিত ধাতুর প্রবাহিত ধারার মত। সে যুগের অভ্রান্ত ঐতিহাসিক ঝটিকা ভারতের বক্ষে ভাব, আদর্শ ও সাধনার যে জোয়ার-ভাটা মুকুরিত করেছে, বাংলা সাহিত্যের পুলকিত সৃষ্টির সঞ্চয়ে তার কোন রক্তিম তিলক বা রুক্ষ রোমাঞ্চ কি নেই? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রচুরভাবে এ সাহিত্যে পাওয়া উচিত। ভাবের বাজারে তৈরী মালের কেনা বেচা হয়ে থাকে—কিন্তু আমদানী-রপ্তানীর হেরফের

বিচার বা রসবস্তুর স্বচ্ছ-সঞ্চয়কে হৃদয়যমুনার ঘাটে ঘাটে খোঁজবার উৎসাহ খুব কমই দেখা যায়।

সুতিকাগারে বিধাতা এই সাহিত্যের ললাটে বহু প্রলয়ের স্বস্তিকচিহ্ন অঙ্কিত করেন। অতীত যুগের স্রোতঃভঙ্গের নানা সন্ধিস্থলে ভাবের বহুমুখী মন্থনে এ সাহিত্য বার বার উপচিত হয়েছে। ভারতে অপর কোন সাহিত্যের এরূপ পুটপাক হয় নি। বাংলা সাহিত্য আবির্ভূত হয়েছে এক বিরাট বিস্ফোরক বজ্রের উদ্গারে এবং এর বাণী মুখর হয়েছে এক সুগভীর বিপ্লবাগ্নির কন্দর হ'তে! ভারতের ইতিহাসে এক সময়ে তা' অপ্রত্যাশিত ছিল। বৌদ্ধ যুগের আলোড়নে হিন্দুসভ্যতা আন্দোলিত হয় এক প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পে। সেযুগে আত্মবাদী ভারত বায়বীয় অধ্যাত্ম জগৎ হ'তে চোখ ফিরিয়ে হাজার বছর পরে ভাল ক'রে মাটীর দিকে চোখ ফেরালো। বস্তুতঃ সে সময়ের এই বাস্তবতাপ্রীতি ভারতীয় চিন্তাজগতের এক নূতন অধ্যায়। এই বাস্তবতার অন্ধ অলিগলি, গবাক্ষঝারোকা ও কন্দর-গহ্বর প্রদক্ষিণ করে' ভারতের অন্বীক্ষা ছুটে যায় অজানা রাজ্যের জটিলআবর্ত্তের ভিতর! ইতিহাসের এই অধ্যায় অফুরন্ত আবর্ত্তে মথিত এবং অকল্পিত ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হয়ে আছে। 'একে অস্বীকার করা চলে না। প্রাক্‌ভারতের (East India) আকাশের মেঘেই এসব আন্দোলনের ছায়াপাত হয়। বাংলা দেশেই এই নব্য হোমের অধ্বর্য্যু জন্মায় এবং বাঙালীই তিব্বত হ'তে মধ্য এশিয়া, চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এই ভাবের মশাল হাতে ধাবিত হয়। বাঙালীর এই চরিত্রবল, সঙ্কল্প ও সাধনা সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। বর্ত্তমান যুগেও বাঙালীই ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু একমাত্র জাতি যার ভিতর নূতন বার্ত্তা ও নূতন দৃষ্টি সজাগ হয়েছে এবং বাঙালীই ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণেও অগ্রসর হয়েছে। এই চরিত্রবল বাঙালী লাভ করেছে বহু সাধনা, অগ্নিপরীক্ষা এবং আত্মাহুতিতে। কাজেই বাংলার সাহিত্যকে বাজে খেয়ালের একটা একটানা রসুনচৌকীর হল্লা মনে করা ভুল হবে। এর বহিরঙ্গে আছে আকাশচারী নহবতের আহ্বান এবং ভিতরে আছে বীণমৃদঙ্গের সমুদ্র-কল্লোল!

বস্তুতঃ প্রাক্‌ভারতেই ছিল ভারতীয় সভ্যতার ভারকেন্দ্র। মৌর্য্যযুগ হ'তে গুপ্ত ও পাল যুগ পর্য্যন্ত পাটলীপুত্র ও গৌড় প্রভৃতি জনপদ ছিল এ অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় নগররাজ। মুসলমানযুগেও দিল্লীর প্রভাবকে হীনপ্রভ করেছিল গৌড় ও মুর্শিদাবাদের ঐশ্বর্য্য। এজন্যই ক্লাইভ প্রাক্‌ভারতেই ইংরাজদের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র ভারতের রাজধানীও পূর্ব্বভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এসব বাজে খেয়ালে হয় নি—এর ভিতরে ছিল অবশ্যম্ভাবী ইতিহাসের নির্দ্দেশ। বাংলা দেশের শীলতা ও চারিত্র্যের মহার্হতার প্রমাণ এর চেয়ে অধিক কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রাক্‌ভারতীয় বৌদ্ধ যুগের আন্দোলনে ভারতীয় সমাজ হয়ে যায় একেবারে ওলটপালট—ঊর্দ্ধ হয়ে যায় অধঃ। নিম্নের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত সমাজস্তর জাতির শীর্ষেই আসন রচনা করে' উৎফুল্ল হয়। এটা সেযুগের একটা বিরাট্ প্রলিটারিয়ান বিদ্রোহের মত! আধুনিক রুশিয়ায় হাজার বছর পরে এরকম একটা বিপ্লব ঘটেছে। সেসময় নিম্নস্তরের সমাজ অভিনব মর্য্যাদা পায়। এই সকল নিম্নস্তর হ'তে বহু সাধু ও পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয় এবং এরাই দেশের সমগ্র চিত্তকে অধিকার করে' চিন্তাক্ষেত্রে এমন এক বিপ্লব নিয়ে আসে যাতে আর্যযুগের শ্রেণীভাগ এবং নানাজাতির অধিকারাদির বিধি একেবারে ধূলিসাৎ হয়! পরবর্ত্তী তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব যুগ এ বিপ্লবকে শিরোধার্য্য করে' এক অখণ্ড অভিনব সাম্যবাদের ধারা অগ্রবহ ক'রে চলে। এ যেন বহুকাল পরে আবিষ্কৃত কোন অনন্ত সত্যের মাথার মণি যার আলোকে সমগ্র দেশে তোলে একটা প্রবল দিগন্তব্যাপী আনন্দ উচ্ছ্বাস! এই আন্দোলনে অপ্রত্যাশিতভাবে ভাবের বহু গুপ্ত গবাক্ষ খুলেছে এবং প্রাচীন সংস্কারের লৌহদ্বার চূর্ণ হয়েছে! ঊর্দ্ধ স্তরের আর্য-প্রেরণাপ্রসূত উপনিষদ ও গীতাদির অনুশাসনের পরিবর্ত্তে অধস্তরের উৎখাত নানা তান্ত্রিক আচার ও সাধনার ধারা প্রামাণ্য হয়ে উঠে। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রশস্তি, সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের চর্চ্চা এবং বহু গুহ্য ও অপ্রকট তন্ত্রাদির উৎকট নির্দ্দেশ সে-সময়ে প্রভাব বিস্তার করে। তাতে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীই পরিবর্ত্তিত হয়। এসব আয়োজনে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল সভ্যতার একটা নূতন

অধ্যায়ের। বহু শতাব্দীর দর্শন এক নিমেষে মায়াঞ্জনের প্রলেপে যেন গেল বদলে। বর্ণভেদের গণ্ডী ভাঙ্গতে সুরু হয় এই নূতন সোণার হরিণের পেছনে ছোটার উৎসাহে। স্ত্রীজাতির সমান অধিকার স্বীকৃত হ'ল বহুকাল পরে। একথা গৌতমীয় তন্ত্র সানন্দে ব্যক্ত করেছে—

"সর্ব্বাধিকারাশ্চ নারীণাং যোগ এব চ।"

পরবর্ত্তী চৈতন্য যুগও অধঃপতিত ও নিমজ্জিত নিম্ন স্তরকে মাত্র নয়, সমাজগণ্ডী হ'তে একেবারে বর্জ্জিত জাতিকেও মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। নেড়া হরিদাসের স্নানে সাগরই পবিত্র হয়েছিল—হরিদাস নয়, এরূপ কথা বৈষ্ণব সাহিত্য লিপিবদ্ধ ক'রে নিজকে ধন্য মনে করেছে—

"হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হ'ল।"

—বৃন্দাবন দাস

—আধুনিক বলশেভিকবাদের আয়োজন এবং আন্দোলনও এরূপ ব্যাপক নয়। একটা বিরাট্ ভাবের কটাহে পূর্ব্বতন শতাব্দীর সমগ্র ধ্যান ও ধারণার পুটপাক হ'ল এ সময়ে। সে যুগে বাংলাসাহিত্যে এই প্রলয়ের পতাকা বার বার মুকুরিত হয়েছে। সরোরুহের দোহাকোষ ও অদ্বয় বজ্রের টীকা ষড়দর্শনকে খণ্ডন করতে এল কৃপাণ হস্তে এক কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। এই ছিন্নমস্তা প্রেরণার উৎস ছিল প্রাক্‌ভারতীয় বিশ্ববিদ্যায়তনগুলির উর্ব্বর ক্ষেত্র! এই বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত করতে বাংলাদেশ জীবনমরণকে তুচ্ছ করেছে এবং সকল ত্যাগের বিভূতিকে বরণ করেছে। এইজন্যই বাংলার আদি কবি সরোরুহের লেখনী হ'তে বেরিয়েছে অপরূপ কথা—

"জইসো জাম মরণ কি ওইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসেঁা।"

—অর্থাৎ জন্মও যেমন, মরণও তেমন, জীবনে ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নেই। শুধু স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতির মুখেই এরূপ কথা সাজে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার হোমানল যখন অহর্নিশ প্রজ্জলিত ছিল তখনই বাংলা-সাহিত্য একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ ক'রে আবির্ভূত হয়। বস্তুতঃ কোন বৈদেশিকের পদতলে অর্পিত অঞ্জলিতে পুষ্পিত বা মুকুলিত হয়নি আদি বাংলা সাহিত্য!

সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন সে সময়কার বাঙালীদের মনোভঙ্গী যাকে জার্ম্মাণ ভাষায় বলা হয় "Weltanshaung"। এ দৃষ্টিভঙ্গী না বুঝলে সে-যুগের সমগ্র কাব্য-কবিতা ও রূপের ডালি রসার্থীর নিকট ব্যর্থ হ'বে। এই দৃষ্টিভঙ্গী-বিচারে দেখতে হয় সেকালের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং জাতির রক্তগত সংস্কার ও প্রেরণা। সাহিত্য-বিচারে সাহিত্য-স্রষ্টার প্রবৃত্তি ও রুচি জানারও দরকার। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-প্রভাবিত এ দেশের বিচার অতি লঘু ও তরল। তা দাসসুলভ অবনত সংস্কারের (inferiority complex) কাল্পনিক আলেয়া মাত্র—তাতে কোন গভীর বাস্তবতা নেই। ভারতের নব্য জাতিত্ববোধের প্রস্ফুরণ হয়েছে অষ্টম ও নবম শতাব্দী হ'তে। ইউরোপে যেমন ভৌগোলিক রাষ্ট্র (territorial sovereignity) ভিত্তি করে' ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতির অভ্যুদয় হয়, সেযুগের ভারতের বিরাট্ রঙ্গভূমিতেও বহু দুর্দ্ধর্ষ জাতি এক একটি ভূখণ্ডে জমাট হয়ে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছিল। এই নব্য স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রেরণা ফলিত হয়েছিল জীবনে ও সাহিত্যে। শুধু রাষ্ট্রীয় কারণে নয়—নব্য শীলতার দীক্ষাই হয়েছিল এই সজ্ঘর্ষগত অগ্নিসংস্কারের ভিতর। সমগ্র ভারতে এই প্রতিরোধ উগ্র হয়েছিল এ যুগের নূতন তান্ত্রিক শক্তিবাদের আনুকুল্যে। এই যুগে সেই তান্ত্রিক শক্তিবাদের মধ্যাহ্ন প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠে। ঐতিহাসিকেরা দেখেছেন সে সময়কার ভারতীয় শক্তিপুঞ্জের মত্ত রণকেলি। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট, রাজপুতনার গুর্জ্জর-প্রতিহার এবং বাংলার পালদের ভিতর অষ্টম হ'তে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ঘটেছে উৎকট সংগ্রামের অফুরন্ত তরঙ্গভঙ্গ। সেই দ্বন্দ্বের ভিতরই ভারতের নবীনতম উত্থান-যুগের (renaissance) শতদল বিকশিত হয়। সাহিত্য-বিচারে ইতিহাসের এই সমস্ত উপাদান লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

আদিম বাংলা সাহিত্যের জাতি বিচার করতে হলে সমসাময়িক অন্যান্য সৌন্দর্য্যবিধি ও লীলার সহিতও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। কাব্য ও কলা একই রসের দু'টি প্রসূন—একটির সাহায্যে অন্যটির পরীক্ষা ইদানীং সারা জগতে চলছে। যেখানে একটির রহস্য ভেদ অসম্ভব হয়,

সেখানে অপরটির ব্যঞ্জনা প্রচুর আলোকপাত করে। শুক্রনীতির মতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দু'টি ধারা—একটা হলো বাচিক অর্থাৎ বাক্য দ্বারা উদ্ঘাটিত (linguistic)। এটা হ'ল সাহিত্য পদবাচ্য। অন্যটি হ'ল বাক্যেতর আয়োজনের ব্যাপার এবং তার নাম হল কলা :

"যদ্ যদ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্মবিদ্যাভিসংজ্ঞকং
শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎ স্মৃতম্।"

শতপথব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন দু' উপায়ে—নামে ও রূপে। প্রথমটির পথ হচ্ছে সাহিত্যের আর দ্বিতীয়টির হচ্ছে কলার। একই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দু'টি অঙ্গ। বাংলা সাহিত্যের সমসাময়িক অন্যান্য রসসৃষ্টিগুলির এজন্যই বিচার করা প্রয়োজন। তা হলেই এ সাহিত্যের অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত ঐশ্বর্য্য ধরা পড়বে। বাংলা সাহিত্য সে-যুগে গণকলার দুর্লভ ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত ছিল। লোককলার সহজ আবেদন, প্রখর ব্যঞ্জনা ও উদগ্র ভঙ্গী যেমন একটা প্রচণ্ড বাস্তবতাকে শ্রীযুক্ত করে, তেমনি এ সাহিত্যের কাঠামোও ছিল উর্দ্মিত কাঠিন্যে লীলামুখর এবং অস্খলিত সত্যের প্রেরণায় ভরপুর। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ভজনপূজনের অভিনব জীবনবত্তা একটা বহুমুখী প্রেরণা সঞ্চারিত ক'রে এসেছে ইতিহাসের উত্তরোত্তর নূতন বিজয়-যাত্রার পদাঙ্কে। তাতে করে আর্যযুগের ক্লান্ত আয়োজন ও উর্দ্ধমুখী বায়বীয় সত্তাবোধ উবে যায় কুজ্ঝটিকার মত নিমেষে! প্রোথিত ও অবজ্ঞাত নিম্ন সমাজ এ সুযোগে যেন মাটির ভিতর হতে সহস্রফণা প্রসারিত নাগরাজের মত ঊর্দ্ধে উঠে' পড়ে! প্রাক্‌ভারতীয় রক্তাক্ত আন্দোলনের প্রেরণায় শিহরিত এই সাহিত্য ও কলার কণ্ঠে এজন্যই দেখা যায় কখনও বা কাপালিকের অকুণ্ঠ মুণ্ডমালা ও রক্তাক্ত খর্পর এবং কখনও বা সর্ব্বস্ব নিবেদন-অর্পণের গৈরিক ঝুলি! সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের কৃত্রিম ভব্যতা, ভদ্রতা ও আলঙ্কারিক শ্রী এক্ষেত্রে হয়ে পড়েছিল একান্ত অপ্রচুর ও অসংলগ্ন। এ রকমের গতানুগতিক সাহিত্যের বাংলার সে যুগের অভিনব অনুভূতি প্রচারের যোগ্যতা ছিল না। বাংলার আদিম সাহিত্যও এজন্যই এক অলৌকিক সৃষ্টির চঞ্চল রামধনু সমগ্র চিন্তার আকাশকে মুকুরিত ক'রে তোলে।

তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথ প্রাক্‌ভারতীয় কলাকে নাগকলা নামে অভিহিত করেন। ভূগর্ভ হ'তে উর্দ্ধ স্তর ভেদ করে' যার জন্ম, সে সাহিত্যও যে যথার্থ নাগসাহিত্য একথা প্রমাণ করা কঠিন হয় না। কুলকুণ্ডলিনীর মত এই নাগসাহিত্য জাতির ইতিহাসে বারবার উঠেছে উর্দ্ধপ্রজ্ঞার সহস্রার চক্রে এবং তাতে করে' অধিকার লাভ করেছে শুধু তুরীয় তথ্য নিবেদনে মাত্র নয়, ঐহিক বাস্তবতার অফুরন্ত জটিলতা উদ্ঘাটনেও। এর প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যে আছে। এই বাংলা সাহিত্যের শারীরক ঐশ্বর্য্য বহুবার উপচিত হয়েছে; অথচ এ কাহিনীর অজ্ঞতার অনেকখানিই এখনও বিস্মৃতির অতলে ঢাকা পড়ে আছে। হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয়, তামিল প্রভৃতি সাহিত্যের তুলনায় এর বিভিন্নতা কোথা, বোঝা প্রয়োজন। এ আলোচনা না হ'লে বাংলা সাহিত্যের বিচারই হয় না।

(ক্রমশঃ)

অতীতের আমি

কুমার

কবে জানি লভেছিনু এ জীবনে সুখের পরশ
সে কথা পড়ে না মনে। তাই আজি খুঁজি নিরলস
স্মৃতি-চিহ্নখানি তার অতীতের ভগ্ন স্তূপ মাঝে,—
শুক্তি মধ্যে মুক্তাসম যদি হায় কোথাও বিরাজে!
নিজেরে হেরিনু সেথা,—ক্ষতদেহী সমর-বিহ্বল;
স্খলিত ললাটে মোর নিশি-শেষে শুকতারা প্রায়
ফুটিয়া উঠিছে যেন নিরাশার তিলক উজ্জ্বল।
আঁখি শুধু সমুজ্জ্বল,—অনাগত কালের আশায়।
ধূলায় লুণ্ঠিত হ'ল কামনার কুসুম-কলিকা;
সুবর্ণ পরাগ তার সকরুণ আকাশে মিলালো,
তন্দ্রাহীন চন্দ্রালোকে রাঙাইয়া বিষণ্ণের কালো।
হেরি যেন সেইক্ষণে ধরণীর রূপ-মরীচিকা।
পলে পলে কণ্ঠতালু যেন মোর শুকাইয়া যায়;
আঁখি শুধু সমুজ্জ্বল—অনাগত কালের আশায়!

অন্তরায়

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১

ফুল তুলিতে তুলিতে গীতা বার বার অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে।

বাগানের পূর্ব্ব দিকটা খোলা। প্রভাতের কোমল রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে ভিজা ঘাসের উপর। গাছের পাতায় পাতায় শিশির-কণিকাগুলি ঝলমল করিতেছে বুটদার সাড়ির জরির মত। বাগানের ভিতর কতগুলি দেশী ফুলের গাছ। গাছে গাছে ফুলগুলি শিশুর চোখের মত ফুটিয়া আছে।

কিন্তু আজ কোন কিছুর ভিতরই গীতার মন নাই। ঘর ও বাহির সব কিছু হইতে উঠিয়া তাহার মন বার বার আজ কোথায় যাইতেছে?

মোটেই অপরিচিত স্থান সে নয়। প্রায়ই তাহাকে যাইতে হয় সেখানে। তথাপি কি মোহই না সৃষ্টি করিয়াছে ঐ বাড়ীর ঘর-দুয়ার, ইট-পাথর অতি তুচ্ছ লতা-পাতটি পর্য্যন্ত!

গীতার চক্ষুর সম্মুখে ঐ বাড়ীর সব কিছু ভাসিয়া উঠিল। নাতিবৃহৎ একখানি বাড়ী, আম্র ও নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা—স্বপন পুরীর মত। দক্ষিণে একটী পুকুরে একটি সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। পুকুরের উত্তরে বাড়ীর তিন ভিটায় তিনখানা ঘর। পূবের ঘর খানি সব চেয়ে ছোট, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর। ঐ ঘরে ঠাকুর থাকেন—বাড়ীর গৃহদেবতা পঞ্চানন। বাড়ীর দক্ষিণ ঘরে থাকেন কর্ত্তা ও গৃহিণী। আর একখানা ঘরে কে থাকে?

গীতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ঐ-ঘরখানিই তাহার হইবে। ঘরের সব কিছুই যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের ন্যায় এই ঘরখানি নয়। ঘরের এক কোণে একটি বইয়ের আলমারি। আর এক কোণে শয়নের খাট ও আলনা। মধ্যে ক্ষুদ্র একটি টেবিল। তাহার দুইদিকে দুইখানা চেয়ার।

কিন্তু গীতার মনে পড়িল, ঘরের মালিকটি বাড়ী নাই। এক বৎসর দেশে নাই সে। কিন্তু সে ফিরিতেছে। কাল রাত্রেই হয়তো সে ফিরিয়াছে, না হয় আজ ফিরিবে। ফিরিয়া আসিলেও এখন তাহার সহিত দেখা হইবে না। ছেলেবেলা হইতে যাহার সহিত এক বাড়ীর মেয়ের মত হাসিয়া খেলিয়া বড় হইয়াছে সে, এই কয়টি দিন তাহার জন্য কত না সঙ্কোচে থাকিতে হইবে তাহাকে!

কিন্তু সকল সঙ্কোচের অবসান হইতেছে। সাহানার তান, পুরোহিতের মন্ত্র আর নারিকণ্ঠের হুলুধ্বনি শীঘ্রই সকল সঙ্কোচ ঢাকিয়া দিবে।

কয়টা অকালের স্থলপদ্ম অনেক উপরের ডালে ফুটীয়াছে। দলের পর দল মেলিয়া কি অপরূপ হইয়াই ফুটিয়াছে ফুলগুলি! কোমল হস্তে ধীরে ধীরে শাখা নোয়াইয়া ফুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গীতা তাহার জীবনের অনাগত উৎসবের কথা ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু হঠাৎ ফিরিয়া আসিল তাহার মন। বাড়ীর ঝি কেয়ারির কাছে আসিয়া কহিল, একজন অতিথি এসেছেন, দিদিমণি।

এই সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। এত সকালে কে আসে অতিথি হইবার জন্য! গীতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, অতিথি!

হাঁ, দু'টো খেয়ে যাবে আজ বলছে।

গীতা ক্ষণকাল ভাবিয়া কহিল, মা যে বাড়ী নেই, কেমন হবে?

বলে দেই সে-কথা, গিন্নী বাড়ী নেই।

না—না, বলিসনে। ব্রাহ্মণ?

হাঁ, ব্রাহ্মণ বৈ কি। গলায় পৈতে দেখলাম।

তবে আর ফেরাবো কেমন করে? বুড় মানুষ তো?

না দিদিমণি, একদম ছেলে ছোকরা

গীতা বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি!

হঠাৎ বাড়ীর উঠান হইতে অতিথির গলাশুনা গেল, কি বাধা আছে, ছেলে-ছোকরাদের অতিথি হবার?

ঝি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ওমা, ছোঁড়াটা দেখি বাড়ীর ভিতর এসে ঢুকেছে। তুমি কেমন লোক গা? বলা নেই, কওয়া নেই, ভিতরে চলে এসেছ?

শোয়ার ঘরের পিছন দিকে গীতাদের ছোট ফুলের বাগান। অতিথির কণ্ঠ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গীতা তাড়াতাড়ি উঠানের কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অতিথির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কে যেন তাহার সমস্ত মুখে কতগুলি আবির ঢালিয়া দিল। সে মহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ঘরের পিছনে পলাইয়া গেল।

অতিথিটি কহিল, পলালে যে গীতা!

ঝি একবার গীতার রক্তিম মুখের দিকে চাহিল এবং আর একবার অতিথির আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু সে কিছুই না বুঝিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতিথিটি কতক্ষণ অপেক্ষা করিল। [illegible] কহিল, তবে চলে যাবো গীতা?

গীতা এবার সলজ্জ সস্মিত মুখে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, না বস। বলিয়া ঘরের বারান্দায় একখানা জলচৌকি পাতিয়া দিল।

অতিথিটি বসিলে ঝি কহিল, এ কে দিদিমণি?

কিন্তু দিদিমণি অত্যন্ত বিপদে পড়িল। আবার তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু অতিথিই তাহাকে উদ্ধার করিল। অতিথি কহিল, তুমি নূতন ঝি? আমাকে কখন দেখোনি?

নূতন আর কই, আট ন' মাস হ'লো তো এসেছি। তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়েছে না!

অতিথিটি হাসিয়া কহিল, যখন আমাকে চিনতে পারলে না, তখন একদিন যে বলবে, আমাকে বকসিস্ দাও,—তোমার বৌকে আমি দেখাশুনা করছি, তা কিন্তু তুমি পাবে না।

এইবার ঝিয়ের চোকটি যেন খুলিয়া গেল। সে আনন্দে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত করিয়া কহিল, তবে তুমি দেবকুমার? আমাদের দিদিমণির বর?

দেবকুমার কোন উত্তর করিল না। হাসিতে লাগিল।

ঝি এবার অনুতাপের স্বরে কহিল, আমি কি করে' জানবো ভাই, তুমি এসেছ। তোমাকে খারাপ কথা বলেছি। হাত জোড় করি তোমার কাছে, ভাই।

ভিজা ঘাসের ভিতর দিয়া আসিতে দেবকুমারের জুতা ভিজা টুকরা ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে। সে কহিল, আচ্ছা একটু নেকড়া নিয়ে এসো তো ঝি, জুতোটা পরিষ্কার করি।

ঝি কহিল, আমাকে দাও, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি, বলিয়া তাহার পা হইতে জুতা খুলিয়া লইয়া গেল।

গীতা এইবার কহিল, আচ্ছা আজ কোন্ সাহসে এলে?

আকাশে একখানা ধবল মেঘ নিরুদ্দেশ অভিসারে চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে অনন্ত আকাশ নীল চন্দ্রাতপ মেলিয়া দাঁড়াইয়া। দেবকুমার বলিল, না এসে পারলাম না, গীতা। আর কয় দিন পর তো দেখা হবেই। কিন্তু এতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। ট্রেনে আসার পথে মনটা কেবলই বলতে লাগলো,—গীতা, গীতা, গীতা।

গীতার জীবনের পটভূমিতে কিসের যেন একটা নূতন ছায়া পড়িল এই প্রথম। আনন্দ ও লজ্জায় গীতা কোন কথা বলিতে পরিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, বস আমি আসি।

বলিয়া ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ঝি জুতা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আসিল। দেবকুমার তাহার কাজের প্রসংসা করিয়া কহিল, চমৎকার করেছ তো!

মিনিট দুই পর গীতাও ফিরিল। তাহার হাতে একখালা খাবার। দেবকুমার কহিল, এ আবার কি?

গীতা বলিল, অতিথি যে!

তাহার চোক দু'টি হাসিতে ঝিলমিল করিতে লাগিল।

কিন্তু দেবকুমার তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া কহিল। না এখন অতিথির সময় নেই।

কেন?

তোমার মাকে আমাদের বাড়ী দেখে তবে পালিয়ে এলাম। উনি এসে পড়লে বলবেন কি? বলিয়া থালা হইতে একটা নারকেল-লাড়ু তুলিয়া খাইয়া বারন্দা হইতে উঠানে নামিয়া আসিল।

গতকল্য একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ঠাকুরপূজার একখানা নৈবেদ্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার ভিতর হইতে ভাল ভাল খাবারগুলি বাছিয়া গীতা তাহার উপচার সাজাইয়া আনিয়াছিল। গীতা দুঃখিত হইয়া কহিল, ভাল, তুমি কিছুই খেলে না!

আজ আর নয় গীতা, এখন পলাই, বলিয়া দেবকুমার রওনা হইল।

গীতা দেখিল, দেবকুমার চলিয়া যায়। সে পিছু হইতে ডাকিয়া কহিল, না, দাঁড়াও।

দেবকুমার দাঁড়াইল। গীতা কাছে আসিয়া কহিল তোমাকে একটা প্রণাম করি। বলিয়া গলায় অঞ্চল জড়াইয়া একটা প্রণাম করিল।

দেবকুমার কহিল, আমি কারো প্রণাম নেইনে গীতা। কিন্তু তোমার এই প্রণামটি আজ আমার কাছে কত মিষ্টি আর মূল্যবান তা জান?

বলিয়া হাসিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

২

গীতা ঘরের পিছনে ফুলের সাজি রাখিয়া আসিয়াছিল। সাজি তুলিয়া লইয়া আবার সে বাগানে গেল। তাহার মা প্রতিদিন শিবপূজা করেন। গৃহদেবতারও পূজা হয় বাড়ীতে। কিন্তু ফুলের জন্য তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে হয় না। এই ছোট্ট বাগানখানিতে এত ফুল হয় যে, কোন কোন ঋতুতে দুইখানা সাজি ফুলে ভরিয়া যায়।

ছেলেবেলা হইতে গীতা প্রতিদিন এই ফুল তোলে। এই ফুল তোলার ভিতর অসীম একটা আনন্দ সে পায়। একবার ছেলেবেলা তাহার সামান্য অসুখ করিয়াছিল। তাহার বাবা তাহাকে না জাগাইয়াই ফুল তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেইদিন তার কি কান্না! সেই হইতে প্রতিদিন সে ফুল তুলিতেছে।

কিন্তু পিত্রালয়ে থাকিয়া প্রতিদিন এই ফুল তোলার অধ্যায় অনেকদিন পূর্ব্বেই তাহার শেষ হইয়া যাইত! এখনো যে হয় নাই, ইহা নিতান্তই একটা দৈব ব্যাপার। আট বৎসর পূর্ব্বে তাহার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। তখনই তাহার বাবা তাহাকে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। দেবকুমারের সঙ্গেও একবার হইয়াছিল। কিন্তু একদিন একজন জ্যোতিষ আসিয়া বলিলেন, তাহার নাকি বৈধব্য যোগ আছে। আঠারো বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দিলে তাহার ফাঁড়া কেহ কাটাইতে পারিবে না। তখন তাহার বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল এবং সে স্কুলে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেবকুমারের বিবাহের কোন সঙ্কত বাধা ছিল না। তাহার পিতা অবশ্যই অল্প বয়সে তাহাকে বিবাহ দিতে বরাবরই অনিচ্ছুক ছিলেন। তথাপি বি, এ পাশ করার পর তাহাকে জামাতা রূপে লাভ করার জন্য সমাজের বহু লোকেরি আগ্রহ ছিল। বহু স্থান হইতেই তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিয়াছে। কিন্তু দেবকুমার নানা অছিলায় সকলকে ফিরাইয়া দিয়াছে। অবশেষে এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা যাইবার সময় তাহার মাকে সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছে, গীতার সঙ্গে যদি তাহার বিবাহ হয়, তবে আর অন্যত্র সে বিবাহ করিবে না।

দেবকুমার যে নিজে আগ্রহ করিয়া গীতাকে বিবাহ করিতে চায়, বিগত এক বৎসর এই চিন্তা গীতাকে আনন্দের খোরাক যোগাইয়াছে। কিন্তু সেই আনন্দের স্রোত ছিল শীতের ক্ষীণ প্রবাহের মত। আজ জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মতই তাহা তাহার বুকের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ছেলেবেলা হইতেই দেবকুমারকে সে দেখিয়া আসিয়াছে। অনেক দিন তাহার সহিত হাসি তামাসা হইয়াছে, ঝগড়া-ঝাঁটিও হইয়াছে আবার। কিন্তু আজ দেবকুমারের এই অতর্কিত সাক্ষাৎকার তাহার সহিত দেবকুমারের পূর্ব্বের সকল সম্পর্ক যেন ঢাকিয়া দিল। আজ দেবকুমার যে বলিয়াছে, তাহার সহিত দেখা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিয়াই চুরি করিয়া সে দেখা করিতে আসিয়াছে, ঐ কথা কয়টি তাহার মনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া অনুক্ষণ সুধা সিঞ্চন করিতে লাগিল।

কিন্তু গীতার চিন্তার মোড় ঘুচিয়া গেল। উঠান হইতে তাহার মা ডাকিয়া কহিলেন, এখনও তোর ফুল তোলা হ'ল না গীতা?

গীতার মনের মতো একটা আনন্দের ফল্গুধারা নাচিয়া চলিয়াছে। সে কহিল, তুমি তো এখনও চান করে' এলে না মা! বেড়াতে বেরিয়েছিলে তো ভোর বেলাই!

বেড়াতে আর কোথায় গেলাম! দেবকুমারদের বাড়ী গেছিলাম। এতক্ষণ বসে রইলাম, দেখা হলো না ওর সঙ্গে। ভোরে উঠেই কোথায় বেরিয়েছে যে! বলিয়া নির্ম্মলা দেবী স্নান করিতে গেলেন।

গীতার তখন ফুল তোলা হইয়া গিয়াছে। বাগানে আর ফুল আছে কিনা একবার দেখিয়া লইয়া, সে কিছু দুর্ব্বা তুলিয়া লইল। তাহার পর ঠাকুর ঘরে সাজি রাখিয়া সে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাঘ মাস। আজ হঠাৎ অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। গীতার রৌদ্র হইতে সরিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রান্না ঘরের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, ঝি ইতিমধ্যেই কয়লা ধরাইয়া দিয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া সে রান্না ঘরেই গেল। কিন্তু রান্না করিতে করিতেও একই চিন্তা তাহার মনের ভিতর ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

আজ মাসের দুই তারিখ। আর এগারোটি দিন মাত্র বিলম্ব আছে। তাহার পরই তাহাদের বিবাহের শাঁখ বাজিয়া উঠিবে। এখনই তাহার আনন্দ সে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহার পর? গীতা চণ্ডীদাসের কবিতার একটা ভাঙা টুক্‌রা নিজের মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল: নামের প্রভাবে যার ঐছন করিল গো—

গীতার ভাত হইয়া গিয়াছিল। ভাত নামাইয়া রাখিয়া মাথা ফিরাইতেই সে দেখিল, তাহার বাল্য বন্ধু অরুণা কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গীতা অমনি উঠিয়া এঁটো হাতেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, অরুণা, সে এসেছিল।

অরুণা বাড়ী হইতে কেবল স্নান করিয়া আসিয়াছে। গীতার অশুচি আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, ছাড় পোড়ারমুখী, এঁটো হাত নিয়েই আমাকে ধরলি!

কিন্তু গীতা এত জোরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, সে তাহাকে ছাড়াইতে পারিল না। গীতা তাহাকে আর একবার জোরে চাপ দিয়া শেষে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, সে এসেছিল আজ, অরুণা।

অরুণা অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া কহিল, কে এসেছিল পোড়ারমুখী?

গীতা অমনি তাহাকে এমন জোরে একটা ধাক্কা দিল যে, অরুণা ঘরের দেয়ালের উপর যাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে ঝুলান তাকের উপর হইতে থালা, বাটি, গ্লাস, সমস্ত বাসন ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। নির্ম্মলা দেবী কেবল পূজায় বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন। শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, একি! একি গীতা!

ছ্যাখো অরুণার কাণ্ড! সব বাসনগুলি ফেলে দিল।

অরুণা গর্জ্জিয়া কহিল, আমি ফেলেছি বুঝি! তুই ধাক্কা দিলিনে আমাকে?

মা বুঝিলেন, ইহা তাহাদের নিজেদের গোপন কলহ। তিনি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া গিয়া পূজায় বসিলেন। গীতা চাপা গলায় কহিল, ও রকম করে' চীৎকার করলি কেন?

অরুণা এইবার হাসিয়া কহিল, কে এসেছিল? দেবুদা এসেছিল?

গীতা আবার খুব জোরে অরুণার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল, তবে বল্লাম কি তোকে বোকা মেয়েটা!

অরুণা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তোদের বাড়ী এসেছিল!

হুঁ।

তোর মা ছিলেন না?

না।

কি বল্লে এসে?

তা বলবো না।

অরুণা মুখ ফিরাইয়া কহিল, আচ্ছা ছেলে-খেলার গল্প শুনতে চাইনে আমি।

কি গল্প শুনতে চাস তবে?

অরুণা উত্তর করিল না। মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

গীতা আবার কহিল, বলতে পারি, আমাদের এখানে যদি খেয়ে যাস তবে।

কেন খেতে বলছিস, বলতো? আজ তোর হ'লো কি?

তুই খাবি কিনা বল।

তুই কি কাণ্ড করেছিস, দেখছিস না পোড়ারমুখী? বাড়ী গিয়ে চান করবো, কাপড় ছাড়বো, তারপর তো খাবার কথা!

আচ্ছা আমার একখানা শাড়ি পরবি এখন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঝিকে ডাকিয়া অরুণার মাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিল, গীতাদের বাড়ী খাইয়া সে যাইবে।

আহারের পর প্রতিদিন অরুণা একটু ঘুমায়। সুতরাং গীতাও না ঘুমাইয়া পারিল না। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত তাহারা ঘুমাইল। তাহার পর মায়ের ডাকে গীতার ঘুম ভাঙিয়া গেল। গীতা উঠিয়া বসিতে মা কহিলেন, দেবকুমারদের বাড়ী চল এক্ষুণি।

গীতা প্রতিবাদের সুরে কহিল, ওদের বাড়ী কেন?

ওদের চাকর এসেছিল। দেবুর বাবা চন্দনা গেছিলেন স্বস্ত্যয়ন করতে। সেখান থেকে কলেরা হয়ে ফিরেছেন।

কলেরা!

হাঁ, ওকে পাল্‌কিতে আনা হচ্ছিল। পালকি থেকে দু'বার পড়ে গেছিলেন। অবস্থা ভাল নয়। তোকে নাকি দেখতে চেয়েছেন। চল শীগ্‌গির।

গীতা তখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অরুণার ওদের সঙ্গে যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মায়ের কাছে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে যাইতে পারে না। সুতরাং সে বাড়ী চলিয়া গেল।

গীতার চোখে তখনো নিদ্রার আবেশ রহিয়াছে। মায়ের সহিত যাইতে যাইতে সে ভাবিল, আজ ভোর বেলা হইতেই সে যেন ঘুমাইতেছে। ঘুমের ভিতর একটা মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

বার্লিনে একদিন

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

হার হিটলার তখনও চরম ক্ষমতার গদীতে প্রতিষ্ঠা পাননি। তখনও বিদেশী জাহাজ হামবার্গে বিনা পাইলটে প্রবেশ করলেও জার্মানরা কিছু বলত না। তখনও দমন নীতি চরমে উঠেনি। আমি সেই সময়কার বার্লিনের কথা বলছি। ড্রেসডেন হতে আসছিলাম। রোজই ৩০ হ'তে ৪০ কিলোমিটার করে' ভ্রমণ করি। অনতিদূরে একটি ছোট সহর হ'তে রাজধানী বার্লিন অভিমুখে সাইকেলে চলেছি। এত ক্লান্ত যে পা প্যাডেল করতে বার বার বেঁকে বসছিল। আগের দিন জু-বিদ্বেষিণী জনৈক জার্মাণ-যুবতীর সংগে বেশ ঝগড়াও হয়। সেজন্য মনটাও তত ভাল ছিল না। পথে ক্রেসল-ম্লেছ (দই) খেতে ইচ্ছা হ'ল না, শুধু কাফি আর ডিম খেয়েই পথ চলছিলাম।

বার্লিন হতে তখনও বার কিলোমিটার দূরে ছিলাম, অথচ মনে হচ্ছিল যেন বার্লিনে পৌঁছে গেছি। পকেট হতে ম্যাপখানা বের করে' উলেনব্রাসে কোথায় হবে, তাই দেখছিলাম। এমনি সময়ে কয়েকটি দুধবিক্রেতা যুবক আমার কাছে এসে কি যেন বলল। আমি তাদের কথা একটুও বুঝতে পারলাম না। শুধু বললাম "উলেনব্রাসে"। তারা ইংগিত করে' বলল, তাদের সংগে যেতে। আমি তাদের সংগ নিলাম, কিন্তু পা চলতে চাইছিল না।

বুদাপেস্তে দিন কয়েক এক ইহুদী মহিলা আমাকে ভাত রেঁধে খাইয়েছিলেন, তারপর থেকে ভাত আর পেটে পড়েনি। দুধ, রুটি, মাংস, ফল, মাখন, মিঠাই, চপ, কাটলেট, অম্‌লেট কতই খাচ্ছিলাম, তবুও যেন শক্তি পাচ্ছিলাম না, তৃপ্তিও হচ্ছিল না। অবশেষে পায়েস খেতে লাগলাম, তাতেও আশ মেটে না, শক্তি যেন আর ফিরে আসে না! মন বুঝাতে একদিন পেট ভরে বিয়ার খেলাম। ফল তার আরও উল্টো হ'ল। পরের দিন প্রতিক্রিয়া আর অবসাদে শরীরটা অনড়প্রায় হ'য়ে উঠল। শুনেছিলাম উলেনব্রাসে নামক স্থানে মিঃ গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক আছেন। তাঁর একখানা ভাতের দোকান আছে। সহর দেখার চেয়ে শুধু ভাত খাবার জন্যই বার্লিনে যাবার তাই এত আগ্রহ। দুধ বিক্রেতাদের পেয়ে তাদের সংগ নিলাম; কিন্তু পথ যে শেষ হতে চায় না!

পথে বিশ্রামার্থ দুধবিক্রেতাসমেত একটি রেস্তোরায় গিয়ে উঠলাম। পেট ভরে খেলাম, সঙ্গীদেরও খাওয়ালাম। তবুও যেন জোর পাই না—শরীরেও না, মনেও না। বেশ অনুভব করলাম, এ প্রাণ অন্নগত। রুটিফুটি এ প্রাণে সইবে না। অতি কষ্টে তাঁদের সংগে চললাম। পথের মনোহারী দৃশ্যাবলী আমার কাছে

বিষতুল্য অনুভব হচ্ছিল। শুধু মনে হচ্ছিল লম্বা এবং মোটা চালের গরমভাতের কথা এবং তার সুগন্ধ যেন কোথা হতে এসে আমার নাকে পৌঁছাল।

বার্লিনে প্রবেশ করলাম। অনেকগুলি ষ্ট্রীট পার হলাম। ডাইনে এবং বাঁয়ে ছবি, সংবাদপত্র, লোকের বাড়ী-ঘরের সুন্দর দেওয়াল, বড় বড় রেঁস্তোরা, কিছুতেই আমার মন উঠছিল না। শুধু ভাত আর ভাত! অবশেষে উলেনত্রাসে এলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট বাড়ীর গায়ে সাইনবোর্ড দেখলাম "ইণ্ডিয়া টি" ইংলিশে লেখা। ঘরে প্রবেশ করলাম, মিঃ গুপ্তের সংগে দেখা হল। তিনি পেট ভরে ভাত খেতে দেবেন বলে আশ্বাসও ~~দিলেন।~~ তারপর ফিরে দাঁড়াতেই দুগ্ধ-বিক্রেতা যুবকগণ 'হেইল হিটলার' বলে বিদায় নিতে চাইল। আমি তাদের বিদায় দিতে রাজী হলাম না, বললাম "কাফি খেয়ে যাও।" তারা তাতে রাজী না হয়ে "মারসি মঁসিয়ে" বলে' বিদায় নিল। আমিও 'গান্ধীকি জয়' বলে' কৃতজ্ঞতার সহিত বিদায় দিলাম।

ইউরোপ তোমার সভ্যতা, তোমার আচার ব্যবহারকে নমস্কার। চীন হতে যেদিন প্রথম কলকাতায় আসি সেদিন রাতের ঘোরে হ্যারিসন রোডের একটা হোটেল খুঁজে বের করতে আমায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয়েছিল। সবাই মুখে পরামর্শ দিল, এগিয়ে যাও। শেষটায় যখন এগোতে এগোতে বাগবাজার অমৃতবাজার অপিসে পৌঁছালাম তখন স্বগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমায় গন্তব্য স্থানের হদিশ হাতে-কলমে দিলেন। এই অন্যায়ের জন্য কলকাতার লোককে মন্দ বলা চলে না। যদি আমাদের মাঝে দায়িত্ব ও নীতিবোধ থাকত তবে আমাদের দেশ বিদেশীরা বার বার আক্রমণ করতে সাহস করত না। আমরা স্বাধীনতাও হারাতাম না, সামাজিক দায়িত্ববোধহীনও হতাম না। টাকার লোভে মনুষ্যত্বহীন হয়ে এত লোক মারবারও হেতু হতাম না। ইউরোপে শুধু জার্মানজাতই আমাকে পথ দেখিয়ে দেয়নি, রাত তিনটায় পথ ভুলে একদিন ইংলণ্ডের এক গণ্ডগ্রামে এক বৃদ্ধের দরজায় করাঘাত করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বৃদ্ধ আমাকে পথভোলা বিদেশীরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। শাসিত ভারতবাসীরূপে গ্রহণ করেননি। বৃদ্ধ আমাকে তাঁর বাড়ীতে বাকি রাতটুকু থাকতে দিয়ে পরের দিন সকাল বেলা বড় পথে এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং এশিয়ায় শুধু জাপানেই দেখেছি, পথ দেখিয়ে দেবার অভ্যাস আছে। সে জন্যই ঐ দেশের চরিত্রের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আমি খালি হাতে পরের উপর নির্ভর করে দুনিয়া ভ্রমণ করেছি। যেদিন বার্লিন পৌঁছালাম তার পরের দিন থেকেই ভিক্ষা আরম্ভ করি। বিদেশে গিয়ে আমি নমস্কার শব্দটি সর্ব্বত্র ব্যবহার করেছি। সকালবেলা সুন্দর একটি রেঁস্তোরাতে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম। তখন হিটলারের উঠ্‌তি সময়। প্রত্যেকেই আমাকে "হেইল হিটলার" বলে সম্বোধন করলো। মনে মনে ভাবলাম আমারও তাদের মতই একটা নতুন কিছু করতে হবে। নমস্কার শব্দটা যেন আমাকে 'কমফর্ট' দিতে পারছিল না, সেজন্য আমিও তাদেরই ধরণে "হেইল মহাত্মা গান্ধি" বলে প্রতিনমস্কার জানালাম। মহাত্মা গান্ধির নাম শুনে অনেকেই বিরস বদনে আমার দিকে চেয়ে থাকত। তাদের ধারণা ছিল, আমিও 'হেইল হিটলার' বলেই প্রত্যভিবাদন জানাব। কিন্তু তা না করে 'হেইল মহাত্মা গান্ধি' বলাতে তাদের পছন্দসই হল না। তবু পর্য্যটকদের এরা অসম্মান করে না। গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের নাম শিক্ষিতদের অনেকেই শুনেছে। পরের বিষয়ে এরা বড় অসহিষ্ণু, নিজেরটা পরের ঘাড়ে চাপানো এদের প্রকৃতি।

সকালবেলা ভিক্ষা করে ছয় মার্ক পেয়েছিলাম, তার দ্বারা বেশ করে কতকগুলি উত্তম চাল কিনে মিঃ গুপ্তকে বলেছিলাম "এগুলি পাক করে দিন।" সেদিন বোধহয় আধসের চালের ভাত খেয়েছিলাম। ভাত খাবার পর চোখে তৃপ্তির আমেজ এসে গেল। সকাল বেলা ভাত খাবার পর বিকাল বেলাই শরীরে জোর পেয়েছিলাম। তারপর যখন দু'বেলা ভাত খেলাম তখন মনে হ'ল আমার মত শক্তিশালী অতি অল্প লোকই আছে। তৃতীয় দিন বিকাল বেলা সাইকেলে লম্বা দৌড়ের একটা রেস হল। তাতে যদিও আমার স্থান ছিল না, তবুও যারা সাইকেলে

রেস দিচ্ছিল, তাদের সংগে আমিও সাইকেলে চলতে লাগলাম। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পর দেখা গেল, যে লোকটি প্রথম হয়েছিল সেও আমাকে বেশি পেছনে ফেলে যেতে পারেনি। অর্থাৎ আমি 'আন অফিসিয়ালি' দ্বিতীয় হয়েছিলাম, বলা চলে। যথাস্থানে পৌঁছার পর সকলেরই বিস্মিত চোখ আমার বাইসাইকেলটার উপর গিয়ে পড়ল। সাইকেলটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। আমার পায়ের দিকে কিন্তু কেউ তাকাল না। আমি চীৎকার করে ইংলিশে বললাম "you see only what make the bike, but don't see what make my feet ?" তারা বুঝলো কিনা, জানি না; তবে অনেকেই এসে আমার করমর্দ্দন করলো।

এ সেদিনের সেই উদীয়মান জার্মানীর কথা। সেই পরিচ্ছন্ন ইন্দ্রপুরী বার্লিনের ছবি আমার চোখের উপর ভাসছে। কিন্তু আজ! দুর্দ্ধর্ষ জার্মানী পরাজিত! বার্লিন ধ্বংস-স্তূপে পরিণত! কলকাতার এক নগণ্য হোটেলের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসে জার্মানী ও বার্লিনের আজিকার পরিণতি খানিকটা কল্পনা করা চলে, কিন্তু এ জাতটার প্রত্যক্ষ পরিচয় না জানা থাকলে, তার সবটা অনুভব করা সম্ভব নয়। যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে অথচ কণ্ঠে প্রতিবাদ উঠে না, লুটপাট করে' বাঁচার প্রয়াস করে না, আর যে দেশের লোক অম্লান বদনে তা দেখে এবং নিজের পুষ্ট ভুঁড়িকে আরও পুষ্ট করতে এই অসহায়দের মরণের পথে ঠেলে দেয়, সেই নির্লজ্জ পঙ্গু মানুষের পক্ষে জার্মানজাতির প্রাণপ্রকৃতিকে বুঝাও সম্ভব নয়। আমার সাইকেল পরীক্ষার মতো এই যুদ্ধ-পরাজয়ের হেতুও তারা শেষ পর্য্যন্ত যন্ত্র ও উপকরণের অভাব বলেই নির্দ্দেশ করেছে। ও-দেশের কোন স্বাধীন জাতিই মরতে পারে না এই জন্য যে, তাদের 'ডিফিটিষ্ট মেণ্টালিটি' (defeatist mentality) নেই।

অনধিকারী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার চোখে যা লাগে নাকো ভাল
দেখেই বলো না—ছাই
হয় ত তাহার মহিমা বুঝিতে
অধিকারী হওয়া চাই।
চেনে যারা জানে তারাই এ দাম
শিলা হয়ে পড়ে রহে শালগ্রাম,
জানে দুর্লভ মণি রত্নের
মূল্য যে গুণীরাই।

মন্দির গায়ে অঙ্কিত ছবি
দেখিলেই হয় ঘৃণা,
আছে ভক্ত ও শিল্পীর কাছে
মূল্য তাহার কি না?
তন্ময় মন জানে না বিকার
মন্দিরে তারি প্রবেশাধিকার
পিপাসু চকোর সুধা চায় শুধু
আন ক্ষুধা তার নাই।

লৌহ মনকে চুম্বক পারে
করিতে আকর্ষণ,
সোনা যে হয়েছে—নির্ভীক সেযে
চির বিশুদ্ধ মন।
ছাগলে কি ভয় কল্পতরুর?
ফাঁদে পড়ে ঘুঘু—পড়ে না গরুড়,
কালো ও নিকষে খাঁটি স্বর্ণের
নিয়ত হয় যাচাই।

মন্দির পথে বিপনী সাজায়ে
রূপ বিলাসিনী রয়
মুক্তা তোলার ডুবারীরে কিসে
ভুলাবে সফরীচয়?
যাহারা প্রেমিক—যারা উপাসক—
তাহারা তাপস তাহারা বালক,
তাহাদের চোখে অমল কমল
গোটা এ পৃথিবীটাই।

বাহির দেখিয়া আমরাই ভুলি
অনধিকারীর দল,
মূল্য তাহার না বুঝিয়া করি
তর্ক ও কোলাহল।
চিনিতে শিবের চরণ দাগ গো
চাই যে ভকতি—চাই যে ভাগ্য
যন্ত্রেতে যাহা জানাতে পারে না
মন্ত্রেতে তাহা পাই।

নব বর্ষ

নব বর্ষের নব সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কি রক্তস্নাতা ধরণীর নব যুগান্ত উপস্থিত হইবে না? আজ এই প্রশ্নই কোটী কোটী মানবের, বিশেষতঃ নিখিল বাঙালী জাতির হৃদয়ে বুঝি গুমরিয়া উঠে! ১৩৫১ সাল বিদায় লইয়াছে—১৩৫২ সাল মহাকালের নূতন গুপ্ত বাণী লইয়া আবির্ভূত। সে অজানা বাণীর নিগূঢ় মর্ম্ম দিনে দিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা যাহারা মহাশক্তির বিশ্বলীলায় বিশ্বাসী, আমাদের সাধনা হউক—সেই মহাদেবীর করুণাধারা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া, চিন্তায় ও কর্ম্মে তাঁহারই বিধানকে জয়যুক্ত করা। এই বিধান সত্যের, তাই তাহা সত্য। উহা আবার ঋতময় অর্থাৎ সৃজনকরী শক্তিপূত। ব্যক্তিকে ও জাতিকে এই সত্যে ও ঋতে সমুন্নত হইয়াই আপনাকে বৃহৎ করিতে হইবে। ভূমার পরিচয়ই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এইখানেই আমরা আমাদের প্রকৃত ঐক্যের মিলনভূমি খুঁজিয়া পাইব। জাতির বিরুদ্ধে জাতির যে সর্ব্বনাশকর পরিস্থিতি আজ লক্ষ্যে পড়ে, এই শতাব্দীর মধ্যেই তাহাতে দুইবার ভাঙ্গন ধরিয়া মানবসভ্যতার উৎসন্নের পথ পরিচ্ছন্ন করিল। এবার কি জ্ঞানোদয় হইবে? মানবহৃদয়ের যেটুকু পরিবর্ত্তন হইলে, মানুষের সাধনা ভাঙ্গার দিকে না চলিয়া গড়ার দিকেই ছুটিয়া চলে, তাহার সৃষ্টি হয় সার্থক— আজও কি তাহা আসন্ন বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি? তাহা যদি না হয়, মহাকালের বিশ্বনাট্যে এখনও অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্যেই আমাদের অন্ধকারের মধ্য দিয়া দীর্ঘ যাত্রা করিতে হইবে। তবুও সেখানে আছে ব্যক্তি ও সমষ্টির কাজ। সেই কাজটুকুর ইঙ্গিত দিতে পারিলেও আমরা ধন্য হইব।

জীবের সিদ্ধি যোগে। যোগের মধ্যে আত্মসমর্পণযোগেই আমরা বিশ্বাসী। কারণ এই যোগেই ব্যষ্টির অন্তরাত্মা ইষ্টে সংযুক্ত হইয়া নিজ ও পারিপার্শ্বিকের কল্যাণকর চিৎ-কেন্দ্রে পরিণত হয়। যোগীর জীবনযন্ত্র-গুলি—তাহার দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা—চিচ্ছক্তির আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়, সুপরিণতি লাভ করে। এই শোধন ও সাধনের মধ্য দিয়াই যোগের পরিপাক অর্থাৎ জীবশক্তি যোগশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ভারতে যোগসিদ্ধ জীবনের একটী ক্ষুদ্রতম সংহতিও যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, উহাই নব যুগপ্রভাতের আশা-কেন্দ্র হইবে।

"প্রবর্ত্তকে"র দেবতা এই যোগজীবনেরই সঙ্গীত গাহিয়া ২৯শ বর্ষ অতিবাহন করিয়াছে। "প্রবর্ত্তক" চাহিয়াছে যোগসিদ্ধ ব্যষ্টি ও সমষ্টি। তাহার আহ্বান অরণ্যে রোদন হয় নাই—এ প্রত্যয় আমাদের অটুট। প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন অতিশয় অণুতুল্য, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু যোগবীর্য্য বিন্দু পরিমাণ হইলেও, তাহা অনন্ত শক্তি ধারণ করে। খাঁটী আত্মসমর্পণযোগের দুইজন মানুষও পূর্ণ ইষ্টযুক্তি লাভ করিলে, তাহাই হইবে নবসৃষ্টির উৎস। আমরা আজ সেই যোগসিদ্ধ সঙ্ঘ-শক্তিরই আবাহন করিতেছি—যাহা কাম ও দুর্ব্বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত, যাহা উৎসর্গে স্বচ্ছ ও সুন্দর, যাহা শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সর্ব্বজয়ী, অখণ্ড অমৃতময়। এই সঙ্ঘচক্রের সম্পর্কিত 'প্রবর্ত্তকে'র গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুরাগী সুহৃদ্‌গণকে আমাদের নব বর্ষের অকপট শুভেচ্ছা ও সপ্রেম অভিবাদন জানাইয়া এই প্রার্থনাই করি—হে ভগবান, এই যোগসিদ্ধিতে তাঁহাদের জীবনও যেন অমৃতায়মান হয়।

মহাসমর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একাংশ আজ সমাপ্তির পথে। ইউরোপের করাল সমরনাট্যের পঞ্চাঙ্ক দৃশ্যে এইবার যবনিকা পড়িতেছে। অক্ষশক্তিত্রয়ের অন্যতম শক্তিনায়ক, ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠাতা সীনর মুসোলিনীর স্বদেশ-বাসী ইতালীয়ানের হস্তেই জীবনান্ত ঘটিয়াছে। সে মরণ অতিশয় ভয়াবহ, শোচনীয়। তবুও বীরেরই ন্যায় মুসোলিনী নাকি তাঁর প্রণয়িনী সহ সহাস্যমুখে মরণ বরণ করেন। ইতালীর জার্ম্মাণবাহিনী মিত্রসেনাধ্যক্ষ ফিঃ মাঃ আলেকজান্দারের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। স্বয়ং রুশনেতা ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে রীথ-রাজধানী বার্লিন নগরীর অবরোধ ও তাহার ধ্বংসসাধনের সঙ্গে জার্ম্মাণীর মেরুদণ্ডও ভাঙ্গিয়া পড়িল। নাৎসী নেতা এডল্‌ফ হিটলার খুব সম্ভবতঃ বীরেরই ন্যায় অন্তরঙ্গ কয়েক জন সাঙ্গোপাঙ্গসহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পাতালপুরীতেই জীবনাহুতি দিয়াছেন। তাঁর সহকারী প্রচার-সচিব গোয়েব্‌ল্‌স সপরিবারে বিষসেবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। লুট্-ওয়াফ-নেতা গোয়েরিং পলাতক—তিনি নাকি সস্ত্রীক প্রচুর ধনরত্নসহ বিমানযোগেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। পরবর্ত্তী সংবাদ, তিনি ধৃত ও বন্দী হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইয়াছেন। ফিঃ মাঃ রুণষ্টেড প্রমুখ বিখ্যাত রণদুর্ম্মদ সেনানীবৃন্দ অনেকেই মিত্রপক্ষের বন্দী, কেহ কেহ হত বা স্বয়ং-মৃত হইয়াছেন। হিটলারের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য হেস ইংলণ্ডের কারাগারে বন্দী ও উন্মাদগ্রস্ত। জার্ম্মাণীর দুর্দ্ধর্ষ সামরিক অনীকিনী আজ ভগ্নপ্রাণ, জার্ম্মাণীর নগর-নগরীগুলি বিধ্বস্ত শ্মশানতুল্য। কর্ম্মচক্রের আশ্চর্য্য বিবর্ত্তনে নিখিল ইউরোপের বিজেতা আজ স্বয়ং অধিনত—এডমিরাল ডোণিৎজ বীর-বিক্রমে হিটলারের জয়পতাকা উড্ডীন রাখার চেষ্টা করিলেও, সে চেষ্টা শেষ-চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। অক্ষচক্রের মধ্যকেন্দ্র জার্ম্মাণীকে অতঃপর নতজানু হইয়াই সর্ত্তহীন সন্ধিভিক্ষা করিতে হইল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সমরানল এইবার সারা ইউরোপে মহাশ্মশান সৃষ্টি করিয়া নিভিবে—ইহাই ভবিতব্যের লিপি, আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

মিত্রশক্তি ইউরোপে বিজয়ী হইয়াছেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের রণনাট্যে যবনিকা পড়িতে হয়ত এখনও বিলম্ব আছে। জাপানের

প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন—জার্ম্মাণীর পরাজয় দুঃখের বিষয় হইলেও, ইহাতে জাপজাতির সমরশক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে না। জাপান আজও এক কোটী প্রাণ বলি দিয়াও যুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত। বর্ম্মার রাজধানী রেঙ্গুন সহর মিত্রসেনা দখল করিয়াছে, কিন্তু সিঙ্গাপুর এখনও অবিজিত। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, হংকং—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজ্যাংশগুলি একে একে জয় করিতে কি শক্তি ও রক্ত ব্যয় করিতে হইবে, কত সময় যাইবে, তাহার গণনা দুঃসাধ্য। অবশ্য রুষ-জাপ মিতালী-সূত্র প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর, এই যুদ্ধের পর্য্যায়ও সংক্ষিপ্ত করিতে রুষনেতা অগ্রণী হইলে তো কথাই নাই—ইউরোপের যুদ্ধান্তে সমগ্র ইঙ্গ-মার্কিণ সমরশক্তি এদিকে নিয়োজিত হইলে, সে আক্রমণের বেগও দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুর্জ্জয় গতিবেগ সামলাইয়া জাপানের আত্মরক্ষা অতিশয় সুকঠিন। আমরা মহাকালীর ভৈরব নৃত্যের আশু সমাপনই কামনা করি। এই রণচণ্ডীর পদভরে রক্তাক্ত মেদিনী, রক্তাক্ত মানবজাতি আর বুঝি এই অতি ঘোর দুঃসহ তাণ্ডবলীলা দর্শন ও বহন করিতে পারিতেছে না। মানবহিয়া হাহাকার করিয়া শান্তি কামনাই করিতেছে। আমরাও করুণ কণ্ঠে মহামায়ার সেই শান্তিমূর্ত্তির আবাহন করিয়া বলি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

হিন্দুর ধর্ম্মবিধি ও সমাজবিধি

হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজনীতি ভিন্ন নহে, অভিন্ন। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর তাহার জীবন। এই নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম-সমাজ সম্বন্ধে কাহারও হস্তক্ষেপ করা তো দূরে থাক, কথা কহারও অধিকার থাকে না।

হিন্দুর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার মূলে এইরূপ একটা মৌলিক অজ্ঞতাই সমস্যাটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে, ইহা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সংস্কারকামী মনীষিগণ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা জানি না; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাহারও এতদ্বিষয়ক উক্তি বা লেখা যুক্তির বা প্রমাণের কষ্টি-পাথরে টিকে না।

হিন্দু কোডের সমর্থনকল্পে এরূপ একজন শ্রদ্ধেয় মনীষী লিখিয়াছেন, "হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন হিন্দুধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই পরিবর্ত্তনে হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে, এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। দায়বিভাগ বিধিধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায় যাহাকে ইংরেজীতে রিলিজিয়ন বলে, তাহার অন্তর্গত নহে। কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্গণ স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ব্যবহারবিধি ও উত্তরাধিকার বৈদিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উহার ভিত্তি অর্থশাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধি। সুতরাং উত্তরাধিকার বিধির পরিবর্ত্তনে হিন্দুর ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নে কোন আঘাত লাগে না। লোকব্যবহারের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, লৌকিক ব্যবহার পরিবর্ত্তনে তাহার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে লোকযাত্রা ও সমাজযাত্রা সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ হয় না। সেইজন্য দায়ভাগকার জীমূতবাহন বাংলাদেশে অন্যত্র প্রচলিত উত্তরাধিকারবিধির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন।"

এই কথাগুলিই মনে হয় একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সে ধারণার মূলগত কথা—হিন্দুর ধর্ম্ম আর রিলিজিয়ন একার্থক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজ-জীবনে ব্যবধান থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে এ কথা কোনদিনই স্বীকৃত হয় নাই। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির কথা আছে; কিন্তু তাহা বর্ণধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম বলিয়াই কথিত ও বিশদীকৃত হইয়াছে। রাজধর্ম্ম কি রিলিজিয়ন? তাহা যদি হয়, তবে হিন্দুর সমাজযাত্রা ও লোকযাত্রা রিলিজিয়ন না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত—হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনেই তাহা সংগঠিত ও পরিচালিত, আর এই ধর্ম্মবিধানসমূহের মূল উৎস বেদ, তাই বেদানুগ ধর্ম্মবিধিই হিন্দুর সমাজ, লোকযাত্রা, উত্তরাধিকার, পরিণয়, এমন কি রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করার মূল শক্তি।

তারপর, উদ্ধৃত উক্তির লেখক জীমূতবাহনের কথা আনিয়াছেন—জীমূতবাহন নাকি বাংলাদেশে অন্যত্র প্রচলিত উত্তরাধিকার বিধির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। ইহাও তো সত্য কথা নহে!

বৈদিক বিধান দেশ, কাল, পাত্র লক্ষ্যে রাখিয়াই প্রবর্ত্তিত—তাই বিশাল ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য—প্রকৃতিভেদে সাংস্কৃতিক ও লোকাচারস্বাতন্ত্র্যকে সে বিধানে মর্য্যাদা দান করাই হইয়াছে। বাংলার দায়ভাগ, অন্যত্র মিতাক্ষরার অনুশাসন একই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচিত্র বিধান মাত্র। জীমূতবাহন বাংলার এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন মাত্র, তিনি কোনও নূতন মত প্রবর্ত্তন বা প্রচলন করেন নাই, ধর্ম্মাচার বা লোকাচারের পরিবর্ত্তন তো করেন নাই-ই। হিন্দু কোডে এই সকল বৈশিষ্ট্য একাকার করা হইতেছে—তাহা শুভ-বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। ইহার মূলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম-পরিচয় না থাকায়, যাহা উক্ত বা চেষ্টিত হইতেছে তাহা নিছক অহং-বুদ্ধির প্রেরণায় বলিতে হইবে এবং তাহা এই জন্যই কি রাজপুরুষ, কি সমাজপুরুষ উভয় শ্রেণীরই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইতেছে। ফলে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ইহাতে সাধিত হইতেছে না। নব্য শিক্ষিত মনীষিগণ কি বুঝিবেন না—ধর্ম্মের অনুকূল পরিবর্ত্তন যদি হয়, তবেই হিন্দুর অন্তরাত্মা তাহা স্বীকার করিবে, নতুবা মূল ছিঁড়িয়া তরু-রক্ষার ন্যায় অপচেষ্টা ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়াই উপেক্ষিত। উহা সংশয় ও আশঙ্কারই কারণ হইবে।

বস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন

সরকারী মুখপত্র "বাংলার কথা" দেশবাসীকে জানাইতেছেন "চাহিদার তুলনায় কাপড়ের সরবরাহ একান্তই কম"—এই অবস্থায় রেশনিং-

প্রবর্ত্তনের ফলে, ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি ২ খানা শাড়ী কিম্বা ৭ গজ করিয়া জামার কাপড় পাইবে আশা করা যায় এবং ইহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে ; কারণ, বর্ত্তমান যুদ্ধের দিনে অন্যান্য অসুবিধার ন্যায় বস্ত্রের প্রাচুর্য্যও আশা করা যায় না।

মানিলাম। কিন্তু এদিকে ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ—মাদ্রাজ মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ এম, এস, আবদুল মজিদ বলিয়াছেন—"বাংলায় রপ্তানী হইতে পারে, এমন হাজার হাজার গাঁইট তাঁতের কাপড় পড়িয়া আছে, কিন্তু বাংলা গভর্ণমেণ্টের বহু প্রকার বাধানিষেধের ফলে তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে না।"

কথাটা সত্য বলিয়াই বুঝিতে হইতেছে—কেননা, এ পর্য্যন্ত বাংলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার কোন প্রতিবাদ আমরা শুনি নাই। মিঃ মজিদ আরও বলিয়াছেন—"বাংলায় তাঁত বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স পার্মিট্, বিক্রয়-কর প্রভৃতি ব্যাপারে এত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁতের কাপড়কে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, বাংলার গভর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই।

মুসলিম চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে, বাংলায় পর্য্যাপ্ত কাপড় আমদানী না হওয়ার কারণ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের অবলম্বিত বাধা-নিষেধমূলক বস্ত্রনীতিই বলিতে হইবে এবং প্রজাসাধারণের অসুবিধা দূর করিতে হইলে এই কর্ম্মনীতির অবিলম্বে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, ইহা না বলিলেই চলে। "বাংলার কথা" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের এই বস্ত্রনীতি সম্বন্ধে কি অবগত আছেন? এতদ্বিষয়ে কেহ উপযুক্ত আলোকপাত করিলে আমরা সুখী হইব, দেশবাসীও আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

আবাদ-কর

সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশ—"বাংলার সকল পতিত জমির একটী তালিকাপ্রণয়ন কার্য্যে উন্নয়ন বিভাগ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাংলা দেশকে খাদ্যের দিক্ দিয়া স্বাবলম্বী করার জন্য যতটা সম্ভব পতিত জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায়, বাংলায় পতিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪২·৪ লক্ষ একর হইবে।"

উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট জমির মালিকগণকে উন্নত ধরণের বীজ, সার, যথাসম্ভব জলসেচনের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়াও আশ্বাস দিয়াছেন। দেশের প্রাণ এই উদ্যমে কতখানি সাড়া দেয়, তাহারই উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে। সেই প্রাণের সাড়া জাগাইবার কাজেও গভর্ণমেণ্টের কিছু করণীয় আছে। যাহা হইলে মুমূর্ষু প্রাণে নূতন আশা ও উৎসাহের শিহরণ জাগে, জাতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে অভিনব চেতনায় ও প্রেরণায়, উহা শুধু সংখ্যা-তথ্য নহে, বক্তৃতা বা পরিকল্পনাও নহে, উহা তরুণ তরুণীর জীবনগঠনের যথার্থ জাতীয় শিক্ষা। এই দিকেও আমরা যোগ্য জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম। নতুবা শুধু "আবাদ কর" বলিয়া কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

জনস্বাস্থ্য

কলিকাতায় নিখিল ভারত স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ গ্রাণ্ট সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট স্বীকার করেন, "অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা অতিশয় নিম্নস্তরের ; ইহার হেতু আমাদের নিম্নতর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তজ্জনিত জনস্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয়ের অক্ষমতা।"

কারণটি অতিশয় স্পষ্ট, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য শুধু এইটুকু যে, আগামী যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যে সকল পরিকল্পনা হইতেছে, তাহাতে এই আর্থিক অক্ষমতা দূর করিয়া জনস্বাস্থ্যোন্নতির কিরূপ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে? ডাঃ গ্রাণ্ট বলেন যে, যে পর্য্যন্ত না আদর্শমূলক কোনও পরিকল্পনা গৃহীত হইবে ও তাহা কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধোত্তর-পরিকল্পনা শুধু দলীল দস্তাবেজ বন্দী হইয়াই থাকিবে। আমাদেরও সেই আশঙ্কা হয়।

উক্ত বিভাগের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—সিঙ্গুর হেল্‌থ ইউনিট কর্ত্তৃক স্থানীয় সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান, ম্যালেরিয়ানিয়ন্ত্রণ, যক্ষ্মা ও যৌন ব্যাধি প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও জন্মমৃত্যু-সংখ্যাসংগ্রহ—এই সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়াছে ও এইভাবে পল্লী-স্বাস্থ্য-সমিতি ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসমিতিগুলিকেও আত্মনির্ভরশীল করার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য আছে।

এরূপ একটী ইউনিটের জন্য কিরূপ অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে ও সেই অনুপাতে বাংলার শত শত স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংগঠন করিতে হইলে যে ধন-ভাণ্ডারের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আলোকপাত করিলে আমরা আশান্বিত হইতে পারি।

শিক্ষা-সংস্কারে ডাঃ চৌধুরীর প্রস্তাব

গত ২৯শে এপ্রিল বনগ্রামে অনুষ্ঠিত যশোহর জিলা শিক্ষক সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন—বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে অতীত ভারতের শিক্ষার প্রসার যেমন একদিকে নাই, অন্যদিকে বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিষয় সমূহের অবতারণাও তেমনি হয় নাই। ফলতঃ, পত্রিকা-পরিচালনা, গ্রন্থাগার-পরিচালনা, উচ্চ সীবনশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় দেশের পক্ষে অতি কল্যাণকর, অবিলম্বে ঐ সব বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের অত্যাবশ্যক। দরিদ্রের পক্ষেও যাহাতে বর্ত্তমান স্কুল-কলেজের শিক্ষার পথ সুগম হয়, তজ্জন্য যেমন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন, তেমনি বঙ্গভাষার

মাধ্যমিকতায় অনেক সমুৎসুক ব্যক্তির যাহাতে জ্ঞানলাভের সহায়তা ঘটে, তজ্জন্যও বিশেষ বিধান আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিত সঙ্ঘ, সমিতি, বিজ্ঞানমন্দির প্রভৃতি পরীক্ষাদির দ্বারা যাহাতে উপাধি দান করে বা অন্যান্য উপায়ে বিভিন্ন বিষয়ের বিশিষ্ট অনুশীলনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে, তজ্জন্য বিশেষ প্রযত্ন অবশ্য কর্ত্তব্য। দীর্ঘতমা, গৌতম, কপিল প্রভৃতি ঋষির সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অগণিত বেদ-বেদান্তবিৎ, কবি, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, ছন্দঃশাস্ত্রবিৎ, দার্শনিক, তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ প্রভৃতি বঙ্গদেশ সমলঙ্কৃত করেছেন। শিক্ষাব্যাপারে বঙ্গদেশের নেতৃত্ব চিরকালের। এজন্যই শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। বঙ্গদেশের শিক্ষার সমুন্নতির জন্য ডক্টর চৌধুরী কতিপয় বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন: ১। শিক্ষক ও ছাত্রের—প্রাচীন ভারতের মত সুমধুর সম্বন্ধ-স্থাপন। ২। শিক্ষক-নিয়োগের সময়ে পরীক্ষার সাফল্যের চেয়েও শিক্ষকের পরোপকার প্রভৃতি ও সচ্চরিত্রতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। ৩। শিক্ষকদের চিরন্তন জ্ঞানস্পৃহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ৪। ছাত্রদের চিন্তাশক্তি বর্ধনের প্রতি শিক্ষকের প্রখর দৃষ্টি। ৫। স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতিসাধন। গ্রন্থাগার ব্যতীত শিক্ষক ও ছাত্রদের সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি প্রসারণ বা বিশেষ বিষয়ে সমধিক অন্তর্দৃষ্টি সম্ভবপর নহে। ৬। ভারতের নারী শিক্ষা সর্ব্বকালীন, নূতন সংঘটন কিছুই নয়; সুশিক্ষা এ দেশের নারীদের অস্থিমজ্জাগত। নারী শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুযোগবিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ৭। শিক্ষাব্যাপারে সর্ব্বত্র শিক্ষকদের সম্মান অব্যাহত থাকা প্রয়োজনীয়। বাহিরের লোকেরা অনেক সময়ে শিক্ষকদের স্থানচ্যুত করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, ইহা অত্যন্ত অসমীচীন। পরিশেষে ডক্টর চৌধুরী বলেন যে, শিক্ষকদের দারিদ্র্য সর্ব্বজনবিদিত, দুঃখদৈন্য অন্তহীন, তাহা হইলেও তাঁহারাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, দেশের ত্রাতা। সর্ব্বস্বের বিনিময়েও দেশের জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বল্যমান রাখা তাঁহাদেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা ডাঃ চৌধুরীর প্রস্তাবগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি ও এই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও চিন্তাশীল সুধীসমাজ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পেচক

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

আঁখির আলোকে পড়িল না কিছু ধরা—
আঁধারে পেলাম দেখা!
নয়নের দিঠি মনে হয় ধার-করা—
যা দেখি তা দায় ঠেকা!
যাহাদের পানে চোখ মে'লে চেয়ে থাকি—
রঙীন্ তুলিতে আল্‌পনা যাহা আঁকি,
'আল্‌গোছে সব মুছিয়া নে যায় ত্বরা—
চেয়ে থাকি আমি একা!

চোখ দু'টি নিয়ে ভয়ে ভয়ে তাই মরি'—
তাকাব কাহার দিকে?
রঙের তামাসা দু'দিনেই যায় সরি'—
লাল হয়ে আসে ফিকে!
সোনালি আলোয় ঝলোমলো পোড়া আঁখি—
কোটরে লুকাই আমি যে পেচক পাখী;
ছোঁ পে'তে রয়েছে বাজ—হায়, কিবা করি?
থাকিতেই হবে টি'কে!

আলোর দাপটে চোখ দু'টি তাই বু'জে
আঁধার ডাকিয়া আনি,
তবু কেন মরো তোমরা আমায় খুঁজে—
শোনাও ছলনা-বাণী?
আঁধার হইতে আলোকে নেবার ছলে—
দুনিয়ায় আজ যারা যত কথা বলে,
সনাতন কত প্যাচ্ প্যাচ্ করে পুঁজে—
বাঁধিবার নাই বাণি!

সোনার স্বপন হয় হোক যত দামী—
হাত কে বুলোয় পেটে?
স্বখাত আঁধারে ডুবে আছি তাই আমি—
দিন যায় তোফা কে'টে!
পোকার নয়নে আগুন কত না মিঠে—
ঝাঁপ দিলে কেউ দেয় না তো জলছিটে!
ভাবের আবেগ তাই যে গিয়াছে থামি'—
কি হবে বেগার খেটে?

তোমাদের দিন রাঙা হয়ে থাক্ পূবে—
আমার ধরণী কালো:
পাঁকাল মাছটি পাঁকেই থাকে যে ডুবে—
আঁধারেই থাকে ভালো।
আলোর ধরণী!—পার তো করিয়ো ক্ষমা।
কালো মেঘ ওই আকাশে হয়েছে জমা:
দমকা বাতাসে যায় যদি যাক্ উবে—
নিভে যাক্ যত আলো।
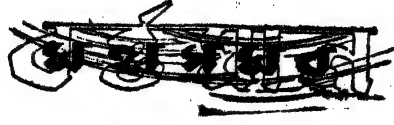
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

জার্ম্মাণীর নিঃসর্ত্ত আত্মসমর্পণের সঙ্গে বর্ত্তমান বিশ্ব-মহাসমরের ইউরোপীয় অঙ্কের উপর যবনিকা পড়িল। প্রায় ছয় বৎসর এই ভয়াবহ যান্ত্রিক যুদ্ধ ইউরোপে যে রক্তস্রোত বহাইয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে নাই। স্থলে, জলে, আকাশে লড়াইয়ের যে উন্নততর নূতন কায়দা প্রত্যক্ষ হইল তাহা মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উৎকট ও সীমাহীন সাস্তব্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বধ্বংসী আহবের নৃশংস চেহারা দেখিয়া মানুষ শিহরিয়া উঠিয়াছে যে, যদি আগামীকালে ইহার পুনরাবর্ত্তন হয় তাহা হইলে এই পৃথিবী হইতে কিবা মানুষের বংশই লোপ পাইয়া যাইবে। এইরূপ সম্ভাবনা-কাতর নেতৃবৃন্দ ভাবীকালে যুদ্ধ-নিবারণের জন্য পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সার্মগ্রিক মানবতার কল্যাণকর দ্বন্দ্বহীন অহিংস সাম্রাজ্য-গঠনের স্বপ্ন স্বার্থকলুষিত ক্ষুদ্রচেতার দ্বারা সিদ্ধ হইবার নয়, এ পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই পাইতেছি। একমাত্র প্রজ্ঞাবান মনীষী মানুষের দ্বারাই তাহা সম্ভব প্রাচ্যের সংজ্ঞায় যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বশ হইয়াছে তাঁহারাই প্রজ্ঞাবান (বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা। গীতা)। গীতারই বাণী :

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

সমগ্র সমরের পারম্পর্য্যক্রমে মূলকথাই হইতেছে বিষয়াসক্তি, বাসনা-কামনা-লোভ, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশের অপরিহার্য্য পরিণতি ধ্বংস ব্যক্তিগতভাবে এই জীবন-দর্শন যেমন সত্য, সমষ্টিগত-ভাবেও ইহা তেমনি সত্য। ইউরোপীয় যুদ্ধ-গতির গন্তব্যে আসিয়া ইহার প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম।

সৃজনের ছন্দঃ ও বিধানক্রমে ঘটনা ও মানুষ উপলক্ষ্য। ইউরোপীয় মহাসমরের প্রধানতম নিমিত্ত হিটলার তথা নাৎসীদল। পশ্চিমের মহাঝঞ্ঝাময় গগন হইতে হিটলারের তিরোভাব ইন্দ্রপাতের মতই একটি ঘটনা। পাঁচ বৎসর আট মাস আগে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এই অ-সাধারণ মানুষটিরই ফুৎকারে আবার উহা নির্ব্বাপিত হইল তাঁহারই জীবনাবসানে (?)। ফ্যাসিজমের জন্মদাতা, একদা প্রবল প্রতাপশালী মুসোলিনীর ধূমকেতুর মত আবির্ভাব, পতন ও শোচনীয় মৃত্যু আমাদের চোখের সামনেই সংঘটিত হইল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম নায়ক রুজভেল্ট অক্ষপক্ষের প্রতিকূলে বর্ত্তমান মহাসমরের মোড় ফিরাইবার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যুদ্ধের অনুকূল পরিসমাপ্তি দেখিবার জন্য আজ আর তিনি বাঁচিয়া নাই। রণাঙ্গন হইতে বহুদূরে প্রমোদ-পরিবেষ্টনীর মধ্যে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু বিশ্ববাসী অত্যন্ত দুঃখের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া পশ্চিমের নরমেধ যজ্ঞে যে খ্যাত-অখ্যাত অগণিত নরবলি ও ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইল তাহার সঠিক হিসাব-নিকাশ যখন পরবর্ত্তী কালে প্রকাশ পাইবে, তাহাও অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হইবে। বর্ত্তমান সার্ব্বিক যুদ্ধের ফলে বিশ্ব-গগনে যে ভায়াবহ মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে, কত সযত্ন সঞ্চিত সম্পদ, কত সুরম্য প্রাসাদ-নগরী, কত কল-কারখানা ভাঙিয়া চূরমার হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান বৈশ্য সভ্যতারই ঐতিহাসিক পরিণতি বলিয়া এ যুগের মানুষের উহাতে অনুতাপ করিবার কিছু নাই। পরন্তু সান্ত্বনাস্থলই হইবে যদি রক্তস্নাত হইয়া মানবতার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক কাঠামো সার্ব্বভৌম কল্যাণের পথেই ক্রমবিকশিত ও বিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

কিন্তু তাহা হইবে কি? বিশ্ববাসীর বিশেষভাবে দীর্ঘ পরাধীনতায় পঙ্গু, শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে এই প্রশ্ন উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। নাৎসী-জার্ম্মাণীর বর্ব্বর পাশবিকতায় আমরা আতঙ্কিত। ও-দেশের এই মৃত্যু-যজ্ঞে আমরা চোখের জল তর্পণ করিতেছি। কিন্তু যাহাদের জন্য আমাদের এই মাথাব্যথা তাহাদের তত্ত্ব ও দর্শনে যুদ্ধ পরিহার্য্য নয়। শক্তিবাদী ভারতেরও নয়—কাহারও পক্ষেই নয়। সম্ভবতঃ এই বৈচিত্র্যময় জগতে

স্বজনের স্বধর্ম্ম। বস্তুতঃ যুদ্ধের অভিসন্ধি লইয়া কথা। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাই যদি যুদ্ধের অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ এবং উহা সর্ব্বমানবের পক্ষেই মঙ্গলজনক। বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীকেই ভবিষ্য স্বর্ণ (সত্য) যুগের ঘোষণা করিতে শোনা যায়: স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা নয়, পরন্তু সত্যের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। পশ্চিমের স্বাধীন শ্বেতকায় জাতির তাত্ত্বিক ও দার্শনিক যে পটভূমি তাতে যুদ্ধ তাদের রক্তে অবসাদ আনে না। নেতিবাদ ওদের তত্ত্ব. ওদের দর্শন দ্বান্দ্বিক, আর মৃত (ক্রশ) ওদের উপাস্য। মৃত্যু, সংঘর্ষ ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়াই তারা বাঁচার পথ খুঁজে। নিজেকে ছাড়া পারিপার্শ্বিককে তারা অস্বীকার করে। দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়া তারা শক্তি সঞ্চয় করে। মারিয়া, শোষণ করিয়া, ধ্বংস করিয়া তারা আত্মপুষ্টি করে। বাঁচাইয়া, স্বীকার করিয়া তারা বাঁচিবার কৌশল জানে না। ইতিবাদ তাদের স্বধর্ম্ম নয়। তাই ইউরোপের আজিকার এতবড় ধ্বংসের পরেও মনে হয়, ওরা কেহই মরিবে না, বড় জোর ওদের অর্থনৈতিক জাতীয়তার কাঠামোর কিছুটা রূপান্তরিত হইতে পারে মাত্র।

বর্ত্তমান মহাসমরে সামরিক জয়-পরাজয় বড় করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হইবে না। সমরের পশ্চাতে যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক চেতনা বর্ত্তমান তাহাই মুখ্য। প্রাথমিক সামরিক প্রচণ্ডতা ম্লান হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক যুধ্যমান জাতির মুখ্য স্বার্থাভিসন্ধি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য যুদ্ধের পরে শান্তির সমস্যা আজ ইউরোপে উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে গত বর্ষের আশ্বিন সংখ্যা প্রবর্ত্তকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনার ভবিষ্যৎ দর্শনের ব্যতিক্রম কিছুই হয় নাই বলিয়া ইহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সেই সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম যে, ইহা সুনিশ্চিত জার্ম্মানীর সামরিক জয়ের আর কোন আশা নাই, পরন্তু কূটনীতির আশ্রয়েই সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সানফ্রান্সিস্কোর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন বনাম রুশিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ না হওয়ায়, জার্ম্মানী বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

পশ্চিমের যুদ্ধের যে পরিণতি তাহাতে একদা একঘরে রুশিয়া ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রবলতম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। কি সমর-পরিচালনায়, কি কূটনীতি-ক্ষেত্রে, কি বাস্তব রাজনীতিতে মঁ ষ্টালিন তথা তাঁর সুদক্ষ সহকারীবৃন্দ অতুলনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ফলে রাশিয়া বর্ত্তমান বিশ্বের শক্তি-সাম্যের ভারকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বীয় সুবিধা বুঝিয়া তার চলিবার পথ এখন পরিচ্ছন্ন, নিষ্কণ্টক। ইঙ্গ-মার্কিন এখনও জাপানের সহিত যুদ্ধরত। যুদ্ধের বাহিরে থাকার ফলে রাশিয়ার সুবিধা এই যে, সে এখন স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে কর্ত্তব্য স্থির করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইবে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের কুশলী কূটনৈতিক বুদ্ধি এতাবৎ সামরিক জয়ের পথে প্রচুর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শেষরক্ষা করিতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের ইতিহাসে চার্চ্চিলের সুনাম চিরসমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সপারিষদ বয়োবৃদ্ধ চার্চ্চিলের পুরাণো মন পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে-কিনা, পরবর্ত্তী ঘটনাই প্রমাণ করিবে। যদি তাহা সম্ভব হয় অর্থাৎ ধরিত্রীর অগণিত অসহায় নরনারী পরাধীনতার পাষাণনিগড় হইতে মুক্তি না পায়, তবে বুঝিতে হইবে এই মহাযুদ্ধ বৃথাই সংঘটিত হইল, এত রক্তপাতের কোনই অর্থ হয় নাই। পৃথিবীর বুকে এই বিংশ শতাব্দীতেই ভীষণতম তৃতীয় মহাসমর আসন্নই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের ধারণা, এই স্বার্থ-সন্ধীদের পৃথিবী-আধিপত্যের ষড়যন্ত্র স্বকীয় গলদেই বেফাঁস হইতে বাধ্য। যেহেতু তাঁদের সার্ব্বভৌম উদার আদর্শ বা নিষ্কাম উন্নত মনের পরিচয় আমরা পাইতেছি না।

ইউরোপের যুদ্ধ-সমাপ্তির সহিত ওখানকার ইতিহাস নূতনভাবে রচিত হইতে চলিয়াছে। জাতিনিচয়ের নূতন ভৌগোলিক সীমানা নির্দ্ধারণের প্রশ্ন উঠিয়াছে। নব নব দাবীও ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিতেছে। যতটুকু সংবাদ আমরা পাইতেছি তাহতেই বেশ বুঝা যায়, ইউরোপে বিশেষ করিয়া মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় জটিলতা ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়া তার অতি-জাতীয়তার (supra

nationalism) ফাঁদে প্রায় অর্দ্ধেক ইউরোপকে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বাস্তববাদী রাশিয়াকে পিঠ চাপড়াইয়া এ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যে সম্ভব নয়, তা আজ দিনের মত স্পষ্ট। বৃটেনের 'কমন ওয়েলথ অব নেশনস্-এর' সমস্তরালে এশিয়া ও ইউরোপ ব্যাপিয়া মস্কোর ক্রেমলিনকে মধ্যমণি করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমশ: এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ভাব ও আদর্শের দিক্ দিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিপীড়িত জনসমাজ আজ কমবেশী সোভিয়েট প্রভাবিত। যুদ্ধ বা শান্তিপূর্ণ কৌশল যে ভাবেই হউক, রাষ্ট্র তথা দণ্ড ও শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই রাশিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পূর্ব্ব ইউরোপে স্বদেশের পশ্চিম সীমান্ত নিরাপদ করিতে রাশিয়া যে কিরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প তাহা আজ চোখের সামনে সুস্পষ্ট। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বর্ত্তমানের বাস্তবতা ও সুযোগকে পরিহার করিতে সে কিছুতেই রাজী নহে। পোল্যাণ্ডের ব্যবস্থা সে স্বীয় অনুকূলেই করিয়াছে, যেহেতু পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়াই পশ্চিম ইউরোপ তথা জার্ম্মানী বরাবর পূর্ব্ব ইউরোপ, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, বাল্টিক ও বল্কান অঞ্চলের দেশসমূহের উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়াছে। শতাব্দী ব্যাপিয়া জার্ম্মানীই এই রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। জার্ম্মানীর পতনের সঙ্গে এই ভারসাম্য অবধারিত ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাশিয়ার জ্ঞাতি শ্লাভজাতি-প্রধান এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশসমূহের রাষ্ট্রনীতি ঘোলাইবার সুযোগ যাহাতে ইঙ্গ-মার্কিন-টিউটন বা অন্য কোন পশ্চিম ইউরোপীয় জাতি না পায়, এদিকে রাশিয়া এবার অত্যন্ত সচেতন। আর সচেতন বলিয়াই রাশিয়া পূর্ব্ব ইউরোপে তার অধিকৃত অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিনের গতায়াত এমন কি সাংবাদিকগণের যথেচ্ছা প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত দিতে অনিচ্ছুক। ভিয়েনা বার্লিনে ইঙ্গ-মার্কিনের সাংবাদিকগণের পক্ষেও বিশেষ অনুমতি ভিন্ন প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, বুলগেরিয়ায় ইঁহাদের প্রতিনিধিদেরও স্থান সে দেয় নাই। এমন কি রুমানিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিনের পূর্ব্ব কায়েমী স্বার্থ রাশিয়া এখন আমলে আনিতে নারাজ। ইহার পরে বার্লিনে যদি সোভিয়েট অনুমোদিত স্বাধীন জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ক্রেমলিন-প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠা পায়, তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পোল্যাণ্ডের লুবলিন গভর্ণমেণ্টের সহিত মস্কোতে প্রতিষ্ঠিত এই স্বাধীন জার্ম্মান কমিটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিনা অভিপ্রায়ে জার্ম্মান কমিউনিষ্ট এরিক উইনারের সভাপতিত্বে এই কমিটি নিশ্চয়ই গঠিত হয় নাই। প্রকাশ এই কমিটির অধীনে প্রায় চারি লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য প্রস্তুত এবং আরও বহু সৈন্য রাশিয়ায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে 'রাশিয়ান এফেয়ার্স' (Russian Affairs) পত্রিকায় এই সম্পর্কিত মন্তব্য অতিশয় অর্থপূর্ণ :

"We do not pursue the aim of destroying the entire organised military force in Germany, for every literate person would understand that this is not only impossible as regards Germany, just as it is in regard to Russia, but also inadvisable from the point of view of the victor But we can and must destroy the Hitler state."

মোটের উপর উত্তরে ফিন্ল্যাণ্ড, দক্ষিণে তুর্কি এবং পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক (তথাকথিত কুর্জ্জন অথবা মলোটভ রিবেনট্রপ নির্দ্ধারিত সীমানা) পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জারিষ্ট রাশিয়ার বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়া কুক্ষিগত করিবার এবং মধ্য ইউরোপের বার্লিন পর্য্যন্ত অপর অর্দ্ধাংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ এই বর্ত্তমান মহাসমরে রাশিয়া পাইয়াছে। ষ্টালিনের হাতের পুতুল মার্শাল টিটোর যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়াসহ বল্কান ফেডারেশন গঠনের নয়া পরিকল্পনার পশ্চাতেও মঁ ষ্টালিনের অলক্ষ্য হস্ত আছে। বল্কানের মধ্য দিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষী-দ্বার (life line) স্বরূপ ভূমধ্যসাগরেও বিস্তারলাভ করিবে। সোভিয়েট রাশিয়া তুর্কির সহিত অনাক্রমণ চুক্তি ইতিমধ্যেই রদ করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা এখন যেরূপ সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে তাহাতে দার্দ্দানেলিজ হইয়া ভূমধ্যসাগরে তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত অবকাশ লাভের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের একাধিপত্য এখানে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। উত্তরে ফিন্ল্যাণ্ড তথা পূর্ব্ব বাল্টিকসাগরের তীর ধরিয়া রাশিয়ায় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারও পশ্চিম ও

উত্তর ইউরোপীয় জাতির নিকট নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয় হইবে না।

এশিয়ায়ও বর্ত্তমানে রাশিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এ ক্ষেত্রে জাপান ছিল রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। জাপানের পতন বা প্রতিপত্তি খর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে। কমিউনিষ্টপ্রধান উত্তর চীন এখনও সোভিয়েট রাশিয়ার মুখ চাহিয়াই চলে। পোর্ট আর্থার একদা জাপান জারিষ্ট রাশিয়ার দুর্ব্বলতার সুযোগে ছিনাইয়া লইয়াছিল। ইহা পুনরায় ফিরাইয়া পাইবার এ সুযোগ যে রাশিয়া ছাড়িবে এমন নিরীহ গোবেচারি সপার্ষদ মঁ ষ্টালিন নয়। তাছাড়া রাশিয়ার সংলগ্ন সুবৃহৎ ভূখণ্ড মাঞ্চুরিয়ার প্রতিও যে রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি নাই, একথাও হলপ করিয়া বলা চলে না। অথচ ইঙ্গ-মার্কিন ইতিপূর্ব্বেই চীনকে মাঞ্চুরিয়া ফিরাইয়া দিবার ভরসা দিয়া মার্শাল চিয়াং কাইশেককে যুদ্ধ চালাইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ায় যদি দ্বিতীয় পোল্যাণ্ডের অভিনয় হয় তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। শুধু ইউরোপ এবং এশিয়ায় নহে, দক্ষিণে মধ্য প্রাচ্যেও রাশিয়ার প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে। তেহেরানের তৈল সম্পর্কীয় ব্যাপারে ইতিমধ্যেই রাশিয়া প্রহরী বসাইয়াছে। ভীমকায় রাশিয়ার এই লৌহ-আলিঙ্গন যে কত কঠিন, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনার ক্রমোন্মেষে অবশ্য প্রকাশ্য।

ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতিজ্ঞেরা যে উদীয়মান রাশিয়ার এই প্রচণ্ড শক্তির কথা বুঝেন না, এমন নয়। ঐকান্তিকভাবে ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াও এবং যথাসম্ভব সতর্ক হইয়াও, তাঁরা এখন সামরিক কারণে নিরুপায়। আন্তর্জ্জাতিক শক্তির ভারসাম্য প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্য ইঙ্গ-মার্কিনের স্বানুকূল্যে প্রতিষ্ঠা দিবার সময় ও সুযোগ ঘটনার পর ঘটনাবর্ত্তের জন্যই ঠিক তেমনভাবে এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন হইবে তখন হয়তো অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে রাশিয়াকে তুষ্ট করা ছাড়া আর তাঁদের গত্যন্তর নাই। অবশ্য আন্তর রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তি-রাজনীতির পরিবর্ত্তে আপোষ-নিষ্পত্তিমূলক ঐক্যের মধ্য দিয়া মহীভোগের প্রচেষ্টা স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোয় চলিয়াছে। এ প্রচেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা ভবিষ্যৎই প্রমাণ করিবে। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সার্ব্বভৌম মানবিক কল্যাণকামনা অন্তরে না থাকিলে, আপাততঃ জোড়াতালির দ্বারা মুখরক্ষা হইলেও, এ মিলন অদূর ভবিষ্যতে তাসের ঘরের মতই স্বার্থসঙ্ঘাতের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। পাশ্চাত্য জাতি তথা সভ্যতার বহিরঙ্গ জৌলুষের অভ্যন্তরে যে কুৎসিৎ অনুদার হৃদয় ও মন বিদ্যমান, তারই শোধন ও রূপান্তরেই একমাত্র পৃথিবীতে সর্ব্বমানবের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তাজমহল

শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

নূতন কলোনি হইয়াছে।

বেতের জঙ্গল কাটিয়া, সাপ-খোপের গর্ত্ত বুজাইয়া, খানা-ডোবা ভরাট করিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকের অগম্য স্থানটি আজ কলোনি হইয়াছে।

যেদিন জঙ্গল কাটা সুরু হয় সেদিন গ্রামের অনেকেই নানা অশুভ দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছিল এবং যাহাতে এমন কাজ না হয় তাহার চেষ্টাও করিয়াছিল। তাহারা বলে, গভীর রাত্রে ওখানে কে যেন কাঁদে, ভোর রাত্রে কে ওখান হইতে করুণ সুরে বাঁশী বাজায়; তাহারা বলে, বড়-বড় অজগর আর ময়েল সাপ ওখানে দুপুর রৌদ্রে ঝগড়া করিতে করিতে খালের জলে গড়াইয়া পড়ে; তাহারা বলে, গত সনের আগের সনে ওই বন হইতে একটা বিরাট বাঘ বাহির হইয়া গ্রামের পাঁচটা মানুষ আর তিনটি গরু মারিয়াছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহাদের বিস্মিত করিয়াই মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই কলোনি তৈয়ারী হইয়া গেল। বাঁশী যেখানে বাজিত, অজগর আর ময়েল যেখানে ঝগড়া করিত, বাঘ যেখান হইতে বাহির হইয়াছিল, আজ সেখানে

হইয়াছে নানা রকমের বিলাতী ধরণের বাড়ী। খালের এপারে এখনও গ্রামবাসীরা কেউ কেউ রহিয়া গিয়াছে; পরম বিস্ময়ে তাহারা মানুষের এই কাণ্ডকারখানা দেখে।

জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, এ্যাড্ভোকেট্, বড়-বড় ব্যবসায়ী, ডাক্তার প্রভৃতি ভরিয়া গিয়াছে এই নূতন কলোনিতে। হুস্ হুস্ করিয়া মোটর আসিয়া প্রবেশ করে, নানারকমের নরনারী হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, রেডিওতে গান হয়, রাত্রদিন সভা-সমিতি হয়। এপারের বাসিন্দারা অবাক হইয়া দেখে আর ভাবে, এরা মানুষ তো?

বেতের জঙ্গল কাটিবার পূর্ব্বে যাহার নাম খাল ছিল আজ সে হইয়াছে লেক্। বৈকাল হইলেই কত বিচিত্র ভাবে শাড়ী পরিয়া কত নারী আসিয়া এই লেকের ধারে বসে, কত সুন্দর যুবক আসিয়া এখানে ভীড় করে, মোটর-গুলি হাঁক্ হাঁক্ করিয়া দানবের মত লেকের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

খালের কাছেই যে নতুন বাড়ীখানা সম্প্রতি তৈয়ারী হইল, তাহাতে আসিয়া উঠিয়াছেন এক অধ্যাপক আর তাঁহার স্ত্রী। অপরূপ সুন্দরী অধ্যাপকের স্ত্রী। সারা কলোনিতে নাকি এমন সুন্দরী নারী নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই কলোনির যুবকমহলে অধ্যাপকের স্ত্রীর সৌন্দর্য্যচর্চ্চা স্থান পাইল, কুমারী মহলে হিংসা বাসা বাঁধিল, সভা-সমিতি অধ্যাপকের স্ত্রীকে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

খালের এপারের লোকেরাও অবাক্ হইয়া গেল। অধ্যাপকের স্ত্রীকে তাহারা স্বর্গের কোনও শাপভ্রষ্টা দেবী ধরিয়া লইল।

ভাগ্যবান্ অধ্যাপক অনেকের নিমন্ত্রণ সস্ত্রীক রাখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কাণাঘুষায় শোনা গেল অধ্যাপকের স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী সেন।

খালের এপারের লোক ভাবে, মানুষের কখনও এমন নাম হয়!

অরুন্ধতী সেন! অধ্যাপকের নাম দেবতোষ সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি।

খালের অপর দিকে অধ্যাপকের বাড়ীর ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি যাহার বাস, তাহার স্ত্রীর নাম, এলোকেশী। স্বামীর নাম বিশ্বম্ভর। কাজ করে শ্রমিক:কর—কলোনিতেই।

এদের মধ্যেও কলহ বাধে অধ্যাপক আর তাহার স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। স্ত্রী এলোকেশী,—বিশ্বম্ভর বলে, মোটা, কালো আর বিশ্রী। স্বামী বিশ্বম্ভর—এলোকেশী বলে—নির্গুণ, অমিশুক আর লিক্‌লিকে।

বিশ্বম্ভর ওপারে কাজ করিতে গিয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত অরুন্ধতী সেনের একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সারা বস্তী মহলে দেখায়—চুপি চুপি, আড়ালে, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া। বস্তীর মধ্যে নানা বয়সের পুরুষ ও রমণীর মধ্যে অরুন্ধতী সেনের সৌন্দর্য্যচর্চ্চা আসিয়া পড়ে।

এরা বলে, মর্ত্ত্যে এত রূপ কেউ কখনও কোথাও দেখে নাই।

বিশ্বম্ভর অনেক চেষ্টা করিয়া অধ্যাপকের বাড়ীতেই একটা চাকরী যোগাড় করিল—একেবারে অন্দরমহলের কাজ, দিবারাত্র সে দেখিতে পায় এই শাপভ্রষ্টা দেবীকে।

বস্তীতে বিশ্বম্ভর এখন একজন মাননীয় ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছে। অরুন্ধতী সেনের অনেক খবরই সে আনিয়া দেয়। অরুন্ধতী সেন কখন পড়েন, কখন খান, কখন শোন্, কখন বাহিরে যান—সব ঠিক না জানিলেও, বিশ্বম্ভর মিথ্যা করিয়া অনেক কথা বলিয়া বাহাদুরী নেয়।

রাত্রে এলোকেশীকেও বিশ্বম্ভর বলে অরুন্ধতী সেনের কথা।

এলোকেশী হাঁ করিয়া শোনে আর বিশ্বম্ভরের অনুপস্থিতিতে আয়নার সম্মুখে বসিয়া অরুন্ধতী সেনের মত ফাঁপাইয়া চুল বাঁধিবার চেষ্টা করে, দরজা বন্ধ করিয়া ছাপা শাড়ীটি অরুন্ধতী সেনের মত পরিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মরে।

বিশ্বম্ভর বলে, আমাদের বাড়ীটার কি একটা নাম রাখি বল্‌তো?

—নাম? বাড়ীর আবার নাম কি? এলোকেশী আকাশ হইতে পড়ে।

—বাড়ীরও নাম আছে রে! আমি যেখানে কাজ করি, তাদের বাড়ীর নাম কি জানিস্?—বিশ্বম্ভর বলে।

—না তো ! হাঁ করিয়া এলোকেশী তাকাইয়া থাকে।

—তাজমহল। বিশ্বম্ভর গম্ভীর হইয়া বলে : তাজমহল মানে কি জানিস্ ?

—না তো ! এলোকেশী ঘামিয়া উঠে।

—তাজমহল মানে ভালবাসার জায়গা। বুঝেছিস্ ?

কপালের ঘাম মুছিয়া এলোকেশী বলে : না তো !

—সে তুই বুঝ্‌বিনে ! বিশ্বম্ভর বলে : সে বুঝতে হলে অনেক লেখাপড়া জান্‌তে হয়।

এলোকেশী মহাচিন্তায় পড়িয়া যায় : তাজমহল ! ভালবাসা ? উহারা স্বামী-স্ত্রীতে বুঝি খুব ভালবাসিয়া দিন কাটাইতেছে ? একদিনের জন্যও বুঝি উহাদের ঝগড়া হয় না ? একদিনও বুঝি…

এলোকেশী বলে মনে মনে : আমিও আর ঝগড়া করবো না, আমিও খুব ভালবাসবো। প্রকাশ্যে বলে : আমাদের বাড়ীটারও ওই তাজমহল নাম দাওনা কেন ?

বিশ্বম্ভর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে : ঈস্ ! কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন ! ভারী আমাদের বাড়ী, তার আবার ইয়ে। তার ওপর তুই তো আমাকে ও রকম ভালবাসিস্‌নে !

—এবার থেকে বাসব। আর একটি দিনের জন্যেও তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।

—সত্যি ? বিশ্বম্ভর বলে : সত্যি ঝগড়া করবিনে ?

—না। তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি। এলোকেশী বিশ্বম্ভরের পা ছুঁইতে যায়, বিশ্বম্ভর তাহাকে বুকে তুলিয়া নেয়।

এলোকেশী বলে, আমাকে একদিন ওদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে ?

—ওদের বাড়ীতে ? কেন ?

— আমি দেখবো কেমন করে' ওরা ভালবাসে, কেমন করে' ওরা দুজনে কথা কয়, কেমন করে ওরা দু'জনে হাসে। আমিও ঠিক তেমনি করবো।

বিশ্বম্ভর হাসিয়া এলোকেশীর চুলের খোঁপাটি খুলিয়া দিয়া বলে : পাগলী ! মুখ্‌খু !

দিন কাটে।

এলোকেশী এখন অন্য মানুষ হইয়াছে। বিশ্বম্ভরকে সে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। তাহার রূপ বদলাইয়াছে, কথা অন্য ধরণের হইয়াছে। বস্তীর আর সব মেয়ের সহিত তাহার তুলনাই হয় না।

দেবতোষবাবুর বাড়ীতে কাজ করিয়া বিশ্বম্ভরও অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল ভুবন ছাইয়া, পূর্ণিমার রাত্রি ছিল বোধহয়।

দেবতোষবাবুর বাড়ীর কাজ সারিয়া বিশ্বম্ভর বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, এলোকেশী তখনও ভাত লইয়া তাহার জন্য বসিয়া আছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিশ্বম্ভর আব্দার ধরিল, আজ সে ঘুমাইবে না। নিম গাছের উপর এই যে চাঁদের আলো পড়িয়াছে, লাউ লতার মাচার উপর এই যে চাঁদের হাসির ঝরণা ঝরিয়া পড়িতেছে—বিশ্বম্ভর তাহা লইবে।

এলোকেশী বলে, সে কি গো ?

বিশ্বম্ভর বলে, সে তুই বুঝবিনে ! দেবতোষবাবু সেদিন এমনি এমনি একটা পদ্য পড়ছিলেন একলা-একলা। মাইরি, কিন্তু সুন্দর !

—আমাকে কিছু করতে হবে তাহ'লে ?

—কি করতে হবে ? ছাপা শাড়ীটা পরবি, চুল খুলে দিবি, বেলফুলের মালা দিবি গলায়, চন্দন মাখবি সারা দেহে—

—তারপর ?

—তারপর গলা জড়াজড়ি করে' আমরা সারা রাত্তির বসে' থাকব এই দাওয়ায়।

—ঘুম পাবেনা ?

—নারে পাগলী, না। দেবতোষবাবু বইয়েতে পড়ছিলেন।

—আচ্ছা ! এলোকেশী ঘরে যায় কাপড় পাল্টাইতে।

—বিশ্বম্ভর বাহির করে তাহার বাঁশের বাঁশী। এলোকেশী তাহার ছাপা শাড়ী পরিয়া বাহিরে আসে। বিশ্বম্ভর বহুদিন পরে তাহার বাঁশীতে ফুঁ দেয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। বিশ্বম্ভর বাঁশী বাজাইয়া চলে। নেশা লাগিয়া গিয়াছে যেন। এলোকেশী তাহার কোলে শুইয়া আছে।

খানিক পরে বাঁশী থামাইয়া বিশ্বম্ভর ওঠে। বলে, চল্, খালের ধারে যাই—

—খালের ধারে? ভয় করবে না?

—নারে পাগলী! আমি রয়েছি যে! হাসিয়া এলোকেশীর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বিশ্বম্ভর বলে: মুখ্খু!

খালের ধারে আসিয়া দু'জনে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকে। বিশ্বম্ভর বাঁশীতে ভৈরবীকে আহ্বান করে। জলের ঢেউয়ে আকাশের চাঁদ নাচিয়া বেড়ায়।

ওপারের তাজমহলের ছায়াও পড়িয়াছে জলে।

চারিদিকে নিস্তব্ধ। বাঁশীর সুর দিগন্ত কাঁপাইয়া, প্রতিটি গৃহস্থের কক্ষ ঘুরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

বিশ্বম্ভর প্রাণ খুলিয়া বাজাইয়া চলে।

হঠাৎ এলোকেশী একসময় আঁৎকাইয়া উঠিয়া বিশ্বম্ভরকে জড়াইয়া ধরে। বাঁশীর সুর কাটিয়া যায়।

বিরক্ত হইয়া বিশ্বম্ভর বলে: কি?

চোখ বুঁজিয়া এলোকেশী বিশ্বম্ভরকে জড়াইয়া বলে: ভূত!

—ভূত! কোথায়?

—ওপারে। তাজমহলে—

—তাজমহলে ভূত? বিশ্বম্ভর তাকাইয়া দেখে দেবতোষবাবুর বাড়ীর দিকে: সত্যই তো বারান্দায় কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

—তাইতো! বিশ্বম্ভরও বলে। মনে পড়িয়া যায় কলোনি হইবার পূর্ব্বের কথা। ওখানে ভূত ছিল বটে, ওপারে বেতের জঙ্গলের মধ্যে কে কাঁদিত বটে! কিন্তু চোখে কেউ কোনদিন ভূতকে দেখে নাই। আজ বিশ্বম্ভর চোখে দেখিল।

খানিকক্ষণ অমনিভাবে বসিয়া থাকিয়া বিশ্বম্ভর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল: চল্! দেখ্‌ব কেমনতর তারা ভূত। যাবি?

—না। বাপ্‌রে! এলোকেশী আরও জোরে চাপিয়া ধরে বিশ্বম্ভরের দেহকে।

—দূর, ভয় কি? আমি রয়েছি তো? আয়! বিশ্বম্ভর জোর করিয়া টানিয়া হিচড়াইয়া এলোকেশীকে ওপারে লইয়া চলে।

দেবতোষবাবুর বাড়ীর গেটের সম্মুখে আসে বিশ্বম্ভর। দেখে, এত রাত্রেও গেটটি এখনও খোলা। আরও আগাইয়া আসে, দরজাটিও খোলা। বিশ্বম্ভর চলিতে-চলিতে ভাবে: কেন?

এলোকেশীর ভয় অনেকটা গিয়াছে। সে দুই চোখ মেলিয়া সুন্দর সাজানো ঘরগুলি দেখিতেছে। ক্রমে উহারা সেই ভূতের কাছে হাজির হইল।

দেয়ালের গায়ে ভূতের ছায়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এ কে? এ যে দেবতোষবাবু নিজে!

বিশ্বম্ভর আস্তে-আস্তে আরও আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যায়: বাবু—

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ছায়ার মানুষের চোখ হইতে অকস্মাৎ দুই বিন্দু ছায়া খসিয়া পড়িল।

এলোকেশী ফিস্-ফিস্ করিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিল, বাবু কাঁদছেন!

দেবতোষবাবু এই কথায় চমকাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে হাত দিয়া সুইচ্ টিপিয়া বলিয়া উঠিলেন: কে?

বিশ্বম্ভর ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল: আমি বিশ্বম্ভর। এটি আমার স্ত্রী।

—ও! দেবতোষবাবু দুই চোখ বড় করিয়া বিশ্বম্ভর আর এলোকেশীকে দেখিতে থাকিলেন। বিশ্বম্ভর বলিল, মাকে ডেকে দেব, বাবু?

দেবতোষবাবু ধ্যানভঙ্গের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন: এঁ্যা! মাকে? তোর মা ফিরেছে বিশ্বম্ভর?

—মা এত রাত্রেও ফেরেন নি! বিশ্বম্ভর বিস্মিত হইয়া বলে, কোথায় গেছেন মা?

—জানিনে বিশ্বম্ভর! তাজমহলের বাসিন্দা অধ্যাপক দেবতোষ সেন টলিতে টলিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

এলোকেশী কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভীতকণ্ঠে ফিস্-ফিস্ করিয়া বিশ্বম্ভরকে জিজ্ঞাসা করিল: এই বাড়ীটার নামই বুঝি তাজমহল?

সাময়িকী

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও স্মৃতি-রক্ষা :

যুগের প্রতীক রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বার্ষিকীর তারিখ হিসাবে ২৫শে বৈশাখ জাতির পুণ্যতিথি। এইবার এই তারিখে বাংলার সর্ব্বত্র রবীন্দ্র-নাথের ৮৫তম বার্ষিক জন্মোৎসব ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা সমিতির আবেদনে পক্ষকালব্যাপী সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং এর মধ্যে
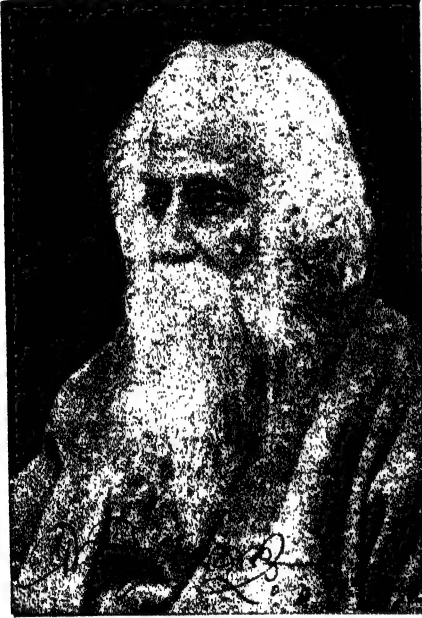
আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হইবে বলিয়াও আশা করা যাইতেছে। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আন্তরিক উদ্যোগ এই সম্পর্কে স্মরণীয়। ২৫শে বৈশাখ মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সিনেট হলে যে বিরাট্ স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বহু সুধী উপস্থিত হইয়া বিদেহী কবির প্রতি শ্রদ্ধা-তর্পণ করেন। আমরা আশা করি, বাঙালী মুক্তহস্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার এই মহান্ আয়োজনকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন :

বিগত ১৩-১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন দিবস ব্যাপী শিলং-এ নিখিল আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশ এবং মূল সভাপতি ছিলেন জনপ্রিয় সাহিত্যিক মিঃ এস. ওয়াজেদ্ আলি বি. এ. (ক্যান্টাব) বার-এ্যাট-ল। শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, লোক-সাহিত্য, শিশুসাহিত্য ও রবীন্দ্রশাখার পৌরোহিত্য করেন। মূল সভাপতির অভিভাষণ নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। মৌলিকতা ও নিরপেক্ষ চিন্তাশীলতার দিক দিয়াও ইহা মিঃ ওয়াজেদ আলির খ্যাতি রক্ষা করিয়াছে। সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও গৃহীত হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মারফৎ আসাম ও বাংলার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ও সৌহার্দ্দ্য প্রবৃদ্ধ করিতে এই সম্মেলন বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সমগ্র বাঙালীর ধন্যবাদার্হ।

নব নির্ব্বাচিত মেয়র ও ডেপুটি মেয়র :

কলিকাতা কর্পোরেশনের নব নির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডেপুটি মেয়র মিঃ সামসুল হক মহোদয়কে তাঁহাদের এই প্রধান নাগরিক-সম্মান লাভের জন্য আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ও মিঃ হক যথাক্রমে হিন্দু মহাসভা দলের ও স্বতন্ত্র মুসলিম দলের নেতা

শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সম্মান লাভ :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসর খ্যাতনামা সাহিত্যসাধিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দানে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ ও দীর্ঘ নীরব সাহিত্য সাধনা বর্ত্তমান যুগে একান্ত বিরল।

ডাঃ দাশগুপ্তের অবদান :

আমরা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, সম্প্রতি অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার আজীবনের সংগৃহীত পুস্তকের গ্রন্থাগারটি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গবেষণাগারে দান করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের মূল্য প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হইবে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিভাগ যে ইহাতে বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির রজত-জয়ন্তী :

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ১লা বৈশাখ হইতে সপ্তাহকালব্যাপী ইহার জয়ন্তী উৎসব বাংলার সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে একখানি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হইবার কথা। যে সব সভাসমিতির অধিবেশন হয় তাহাতে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষকের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচারিত হয়। এই জয়ন্তী উৎসবকে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়া প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য A. B. T. A. Silver

Jubilee Medal দিবার প্রস্তাবও খুবই সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। বহু ত্যাগব্রতী শিক্ষকের তপস্যায় এই সমিতি গড়িয়া উঠিয়া বর্ত্তমান বৃহৎ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বহু শিক্ষকের ঐকান্তিক নীরব শ্রম ও উৎসাহে এই সমিতি আজ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইয়াছে। বাংলাদেশে শিক্ষান্দোলনে এবং অবজ্ঞাত শিক্ষকের মান ও মর্য্যাদা উন্নয়নে এই সমিতির কার্য্য অতুলনীয়। অধিকন্তু নানা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক হিসাবে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পথেও সমিতি অন্যতম আদর্শস্থানীয় বলা যায়।

রসিক জয়ন্তী:

সম্প্রতি ১০৬ বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হওয়ায় বৈষ্ণবাচার্য্য পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব তাঁহার বাগবাজারস্থ বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বহু সুধী

ব্যক্তির অর্ঘ্য ও তাঁহার জীবনকথা সমন্বিত গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। এখনও তাঁহার স্মরণশক্তি, চক্ষু-কর্ণ-শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাক্‌শক্তির স্বাভাবিকতা প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার পবিত্র সংস্কৃতিপরায়ণ জীবন এ যুগের আদর্শস্বরূপ।

ভারতীয় জরীপ বিভাগের অবদান:

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় জরীপ বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন বিষয়ের দেড় হাজার মানচিত্রের ৫-৭ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইত। যুদ্ধারম্ভের পরে ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের কয়েক হাজার মানচিত্রের প্রায় পাঁচ কোটি সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। এ জন্য ছাপাখানায় প্রায় ৩০ কোটি বিভিন্ন রং-এর অংশ ছাপিতে হইয়াছে এবং কাগজ লাগিয়াছে প্রায় দুই হাজার টন। ইহার জন্য কত ছাপাখানা, শিল্পীও কর্ম্মীর যে প্রয়োজন হইয়াছে তাহা অনুমেয়। যুদ্ধোত্তর কালে এই সব মানচিত্রগুলি শিক্ষা ও গঠন কার্য্যে লাগিতে পারিবে।

বড়লাটের সাহায্যভাণ্ডার:

যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। আজ পর্য্যন্ত এগার কোটি টাকার উপর এই ভাণ্ডারে আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতীয় রাজন্যবর্গের দানের পরিমাণই ৬ কোটি টাকার উপর। হায়দ্রাবাদের নিজামই দিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ১৯০ লক্ষ টাকা। আজ পর্য্যন্ত দশ কোটি টাকার অধিক যুদ্ধে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের পর এই ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থ যুদ্ধে হতাহত সৈন্যদের পরিবারবর্গের সাহায্যে এবং সৈন্যগণকে পুনরায় তাহাদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠা দিতে সাহায্য করিবে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব:

চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে ১৪-২৭ মে পর্য্যন্ত পক্ষকালব্যাপী এই উৎসবের বিপুল ও বিচিত্র আয়োজন আজ জাতীয় উৎসবরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। গঠনমূলক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া জাতীয় চেতনার উন্মেষপ্রচেষ্টা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বিগত ২৩শ বর্ষ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে এবং এদিকে তারা অগ্রণীও বলা যায়। এই উৎসবের বিস্তারিত পরিচয় আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৺সারদাপ্রসাদ রায়:

প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর সারদাপ্রসাদ রায় গত ২৮শে মার্চ্চ পুরীধামে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। হুগলী কলেজের তিনি ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ও অবদান স্মরণীয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেরও তিনি বিশেষ অনুরাগী সুহৃদ ছিলেন।

অন্নপূর্ণা পাঠাগারের বার্ষিকোৎসব:

গত ২রা বৈশাখ প্রবর্ত্তকের অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের পৌরোহিত্যে তেলেনিপাড়া (চন্দননগর) অন্নপূর্ণা পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুস্তকাগারের সম্পাদক শ্রীযুত সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্য্যবিবরণীতে পাঠাগারের পুস্তক-নির্ব্বাচন ও পরিবেশনের সুনীতির পরিচয় মিলে। শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে নববর্ষোৎসব:

নব বর্ষের প্রথম উষার আলো ফুটিবার সঙ্গে চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে বর্ষোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সঙ্ঘগুরু সঙ্ঘের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক চিহ্নসমন্বিত পতাকা উত্তোলন করেন। সঙ্ঘ সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত পতাকার মর্ম্মপরিচয় প্রদান করেন। সঙ্ঘাচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যতীর্থ ছাত্রগণকে নব বর্ষের সঙ্কল্পবাণী পাঠ করান: "—যেন আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থায় দেশ ও দেশের সমৃদ্ধি লাভ হয়।

জাতির নৈতিক অবনতির দুর্ব্বার গতি রুদ্ধ হয়, শাশ্বত ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমাজজীবন নূতন ছন্দে সুগঠিত হয়। আমাদের জীবনে সত্যের জয় হোক, আমাদের মনে মনুষ্যত্বের প্রতি নূতন শ্রদ্ধা আসুক, আমাদের কর্ম্মে বিগতদিনের ভ্রান্তি-বিচ্যুতির অবসান ঘটুক, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত প্রলোভন, মিথ্যাপদমর্যাদা এবং চারিত্রিক অবনতি যেন আমাদের অন্তরকে শ্রীহীন না করে, যেন মনের শুভ্রতাকে কলুষিত না করে। ভারতের অতীত গৌরব হোক আমাদের আদর্শ, বিশ্বের বৈভব হোক আমাদের করায়ত্ত, বিশ্বমানবতার কল্যাণ প্রচেষ্টা হোক আমাদের লক্ষ্য। আমাদের বিজয় শঙ্খ আবার ধ্বনিত হোক 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।"

এম, জেশরাজ এণ্ড কোং:

চিৎপুরের (৯৬ নং লোয়ার চিৎপুর) এম, জেশরাজ এণ্ড কোম্পানীর দি ন্যাশনাল ফার্ম্মেসীর সুনাম আমরা অবগত হইয়াছি। খ্যাতনামা ডাক্তার বি মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ জে, মল্লিক সযত্নপরতার সহিত সুলভে এখানে দন্ত রোগের চিকিৎসা, দন্ত বাঁধাই, চক্ষু পরীক্ষা ও চশমার কাজ করিয়া থাকেন। এই ফার্ম্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বজবজ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ:

গত ১৬ই বৈশাখ অপরাহ্নে বজবজ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। সভায় বজবজের বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করে ও প্রেরণা যোগায়। তিনি বলেন 'বিবেকানন্দের বাণী প্রেমের বাণী। একমাত্র প্রেমই এই হিংসাবিধ্বস্ত জগতে শান্তি ও সুখ আনতে পারে। সে প্রেম আসবে ত্যাগ ও সেবায়, পরানুকরণপ্রিয়তায় নয়।" সমাপ্তি সংগীত গীত হইলে পর সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি-সম্মেলন:

গত ১৮ই ও ১৯শে চৈত্র দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত হলে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাহিত্যসেবী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, অধ্যাপক ও ছাত্র এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সভার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মূল সভাপতি শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মূল সভাপতি পদে বৃত হন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র। প্রথম দিনে শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যথাক্রমে সাহিত্য, শিশু সাহিত্য ও জনশিক্ষা শাখার অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কাব্য, কথাসাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় সম্মেলন যথাক্রমে শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেবের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বঙ্গভাষাই যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত, এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলন আগামী বর্ষে বর্দ্ধমানে আহূত হইয়াছে।

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট:

সুসাহিত্যিক শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিশির-কুমার ইনষ্টিটিউটের রজত জয়ন্তী উৎসব সম্প্রতি সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের সাহিত্য সম্বন্ধে এই উৎসবে আলোচনা হয় এবং বিশিষ্ট সুধী ব্যক্তিগণ ইহাতে যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সাহিত্য সাধনার জিনিষ, সাধন না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। এই ইনষ্টিটিউট উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে সাহিত্য প্রচারের জন্য স্মরণীয়।

বঙ্গীয় কলালয়ঃ

সম্প্রতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ও শিল্প বিদ্যালয় বঙ্গীয় কলালয়ে এক গ্রীষ্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলালয়ের ছাত্রীগণ একাধিক নৃত্যগীতের দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ পরিবেশন করিয়াছিলেন। নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত কীরিট রায় পরিকল্পিত 'রূপান্তর' ও 'তরুণ নৃত্য' ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অমিয় সাহা পরিকল্পিত "বন্দিনী" নৃত্য দুইটি অতিশয় মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

সম্পাদকঃ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত

এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অলঙ্কার নির্ম্মাণে ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী যথেষ্ট সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারাণ্টি থাকে।

১২৪.১২৪-১, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
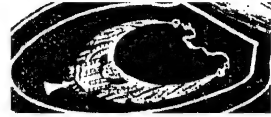
তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
সেলস্ প্রোমোটিং ডিপার্টমেণ্ট
২।১, শ্রীনাথ দাস লেন, কলিকাতা।
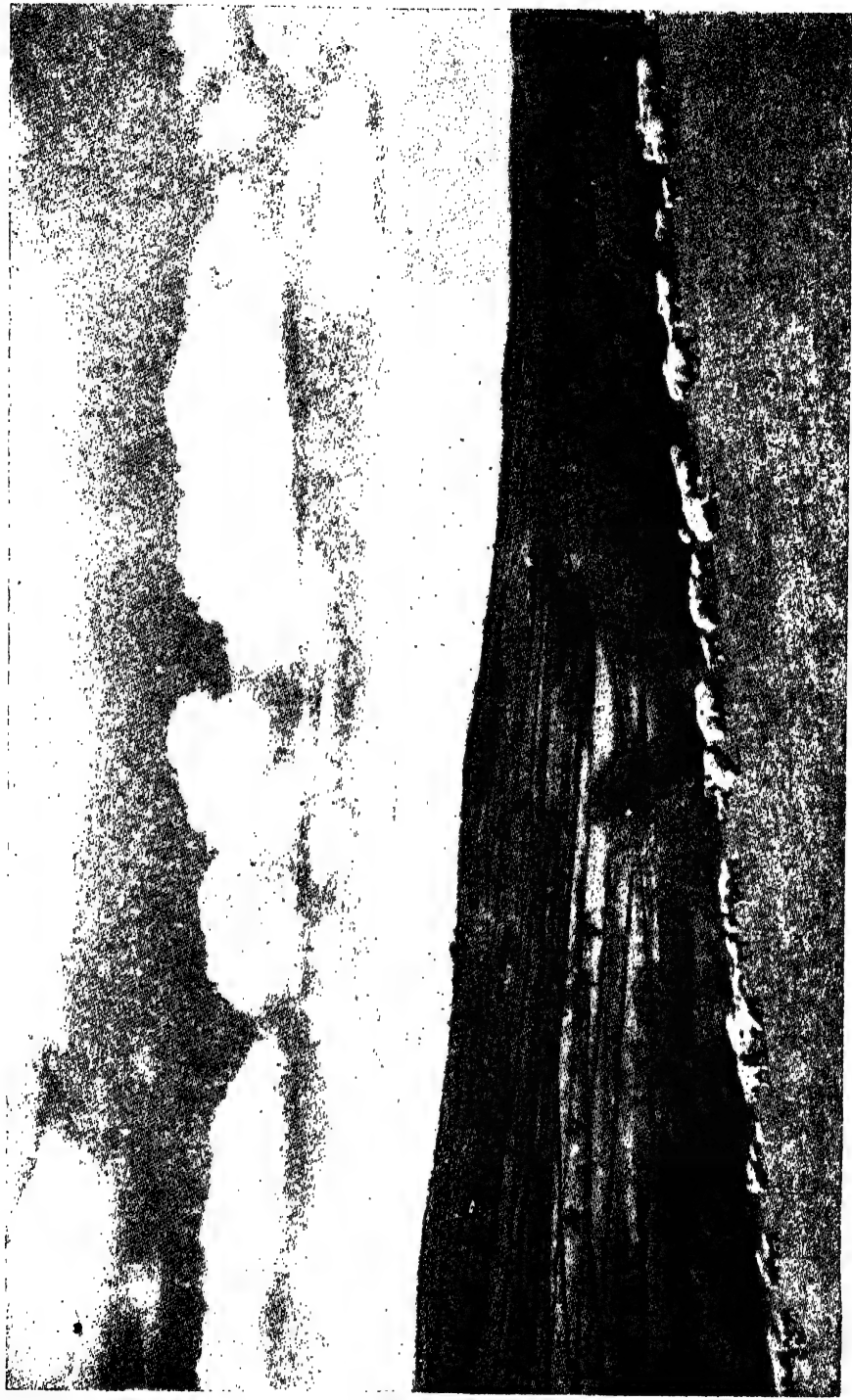
যুদ্ধরত ইংলণ্ডের স্তু পল্লীশ্রী
(By courtesy : B h Council)

৩০শ বর্ষ
১৩৫২ বাং
ইং ১৯৪৫

জ্যৈষ্ঠ ঃ
(মে)
১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

ধর্ম্মের উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য সত্য—কথাটা সহজবোধ্য নহে। সত্য নির্ণয় করিবে কে? যাহা একজনের সত্য তাহা অন্যের পক্ষে প্রযুজ্য নাও হইতে পারে। ধর্ম্ম যখন রুচি ও প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচারগত তখন সত্যেরও রূপভেদ আছে। এই অবস্থায় সত্যের একটা বিগ্রহ চাই। যাহা নাম মাত্র তাহা লইয়া নানা অর্থ অসঙ্গত নহে, কিন্তু তাহাকে যদি বিশেষ রূপ দিয়া সম্মুখে ধরা যায়, তখন সত্যের সেই রূপটীর দিকে সকলেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। ভারতবর্ষ তাই সত্যকে নামে মাত্র না রাখিয়া তাহার একটী মূর্ত্তি দিয়াছিল—তাহা বেদ।

অনৈক্যের সমাধান ইহাতে হয় নাই। ধর্ম্মের লক্ষ্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, সেই সত্যকে রূপে পরিণত করিয়া হিন্দুভারত যখনই তাহার বেদ আখ্যা দিবে, সেই মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মীরা উহা কেন স্বীকার করিয়া লইবে? বেদের সর্ব্বপ্রাচীনতা সকল ধর্ম্মীর উহাতে সম্মতি অকাট্য প্রমাণের হেতু নহে। প্রাচীন বলিয়াই যে সত্যের উহাই একমাত্র মূর্ত্তি বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইবে, ইহার যুক্তি কি আছে? এই জন্য ধর্ম্ম থাকিলেই সম্প্রদায় থাকিবে। এবং ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতি গড়ার চেষ্টায় তাহা এক অখণ্ড জাতি হইতেই পারে না, এই কারণে আমরা রাষ্ট্র গড়িতে চাহি ধর্ম্মের বালাই না রাখিয়াই। কিন্তু ইহাতেও যে এক অখণ্ড রাষ্ট্র সংগঠন হইবে, এ আশাও করা যায় না। ধর্ম্ম বাদ দিয়া রাষ্ট্রলক্ষ্যে অখণ্ড জাতি গড়ার কল্পনা শুনায় ভাল, কিন্তু কার্য্যতঃ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর এক অখণ্ড জাতি গড়ার ন্যায় রাষ্ট্রলক্ষ্যে এই আদর্শও সফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অতএব জগতে এক এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-শক্তিও চিরদিনই থাকিবে। তবে যে কোন ধর্ম্মপ্রভাব বা রাষ্ট্রপ্রভাব যত অধিক লোক ও দেশের উপর বিস্তৃত হইতে পারিবে, সেই ধর্ম্ম বা রাষ্ট্র সেই সেই পরিমাণে বৃহৎ আকার লাভ করিবে। ইহাই হইতেছে বিশ্বের ইতিহাসে চির-নীতি। কিন্তু ইহাই যদি সনাতন হইত ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় হওয়ার হেতু ছিল না। এই কথাটা ভারতবর্ষ স্বীকার করিতে চাহে না। ভারত এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত জাতিকে অখণ্ড করিয়াই বাঁধিতে চাহে।

তদুত্তরেও বলা যায়—এই আকাঙ্ক্ষা শুধু ভারতের কেন, বিশ্বের এক একটা প্রচণ্ড মতবাদ এক একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া এই পথেই তো চলিয়াছে চিরদিন। বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদ জগজ্জয়ী হওয়ার জন্য এই নীতিকে আশ্রয় করিয়াই কি বিশ্বে প্রসারিত হইতে চাহে না? ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর ইউরোপে ফ্যাসিইজম্ এই উদ্দেশ্য লইয়াই কি ভীষণ কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করে নাই? আজও মিত্রশক্তির মধ্যে বিজিত দেশগুলি লইয়া যে ভাগবাটোয়ারার দায় দেখা দিয়াছে, তাহার মূলেও আত্মবিস্তৃতির লক্ষ্যই কি নিহিত নাই? এই হেতু ভারতের ধর্ম্ম যে বিশ্বজয়ী হইতে চাহে তাহার অভিনবত্ব স্বীকার করা যায় কি প্রকারে?

তর্কশাস্ত্রে এমন যুক্তি নাই যাহার দ্বারা বাহ্যতঃ ভারতের অন্তর্নিহিত সত্যের নবীনত্ব প্রমাণ করা যায়, বাহ্যতঃ ভারতের এই আকাঙ্ক্ষার সহিত বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভেদ যাহা আছে তাহা প্রমাণসাধ্য নহে। ইহা অনুভব করার জন্য আমি কয়েকটা কথার অবতারণা করিব। যদি এই দিক দিয়া ভারতের অভ্যুত্থান-কামনা আমাদের আকুল না করে, তবে তাহা গতানুগতিক বিশ্বের সহিত একযোগে চলিবার আয়ুঃ নিঃশেষ হওয়াই শ্রেয়ঃ। ভারতের নূতন কিছু দিবার না থাকে তবে সে নিশ্চয় মরিয়াছে। তাহার প্রেত মূর্ত্তি যাহা দেখিতেছ তাহার মূল্য পৃথিবীতে কিছুই নাই। উহা তাহার স্মৃতিলোকের ব্যর্থ কল্পনা। কিন্তু ভারতের সত্তা তাহা স্বীকার করিতে

চাহে না। ভারতের দিবার বিষয়বস্তু আছে, তাই তার আয়ুঃ আজিও শেষ হয় নাই। এত লাঞ্ছনায় তাহার দিবার বস্তুটী সুপরীক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। ভারতকে বাঁচিতে হইবে, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে, বিশ্বকে তার নূতন অবদান দিবার জন্যই।

কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই সংযম সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হয় নাই। মানবমনের সংস্কার তিনি অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভীষ্মের প্রতি রথচক্র ধরিয়া তাঁহার প্রচণ্ড মূর্ত্তি আমাদের স্মরণে আছে। কুরুক্ষেত্রের এই দৃশ্য কবির কল্পনায় যদিও রচিত হইয়া থাকে, ভারতের ধর্ম্মনীতির নূতন অবদানের নির্দ্দেশ এই রচনার মধ্য দিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব দুইই আছে। মানুষ পশুত্ব লইয়াই মানবতাকে রক্ষা করিতে চাহে। এই পশুত্বের অভ্যুত্থানে দেবত্বের পরাজয় বার বার হওয়ার কথা ভারতের শাস্ত্রাদিতে লক্ষ্যে পড়ে। দেবতারও জয় হইয়াছে বিনা অস্ত্রে নহে; কিন্তু এই রক্ত-সংগ্রামের পশ্চাতে দেবত্ব পুনঃ পুনঃ চাহিয়াছে ঈশ্বরপ্রসাদ। অহংকারের আশ্রয় না লইয়া ভারতের দেবত্ব পশুত্বের জয় কামনায় ঈশ্বরেরই আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু যে অস্ত্রে জগতের পশুবল মাথা নত করিবে সেই অস্ত্র ব্যবহার করার উপন্যাস রচনা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার সাফল্য লক্ষ্যে পড়ে না। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধির শাস্ত্রাদিজ্ঞান যতটা থাকুক আর নাই থাকুক, এই দিক দিয়া তাঁর অভ্যুত্থানে ভারতের অভিনব দান যেন মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিতেছে।

ইউরোপের ধ্বংস যজ্ঞের প্রচণ্ড কোলাহলের পশ্চাতে মহাত্মা ভারতের মুক্তিকামনায় মানুষের মধ্যে যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে তাহাই শান দিয়া চলিয়াছেন—'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি' প্রভৃতি ২৫টী দিব্য অস্ত্রের অনেকগুলি অস্ত্রের সন্ধান যেন তিনি পাইয়াছেন। ভারতের কোন মানুষই তাঁর অস্ত্রচালনায় হয়তো বিশ্বাসী নহেন, শক্তিশালী রাষ্ট্রপতিগণ কিন্তু মহাত্মাকে একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। ইহাও এক প্রকার মহাত্মার অস্ত্রবলের প্রভাব। যদি এই কথাটা স্বীকার করিতে হয়—বাক্যের দ্বারা মানুষ সমাজ রচনা করিয়াছে তাহা হইলে রচনার শক্তি বাক্য। বাক্য খনিত্রের ন্যায় কোন প্রকার স্থূল অস্ত্র নয়, অতএব বাক্যের শক্তি বেদমন্ত্রময়। মন্ত্র বাক্‌শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বেদই আমাদের দিয়াছে ভাষা। ভাষার ক্রিয়াশক্তি আছে, নতুবা ইহা সৃষ্টির হেতু কেমন করিয়া হইবে। ভারতবর্ষ এইখানে এক অধ্যাত্মসম্পদ আবিষ্কার করিয়াছে, ইহার প্রয়োগবিধি খুঁজিতেছে দীর্ঘদিন, কুরুক্ষেত্রের পর এই পাঁচ হাজার ৪৫ বৎসর। বিশ্বের পাশবিক বলকে ভারতের অধ্যাত্মশক্তিপ্রবাহে পর্য্যুদস্ত করিয়া সে চায় বিশ্বে সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে। ধর্ম্মের সাধনায় সে চাহে আত্মিক শক্তি বা যোগশক্তির আবিষ্কার। এইখানে তার তপস্যা যদি জয়যুক্ত না হয়, আর এই অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগে যদি সে রাষ্ট্রশক্তি নূতন বিধানে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারে, তার কণ্ঠে যে এক দিন উদ্গীত হইয়াছিল 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' সে কথার কোনই সার্থকতা থাকে না। আমি বাংলার উদীয়মান চিন্তাশীল তরুণদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলি—ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতি গড়ার প্রাণ উদ্যত করিতে হইবে। এখানে স্থূল সম্পদ তাহার অর্থ, অস্ত্র, লোক যাহাই হউক, তাহা ব্যতীত এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্মবল আমাদের আছে। আমরা তাহা লাভ করিব এবং এই অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগেই আমরা স্বর্গজয়ী হইব। আমি তাই মুক্তকণ্ঠে সকলকে ডাকিয়া বলি 'এহি'।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় ফিকিরচাঁদের দল এবং কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার এই অযোগ্য শিষ্যের গোয়ালন্দের বাসায় দুইদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করিতাম।

কাঙ্গাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদের দল সহ গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে সহরময় একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে লোক আর ধরে না। গোয়ালন্দ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দলে দলে লোক ফিকিরচাঁদের গান শুনিবার জন্য এবং কাঙ্গালকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে গোয়ালন্দে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পূজনীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও এক্ষণে পরলোকগত কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উপলক্ষে গোয়ালন্দে আগমন করিয়াছিলেন। গোয়ালন্দে যে কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ধূমধাম করিয়াছিলেন। এই উৎসবের পরেই গোয়ালন্দে মহা দলাদলি আরম্ভ হইল; হিন্দুসমাজভুক্ত মহোদয়গণ ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অবশ্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ এই কয়েকটী ভদ্রলোককে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। এমন কি আমি জানি যে, এই দলের একজন ভদ্রলোক কোন হিন্দু-সমাজভুক্ত উকিলের বাসায় গমন করিয়া তাঁহার ফরাসে উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ভদ্রলোকের সম্মুখেই হুঁকার জল ফেলিয়া দিবার জন্য উকিলবাবু চাকরদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় এই কথা আমি কাঙ্গালকে বলিয়াছিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আজ আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। দুইদিন তোর বাসাতেই থাকিতে হইতেছে।" এই কারণেই কাঙ্গাল হরিনাথ দলবলসহ গোয়ালন্দে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সকলে আমাদের বাসায় পৌঁছিলেন। আমার বড়দাদা এবং আমাদের বাসার সকলে হাতে স্বর্গ পাইলেন। রাত্রিতে কাঙ্গাল হরিনাথ বড়দাদার নিকট স্থানীয় দলাদলির কথা সমস্ত শুনিলেন। তাহার পর যখন সকলে শয়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন কাঙ্গাল আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্, আমি এখানকার দলাদলি মিটাইয়া দিয়া তবে বাড়ী যাইব।" আমি বলিলাম 'পারিবেন কি?" তিনি তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন "নিশ্চয়ই পারিব। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্। এই ফিকিরচাঁদ অস্ত্রে তোরা যে পৃথিবী জয় ক'রতে পারিস্, এ কথা কি এখনও বুঝতে পারিস নাই।" কাঙ্গালের কথাগুলি আমার নিকট দৈববাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, জীবনের উপর দিয়া কত ঝড়, কত ঝঞ্চা বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও কাঙ্গালের সেই রাত্রির মূর্ত্তি আমার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত রহিয়াছে। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কত লোকের কত উপকার বিস্মৃত হইয়াছি; তখনকার নিষ্কলঙ্ক জীবন কত কলঙ্ক-কালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঙ্গালের সে দিনের সে মূর্ত্তি আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই কাঙ্গালের এত শিষ্য থাকিতে সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য আমি তাঁহার জীবনকথা কীর্ত্তন করিবার প্রয়াসী হইয়াছি। কাঙ্গালের সেই গৌরকান্তি, সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু, সেই তেজব্যঞ্জক মূর্ত্তি তখন যেন এক

স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল এই মূর্ত্তির সম্মুখে পাপ, তাপ, মলিনতা, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে না। এই মুখের বাণী শুনিলে সকলকেই অবনত-মস্তক হইতেই হয়।

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কাঙ্গাল বলিলেন "কী ভাবছিস্?" আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম "না, তেমন কিছু না।" কাঙ্গাল আমাকে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইতে লাগিলেন; আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া আমার দিদিকে ডাকিলেন। আমার দিদি কাঙ্গালের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কাঙ্গাল যখন প্রথম কুমারখালীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন প্রথম যে কয়েকটী ছাত্রী তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করেন, আমার দিদি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। আমার এই দিদিকে কাঙ্গাল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে দেখিয়াছিলেন।

আমার দিদিকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ্, আমি একটা গান বাঁধব, তুই লেখ দেখি।" দিদি তখন তাড়াতাড়ি উঠানেই আসন পাতিয়া দিলেন এবং নিজে কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা এবং আমি উঠানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাঙ্গাল সুর করিয়া গান বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গানটী এই—

"ও ভাই বল্‌রে বল্ সবাই বল্ রে।
দলাদলি, গালাগালি, ধর্ম্মের কি ফল রে।

স্ত্রী-পুরুষে যার ঐক্য নাই, সহোদর যত ভাই ভাই,
সকল কাজেতে ঠাঁই ঠাঁই, সমাজ টলমল রে;
এখন সাকার আর নিরাকার তুলে,
দিচ্ছ খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে,
বাতাস দিয়ে অনলে হাসে শত্রু দল রে।
অসীম আকাশ মাথার 'পরে,
দেখ একবার বিচার ক'রে,
সূর্য্য তারা ঘোরে ফিরে, উদয় অস্তাচল রে;
ওরে, তারার মাঝে যারা আছে,
দেখ্ তিনিও আছেন তাদের কাছে,
কেউ নেই তাঁর আগে পিছে, সমান তাঁর সকল রে।

কি ভাবে কে ভাবে কোথায়, ঠিক নাহি হয়রে কথায়,
ভাবের ঠাকুর ভাবেতে পায় প্রকাশ যে কেবল রে;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে, তিনি,
সেই ভাবে তার হৃদ্-মন্দিরে,
নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে করেন যে শীতল রে।

শুন ভাই সাধুর বচন, তিনি যে সাধনের ধন,
সাধন বিনে ধর্ম্মকথন সকলি বিফল রে;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়,
কিন্তু মনে প্রাণে সাধন কর,
বৃথা তর্ক বিচার ছাড় বুদ্ধির কৌশল রে।

যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে,
যদি সিদ্ধ হও ভাই সাধন ক'রে,
তখন বক্তৃতা ক'রে, খাবে না আর জল রে;
তখন একটা কথার তেজোবলে,
কত পাষাণ শিলা যাবে গ'লে,
হবে এক সত্য বলে পূর্ণ ধরাতল রে।

কাঙ্গাল কয় সকাতরে, ভারতের পায় ধ'রে,
সাধনহীন এ বিচারে হবে গণ্ডগোল রে;
ওরে, সাধন ক'রে সযতনে,
যিনি পেয়েছেন সেই সত্যধনে,
তাঁর উপদেশ বিনে সকলই গরল রে।"

কাঙ্গালের গানের শব্দ পাইয়া দলের যাঁহারা বাহিরে নিদ্রা যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সকলে আমাদের বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আর কি—ঐ গান আরম্ভ হইল। আমার দাদা একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া কাগজ দেখিয়া গানের কথাগুলি বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর দলের লোকেরা গান করিতে লাগিল। তখন পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল; আমাদের বাড়ীর মধ্যের উঠানে আর লোক ধরে না; বাড়ীর মেয়েরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, লজ্জা, সঙ্কোচ কিছুই তখন থাকিল না। সে এক অদ্ভুত ব্যাপারে আমি অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম—বুঝিতে পারিলাম কাঙ্গালের একটু পূর্ব্বের সেই কথা, "দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্"।

রাত্রি বোধহয় এগারটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল তবুও গান থামে না; একজন

যদি চুপ করে, তবে আর একজন গান ধরে! তিন চারিটি গানেই রাত্রি শেষ হইবার রকম হইল। তিনটার পর কাঙ্গালের হুঁষ হইল, তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তিনি তখন কোন্ এক আনন্দলোক হইতে আবার আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। গান ভাঙ্গিয়া গেল, কাঙ্গাল বিশ্রাম করিতে গেলেন। দলের অন্যান্য লোকেরাও বিশ্রাম করিতে গেল।

তখন আমি আর প্রফুল্লচন্দ্র বাহিরে যাইয়া ঘাসের উপর বসিলাম। প্রফুল্ল বলিলেন "আজ রাত্রিতে আর ঘুম হইবে না, এস আমরা বসিয়াই রাত কাটাই।" কিন্তু কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়। প্রফুল্ল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কালকের জন্যে আমিও একটা গান বাঁধি।" আমি বলিলাম "বেশ।" তখনই কাগজ কলম আলো ঘাসের মাঠে আনিয়া দিলাম; প্রফুল্লচন্দ্র গান বাঁধিলেন। সে গানটি এই—

আছে কি কোন ঠিক তার,
কখন তোমার নথী উঠে পেশ হইবে।
কিবা রাত কিবা সকালে, সাঁজ বিকালে,
যে কালে সে মন করিবে;
তখনই নথী ধরে, অবোধ তোরে,
জবাব দিতে তলব দিবে।

সে তলব চিঠি লয়ে, হুকুম পেয়ে,
যখন ধেয়ে দূত আসিবে;
তখন তোর আত্ম সন্ধান, স্ত্রী পরিজন,
ক'রে যতন কে ঠেকাবে।

যখন সেই আদালতে জজের হাতে,
অবোধ রে তোর বিচার হবে;
তখন তোর সপক্ষেতে সাক্ষী দিতে,
ঝুটো কথা কে বলিবে।

যাদের তুই ভেবে আপন, করিস যতন,
তারা আপন না হইবে;
দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে ছয় সাক্ষীতে,
তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেবে।

যাদের তুই হেলা করিস্, দেখ্‌তে নারিস্,
দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে;
হয়ত তার কেহ গিয়ে তোমার হ'য়ে
ঝুটো কথা তাঁয় বলিবে।

ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, তৈয়ার হ'রে,
কি ব'লে জ'ব তখন দেবে;
হ'লে জ'ব খেঁচা নেষা সাক্ষী কাঁচা,
পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে।"

এই গানটী শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। গোয়ালন্দ সাব-ডিভিসন স্থান; সেখানে আমাদের পাড়ায় দিনরাত্রি শুধু মামলা আর মোকর্দ্দমা, মোকর্দ্দমা আর মামলা, শুধু হাকিম আর শামলা। এ অবস্থায় শেষ মামলার সম্বন্ধে উকিল মোক্তার বাবুদিগকে সজাগ করিয়া দেওয়া বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল।

যাহা হউক, পরের দিন প্রাতঃকাল হইতেই গান আরম্ভ হইল। সেদিন রবিবার ছিল, কাছারী সমস্তই বন্ধ। কাহাকেও সংবাদ দিতে হইল না, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইল না; কাঙ্গালের গৃহে কাঙ্গালের গান, তাহাতে আর নিমন্ত্রণ কি!

কিসে কি হয়, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব। প্রাতঃকালে প্রায় আটটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, অপরাহ্ন তিনটা বাজিয়া যায় তবুও কেহ উঠে না। ব্রাহ্মদল, হিন্দুদল সকলেই উপস্থিত। যে কয়জন প্রধান উকিল হিন্দুদলের নেতা ছিলেন, তাঁহারা ঐ যে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর উঠিলেন না। সকলের প্রাণ মন ভিজিয়া গেল; কোন দলাদলি, কোন প্রকার হিংসা দ্বেষ কিছুই কাহারও মনে থাকিল না! তিনটার সময় যখন গান ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কাঙ্গালের নিকট সকলেই উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন করযোড়ে সকলকে বলিলেন "আপনাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।" বড় বড় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, যাঁহারা হিন্দুসমাজপতি, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "অমন কথা বলিবেন না, আপনি কি অনুমতি করিবেন বলুন।" কাঙ্গাল সহাস্য বদনে বলিলেন "আমার বড় সাধ যে, আজ রাত্রিতে আমার এই ভাইয়ের বাড়ীতে আপনারা সকলে প্রীতি-ভোজন করেন।" তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন; এত দলাদলি, এত যে হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া, এত যে ঠাট্টাবিদ্রূপ, সে সব কোথায় চলিয়া গেল। সকলেই সাগ্রহে বলিলেন "রাত্রিতে গানের

পর আমরা সকলেই এখানে জলযোগ করিব।" আমার তখন ইংরাজ কবির সেই কথাটি মনে হইল—

Those who came to scoff
Remained to pray.

তখন আমাদের ন্যায় গরীবের ক্ষুদ্র কুটীরে মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সে কি উৎসাহ, কি আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। আমাদের বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় ছাত্রগণ তখন পরম উৎসাহে মহোৎসবের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে কে কি পাঠাইতে লাগিলেন, কে কি আনিতে লাগিলেন তাহার ঠিকানা হইল না। আমরা দরিদ্র ব্যক্তি; আমাদের সাধ্য কি যে এতগুলি ভদ্রলোকের সামান্য জলযোগের ব্যবস্থাও করিতে পারি। কিন্তু কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইল না, যাঁহার কার্য্য—যাঁহার মহোৎসব, তিনিই সমস্ত যোগাইয়া দিতে লাগিলেন। দ্রব্যের অভাব হইল না, পরিশ্রম করিবার লোকের অভাব হইল না—আমার এক একটী বালক ছাত্র তিনটী যুবকের কার্য্য একাকী করিতে লাগিলেন।

পাঁচটার সময় আবার গান আরম্ভ হইল। এবার অন্য রকমের গান হইতে লাগিল। এবার ফিকিরচাঁদ শুধু মায়ের নাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই 'মা' নাম শুনিয়া পাষাণও গলিয়া যায়, মানুষ ত দূরের কথা। আমাদের মনে হইতে লাগিল সে স্থানের গগন পবন যেন 'মা' নামে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে সমস্ত প্রকৃতি যেন 'মা' নাম গান করিতেছে। এক একবার সমবেত জনমণ্ডলী যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন "মাগো মা" তখন মনে হইতে লাগিল, মা ব্রহ্মময়ী যেন সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন। সত্য সত্যই ফিকিরচাঁদের গানে তখন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

রাত্রি এগারটার সময় গান শেষ হইল। তখন প্রীতি-ভোজন। সেও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিছু বিচার নাই, কোন অহঙ্কার নাই, কোন গর্ব্ব নাই—সে সময় সব এক হইয়া গেল। মৃত্তিকাসনে বসিয়া ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলে জলযোগ করিলেন। সকলেরই হৃদয় তখন মায়ের নামে নৃত্য করিতেছিল, তখন কি আর ভেদাভেদ থাকে? মায়ের এমনই খেলা বটে! কাঙ্গাল এই মহোৎসব ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর এক একবার বলিতে লাগিলেন—"এ যে আনন্দ-বাজার!" (ক্রমশঃ)

প্রকৃতির ঘরে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ছাড়ি' কলিকাতা ছাড়ায়ে হাবড়া,
আগায়ে ভাসিল তরণী,
আলোকের মালা ক'মে ক'মে এল
এবার প্রকৃতি ঘরণী।

এবার প্রকৃতি তোলে শাখা বাহু,
জোনাকি মাণিক জ্বালিছে,
এবার পাহারা তাল নারিকেল,
শেয়াল অবাধে ডাকিছে।

এবার বনে ও কুটীরে মিশে'ছ,
পাকা বাড়ী যেন বিদেশী,
এবার চাঁদের খুসী বাড়ে যেন,
গাছপালা সব সুবেশী।

এবার মাঠেতে জোৎস্না চাদর,
বায়ু ছোটে যেন সাহসে;
শহরের ধোঁয়া হয়েছে শিথিল,
তারাগুলি ভালো বিকশে।

সহসা কুকুর উঠিল ডাকিয়া,
সে ডাক ঘুরিছে অবাধে,
সে ডাকে কাঁপিছে বায়ুস্তর যেন,
ঢেউ সাথে তাহা বিবাদে।

আমি ব'সে ব'সে জাহাজে ঝিমাই,
মোরে ঘিরে আছে বনদেশ,
সে দেশের হাওয়া, সেথাকার জল,
গাছগুলি নড়ে, নাহি শেষ।

সেই পাতা নড়া সেই মৃদু ধ্বনি,
শান্তির মাঝে শিহরণ
আমার মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিয়া
দেয় হরষণ-পরশন।

জলকল্লোল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা শুনে এসেছি অনেককাল থেকে। ছোটবেলায় দিদিমার মুখে কত গল্প শুনেছি। গঙ্গা-সাগরের মেলা যেখানে বসে সে-জায়গা নাকি সুন্দর-বনের প্রত্যন্তদেশ, সাগরদ্বীপ তা'র নাম। সেখানে বাঘ আর কুমীরের ভয়,—সেটা নাকি সাগরের মোহানা। দিদিমা বলতেন, কপিলমুনির শাপে সগর রাজার বংশ নিধন হয়েছিল। বহুকাল পরে সেই বংশের পৌত্র ভগীরথ এনেছিলেন গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে কপিলের আশ্রমের ধারে। সগরবংশ উদ্ধার হয়েছিল।

বর্মা অভিযানের পর সমুদ্রের কথা উঠলেই আমার দুর্ভাবনা দেখা দিত। তবে এটা শীতকাল, বৃষ্টি বাদলের ভয় নেই, মাঝসমুদ্রেও যেতে হবে না—সুতরাং সাহস ছিল। তা ছাড়া গঙ্গার মোহনালোকে গঙ্গারই অসংখ্য-ধারা, তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে সুন্দরবনের গহন পথ,—সেখানকার চেহারা জাহাজ থেকে কতটুকুই বা দেখেছি? কলকাতায় ফিরে এসে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত হ'তে লাগলুম।

আসল কথা, জোয়ার এলো জলে! আমার প্রাণের নৌকা দুলে উঠলো। সেই গঙ্গাকে দেখে এসেছি একদিন দুর্গম হিমালয়ের তুষার লোকে—সেখানে গঙ্গা গলিত দুগ্ধধারার ন্যায় ব্রহ্মলোকে প্রবাহিনী—নাম মন্দাকিনী! দেবলোকে সেই মন্দাকিনী যখন নেমে এলো—তা'র নাম হোলো অলকানন্দা! আমি সেইখান থেকে গঙ্গাকে অনুসরণ ক'রে এসেছি। উত্তর পশ্চিম ভারতের সকল তীর্থ আর গাঙ্গেয় নগর পেরিয়ে সেই গঙ্গা রূপান্তরিত হোলো পদ্মায়, আর নলহাটির ওদিক থেকে নেমে এলো ভাগিরথী। কিন্তু আমার অনুসরণ করা থামলো না! গঙ্গার উৎপত্তি-লোক দেখেছি, নিবৃত্তি দেখা চাই বৈ কি!

হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার ছাড়ে তক্তাঘাট থেকে। আগের দিন রাত্রে এক বন্ধুর মেসে কাটিয়ে পরদিন প্রত্যুষে রওনা হয়ে গেলুম। সেটা পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন—আগামীকাল অমাবস্যা। দেশ-দেশান্তর থেকে শত সহস্র যাত্রী এসে জুটেছে জাহাজ-ঘাটার চারিপাশে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত প্রদেশের তীর্থযাত্রীরা জড়ো হয়েছে। বহুলোক এই পথ দিয়ে যায়, আবার অনেকে যায় ডায়মণ্ডহারবার থেকে। ডায়মণ্ডহারবার যাবার ট্রেণ ও মোটরবাস দুই পাওয়া যায়।

অত্যন্ত পুরনো এবং দরিদ্র স্টীমার। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন হয়ে থাকে, তীর্থযাত্রীরা অধিকাংশ ইতর শ্রেণীর লোক,—ভদ্র শিক্ষিতসাধারণ ওদের মধ্যে অতি সামান্য। স্টীমারের কর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা, অথবা স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাঁদের উপর,—তাঁরা যাত্রীদের ঠিক মানুষ ব'লে মনে করেন না। সুখ, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ যদি তাঁরা না দেন্ তবে অভিযোগ জানাবার মানুষ কম। শোনপুরের মেলা, হরিদ্বার অথবা প্রয়াগের মেলা, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে শিবরাত্রি অথবা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ণিমা ইত্যাদির মেলা, অযোধ্যার মেলা,—সকল মেলার একই ইতিহাস। জন-সাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টির অভাব! আমরা যে-স্টীমারে উঠলাম, সেটি মাল-চালানি বড় নৌকা বিশেষ। অন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের জন্য যে সমস্ত বজরা অথবা বাষ্পযান মাল নিয়ে আনাগোনা করে, আমাদের স্টীমারও তাই। যাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য দুটি স্টীমারকে একত্র ক'রে বাঁধা হয়েছে,—এবং তা'তে যাত্রী নেওয়া হয়েছে সংখ্যাগণনার অতীত,—কেউ অপমানিত, কেউ আহত, কেউ পদদলিত, কেউ বা রুগ্ন। শীতের দিন, তাই এ-যন্ত্রণা অনেকটা সহ্য করা যায়, অন্য সময় হ'লে অসম্ভব হোতো।

কিন্তু দেবতা ও পুণ্য কেবলমাত্র তীর্থেই নেই, আছে তীর্থপথের দুধারে—এই হোলো বিশ্বাস। সুতরাং তীর্থ-পথের যা কিছু কষ্ট, সেটি আনন্দেরই রূপান্তর, এই চিন্তা

না থাকলে অনেক তীর্থপথই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠতো। আমাদের স্টীমার যখন ছাড়লো বেলা তখন ন'টা বাজে।

নদীপথ অনেকটা আমার পরিচিত। প্রতি দোল-পূর্ণিমার রাত্রে আমরা অনেকগুলি বন্ধু মিলে এই গঙ্গার দক্ষিণ পথে ভেসে যাই। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, অধ্যাপক ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে একটি মস্ত দল। আমাদের নৌকায় আবৃত্তি, গান, কথকতা, রসিকতা, অভিনয়, কানাকানি, পারস্পরিক ঈর্ষা,—সমস্তই অনুষ্ঠিত হোতো। ভোজনের আসর বসে মস্ত আকারে, আয়োজনও প্রচুর। ওর মধ্যে রংয়ের খেলা, রংদার গল্প, রঙীন নেশা। আমাদের নৌকা ভাসতে ভাসতে বহুদূর দক্ষিণে চ'লে যায়। বেশ মনে পড়ছে, একবার আমাদের নৌকা কোটালের বানে বিপর্যস্ত হয়েছিল—দূরের থেকে বানের গর্জন শুনে আমরা তীরভূমিতে উঠে পড়েছিলুম।

আমাদের স্টীমার সেই পরিচিত পথ ধ'রে তর-তর বেগে দক্ষিণে চলেছে।

একটা কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। জলের উপর দিয়ে আমার অভিযান এবার অনেকটা ফুরিয়ে এলো। অনেক নদী আমার দেখা হোলো না, অনেক নদীর তল খুঁজে পেলুম না। নেপালের বাগমতী কোথায় গিয়ে তিস্তার সঙ্গে মিললো, সে কি দেখে এসেছি? কর্ণফুলীর উৎস কোথায়? আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের ডি-বং নদী—যেখানকার কাকচক্ষু জলে বহু বর্ণের দুষ্প্রাপ্য পাথর জলের ভিতর থেকে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে? বরিশালের দক্ষিণে আঁধারমাণিক আর গর্জনবুনিয়া,—যাদের জলের উপর অন্ধকার রাত্রে ফসফরাস জ্বলতে থাকে? নদীয়ার খড়ে, ইছামতী, চূর্ণী, গরাই, কুমার—এদের আদি-অন্ত কি দেখেছি? কত নদী মাঝপথে থেমে গেল, কত নদী বিবাগিনী হোলো, কত জলা-বিলে কত নদী মাথা কুটে ম'রে গেল, কত নদী বুককাটা মরুভূমিতে শুকিয়ে গেল—তাদের খবর কি সব জানি? হিমালয়ের সেই দুর্গম গহ্বরলোক মনে পড়ছে,—সেখানকার সেই বিরহী, হর্ষবতী, নায়ার ইত্যাদি নদীরা! সেই অসংখ্য অজস্র গঙ্গার শতমুখী ধারারা—ভীমগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, পিণ্ডর-গঙ্গা, রামগঙ্গা—কত অগণ্য গঙ্গার দল! মনে পড়ছে দানাপুর পেরিয়ে হলদি ছাপরার ধারে শোন নদী,—মনে পড়ছে নদী তীরের সেই পূর্ণিমার মেলা, আর শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি! বুদ্ধগয়ার পথে সেই ফল্গুনদীর কথা, সেই হাহাকার-করা বালুচড়া,—সেই তা'র ভিতরে ভিতরে স্নিগ্ধ রসধারা! ঝাঁসী-গোয়ালীয়র-মধ্যভারতের পথে সেই হঠাৎ-চকিতের স্বচ্ছতোয়া নদীরা। তা'রা কোথা দিয়ে সামনে এসে পড়লো, আবার কোথায় পালালো—কোনো ঠিক পেলুম না! সেই জয়পুর থেকে ওয়াধওয়ান আর আমেদাবাদের পথ—মাঝখানে মরুভূমির সীমানা—আর রাজপুতনার মরুশুষ্ক বুকে মাঝে মাঝে সেই ক্ষীরধারা নদীরা। মনে পড়ছে ট্রেণ ছুটেছে শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে,—আর পার্বত্যপ্রণালীর মধ্যে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে আঁকাবাঁকা নীল নদীতে! ঘুমচোখে নেমেছিল ইন্দ্রজাল, দেখেছিলুম যেন মরুবালারা মসলীনের ঘাঘরা উড়িয়ে অপ্সরীদের সঙ্গে নিভৃত জ্যোৎস্নায় গলাগলি করছে সেই নীল নদীর উল্লোল রসধারায়!

শীতের সূর্য্য অস্তে নামলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে এলো গঙ্গায়। আমাদের জোড়া-স্টীমারে আলো জ্বললো। এতক্ষণ পরে গঙ্গায় একটু একটু উচ্ছ্বাস দেখা দিল। সন্ধ্যার পরে স্টীমারের তলায় অল্প অল্প দোলা লাগলো। গঙ্গা বিস্তৃত হয়ে এসেছে।

দূরে-দূরে লাইট-হাউস চোখে পড়ছে, মাঝে বয়াগুলির চোখটেপা রাঙা আলোর সঙ্কেত। এদিককার গঙ্গা যেন নিত্য শৃঙ্খলিতা, নিয়মানুগত্যের ক্রীতদাসী! দুই ধারে কল-কারখানা, কুঠি, জেটি, নোঙর-করা জাহাজ, চিমনির ধোঁয়ায়, ঘর্ঘর শব্দে, আওয়াজে, ভাসা-তেলে, ময়লা জলে—সমস্তটা যেন অগম্য হয়ে থাকে। বুঝতে পারা যায় ভাগিরথীর প্রবাহ শুকিয়ে গেলে কলকাতার অস্তিত্ব লোপ পাবে।

গঙ্গার অন্ধকার ভেদ ক'রে আমাদের স্টীমার চলেছে, যেন পেরিয়ে চলেছে রাত্রির পথ ধ'রে প্রভাতের লাল আলোর দিকে, তমসা থেকে জ্যোতির্লোকের পথে। কত অজস্র অফুরন্ত গঙ্গা, সেই হিমালয়ের আদি গুহা থেকে

করেছি আমি আর গঙ্গা, আমরা দুজনে,—একজন গঙ্গা আরেকজন গাঙ্গেয়,—জল আর জীবন একসঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে চলেছে অনন্ত অকূলের দিকে। আমরা অভিন্ন, অন্তরঙ্গ, একাকার। বড় বড় ঢেউ আঘাত করছে আমাদের স্টীমারকে। বা'র বা'র আঘাত ক'রে নিজেরাই ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। আমাকেও যেন ভাঙছে ওরা, আমাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করতে চাইছে ওদের দলে টেনে নিয়ে। আমিও যে এই বিরাট কালসমুদ্রের মাঝখানে একটি ছোট্ট ঢেউ, পরমাশক্তির আমিও যে একটি ভগ্নাংশ—ওরা সেই কথাটা জানিয়ে যায়। আমার ভিতরে এই যে প্রাণকল্লোল, এই যে শব্দস্পন্দনধ্বনি—এ যে সেই বিপুল সৌরবিশ্বের অশ্রান্ত প্রাণস্পন্দন ধ্বনির থেকে বিচ্ছিন্ন একক নয়—এ কথা ওরা ব'লে যায় কানে কানে। এই গঙ্গার স্রোত, সৌরলোকে ওই ঘূর্ণ্যমান গ্রহনক্ষত্রজ্যোতিষ্কসূর্যচন্দ্রের দল, শূন্যলোকের নিত্য-তরঙ্গায়িত বায়ু, বৃক্ষলতা ও জীবলোকের প্রাণময়তা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রাণ, প্রকাশ আর অপ্রকাশ, আলো আর আঁধার, সমস্তটার সঙ্গে আমি অচ্ছেদ্য, আমি সেই বিরাটের চূর্ণবিশেষ, বিশ্বসৃষ্টির একটি পরমাণু, এই কথা ওরা শুনিয়ে যায় তরঙ্গের আছাড়িপিছাড়ি-আহ্বানে!

শেষ রাত্রের দিকে ব'সে ব'সেই তন্দ্রা এসেছিল, সুতরাং শেষ দিকের জল-পথটার কথা আর মনে নেই। সকাল আটটা লাগাৎ আমাদের স্টীমার সাগরদ্বীপের উপকণ্ঠে চড়ার কাছে এসে পৌঁছলো। অল্প জলে এসেছি, কতকটা যেন ভাঁটার টানে,—দ্বীপের উপরে দেখতে পাচ্ছি মানুষের সমাগম। ইতিমধ্যে নানা নদীপথ বেয়ে বহু বজরা নৌকা এসে তটের ধারে নোঙর করেছে। আমাদের বাষ্পযান ডাঙ্গা অবধি যাবে না—সুতরাং কোনো মতো একটা কৃত্রিম সিঁড়ি লাগিয়ে আমাদের দলকে একে একে নামানো হোলো। চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে আমরা একটা দোলায়মান অবস্থার মধ্যে বাস করেছি, সুতরাং তীরভূমির অকম্পতার উপরে পা রেখেও আমাদের শরীরটা যেন কতক্ষণের জন্য দুলতে লাগলো।

সাগরদ্বীপ যাকে বলা হচ্ছে, সেটা দ্বীপ কিম্বা উপদ্বীপ—এটি আমি জরিপ করিনি। তবে আমরা যে-ত্রিকোণাকার অংশটায় নেমেছি সেটির প্রান্ত সমুদ্রমুখী। বুঝতে পারা যায়, সুন্দরবন যেন সমুদ্রের ধারে জিহ্বা মেলে এখানে থাবা পেতে ব'সে রয়েছে। অরণ্যের সীমানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তবে এ অঞ্চলে কোনো কোনো গ্রামের আভাস বুঝতে পাচ্ছি। গৃহপালিত পশুর সন্ধান মিলছে। কোথাও উচ্চভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, হোগলার তাঁবু পড়েছে হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে। মেলা ব'সে গেছে বিরাট। যে-যেমন পেরেছে, এক একটি হোগলার তাঁবু দখল ক'রে পোঁটলাপুঁটলি নামিয়েছে,—এবং এরই মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ইত্যাদি কয়েকজন সেই অগণ্য হোগলার অরণ্যে পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছে। আপন আপন তাঁবুকে চিনে রাখার জন্য অনেকে হাস্যকর উপায়ে হোগলার ডগাকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। বুঝতে পারা যায় বাজারটা এসেছে বাইরের থেকে, জিনিসপত্র সমস্তই দুর্মূল্য। কপিলের মন্দিরটি রয়েছে কিছুদূরে—মেলাটা বসেছে ওটাকেই কেন্দ্র ক'রে। আশপাশে পাকা ঘরদোর, দোকানদানিও রয়েছে কিছু কিছু। মন্দিরের পাড়াটায় কিছু আভিজাত্যের চিহ্ন দেখা যায়। সন্ন্যাসীরা এসেছে, নাগা ফকিররা,—এসেছে ভৈরবীর দল, গৃহস্থ সম্প্রদায়, বোষ্টম-বোষ্টমীরা। পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের বহু যাত্রীরা, উত্তর-বিহারীরা এসেছে জগন্নাথের ফেরৎ। ওদের মধ্যে যাঁরা অবস্থাপন্ন, তারা হোগলার দেওয়াল ঘেরা ঘরগুলি অধিকার করেছে, এ দিকটা অনেকটা মালভূমির মতন। আমি জায়গা ক'রে নিলুম ইতরসাধারণের পল্লীতে। আমাদের পিছনের অংশে রইলো জঙ্গলের প্রান্তভাগ, এবং একটি বাঁধ বাঁধানো মস্ত জলাশয়। এই জলাশয়ে বহুশত যাত্রী ভিড় করেছে। পরিচ্ছন্নতা কোথাও চোখে পড়ছে না—এরই মধ্যে এই অস্থায়ী আবাসস্থলের চারিদিকে জঞ্জাল, নোংরা, উচ্ছিষ্ট এবং ময়লা জলের আঁস্তাকুড় জমে প'চে উঠেছে। মহামারী এই সময়টায় আসে হঠাৎ—এক একটা দলকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চ'লে যায়। যে-অংশটা অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন সেখানে-সরকারী লোকের তাঁবু পড়েছে। হাকিম, দারোগা, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, হারানো আর খুঁজে-পাওয়ার দপ্তর—ইত্যাদি অনেক রকমের লোক ব'সে গেছে।

উৎকৃষ্ট আহার্যের সঙ্গে উৎকৃষ্ট বাস-ব্যবস্থা লাভ ক'রে তা'রা-যে সমস্তক্ষণ ধ'রে যাত্রীসাধারণের ঈর্ষা উদ্রেক করে—এটি তারা বুঝতে চেষ্টা না করলেও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। হাকিম-দারোগারা সম্ভোগ আর শাসন জানে, সেবা জানে না—তাই তা'রা নিত্য অনাদৃত।

বেলা যত বাড়ে, লোক তা'র চেয়েও বেশী বাড়ে,—সুতরাং এই সহস্র লক্ষের ভিতর থেকে টুনুর সন্ধান পাবো, এ আশা দুরাশা। তারা কোথা দিয়ে আসবে আমি জানিনে, কখন্ আসবে তাও অনির্দিষ্ট, ডায়মণ্ডহারবার দিয়ে আসবে কিনা, তাও আমাকে লেখেনি। তা ছাড়া এই সাগরদ্বীপের চক্রাকার প্রান্তভাগ এত বৃহৎ, হাজার হাজার হোগলার ভিড়ের এত ঘিঞ্জি যে, আমি নিজে হারাবার ভয়ে সতর্ক হ'য়ে আছি। ওদিকে সমুদ্রের চক্রাকার তীরভূমিতে বন্যার মত তীর্থযাত্রীরা এসে নামছে; গত দুদিন থেকে শত শত নৌকা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে গেছে; জলের উপর দিয়ে দূর দূরান্তরের সুবৃহৎ দিগন্তপ্রসার—এই একটা সমুদ্র-উপদ্বীপ-অরণ্য-গ্রাম পরিব্যাপ্ত লক্ষ লক্ষের ভীড়ে টুনুকে কোথায় খুঁজে পাবো? সে কেমন ক'রে আমাকেই বা খুঁজে বা'র করবে?—আগে বুঝতে পারলে এই হাস্যকর অভিযান হয়ত বাতিল ক'রে দিতুম। অন্তত টুনুর স্তোকবাক্য না শুনে নিজের গরজেই না হয় একদিন এ পথে আসতুম!

আস্ত ফল ছাড়া আর কোনো আহার্য এখানে নিরাপদ নয়—এইটি ভেবে নেওয়া গেল। এক হিন্দুস্থানী পরিবারের কাছে আমার কম্বলটি গচ্ছিত রেখে এক বৈরাগীর আড্ডায় গিয়ে উঠলুম। সে-লোকটা আজ আটদিন আগে এসে একটি তাঁবু দখল ক'রে বসেছে এবং দিব্য একটি সংসার রচনা করেছে। ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানী বুড়োর কাছ থেকে আমি ধূমপানের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেছিলুম, এবার সেইটির দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে বৈরাগী এবং আমি এক মুহূর্ত্তেই পুলকিত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে গেলুম!

কলকাতা থেকে যে-পরিচ্ছদটি চড়িয়ে বেরিয়েছি, সেটির দিকে আর তাকানো চলে না। ধুলা, বালি, মাটি, অপরিচ্ছন্নতার দাগ, ছিন্ন জীর্ণতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি বরাবরই সংস্কারমুক্ত; তা'র সঙ্গে এলোমেলো ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল,—সুতরাং ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে বৈরাগী যে আমার দিকে এক একবার তাকিয়ে হাসবে, এতে আর বিচিত্র কি? লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ধূমপানে, ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে নয়। এক সময় প্রশ্ন করলুম, এবার কোন্ চুলোয় যাবে, বোরেগী?

সে বললে, তোমার পিছু পিছু!

বললুম, তোমাকে দেখলে আমার বাড়ীর লোক ঝেঁটিয়ে তাড়াবে।

লোকটা হাসলো, তারপর জড়িত কণ্ঠে বললে, ঝেঁটিয়ে ফেলবে না হয় জঞ্জালে, বেশ ত, একটা জায়গা ত মিলবে!

তোমার কি কেউ নেই?

লোকটা বললে, বেশি ক'রে পান খাওয়ালে আমার সব কাহিনী বলবো।

লোকটাকে পান খাইয়েছিলুম বটে, তবে তা'র কাহিনী আর আমার শোনা হয়নি। তা'র সঙ্গে সেদিন আমার সারাদিনই কাটলো, এবং সন্ধ্যার দিকে অনেক পরিশ্রমের পর তাকে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত ক'রে খাওয়ালুম। কিন্তু কাঠ-কুটো সংগ্রহ ক'রে মালসাভোগ তৈরী করতে গিয়ে আমাকে আর কিছু কালিঝুলি মাখতে হোলো। টুনুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবার যখন কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে ভদ্রসমাজের যোগ্য হবার কোনো কারণ দেখিনে। অতএব সেই হোগলার তলায় ধুলামাটির উপর কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে সেদিনকার মতো প'ড়ে রইলুম নির্বিকারভাবে।

সকালবেলা কপিলের মন্দিরের পাড়া থেকে যখন চা খেয়ে ফিরলুম তখন আন্দাজ করতে পারি আটটা বেজে গেছে। হোগলার তলায় এসে দেখি, লোকটা আমার ছোট্ট পুঁটলিটি খুলে ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে ইতিমধ্যেই ব'সে গেছে। বললুম, এর মানে কি, বোরেগী?

বৈরাগী বললে, খুব সোজা! তোমার আছে, আমার নেই—তাই তোমার থেকে নিচ্ছি?

চেয়ে নিলে না কেন?

চাইলে তোমরা দাও না, তাই কেড়ে নিই, না ব'লে নিই! লক্ষ্মী দাদা, এবার একটু পান খাওয়াও, তোমার পায়ে পড়ি।

বললুম, আমার খরচে কাল থেকে তুমি প্রায় বারো আনার পান খেয়েছ, তা জানো?

লোকটা বললে, ও, তাই নাকি? এবার তা হলে পুরোপুরি এক টাকায় পুরিয়ে দাও! আরে ভাই, যত দেবে ততই পেতে থাকবে, বুঝলে না?—শোনো, একটা কথা বলি। এই ব'লে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললে, এখান থেকে যখন যাবো, কী ক'রে যাবো জানো ত? স্রেফ হোগলার তলায় একটি দেশালাইর কাঠি!

হা হা ক'রে সে হেসে উঠলো।

বললুম, কী সর্বনাশ! তুমি এমন সাংঘাতিক লোক?

নিশ্চয়! আমি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য—সাবধান!

স্বামী বিবেকানন্দ!

লোকটা বললে, নিশ্চয়! স্বামীজী বলতেন, জড়তা নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকার চেয়ে বরং অনাচার ক'রো, তা'তে কর্মপটুতা প্রকাশ পাবে! ওই ত' আমার মন্ত্র! যাও, যাও, শিগগির পান আনো—

আমি তখনই পান আনতে ছুটলুম।—

আজ অমাবস্যা। আজই পুণ্যাহ। সহস্র সহস্র লোক আজ স্নান করবে। যাত্রীর বন্যা এতই বেড়ে চলেছে যে, তাদের চাপে বহু তাঁবু ইতিমধ্যেই কাৎ হয়ে দুমড়ে মচ্‌কে গেছে। লোকে মাঠের উপরেই ব'সে যাচ্ছে! মেলাটা নাকি এইভাবে থাকবে অন্তত সপ্তাহ-খানেক। কাল থেকে যে-পথের চিহ্নটা ধ'রে আমি আনাগোনা করছিলুম, সে-পথটা যাত্রীদের ভীড়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে সেই সাগরের কিনারা ধ'রে ঘুরে গিয়ে মন্দিরের দিকে যেতে হবে। যা দেখবার আর জানবার অথবা দর্শন করবার—তা আমার হয়ে গেছে। আজ আমি যে-কোনো জাহাজ পেলেই সাগরদ্বীপ ছেড়ে পালাবো!

জলের ধার দিয়ে যাবার সময় সহসা থমকে দাঁড়ালুম। শত শত নৌকার ভিড়ের ভিতর দিয়ে দূরে একখানা বড় নৌকার দিকে আমার দৃষ্টি ছুটে গেল। বৈষ্ণবের উপরে যখন ঠাকুরের 'ভর' হয়, তখন একটা হর্ষ-কম্প-স্বেদ-পুলকের ভাব দেখা দেয়। দূরের একখানা নৌকার দিকে চোখ পড়তেই তেমনি আমার একটা রোমাঞ্চ দেখা দিল! ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানা আসছে এদিকে এগিয়ে!

টুনু!

নিজের দিকে তাকিয়ে আমি আর কিছু চিন্তা করবার সময় পেলুম না। ঠিক যে-অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলুম, সেই অবস্থায় জলে নেমে ডুব দিলুম। নিজেকে আগে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করলে কিছুতেই লোকসমাজে আর দাঁড়াতে পারবো না। টুনু যেন আমার সমস্ত লজ্জাকে বহন ক'রে এনেছে!

এগারো বছর আগেকার কথা বলছি, কিন্তু তা'র আগে টুনু আমার অনেকদিনের বন্ধু। এই এগারো বছর পরে গঙ্গাসাগরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি স্পষ্ট আর আমার মনে নেই। সম্ভবত দোলায়মান নৌকার উপর থেকেই উচ্চ কৌতুকের কণ্ঠে হেসে উঠে টুনু আশপাশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাদের নৌকা এসে ঘাটে লাগলো অদূরে। টুনুরা বড়লোক, তাদের পোষাক-আসাকে আর জিনিস-পত্রে আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান। আমি আমার জল-ঝরা মাথা আর সপসপে কাপড় নিয়ে তাঁদের নৌকার কাছে এগিয়ে গেলুম। রায় বাহাদুর নৌকা থেকে নেমে বললেন, কই হে, বাসা ঠিক করেছ কোথায়?

হেসে বললুম, আগে হুকুম করেননি ত?

পিসিমা বললেন, সমুদ্দুরেই ভাসতে হবে দেখছি!

টুনু জিনিসপত্র সমেত নেমে বললে, তুমি গেল বছর পশুপতিনাথ গিয়েছিলে, কই আমাকে বলোনি ত?

বললুম, যেদিন গোল্লায় যাবো সেইদিন তোমাকে আগে খবর দেবো।

পিসিমা এবং রায় বাহাদুর দুজনেই হাসলেন। নৌকাওয়ালা জিনিসপত্র নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চললো। টুনু বললে, তুমি উঠেছ কোথায়? চলো আমাদের সঙ্গে। জ্যাঠামশাই, আপনি ওকে চোখে চোখে রাখুন, নৈলে কখন্ গা ঢাকা দিয়ে পালাবে তা'র ঠিক নেই।

জ্যাঠামশাই বললেন, তা'র চেয়ে ওকে পুলিশের জিম্মায় রাখো, তা হ'লে আর হারাবে না।

আমরা সবাই উচ্চরোলে হাসতে লাগলুম! আমি বললুম, তবে হাঁ।, পিসিমা যদি সেই রকম ধোঁকার ডালনা রেঁধে খাওয়াতে পারেন, তবেই কাছাকাছি থাকতে পারি!

পিসিমা বললেন, তা'র চেয়েও ভালো জিনিস এনেছে তোমার টুনু। বাঁধা কপি, হিংয়ের বড়ি আর বেগুন, ঝোল রেঁধে দেবে তোমার পছন্দসই।

টুনু মাথার ঘোমটা একটু টেনে বাঁকা চোখে চেয়ে বললে, খাওয়ার লোভ না দেখালে তোমার মন পাওয়া ভার! জ্যাঠামশাই, আপনার হুঁকো-কল্‌কে সাবধান, ছিঁচকে চোরের উৎপাত হ'তে পারে।

জ্যাঠামশাই যেন শুনতে পেলেন না,—পিসিমা হেসে উঠলেন। চোখ রাঙিয়ে টুনুকে আমি নিঃশব্দে শাসন ক'রে দিলুম।

রায় বাহাদুরের আলাপী লোক ছিল কর্তৃপক্ষের আপিসে। সুতরাং টুনুরা হোগলার একখানা চালা পেয়ে গেল মনের মতন। তিন দিন দিব্য এখানে থাকা চলবে। পিসিমা বললেন, ধুলো পায়ে তিনি কপিলের মন্দির দর্শন করবেন। সুতরাং আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। টুনু জিনিসপত্র গুছিয়ে রায় বাহাদুরের বিশ্রামের জায়গা করতে লাগলো।

মন্দিরে কপিল মুনির মূর্তি এবং অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন সেরে পিসিমাকে তাঁদের চালার দরজা দেখিয়ে দিয়ে আমি ভিজা কাপড়ে চ'লে গেলুম। কথা রইলো, আবার এখুনি আসছি। ভুলে গিয়েছিলুম, এখন মনে প'ড়ে গেল, আজই ১৩ই জানুয়ারী! টুনু আমাকে আজকেই উপস্থিত থাকতে লিখেছিল,—আমি এসেছি একদিন আগে। টুনুর সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ কম, বছরে দু' তিনখানা মাত্র—কিন্তু আমার অনেক খবর তা'র কানে গিয়ে পৌছয়। আজ টুনুর সঙ্গে আমার প্রায় আড়াই বছর পরে দেখা। টুনুরা থাকে রাজসাহীতে। রাজসাহীতে মস্ত বড় বাড়ী ওদের। বরাবর দার্জিলিঙ থেকে ফিরতি পথে ওদের বাড়ীতে গেছি, কতবার গিয়ে থেকেছি। টুনু বলতো, পরিচয় নেই, আত্মীয়তা নেই,—এমন লোকের সঙ্গে আমার প্রথম বন্ধুত্ব,—সে তুমি!

আমি হেসে বলতুম, এ কথা কোথাও বলো না যেন—তা হ'লে নিন্দে হবে দুজনের!

টুনু বলতো, মনে রেখো আমরা উত্তরবঙ্গের মেয়ে, মিথ্যে নিন্দেয় ভয় পাইনে।

আমার বয়স তখন অনেকটা কম। হাসিমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতুম, হায়রে, নিন্দেটা যদি মিথ্যেই হোতো!

টুনু বোকা ব'নে গিয়ে মুখখানা একটু অসহায় ক'রে তুলতো, আর আমি বীরবিক্রমে তা'র নাকের ডগার উপর দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতুম। সে অনেকদিনের কথা!

বৈরাগীকে প্রচুর পরিমাণে পান খাইয়ে ওরই মধ্যে একটু ভদ্র পোষাক চড়িয়ে আমি খুঁজতে খুঁজতে এলুম রায় বাহাদুরের চালায়। দেখলুম ইতিমধ্যে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে মিঠে জল আনিয়ে পিসিমা রান্নায় লেগেছেন। টুনু স্নান সেরে বেশ ভব্যযুক্ত হয়ে পিসিমাকে সাহায্য করছে। রান্না অবশ্য সামান্যই, তবে বেগুনবড়ির ঝোলটা পিসিমাই রাঁধলেন। আমার দু' দিন প্রায় আহারাদি নেই, সুতরাং ভোজনলোলুপতা কিছু ছিল। টুনু আমাকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করছে, কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করছে আমার ভিতর থেকে, তা'র কথার আঘাত কোন্ পথ দিয়ে আসবে—তাই ভেবে আমিও এক একবার আড়ষ্ট বোধ করছি।—রায় বাহাদুর বললেন, তুমি ত' একে একে প্রায় সব তীর্থই ঘুরলে, কি বলো?

বললুম, এখনও কত বাকি!

তিনি বললেন, তুমি সাঁতার শিখলে না, অথচ জলে জলে বেড়িয়ে নিলে খুব। আচ্ছা, ভ্রমণ তোমার কবে থেকে প্রথম ভালো লাগে হে?

বললুম, ঠিক বলা কঠিন, তবে ছোটবেলায় রামায়ণ, মহাভারত শুনতে শুনতে আমি যেন পথ-ঘাট খুঁজে পেতুম। মা-দিদিমা, এঁদের কাছেই মন্ত্র পাই।

রায় বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর শুধু বললেন, আশ্চর্য!

টুনু ব'লে উঠলো, কি আশ্চর্য, জ্যাঠামশাই ?

না, কিছু না—এই মানে ওর মা-দিদিমার কথাই ভাবছিলুম, মা।

টুনু বললে, আপনি উড়নচুড়ে লোককে ভারি আস্কারা দেন জ্যাঠামশাই !

আমরা হেসে উঠলুম। পিসিমা বললেন, এবার ঠাঁই ক'রে দাও।

আমাদের আহারাদির পর রায় বাহাদুরের তামাক সেজে দিলুম, তারপর টুনুকে প্রশ্ন করলুম, হঠাৎ আমাকে ছুটিয়ে গঙ্গাসাগরে আনলে কেন বলো ত ?

টুনু হাসিমুখে বললে, বেগুন-বড়ির ঝোল ত' খেতে পাও না, তাই ডেকে এনেছি। ঝকমারি করেছি।—দাঁড়াও, হোটেলের ভাত খেয়ে যেন পালিয়ো না, আমাকে দর্শন করিয়ে আনো। আমরা শিগগিরই আসামের দিকে যাবো, কিন্তু তা'র আগে কলকাতায় তোমার মা'র সঙ্গে একবার দেখা করবো—

বললুম, সর্বনাশ !

টুনু বললে, যতই মানা করো, আমি যাবো। তাঁর সঙ্গে কথা আছে।

কি প্রকার কথা ?

রায় বাহাদুর বললেন, তোমার ঘরে গোপনে সিঁধ কাটার মন্ত্রণা—বুঝতে পেরেছ ?—এই ব'লে তিনি দিব্য আরামে চোখ বুজে তামাক টানতে লাগলেন।

টুনু বললে, ও সব কথাই একটু দেরিতে বোঝে··· ভারি সরল !

বললুম, বাঃ, এই সব গালমন্দ দেবার জন্যেই বুঝি আমাকে ডেকে আনলে ?

টুনু আমার সঙ্গে চললো মন্দির দর্শনে। আমি অনেকটা ক্লান্তি বোধ করছিলুম। টুনুর অনর্থক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সেই ছিল আমার ভয়। টুনুকে দেখে আনন্দ পাই, তা'র অনুরোধ এড়াতে পারিনে—এ কথা সে জানে। কিন্তু টুনু হোলো ঘরোয়া, গৃহসেবিকা, টুনু বাঁধা ছকের মধ্যে আনাগোনা করে, টুনু কিছু খোঁজে না, কিছু কঠিন ক'রে চায় না। কিছু না পেলে প্রতিবাদ করে না,—বরাবর শুধু দেখে এলুম তা'র একটি অম্লান সরলতা! টুনু জানতো, আমি কিসে ক্লান্তি বোধ করি।

মন্দিরে গিয়ে টুনু অনেকক্ষণ কাটালো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, এক সন্ন্যাসী মাটির গর্তে ঢুকে উপরের মুখটা বন্ধ ক'রে ভোজবাজি দেখাচ্ছে। সবাই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে চারদিকে। কতক্ষণ পরে টুনু বেরিয়ে এলো। বললে, তুমি দর্শন করেছ ?

হেসে বললুম, দর্শন করতে এসেছি তোমাকে।

টুনু মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, আমি ত তোমার কোনো ক্ষতি করিনি যে, তুমি আমার মন ভোলাতে চাও ? চলো যাই—

সমুদ্রের সীমানা এ দিকটায় বাঁক নিয়েছে। এখান থেকে যতদূর দেখা যায়, জল ঘোলা। দূরে দূরে এক আধখানা জেলে নৌকা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। একটা হোগলার চালার কাছে এসে টুনু বললে, এবার তোমার সঙ্গে আর অনেকদিন দেখা হবে না,—হয় ত হবেও না আর।

আমি বললুম, পুরুষ মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখো, ইচ্ছে হলে তোমাকে খুঁজে বা'র ক'রে নেবো।

কেন ?

বললুম, এমনি···অকারণে !

টুনু বললে, আমি কিন্তু তোমাকে অকারণে ডাকিনি। আমি শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে তোমার সাধুর কথা!

বললুম, সাধুর কথা আরম্ভ করবো কোথা থেকে তাই ভেবে পাইনে।

টুনু বললে, তোমার সব কথা যদি সত্যি হয় তবে সাধুকে বলতে হবে অসাধারণ মেয়ে! সাধুর আসল নাম শুনতে ইচ্ছে করে!

বললুম, সাধু নিজেই প্রকাশ করতে চায় না তা'র আসল নাম।

সাধুর বয়স কত ?

জিজ্ঞেস করিনি!

টুনু ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে বললে, দেখতে সুশ্রী ?

হেসে বললুম, টুনু, তুমি কি আমার ভেতরের লোভটাকে খুঁজে বা'র করতে চাও ? তা' হ'লে বলি, সাধু দেখতে কেমন, এ আমি আজো বিচার করিনি !

টুনু বললে, সাধু এখন আছে কোথায়?

বললুম, সে থাকে এক সাম্যবাদী দলের আড্ডায়—মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়।

তা'র আত্মীয়স্বজন? মা বাপ?

সবাই আছে। সেও বড়লোকের মেয়ে!

টুনু প্রশ্ন করলো, সাধু বিয়ে করেছে?

বললুম, স্পষ্ট জবাব চেয়ো না।

টুনু যেন এরপর অসংখ্য প্রশ্ন আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝ পথে সহসা থেমে সে বললে, তোমাকে আর আমি বিরক্ত করবো না। তবে এই কথাটা আমার মনে রেখো—

তা'কে থম্‌কাতে দেখে বললুম, কি?

না, থাক্।—টুনু যেন মুখে তালা চাবি বন্ধ ক'রে দিলে। আমি হাসলুম। হেসে বললুম, আচ্ছা, তোমার কৌতূহল মেটাবো, সাধুর গল্পটা ছোট্ট ক'রে বলি।

অধীর অসহিষ্ণু টুনু নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

দার্জিলিঙের এক হোটেলে আছি। রাত দেড়টার পর বেরোলুম টাইগার হিল্‌-এর পথে। উদ্দেশ্য, শেষ রাত্রির সূর্যোদয় দেখা উপর থেকে তিস্তা উপত্যকার নীচে। সেদিন জ্যোৎস্না, হেমন্তকাল। 'ঘুম' থেকে সেনচলের রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে টাইগারের রেস্ট হাউস পেরিয়ে একেবারে চূড়ায় উঠে অনেকের সঙ্গে দাঁড়ালুম। কে কোন্ জাত—চেনবার জো নেই। সবাই গরম কাপড়ে আর টুপিতে মোড়া…ভারি শীত। আশ্চর্য, সেদিনের শেষ রাত! ভোরের আগে আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় তিস্তার দিগন্তের সীমানায় মাটি চৌচির হয়ে ফাটল ধরলো, আর পৃথিবীর হৃদ্‌পিণ্ড থেকে উঠতে লাগলো ভলকে ভলকে লাল, নীল, সোনালি, বেগুনী রক্ত, সেই রঙিন রক্তের বন্যায় স্নান ক'রে উঠলো একটি ছোট্ট আগুনের গোলা,—পৃথিবী তখন অন্ধকার, ওরা সেটাকে বললে সূর্য! সেই ছোট্ট অগ্নিপিণ্ড থেকে একটি রশ্মি ছুটে এলো আমার কপালে, আর একটি ছুটে গিয়ে বাণ মারলো গৌরীশৃঙ্গের ললাটে। গৌরীশৃঙ্গের ললাট থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি আবৃত্তি করলুম—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!"

টুনু বললে, তারপর?

ভোরের আলোয় পিছন থেকে একটি মেয়ে বললে, কবিতাটা কি সব আপনার মুখস্থ আছে?

রেস্ট হাউসে নেমে এসে তা'কে সব কবিতাটা শোনালুম। সাধুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। সেই আদর্শ থেকে সাধু আজো নামলো না। গৌরীশৃঙ্গে বাসা বাঁধলেই তা'কে মানায়।

গল্প শুনে টুনু চুপ ক'রে রইলো। তা'র মুখে কোনো উদ্বেগ নেই, রেখা নেই, কোনো ভাবের আভাস মাত্র নেই। মনে হোলো প্রশ্নের জবাব সে সমস্তই পেয়ে গেছে। খানিক পরে সে বললো, চলো উঠি, বেলা প'ড়ে এলো।

লোকজনের মাঝখানে এসে টুনু একবার ফস ক'রে বললে, আমি কি ভাবছিলুম জানো?

হাসিমুখে তা'র দিকে তাকালুম। টুনু বললে, জলের ওপর দাগ পড়ে না এই কথাই জানতুম, সাধু যে দাগ টানতে পারলো এ জন্যে তাকে আমার প্রণাম জানিয়ো!—

এ সেই জল, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে! আমার শিশুকালের সেই করাল চক্ষু কপিলমুনি! সেই গোমুখী থেকে ছুটে আসা গঙ্গা, সেই গঙ্গা এসে আত্মসমর্পণ করেছেন এখানে ভৈরবের আলিঙ্গনে। আমিও যেন আমার যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম বহুকাল আগে, ইতিহাসের অতীত যুগে, পৌরাণিক ভারতের পথ ধ'রে। আমি এসেছি গঙ্গার সহচর, গঙ্গার অগ্রগামী—আমারই হাতে যেন শঙ্খ ছিল! ছোটবেলায় মা-দিদিমার কাছে যে-ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছিলুম, এখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখছি গঙ্গাসাগরের দিগন্ত জুড়ে' তা'র সার্থকতা। দেখলুম, সমস্তটাই শান্ত, পরিতৃপ্ত,—কপিলের চেহারা প্রসন্ন। কিন্তু ভাগীরথ? তা'র কাজ

ফুরোবার পরও সে কি ক্লান্ত নয়? অমৃতের আস্বাদে তা'র কি প্রয়োজন নেই? গঙ্গাকে সে পথ দেখিয়ে আনলো,—তারপর? তা'র পথ কি অকূলে? তা'র শঙ্খ কি শুদ্ধ হ'য়ে যাবে?

পরদিন টুমুদের সঙ্গে আর দেখা করিনি। সকাল বেলাটা বৈরাগীর সঙ্গে ধূমপানের আসরে কেটে গেল। গত রাত্রে সমুদ্রের একটা ঢেউ এসে আমাদের কতকগুলো হোগলা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অমাবস্যার কোটাল ছিল।

বেলা তিনটে লাগাৎ ডায়মণ্ডহারবার যাবার স্টীমার পাওয়া গেল। মনে পড়ছে কলকাতায় ফিরেছিলুম শেষ রাত্রের দিকে। পরদিন মধ্যাহ্নের পর একটা মস্ত ভূমিকম্প হয়েছিল। সেটি ইতিহাসে প্রখ্যাত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের বিহার ভূমিকম্প!

রাশিয়ার মেয়ে

ওয়াই ইয়ানোভস্‌কি

অনুবাদক: নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ওয়াই ইয়ানোভস্‌কি বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যে ছোট গল্পে বেশ কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। প্রতিপাদ্য রচনাটী আধুনিক রাশিয়ার যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ যুক্রেনের পটভূমির উপরে রচিত হয়েছে। গল্পের দিক থেকে যত না হোক, আজকের দিনের চিত্র হিসেবে এর একটী চমৎকার সার্থকতা আছে, ঠিক সেই জন্যেই 'প্রবর্ত্তক'এর পাঠক-পাঠিকার জন্যে এটী বিশেষ ভাবে ভাষান্তরিত করা হ'ল।—অনুবাদক]

বিস্তৃত অরণ্য-ভূমির উপরে হিম-নিষিক্ত প্রত্যুষ নামছে তখন। সৈন্যরা ট্যাংক-কমাণ্ডারের মেশিনের উপরেই সযত্নে মেয়েটীকে এনে বসিয়ে দিলে। হাল্‌কা, প্রায় পালকের মতো নরম তার শরীর। সমবেত সৈন্যেরা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

চারদিকে ভালো ক'রে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো সে, এখনো এদিকে ওদিকে অস্পষ্ট অন্ধকারের আবরণ ঝুলছে। প্রায় পাঁচশো সৈন্য সেই ট্যাংকটাকে ঘিরে পাথরের মতো তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হোল, সৈন্যদের মধ্যেও যেন একটা শিহরণ এসেছে। মনে পড়ছে তাদের যুদ্ধহীন নীরব সেই সব শান্ত দিনগুলিকে। মেয়েটীর মুখের প্রশান্ত কমনীয়তার দিকে চেয়ে তাদের মনে পড়ছে মাকে, মনে পড়ছে বোনকে মনে পড়ছে প্রিয়তমাকে—যাদের না হোলে একটী মুহূর্ত্তও চ'লতো না!

আস্তে মেয়েটী ট্যাংকটার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপরে শালের নীচে ঢাকা তার দুখানি হাত এবারে বের ক'রে সাম্‌নের দিকে সে মেলে ধরলো।

আবার একটা কম্পিত শিহরণ সমস্ত সৈন্যদলটীর উপর দিয়ে ব'য়ে গেলো যেন, অবাক্ হোয়ে তারা দেখলে, মেয়েটীর একটীও হাত নেই—দু'খানি হাতই ব্যাণ্ডেজ করা—কাটা!

সমস্ত বন যেন কেঁপে উঠলো একবার—মনে হোল সমস্ত অরণ্য এই মুহূর্ত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লো। পাখীরাও যেন ভোরের গান গাইতে ভুলে গেলো—তারাও সমবেদনা জানাচ্ছে আজকে!

কমরেড—মেয়েটী শালের নীচে তার সেই কাটা হাত দুখানি আস্তে আবার লুকিয়ে ফেললে, তারপরে বললে, আমি 'পোলটোভা' প্রদেশের 'খরোল' জেলা থেকে আস্‌ছি, সেখানেই আমার বাড়ী। সেই আমার জন্মস্থান। গত গ্রীষ্মের সময়ে আমার সতেরো বছর বয়েস পূর্ণ হোয়েছিল মাত্র।

সংগীতের মতোই তার কণ্ঠস্বর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সৈন্যরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে শুনতে লাগলো:

আমার নাম 'ম্যারিকা'। আমি আর আমার মা খুব

সুখেই সেখানে বাস করতাম। বাড়ীর কাছেই ছোট্ট একটী স্কুলের ছাত্রী ছিলাম তখন। বড়ো আনন্দে, বড়ো সুখেই তখন আমাদের দিন কাটতো।

তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর সেই সমস্ত বনভূমির মধ্যে সংগীতের মতো যেন বেজে বেজে উঠতে লাগলো। তার কথা বলার ভংগী তার প্রত্যেকটী শব্দ-উচ্চারণ-রীতি মুগ্ধ করলো সকলকে। স্তব্ধ-বিস্ময়ে তারা মেয়েটীর দিকে চেয়ে রইলো।

আমার এই হাত—ম্যারিকা বলতে লাগলো—আহা! আমার এই হাত ছিল সোণার হাত—তারা যে কতো কাজ ক'রেছে তার শেষ নেই, যেমন বাইরে তেমনি ঘরে। তারা সুতো কাটতে পারতো, রান্না করতে পারতো, ইস্ত্রি করতে পারতো, দুধ দুয়ে আনতো, আর—আর আমার মাকে তারা আদর করতো! আহা, আমার মা, আমার মা,—আমার মা আমাকে কত ভালোবাসতেন!

তারপরেই তার কণ্ঠস্বর আরো উগ্র হোয়ে উঠলো, চীৎকার ক'রে বললে: আজ যদি আমার সেই হাত-দুটোকে ফিরে পেতাম একবার—আমার সেই দুখানি হাত, তা হ'লে—তা হ'লে আমি তাই দিয়ে হতভাগা জার্ম্মানদের চূর্ণবিচূর্ণ করতাম। ধ্বংস করতাম তাদের—তাদের আমি প্রতিশোধের তিক্ততম পাত্র মুখের কাছে তুলে ধরতাম। হায়! এখন আমার সেই হাত দুটী জার্ম্মানীর মাটীতে কবরিত। তারপরেই কণ্ঠস্বর নামিয়ে পুনশ্চ বললে, শোনো ভাইরা, তোমাদের সংগে আমাকে নিয়ে যাও—আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

সমস্ত বনভূমির মধ্যে যেন একটা মর্ম্মরধ্বনি উঠলো। সৈন্যরা তার দিকে নিশ্চল, নিষ্পলক চেয়ে রইলো।

তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, আমি কারুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে চাইনে। আমি কেবল আমার বর্ত্তমান অনুভূতিগুলিকে বর্ণনা ক'রে যাচ্ছি।

আমার দলে যে সব মেয়েরা ছিল, তারা আমাকে 'ম্যারিকা' ব'লে ডাকতো না, তারা বলতো 'ম্রিকা'। আমাদের ঐ অঞ্চলে 'ম্রিকা' শব্দটীর অর্থ হোচ্ছে 'স্বপ্ন-বিলাসী'। তারা আমায় ঐ ব'লে ডাকতো তার কারণ আমার মতো স্বপ্নবিলাসী ঐ গ্রামে বোধহয় আর কেউ ছিল না। আমি অনবরত স্বপ্ন দেখতাম আর শূন্যে নিপুণভাবে চলতো আমার সৌধ-নির্ম্মাণের কাজ।

তারপরে এলো পরিবর্ত্তন। যুদ্ধ বাধলো একদিন। নানা রকম কাজে আমরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম।

মনে পড়ে, আমরা কয়েকজনে চ'লে গেলাম ক্রেম্‌লিন্‌-এ, সেখান থেকে আমাদের কৃতিত্বের জন্যে দেওয়া হোল পদক। কালিনিন্ নিজে এসে আমার সংগে 'হ্যাণ্ডসেক্' ক'রেছিলেন, অবারিত উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি আমাদের কাজে।

মনে আছে বাড়ী ফিরে এসে মেডেলটি আমি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিলাম।

একদিন মা জিজ্ঞেস করলেন, যখন সকলে যুদ্ধে এগিয়ে গেলো, তখন তুই কেন পিছনে পড়ে রইলি মা? তুইও গেলি না কেন?

আমি মনে মনে তখন হেসেছিলাম। আমাদের এ যুদ্ধনীতির কতোটুকুই বা বোঝেন মা। তাঁর মাথার চুলগুলি ধুয়ে দিচ্ছিলাম সেদিন, কোনো উত্তর দিইনি।

উত্তর দিচ্ছিস্ না কেন? মা ব'লেছিলেন।

—মা, অবশেষে আমি বললাম, আমার এখন এইখানে থাকা বিশেষ দরকার; সেই রকমই নির্দেশ পেয়েছি। জার্ম্মানরা যাতে একেবারে ধ্বংস হোয়ে যায় তারই চেষ্টা চল্‌ছে আমাদের মা!

সমস্ত বনের উপর দিয়ে আবার হু হু ক'রে একটা বাতাস ব'য়ে গেলো।

ম্যারিকা বল্‌লে, আর হঠাৎ এই সময়েই দলের থেকে আমার ডাক এলো। মাকে একলা গ্রামে রেখেই তাদের সংগে বেরিয়ে পড়তে হোল। বেরিয়ে পড়লাম অনেক দূরে বিস্তৃততরো কর্ম্মক্ষেত্রে।

একটু থেমে বললে, আমার একটা জার্ম্মাণ 'টমি গান' ছিল। বেশীর ভাগ সময়েই সেটা নিয়ে ঘুরতাম। আর কেবলি ভাবতাম কখন হতভাগাদের ওপর ঝড়ের মতো গিয়ে পড়বো—শোধ নিতে পারবো তাদের অত্যাচারের।

কোনো কোনো দিন কমাণ্ডার আমাকে চটিয়ে দেবার জন্যে হাসতে হাসতে বলতেন, কি হে ম্রিকা, তুমি তো বেশ স্বপ্ন দেখতে পারো, বলতো এই-এই গ্রামে কতোগুলো জার্মান এসেছে—আর কি ভাবে এগিয়ে গেলে তাদের আমরা একেবারে শেষ ক'রে দিতে পারবো? আর তাদের মেশিন গান, বন্দুক সব কোথায় থাকে তাও আমাদের বলে দাও তো দেখি!

আমি খুব রেগে যেতাম, বলতাম দেখুন, এটা মোটেই ঠাট্টা করবার সময় নয়, আমার এখন স্বপ্ন দেখবার অবসর নেই—যখন দেশে শান্তি ছিল তখন ও-সব ভাবতাম। কমরেড কমাণ্ডার! আমি এখন স্কাউট, আর আমার নাম ম্রিকা নয়—আমার নাম ম্যারিকা!

তারা আমার এই সব কথায় হো হো ক'রে হাসতো। সত্যি এটা ঠিক, সেই গেরিলা দলের মধ্যে সকলেই আমাকে খুব বেশী ভালবাসতো।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এলো জার্মানরা আমাদের গ্রাম-আক্রমণ ক'রেছে। মনটা মুহূর্ত্তে দমে গেলো। কেবলি চেষ্টা করতে লাগলাম কি ক'রে এই হতভাগাদের আমার গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবো। আমাদের গ্রামটী চমৎকার। আমার জন্মভূমি ব'লেই যে শুধু বলছি তা নয়, যে-কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই এটা জানা যাবে।

একদিন আস্তে আস্তে উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠে এলাম। তখন রাত্তির। সবে চাঁদ উঠেছে! আমি সেখান থেকে আমার জন্মভূমির দিকে চেয়ে রইলাম। চারদিক নিস্তব্ধ—কুটীরগুলি গভীর অন্ধকারের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হোল। পাথরের মতো স্তব্ধ হোয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মার কথা মনে পড়লো, তাঁকে দেখবার জন্যে মন আমার ভয়ানক অস্থির হোয়ে পড়েছে, ভাবলাম, চুপচাপ গ্রামের মধ্যে আমি ঢুকে পড়ি, তারপরে যা আছে কপালে তাই হোক। মা কেমন আছে, তা আমাকে জানতেই হ'বে, যে ক'রে হোক তা আমাকে জানতেই হ'বে।

আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম। আমার টমি গানটা আমি সযত্নে ঢেকে নিয়ে চললাম, তারপরে আমার বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। একটা কুকুরও ডাকলো না কোথাও, কোনো একটা প্রহরীকেও দেখতে পেলাম না। আমি খানিকটা হতচকিত হোয়ে গেলাম—এসবের মানে কি? অবশেষে বড়ো রাস্তাটার উপরে এসে পড়লাম। একটু এগিয়ে যেতেই আমাদের বাড়ীটাকে চিনতে পারলাম। সেই ছোট্ট উঠোন, আর ঐ পিয়ার গাছটা! সব আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। একটু থামলো ম্যারিকা, তারপরে বললে: দেখলাম আমাদের দরোজাটা সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে—আর দূর থেকে মনে হোল, কে যেন সেখানে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দৌড়তে আরম্ভ করলাম। আমি সেই চাঁদের আলোতে মাকে স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলাম—ভয়ংকর কান্না পাচ্ছিলো আমার, আস্তে আস্তে ডাকলাম, মা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার জন্যে? আমি এসেছি 'মাগো! আমি আরো জোরে ছুটতে লাগলাম।

এসে দেখি মা আমার খালি মাথায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত দুটী পিছনের দিকে একত্রিত। 'মা'—আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম। মা আমি এসেছি ব'লে দুই হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু এ কী! মাকে আমার দরোজার উপরে ফাঁসী দেওয়া হোয়েছে! তিনি ঝুলছেন! সমস্ত শরীর তাঁর এখন ঠাণ্ডা। পাথরের মতো হিম!

বিরাট অরণ্যভূমি আবার যেন থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো! একটা দমকা বাতাস ব'য়ে গেলো তাদের ওপর দিয়ে।

কিন্তু আমি এখন কি করি? ম্যারিকা আবার বলতে আরম্ভ করলো: কয়েক মুহূর্ত্ত পাথরের মতো স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। তারপরে মাকে নামিয়ে নিলাম দরোজা থেকে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। আমি নিজে মাকে আমাদের বাগানের মধ্যে নিয়ে গেলাম, তারপরে কবর দিলাম তাঁকে। তারপরে হাঁটতে লাগলাম।

একটু দম নিয়ে ম্যারিকা এবার ফেটে পড়লো, শোনো ভাইরা, আমার মধ্যে দিয়ে আজ তোমরা সমস্ত য়ুক্রেনকে অনুভব করো, মনে রেখো আমার মধ্যে দিয়ে সমস্ত য়ুক্রেন আজ কথা বলছে—ভুলে যেও না, এর প্রতিশোধ যে ক'রে হোক তোমাদের নিতেই হ'বে। চীৎকার ক'রে বলো:

আমি কখনো জার্মানদের কাছে মাথা নীচু করবো না—আমি কখনো জার্মান হ'বো না।

আবার সমস্ত অরণ্য যেন বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

আমি ধরা পড়লাম, ম্যারিকা আবার বলতে আরম্ভ করলো: তারা আমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেলো—কতো জায়গায় যে আমাকে নিয়ে গেলো তার ঠিক নেই। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাদের সংগে আমাকে হাঁটতে হোত—যখন তারা 'হল্‌ট্' বলে থামতে বলতো তখন থামতাম, আবার চলতে বললে চলতাম।

গোরু আর ভেড়ার অধম ক'রে তারা রাখলো আমাকে—তারপরে তারা আমাকে জার্মানীতে নিয়ে গিয়ে ফেললে। সেখানে তাদের দেবতা হিটলারকে তারা কি ভাবে পূজো করে, তাও দেখলাম। আর শুনলাম লাউড স্পীকারের সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই অবিশ্রান্ত ক্ষিপ্ত চীৎকার।

বিশ্বাস করো ভাইরা, তাদের দেশে কোথাও কোনো সুন্দর জিনিষ আমার চোখে পড়েনি। কমরেড ট্যাংকমেন! তোমরা তাদের সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কথা একটুও বিশ্বাস কোরো না। আমি নিজের চোখে যা দেখে এসেছি তাই বলছি তোমাদের; বরং আমাদের গ্রামে এর থেকে ঢের ঢের বেশী শিক্ষা আছে—আছে অনেক বেশী সংস্কৃতির পরিচয়!

একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার ম্যারিকা বলতে আরম্ভ করলো:

আমাদের ক্রমশঃ সহরের মধ্যে নিয়ে আসা হোল। গাড়ীতে যারা মরে গিয়েছিল, তাদের তখনি তখনি ফেলে দেওয়া হোল। বাকী যাঁরা বেঁচে ছিল তাদের প্রকাশ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে আরম্ভ হোল নিলাম ডাকা। ভাবতে পারো, তোমরা এখন কোন্ শতাব্দীতে বাস করছো কমরেড? জার্মান হূনদের বর্বর অত্যাচারের সেই সব ঘটনা আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি—স্কুলে যেমন ইতিহাসে এ-সব কাহিনী পড়েছিলাম, সেই রকম মনে হোচ্ছিলো এখুনি আবার এরা 'জোহান্‌স্-হাস্‌কে' কোথাও থেকে টেনে বের করবে। আগুনে পুড়িয়ে মারবে তাঁকে। আবার বোধ হয় কোথাও থেকে টেনে বের করবে গ্যালিলিওকে; আর সেই রকম ভীষণ অত্যাচার করবে তাঁর উপরে। আমাদের প্রত্যেককে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তারা করবে ক্রীতদাস, কিন্তু ভাই, তোমরা এটা ঠিক জেনো, আমাদের দেশের লোক ক্রীত-দাস হ'বার জন্যে জন্মায়নি—জন্মায় না কখনো!

একটু থেমে চারদিকে চেয়ে আবার সে আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করলো, একদিন রাত্রে আবার জার্মান-ট্যাঙ্ক মাষ্টারের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সোজা য়ুক্রেনের দিকে রওনা হোলাম।

দু' সপ্তাহ ধ'রে আমি দৃঢ়ভাবে হাঁটতে লাগলাম। কেবল রাত্রিতে পথ চলতাম আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম। কেবলি মনে হোতে লাগলো, এবারে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছবোই। দিনের বেলা কোনো গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রায়ই আশ্রয় নিতাম। জার্মানরা রাত্রে বের হোতে ভয় পেতো; তবু—তবু তারা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে ধরে ফেললে। ধ'রে ফেললে, তার কারণ আমি তখন ভয়ানক ক্লান্ত হোয়ে পড়েছিলাম আর চলতে পারছিলাম না; অবশেষে যখন একদিন অজ্ঞান হোয়ে সারারাত একটা পথের ওপরে পড়েছিলাম, তখন তারা এসে আমাকে ধরলে।

তারপরে তারা আবার আমাকে তাদের সহরে নিয়ে গেলো এবং অন্য একটী ধনী লোকের কাছে আরো উচ্চ মূল্যে বিক্রী করলো আমাকে। এবারে নিতান্ত নির্দয় আর কঠিন শাসনে আটকে পড়লাম।

কিন্তু ভাই ট্যাঙ্কমেন, একদিন আবারো সুযোগ এলো। সেই হতভাগা প্রেমান্ধ জার্মানটাকে আমি ঘরে পুরে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে দম বন্ধ ক'রে মেরে আবার পালিয়ে আসতে পারলাম। তারপরে সোজা ছুটতে লাগলাম য়ুক্রেনের দিকে—আমার পা কেটে গেছে—আমার সমস্ত মুখ ক্ষত-বিক্ষত—নিরন্তর রক্ত ঝরছে! জামা কাপড় সমস্ত ছিন্নভিন্ন। তবু আমি তখন অনবরত দৌড়চ্ছি। দৌড়চ্ছি আর কাঁদছি, কাঁদছি আর দৌড়চ্ছি। কেবলি আমার চোখের ওপরে মার ছবিটা ভাসছে। আঃ য়ুক্রেন, আমার য়ুক্রেন, তুমি আমাকে নাও—তোমারি

কোলে গিয়ে আমি যেন মরতে পারি! গ্রহণ করো তোমার কন্যাকে—আজ সে পলাতকা—অনেক দূর থেকে সে আসছে—সে আসছে সেই শত্রুর দেশ থেকে, সে আসছে সেই নীল ডানিয়ুব নদীর তীর থেকে।

সমস্ত বন আবার যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁপে উঠলো - চারদিকে বেশ আলো ফুটে উঠেছে—পাখীরা ইতস্ততঃ উড়ছে আর চীৎকার করে ডাকছে মাঝে মাঝে।

আমার ভাইরা, ম্যারিকা নবতম উৎসাহে আবার যেন জলে উঠলো। বললে, হে আমার সাহসী ভাইরা, তোমরা শোনো, সেই হতভাগা জার্মানরা আমারই গ্রামে এসে আবার আমাকে ধরলে আর তাদের হাত থেকে পালিয়ে আসার শাস্তি স্বরূপ তারা আমার এই দুখানা হাত কেটে দিলে। তারা জানাতে চায় যে জার্মান শক্তির মধ্যে থেকে এভাবে পালিয়ে এলে তার শাস্তি কতো নিদারুণ হোতে পারে! আমাকে দেখে অন্য মানুষেরা যেন সাবধান হোয়ে যায়, ভবিষ্যতে আমার মতো দুঃসাহস আর না দেখায় তারা।

আর এখন, ব'লে 'ম্যারিকা' সমবেত জনতার দিকে চাইলে একবার, তারপর বললে, এখন আমি তোমাদের কাছে আমার এই অপমানিত লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, আমি আজ এসেছি মূর্তিমতি প্রতিহিংসার মতো—আমি চাই তোমরা জেগে ওঠো—হে আমার য়ুক্রেনের স্বাধীন ভাই-বোনেরা, তোমরা আবার জেগে ওঠো, উড্ডীন করো তোমাদের রক্ত-পতাকা—হে আমার জন্মভূমি জাগো—জাগো! আর আমি সেই জন্যেই তো তোমাদের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমার এই অপমানের—আমার এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নাও তোমরা।

—বুম্—বুম্—বুম্!!

দূরে গর্জন ক'রে উঠলো সোভিয়েটের কামান। দেখতে দেখতে সমস্ত ট্যাংকবহর ঘর্ঘর ক'রে চলতে আরম্ভ করলো। চারদিকের মাটী কাঁপিয়ে, অরণ্য চূর্ণ ক'রে সে কী ভীষণ তাদের জয়যাত্রা! তারা এগিয়ে চললো—তারা ক্রমশঃই এগিয়ে চললো। যেন এতক্ষণ একটা ঝড় থমকে থেমে ছিল চারদিকে—মাত্র একটা আঘাতে আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো।

আর সেই কামান গর্জনের মধ্যে—সেই উন্মত্ত দানবীয় ঝঞ্ঝার মধ্যে একটা ট্যাংকের উপরে ছোট্ট ম্যারিকাকে সত্যিই মনে হোল যেন মূর্তিমতী প্রতিহিংসা, বাতাসে কোঁকড়ানো কালো চুল উড়ছে—সে গান গাইছে—সে চীৎকার করছে—আর তার সেই কাটা দুখানা হাত সামনের দিকে প্রসারিত ক'রে পাগলের মতো বলছে, হে আমার সোভিয়েট্ ল্যাণ্ড, হে আমার য়ুক্রেনের ভাই-বোনেরা, তোমরা এগিয়ে চলো, তোমরা এগিয়ে চলো!!*

* ওয়াণ্ডা ইয়াসোভস্কির 'দি য়ুক্রেনিয়ান গার্ল' থেকে।

গান*

ভীমপলশ্রী

৺অতুলপ্রসাদ সেন

যারা তোরে বাসলো ভালো, যারা দিল প্রাণে ব্যথা
যাবার আগে বন্ধু জেনে সবার পায়ে নোয়া মাথা।
যাদের তুই পর ভাবিলি, যাদের চোখে জল আনিলি,
ক্ষমা চেয়ে সবার পায়ে জানারে আজ প্রাণের কথা।

জীবনে যা পাবার ছিল সবাই তোরে তাইতো দিল
যা পেলি তাঁর চরণ ধূলি আর তবে তোর ভাবনা কোথা।
পাবার বাকী আছে যাহা পাবিনা তুই হয়তো তাহা
খুলিসনে তুই খেয়ার ঘাটে পাওনা দেনা জমার খাতা।

* জাতীয় কবি ৺অতুলপ্রসাদ সেনের অপ্রকাশিত গান। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এই গানটিই কবির নাকি শেষ রচনা। প্রঃ সঃ

বাংলায় মানুষ-গড়া

রায় শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

আজকের এই পূর্ণিমা সম্মেলনের পৌরোহিত্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত ক'রে আমাকে অশেষ গৌরবে ভূষিত করেছেন, কিন্তু এ ভার সম্যকরূপে বহনে আমি নিতান্তই অপারগ। তবে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জাতি-গঠনের এই অপূর্ব্ব প্রচেষ্টার সাক্ষাৎ পরিচয় আমার পক্ষে বড় কম লাভ নয়, তাই আজ আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি ও আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ লাভ করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করচি।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য অতীব মহান্। বাঙালী মাত্রেরই এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা ও তার সাফল্যে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বাংলাদেশের এই ঘোর অমানিশার যুগে এই সঙ্ঘের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করলে, এর মহান আদর্শ ও লক্ষ্য উপলব্ধি করলে, এই অমানিশার মধ্যেও ক্ষীণ আলোক দেখা যায়—ভরসা হয় বুঝি একদিন আসবে যেদিন এ অমানিশা কাটবে—আজকের এই পূর্ণিমার স্নিগ্ধালোক বাংলার জীবনকে আবার আলোকিত করবে।

বাংলাদেশের এ অবস্থা হ'ল কেন ? যে দেশে মাত্র চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হ'য়ে প্রেমের অভয় পতাকা উড়িয়ে সারা ভারতকে শুনিয়েছিলেন—'চণ্ডালোপি দ্বিজঃশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। এই বাংলাদেশ থেকেই তাঁর সেই সাম্যমূলক ধর্ম্মাশ্রিত নবজীবনধারার শঙ্খনিনাদ সারা ভারতবর্ষে নির্ঘোষিত হ'য়েছিল। সে যুগে বাংলাদেশ প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছিল—দিকে দিকে প্রাণশক্তির বিকাশ দেখা দিয়েছিল। সেই যুগারম্ভেই বাঙ্গালী কবি গেয়েছিলেন—

'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

চৈতন্য যুগের পর আবার কিছুকাল বাংলার তথা ভারতের আকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এ তামস রজনীতেও বাংলার বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হয়নি—বাংলার বাউল তখনও পথে পথে ঐক্যের গান গেয়ে বেড়িয়েচে। তারা গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে যে গান গেয়ে বেড়াত সে একতারার তার ঐক্যের তার। তারা তাদের অন্তরের আত্মীয়তা থেকেই হিন্দুকে, মুসলমানকে এক করে জানতে পেরেছিল, তারাই ঋষিবাক্য নিজেদের সাধনায় ও জীবনে প্রমাণ ক'রেছিল—আপনাকে চিনেছিল সকলের মাঝে। তাই পাথরে গড়া ভেদের বেড়া, সমাজের অনুশাসন তাদের ধরে রাখতে পারেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে প্রবল আঘাত ও আক্রমণ এই বাংলাদেশের উপরেই পড়েছিল। একটা বিরাট ভাঙ্গা-গড়ার যুগ তখন এসেছিল। সে যুগেও বাংলা তার আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয়েছিল।

যুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় যখন বাংলাদেশে সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারে মনোনিবেশ ক'রেছিলেন, পাশ্চাত্যের আলোকসম্পাতে আমাদের ঘরের সম্পদ বেদ-উপনিষদাদির পুঁথির ঝুলি-ঝাড়ার যখন ব্যবস্থা চলেচে, তখন শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে যে বৃহত্তর সমাজ নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল তাদেরও সনাতন বাণী শুনিয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ—তিনি গেয়েছিলেন :—

"আপনাতে আপনি থেকো যেও না মন কারু ঘরে।
যা চা'বি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তপুরে॥
পরম ধন এই পরশ মণি যা চা'বি তাই দিতে পারে।
ও মন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সংস্কার যুগের পর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে এক অভিনব সমন্বয় যুগের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মরমীয়া গানের সুর যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের রূপে একদিন প্রকটিত হ'য়েছিল, তেমনই সাধক রামপ্রসাদের মাতৃগানের বেশ একশত বর্ষ পরে মূর্ত্ত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একটা ব্যক্তিগত আকস্মিক অভ্যুদয় নয়, এ একটা যুগধর্ম্মের সমন্বয় ও বিকাশ। বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের এ একটা অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব প্রকাশ। কোন্ মহাশক্তির বলে এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ গভীর অধ্যাত্মবোধ জেগে উঠলো, জগতের যাবতীয় বিরোধীয় ধর্ম্মমতের সাধনায় ও

অনুভূতির এমন অদৃষ্টপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হ'ল, তা একান্তই দুর্জ্ঞেয়। বর্ত্তমান ভারতে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। এর সম্যক উপলব্ধি আজও হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেই মহাশক্তি বলেই আবার যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের আবির্ভাব সাধিত হ'ল। বাঙ্গালীর কোন্ সৌভাগ্যবলে বঙ্গমাতা একই সময় বিবেকানন্দের মত আচার্য্য আর বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিকে ক্রোড়ে ধারণ করলেন! এত সৌভাগ্য আমাদের, তবে আমরা আজ এত হীন কেন? আমাদের শক্তি আমাদের বীর্য্য কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দের সে শক্তির বাণী আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে না কেন? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সে ঐক্যের গাথা যা সবেমাত্র সুরু হয়েছে, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করে না কেন? শ্রীঅরবিন্দ মানব সমাজকে একটা নূতন পদবীতে উন্নীত করবার জন্যে আজও সুদূর পণ্ডিচারীতে তপস্যায় নিরত রয়েছেন—সে আদর্শ আমাদের জাগিয়ে তোলে না কেন? এত ভাব-সম্পদ থাকতে আজ আমাদের এ দশা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আজকার দিনের বাঙালীর অবহিত হয়ে খোঁজা উচিত।

আমরা আজ আমাদের সেই আদর্শ ও সাংস্কৃতিক প্রেমৈক্যমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি। দেশের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরা আজ আত্মসর্ব্বস্ব, যে দেশে ত্যাগের মহিমা চিরকাল কীর্ত্তিত হয়েছে আজ সেখানে ত্যাগ কোথায়, ভোগের পিশাচ নৃত্যই ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হচ্চে। এই সঙ্কট যুগে ভবিষ্য বাংলার দিব্য যুগকে আহ্বান করার আয়োজন যাঁরা কচ্চেন তাঁরা দেশের পূজ্য, দেশের বরেণ্য। বাংলার প্রাণধারা আজ স্তব্ধ রুদ্ধ। কত শতাব্দীব্যাপী সেই অনাবিল ধারার আজ এ দশা হ'ল কেন? ধর্ম্মহীনতা—ধর্ম্মজীবন থেকে একান্ত বিচ্যুতিই কি তার কারণ নয়? প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের দিব্য জীবনবাদের সাধনা ও প্রচার হয় তো সেই রুদ্ধ ধারাকে আবার মুক্ত করে দেবে—প্রাণধারা ছুটে চলবে আবার চতুর্দ্দিকে, প্রাণশক্তি ছেয়ে যাবে দেশময়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মহান আদর্শ কার্য্যকরী হোক্, দেশে একটা নয়, শত শত এইরূপ সঙ্ঘের প্রয়োজন—সঙ্ঘগুরুর প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হোক্ দিকে দিকে। তাঁর এই মানুষ হওয়ার বাণী দেশকে উদ্বুদ্ধ করুক, চরিত্র ফিরে আসুক প্রত্যেক ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে, মানুষ করুক আমাদের—ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করি।*

* ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের সমাপ্তি দিবসের পূর্ণিমা সম্মেলনের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ঘোষের (জেনারেল ম্যানেজার, ই-আই-আর) অভিভাষণ।

বিস্মরণ

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

বলি বলি ক'রে যে-কথা হয়নি বলা,
সে-কথা বলার সময় এসেছে আজ;
আকাশে জাগিছে রূপবতী শশীকলা,
বাতাসে সুরভি, হাতে নেই কোনো কাজ।
বাতায়ন-পথে তরল জ্যোৎস্নাধারা—
আসে বাঁধভাঙা নদীর স্রোতের মত,
খরবেগে ভাঙে অন্ধকারের কারা;
মনে ভীড় করে না-বলা কাহিনী কত।
নারিকেল শাখা শত অঙ্গুলি মেলি—
দূরের প্রিয়ারে ডাকে বুঝি ইসারায়।
টেবিলের পরে রহিয়াছে খোলা 'শেলি'
পড়িতেছিলাম সন্ধ্যার আলোছায়।
আমি কবি আর তুমি কবিতার প্রাণ;
তোমারে ঘেরিয়া রচি ছন্দের মালা,
তোমার লাগিয়া লিখি আজেবাজে গান,
আজিকে আমার কথা শোনাবার পালা।
তুমি আর আমি আর কেহ ঘরে নাই,
অত দূরে নয় আরো কাছে এসে বোসো;
মনের কাহিনী মন দিয়ে শোনা চাই;
কি কথা বলিব? মনে ক'রে নিই রোসো।

অন্তরায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দেবকুমার ও গীতাদের বাড়ী কেবল এক গ্রামে নয়, এই দুইটি পরিবার এই গ্রামে আছে, অনেকটা প্রায় এক বাড়ীর লোকের মত।

দেবকুমারের পিতা ও গীতার পিতা উভয়েই একই পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। মধ্যম বয়সেই পণ্ডিতটির স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তাহার পর তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্রও তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরলোকগমন করে। সুতরাং পণ্ডিতটির মৃত্যুর পর ছাত্র দুইটিই তাঁহার ব্যবসায় লাভ করেন। এইভাবেই দুইটি পরিবার এই গ্রামে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুতরাং এই দুইটি পরিবারের ভিতর ঘনিষ্ঠতার অন্ত নাই। দেবকুমার ও গীতা উভয়েই উভয় পরিবারের ভিতর আপন ছেলে ও মেয়ের মত ব্যবহার পাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। দেবকুমারের সহিত বিবাহ স্থির হইবার পর যদিও গীতা তাহার পিতামাতার সম্মুখে একটু সঙ্কুচিত হইয়াই রহিয়াছে, তথাপি আজ তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ রহিল না। নিজের পিতার অসুখ হইলে মানুষ যেমন অস্থির হয়, এই পিতৃতুল্য বৃদ্ধের অসুখেও তেমনি অস্থির হইয়াই গীতা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া বসিল।

গীতাদের বাড়ী যেমন সংবাদ গিয়াছিল, রোগীর অবস্থা তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র ভাল ছিল না। পূর্ব্বে ডাক্তারবাবু আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা খাঁটি এসিয়াটিক কলেরা। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র রোগীর আয়ু আছে। গীতারা যখন গিয়া পৌঁছিল তখনো রোগীর জ্ঞান ছিল। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার জ্ঞান হইতেছিল, আবার তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলেন। এই রকম অবস্থাই চলিতেছিল। গীতা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিতেই, তিনি তাহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, কত না ইচ্ছা ছিল তোমাকে ঘরে আনবো মা। আমি আর তা দেখে যেতে পারলাম না, বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গীতা আর কি বলিবে? সে মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। নির্ম্মলা দেবী কহিলেন, না হয় কয়টা মন্ত্র পড়া হয়নি। এই আমি গীতাকে দিলাম! আপনি দেখে তৃপ্ত হয়ে যান। কিন্তু ইহা বৃদ্ধের কানে গেল না। সকলেই দেখিল, তিনি পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন।

পার্ব্বতী দেবী স্বামীর মাথার কাছে বসিয়া নীরবে বাতাস করিতেছিলেন। গীতা তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু বেশী সময় বাতাস করিতে হইল না। ঘণ্টাখানেক পরেই রোগীর চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল। তাহার পর সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল। পার্ব্বতী দেবী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটা আকুল বাতাস ঘরে ও বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নির্ম্মলা দেবী তাঁহার মেয়েকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবকুমারদের বাড়ী রহিলেন। তাহার পর দাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে সকলকে অগ্নি ও লৌহ স্পর্শ করাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিলেন। পার্ব্বতী দেবী তখন অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন। তথাপি কহিলেন, এই দশটা দিন গীতা আমার কাছেই থাকুক, নির্ম্মলা।

নির্ম্মলা দেবী পূর্ব্ব হইতেই ইহা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এই কয় দিন তাহাদের দেখাশুনা করিত কে? কহিলেন, তা থাকবে, তাতে কি? সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকবে। সন্ধ্যার পর আমি এসে নিয়ে যাবো।

পরের দিন ভোরবেলা নির্ম্মলা দেবী গীতাকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বেও গীতা বহুদিন এ-বাড়ী আসিয়া রান্না করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এ-বাড়ী আসিয়া কয়দিন কাজ করিয়া দিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। আপত্তির একমাত্র কারণ ছিল, দেবকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব। এই বিষয়ে দেবকুমারের সম্বন্ধে যে সঙ্কোচ ছিল, দেবকুমার কাল

যাইয়া নিজ হাতে তাহা ভাঙিয়া দিয়া আসিয়াছে। আর পাঁচজনের কাছে যে-সঙ্কোচ ছিল, এই নিদারুণ ব্যাপারে তাহাও কুয়াসার মত মিলাইয়া গেল।

দেবকুমারের পিতা কলেরা রোগে হইলেও, বৃদ্ধ হইয়াই মরিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে খুব শোক করিবার ছিল না। কিন্তু দেবকুমারের একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে টাইফয়েডে মারা গিয়াছে। তাহার পর এই নূতন শোকে দেবকুমার অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িল এবং তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ যেন নিঃশেষে বিদায় গ্রহণ করিল।

গীতা এই বাড়ী আসিয়া দেবকুমারের সঙ্গে পারতপক্ষে কোন কথা বলে নাই। দেবকুমারও কথা বলিবার জন্য কিছু মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। গীতা দেখে, সে যেন বিষাদের মূর্ত্তি। তাহার মুখের সেই প্রশান্ত হাস্য কে যেন মুছিয়া লইয়াছে। সে প্রতিদিন একবেলা খায়। কিন্তু তাহাকে খাওয়া বলা চলে না। সে কয়টী মাত্র হবিষ্যান্ন মুখে দেয় মাত্র।

গীতা এইসব দেখে। দেখিয়া অত্যন্ত বেদনা বোধ করে। তাহার ইচ্ছা হয়, দেবকুমারকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া সে খাওয়ায়। কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ তাহাকে বাধা দেয়। তথাপি গীতা একদিন সে সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া উঠিল।

দেবকুমার সে-দিন হবিষ্য করিতে বসিয়াছে। তাহার মা পরিবেশন করিতেছেন। গীতা দেখিল, সে দুইটী ভাত লইয়া নাড়িতেছে। তাহার মা তাহাকে নানা ভাবে বুঝাইতেছেন। কিন্তু কোন কথাই যে তাহার কানে যাইতেছে, তাহা মনে হইল না। গীতা তখন কাছে যাইয়া কহিল, আরো ভাত আনুন তো মা।

সে এমন শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, যেন ইহা তাহার হুকুম।

গুরুদশা অবস্থায় খাইতে বসিয়া দেবকুমার কথা বলিবে না। সে ইঙ্গিতে প্রতিবাদ করিল, সে আর খাইতে পারিবে না। কিন্তু গীতা কাছে থাকিলে পার্ব্বতী দেবীর অনেক সাহস হয়। তিনি থালার উপর আরো ভাত, আলুভাতে ও ঘি ফেলিয়া দিয়া গেলেন। দেবকুমার সেইদিন সমস্ত ভাত খাইয়া উঠিল।

দেবকুমার উঠিয়া গেলে পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, তুমি এই কয় দিন ওর খাওয়ার সময় একটু কাছে থেকো মা।

গীতা একদিকে মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। কিন্তু সে দেখিল, সকলের দিকে লক্ষ্য রাখাই সমভাবে প্রয়োজন। পার্ব্বতী দেবীও প্রায় কিছুই মুখে তুলিতেন না। সে-দিন পার্ব্বতী দেবীকেও সে জোর জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইল।

গ্রামের যে পুরোহিত ছেলেটি সময় সময় দেবকুমারের পিতাকে পৌরোহিত্য কার্য্যে সাহায্য করিত, সেই সাময়িক ভাবে কাজ চালাইয়া লইতেছিল। গত কল্য রাত্রিতে সে অনেকগুলি দামী দামী ফল যজমান বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন সাধারণতঃ ইহার দুই ভাগ হয়। একভাগ গীতাদের বাড়ী যায়, আর এক ভাগ দেবকুমারদের বাড়ী থাকে। কিন্তু হবিষ্যের জন্য প্রচুর ফলের প্রয়োজন, তাই গীতা এখন আর তাহা বাড়ী পাঠাইল না। সে তাহার মাকে বলিয়া দিল, এখন কয় দিন সমস্ত ফল এখানেই খরচ করা হইবে।

এই দুর্ঘটনার পর দেবকুমার ও পার্ব্বতী দেবী উভয়েই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা দুই জনেই অনুভব করিলেন, গীতা যেন একটা আলোক বর্ত্তিকা হাতে লইয়া তাঁহাদের এই অন্ধকার পথটা অতিক্রম করিয়া দিয়া গেল। দেবকুমার দেশে ফিরিবার পর গীতাও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। গত কয় দিনে সে যে পুনরায় এই বাড়ীর মেয়ের মত হইতে পারিয়াছে, এই দারুণ অস্বস্তির ভিতর ইহা ভাবিয়াই গীতা কতকটা স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

৪

পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর বিবাহ হয় না। সুতরাং যে-আনন্দময় সম্ভাবনা উভয় পরিবারকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির মতই কিছুদিনের জন্য আপনা হইতে তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

এতদিন দেবকুমারকে সংসারের জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। সে যাহা পারিয়াছে তাহাই বাড়ী দিয়াছে। এখন পিতার অবর্ত্তমানে সে কেমন করিয়া সংসার চালাইবে, তাহাই তাহার সম্মুখে প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় সে যে চাকুরি করিত, তাহা কোন স্থায়ী কাজ নয়। স্থায়ী হইলেও, কলিকাতায় বসিয়া অল্প বেতনে চাকুরি করা যে পোষাইবে না, ইহা একরূপ স্থির হইয়াই ছিল। উভয় পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠ পৌরোহিত্য ব্যবসায়কে রক্ষা করা যাইবে কেমন করিয়া তাহাই ছিল এখন প্রধান প্রশ্ন।

তথাপি শ্রাদ্ধের পরই দেবকুমার কলিকাতা হইতে তাহার এক বন্ধুর পত্র পাইয়া, হঠাৎ কলিকাতা চলিয়া গেল। যাইবার সময় পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, অনেক কাজ পিছনে ফেলে গেলি বাবা, তাড়াতাড়ি করে ফিরিস।

গীতাও কাছেই ছিল। দেবকুমার কহিল, তার জন্য ভাবনা কি মা। গীতাই তো এতকাল ওদের সংসার দেখেছে। এখন থেকে না হয়, তোমার সংসারও দেখবে।

গীতা উত্তর করিল, তাই বলে আমি তো আর লোকের বাড়ী পুজা দিতে পারবো না।

দেবকুমার তাহার উত্তর করিল না। মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সকলেই আশা করিয়াছিল, দেবকুমার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহার চলিয়া যাইবার পর দুই মাস কাটিয়া গেল, তথাপি দেবকুমার ফিরিয়া আসিল না। অতুল নামে যে ছেলেটি পূর্ব্বে কাজ চালাইয়া লইতেছিল, গীতা তাহাকে দিয়াই কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইতে লাগিল। কিন্তু এই ছেলেটি এতই অক্ষম ও অপদার্থ যে, কোথাও শ্রাদ্ধ বা বিবাহ থাকিলে তাহাকে পাঠাইবার উপায় নাই। তখন বাধ্য হইয়া অপর কাহাকেও পাঠাইতে হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আর কেহ আসে না। গীতার নিজের মা ও দেবকুমারের মা উভয়েই মনে করেন, গীতা যখন আছে, তখন তাহাদের নিজেদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি?

কিন্তু দিনের পর দিন গীতা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। একভাবে সে না হয় কিছুদিন চালাইয়া লইল, কিন্তু দীর্ঘ দিন এরূপ চলিবে কেন? দেবকুমারের উচিত, এই ভাবে তাহার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া কলিকাতা যাইয়া বসিয়া থাকা? গীতা মাঝে মাঝে দেবকুমারের মাকে দিয়া পত্র দেয়। কিছুদিন পর তার উত্তর আসে, সত্বরই আসিতেছি। তাহার পর আবার পনের দিন যায়। অবশেষে যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সে চলিয়া গিয়াছিল, তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে একদিন আবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেবকুমার বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়াই নির্ম্মলা দেবী গীতাকে লইয়া তাহাদের বাড়ী গেলেন। দেবকুমার তখন খাইতে বসিয়াছে। তাঁহারা ঘরে উঠিতেই দেবকুমার কহিল, তোমরা খুব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলে শুনলাম।

নির্ম্মলা দেবী কহিলেন, অতিষ্ঠ হওয়ার কথা নয়! সব নষ্ট হতে বসেছে যে।

গীতা থাকতে নষ্ট হবে কেন? গীতাই তো শুনি এখন ম্যানেজার।

গীতা কহিল, না হয়ে করি কি? অন্নচিন্তা আছে তো!

আমি তো এইজন্যই নির্ভাবনায় ছিলাম কলকাতা।

পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, এ-সব ওর কাজ নয় বাবা। তুমি কলকাতা ছিলে বলে ও এতদিন দেখেছে। এবার তোমার ভার তুমি নিও। কর্ত্তারা এতদিন চালিয়েছেন— এবার তুমি চালাও।

দেবকুমার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া খাইতে খাইতে কহিল, আবার আমাকে কলকাতা যেতে হবে।

গীতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এই তিন মাস কলকাতা থেকে এলে আবার যাবে কলকতা?

হুঁ।

কেন, আবার সেই চাকরিতে?

যদি বলি তাই?

গীতার সত্য সত্যই এবার অত্যন্ত রাগ হইল। সে রুখিয়া কহিল, তোমার লজ্জা করে না এ-কথা মুখে আনতে! এখানে দু-পাশের লোক তোমার পায়ের ধুলো নেয়, আর ত্রিশ টাকার জন্য তুমি যাবে পরের পায়ের ধুলো নিতে!

কিন্তু দেবকুমারের কোন উত্তেজনা নাই। নিশ্চিত মনে খাইতে খাইতে কতক্ষণ পর সে কহিল, আমি চাকরি করবো না।

তবে কি করবে?

দেবকুমার কোন উত্তর করিল না। তাহার খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। কতক্ষণ পর সে ফিরিয়া আসিলে গীতা কহিল, বললে না তো, কলকাতা গিয়ে কি করবে?

ব্যবসা করব।

ব্যবসা! কেন, অন্য ব্যবসারই তোমার দরকার কি? এটা একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা নয়? এই ব্যবসা ক'রেই জেঠামশায় সকলকে খাইয়ে রেখেছেন না? তুমি যখন বি. এ. পাস করেছ, তখন তো এক হাত দেখেই যথেষ্ট টাকা রোজগার করতে পার। কত লোক জান কেবল জ্যোতিষী ক'রেই পাকা বাড়ী করেছে!

দেবকুমার আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সে-সব দিন চলে গেছে। এখন এ-সব ব্যবসা আর বেশী দিন চলতে পারে না।

গীতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, চলতে পারে না! বিবাহ-শ্রাদ্ধ উঠে যাবে?

আমি তা' বলছি নে। আমি বলছি, চলার মত আর চলবে না। সব জায়গায় আমি দেখি, পুরুতের ছেলেরা খেতে পাচ্ছে না। যাদের আর কিছুই করার নেই, তারাই শুধু পৌরোহিত্য করছে। যে সম্মানের আসন সমাজে আমাদের ছিল, তা' আর এখন নেই। আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্মের উপর থেকে লোকের শ্রদ্ধা উঠে যাচ্ছে। এ-সব যে দেখতে না পায়, সে অন্ধ।

দেখতে আমরা পাব না কেন? কিন্তু তার কারণ কি? অযোগ্য লোকের অন্ন কোথাও জোটে না। আমাদের সমাজের যারা যোগ্য লোক, বাবু হবার লোভে তারা বংশগত ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছে। অযোগ্য লোকের দুর্দ্দশা তো হবেই। তোমরা ফিরে এলে, আবার ব্যবসার উন্নতি হবে।

না, ফিরে এলেও হবে না। বাবা তো অযোগ্য লোক ছিলেন না! বাবা শেষ বয়সে কত দুঃখ করে' গেছেন, কাজকর্ম্ম নেই বলে'। এ-ব্যবসার ভিতর এমন কিছু ত্রুটি আছে, যাতে কোন চেষ্টাই একে রক্ষা করতে পারে না। আমাদের প্রধান ত্রুটি কি জান? যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা চলতে পারছি নে। হিন্দুসমাজের সত্যকার কল্যাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। কোনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করাই আমাদের লক্ষ্য। তাই আমাদের এই দুরবস্থা। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা এই, নূতন পথে চলার উপায়ও আমাদের নেই। যদি সে-উপায় থাকত, তবে আমি কিছুই করতাম না। এই দরিদ্র্য-ব্রত নিয়ে পৌরোহিত্যের সেবাতেই জীবন কাটাতাম। কিন্তু আমি জানি, সে সম্মতি কোথাও আমি পাব না।

দেবকুমার এইভাবে কথাগুলি বলিল যে, গীতা নিজেকে অনুপ্রাণিত অনুভব করিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, সকলে তোমার কাছে তো এই আশাই করে, তুমি পৌরোহিত্যকে একটা নূতন রূপ দেবে। তোমাকে আমরা বাধা দেব, এই আশঙ্কা কর কেন?

আমি সমাজকে জানি বলে'ই আমি আশঙ্কা করি। আমি ঠিক বুঝেছি, বাড়ী-বাড়ী পূজা করে', শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে', স্বর্গলাভের ব্যবস্থা দিয়ে, আমাদের ব্যবসায় আর টিকবে না। সমাজে আমাদের যে বৃহত্তর প্রয়োজন আছে, আমাদের তা' প্রমাণ করতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতে পুরুষেরা বেঁচে আছে সমাজ-রক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রচারের কাজ নিয়েই। আমাদের যে প্রয়োজন আছে সমাজে, আমরা তা' প্রমাণ করতে পারি, যদি এই ব্রত গ্রহণ করি জীবনে।

তার মানে? তোমার ধারণা, আমরা সমাজ-রক্ষা বা ধর্ম্মপ্রচারের কাজ করি নে?

আমরা যে-ভাবে করি, তার আর দরকার নেই সমাজে। এখন এমন একদল লোকের প্রয়োজন, হিন্দুসমাজকে গুছিয়ে এনে, যারা সমাজকে রক্ষা করতে পারে—হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর যে-সত্য আছে, তা' দিকে দিকে প্রচার করতে পারে। আমাকে যদি তোমরা অনুমতি দাও, তবে তাই নিয়ে আমি থাকব। আমরা শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখের পুজো করব কেন? বুনা, সাঁওতাল, দেশী-বিদেশী সকলের ভিতর হিন্দু-সংস্কৃতি প্রচার করব। দেবে আমাকে এ-অনুমতি?

দেবকুমারের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে গীতার অনবদ্য সুন্দর মুখখানি ছাইয়ের মত নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। এইবার সে কহিল, ওঃ, এই তোমার

আদর্শ! তুমি ভেবেছ, যা' ইচ্ছে হয়, তাই করতে পার সমাজে। একদিন একজন সাঁওতালের বাড়ী পূজো করে' এলে, তারপর তুমি বাড়ী ঢুকতে পারবে ভেবেছ?

এই জন্যই তো আমার পৌরোহিত্য করা চলবে না। আমি যদি করি, তবে আমার অন্তরের নির্দ্দেশ পালন করব, না হয় আমি করব না।

কাজের সময়ে যে দেবকুমার এই সব কথা বলিবে, তাহা গীতার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সে হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, তবে কি হবে আমাদের যজমানদের, কি হবে আমাদের ব্যবসার? তুমি যদি নিজে না দেখ, এত যজমান ধরে' রাখবে কে? একদিন না একদিন এরা হাতছাড়া হবেই।

আমাকে যদি দেখতে হয়, তবে আরও শীগগির শীগগির যাবে।

এতক্ষণ পার্ব্বতী দেবী ও নির্ম্মলা দেবী কেহই কোন কথা বলেন নাই। তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া আলোচনা শুনিতেছিলেন। এইবার পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, এ-সব কি পাগলের মত কথা বলছিস্ তুই? এই চলতি ব্যবসা তুই রক্ষা করবি নে?

দেবকুমার হাসিয়া কহিল, গীতা থাকতে তোমাদের ব্যবসা নিচ্ছে কে, মা! ওর প্রাণ থাকতে আমাদের ব্যবসা যাবে?

এ-কি কথা বলিস্ তুই! ও মেয়েছেলে হয়ে পৌরোহিত্য করবে? পরকে দিয়ে কাজ চালালে কতদিন চলবে কাজকর্ম্ম? দুই দিন বাদে সব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তার জন্য আমি থাকতে তুমি না খেয়ে মরবে, তা' মনে করো না মা।

গীতা কহিল, তোমার মা না খেয়ে মরবেন না, তা' ঠিক। কিন্তু আমাদের ব্যবসায় উঠে গেলে, আমার মা পথে দাঁড়াবেন।

সে-কথা তুমি বলতে পার না।

এ-কথার অর্থ কি, গীতা তাহা বোঝে। কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখে আটকায় না। সে কহিল, আমার মা কখনও কোন অবস্থায় পরের গলগ্রহ হবেন, এ-রকম কল্পনাও আমি সহ্য করতে প্রস্তুত নই।

দেবকুমার এবার রীতিমত বিব্রত হইয়া কহিল, আমার মন যা' চায় না, তার ভিতর জোর করে' আমায় নামিয়ো না। প্রচলিত পৌরোহিত্য নিয়ে আমি জীবন কাটাব, এ কথা ভাবতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

এ-কথার অর্থ এই, তুমি পৌরোহিত্য কিছুতেই করবে না।

পৌরোহিত্য আমি করব না, তা' আমি বলতে পারি নে। তবে তোমাদের মত করে করব না নিশ্চয়ই।

নির্ম্মলা দেবী এতক্ষণ পর প্রথম কথা বলিলেন। তিনি কহিলেন, না, এ-সব ওর মনের কথা নয়। ও দুপুরবেলা কেবল খেয়ে উঠেছে, এ-সময় ওকে না চটালেই কি হত না!

না, কাকীমা, আমি চটি নি। আমার সব কথা তোমাদের পরিষ্কার করে' বল্লাম। তা' না হলে হয়তো তোমাদের সত্যি সত্যি অনিষ্ট করা হত।

গীতা কতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিল না। তাহার পর কহিল, আমিও স্পষ্ট করে' বলি তবে, তুমি নিজে পৌরোহিত্য ব্যবসা না দেখলে, কখনও এ-ব্যবসা থাকবে না। তখন আমার মা যে পথে বসবেন, আমি তা' সহ্য করতে পারব না। তুমি যদি পৌরোহিত্য নাই কর, তবে মায়ের অংশ মাকে ভাগ করে' দাও। তারপর তুমি যা' ইচ্ছে হয় কর। আমরা বাধা দিতে যাব না।

অংশ আবার কেন? এই ব্যবসার এক পয়সাও আমি চাই নে। সবই তোমাদের দান করে' দিলাম।

পার্ব্বতী দেবী ছেলের কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার স্বামী এই ব্যবসায় করিয়া বৃদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। কত টাকা-পয়সা, কত দ্রব্যসম্ভার, কত মানসম্মান এই ব্যবসায় উপলক্ষে তাহারা ভোগ করিয়াছেন। ইহা সে গীতার মাকে দান করিয়া দিবে এবং তাহার মৃত্যুর পর গীতার মাতুল ভাইয়েরা আসিয়া এই সম্পত্তি ভোগদখল করিবে! তিনি গর্জ্জিয়া কহিলেন, কি বল্লি তুই! তুই দান করে' দিবি? তুই দান করার কে রে? এই সম্পত্তি তুই উপার্জ্জন করেছিস, যে দান করতে এসেছিস্? তুই এই সব না দেখবি, আমি লোক রেখে ব্যবসা চালাব। না হয় গীতাই দেখবে। গীতার বাপ

মরে' গেছিল পর, কর্ত্তা ওদের হয়ে ব্যবসা দেখেননি? গীতা যদি আমার নাও হত, তবু ওকে ব্যবসা দেখতে হত। তুই না করবি, তার জন্য আমাদের ব্যবসা বন্ধ থাকবে, তা তুই স্বপ্নেও ভাবিস্ নে।

দেবকুমার রাগিল না। হাসিয়া কহিল, আমি তো সেই কথাই বলছিলাম, মা। তোমার এত সহায়-সম্বল থাকতে, আমার মত অপদার্থকে কেন?

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়: চতুর্থ পাদ

শ্রীমতিলাল রায়

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৮॥

অধিক-উপদেশাৎ (জীবাতিরিক্ত উপাস্যের উপদেশ হেতু) তু (পরন্তু) বাদরায়ণস্য (আচার্য্য বাদরায়ণের) এবং (এই প্রকার অভিমত অর্থাৎ পুরুষার্থপ্রাপ্তি বিদ্যা হইতে হইয়া থাকে) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই শ্রুতিতে দেখা যায়)। বিশদার্থ—বেদান্তে যে আত্মার উপদেশ আছে, তাহা জীবাত্মা হইতে অধিক বা উৎকৃষ্ট। এই হেতু বাদরায়ণ মুনির মতে এই অসংসারী পরমাত্মার জ্ঞানে কর্ম্মপ্রতীক্ষা নাই। আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির ভাষ্যে এইরূপ দেখা যায়—যথা আত্মা যখন সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকর্ত্তা জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন জীবের কর্ম্ম এই পরমপুরুষার্থ জ্ঞানের পক্ষে নিরর্থক। বিদ্যাই একমাত্র মোক্ষের উপায়। ব্যাসদেবের "অধিকোপদেশাৎ" এই সূত্রব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা:—

"অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", "তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি," "তত্তেজোঽসৃজত," "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ," "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপাপরহিত, বিজর, মৃত্যু-শোক-রহিত, ক্ষুৎ-পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব ও জন্মিব—তারপর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তাঁহার বহুবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, শক্তি ও ক্রিয়া শ্রুতিতে কথিত হয়—ইত্যাদি বহু শ্রুতিবচনে জীবাত্মার চেয়ে পরমাত্মা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

এই সকল আচার্য্যগণের ভাষ্য হইতে কর্ম্ম হেয় মনে হয়। এমন কি কর্ম্মের প্রয়োজনও মোক্ষার্থীর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ব্যাসদেব এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। গীতাই তাহার প্রমাণ। স্বশিষ্য জৈমিনিকে কর্ম্মমীমাংসাপ্রণয়নের উপদেশ দেওয়ায়, কর্ম্মের প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেন নাই।

উপরোক্ত সূত্রে তিনি বলিতেছেন "অধিকোপদেশাৎ"। ইহার অর্থ মধ্বাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন—সর্ব্ব পুরুষার্থ-সাধনা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। ব্যাসদেবের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত এই অর্থেই সঙ্গত হইতে পারে।

ইহা জ্ঞানপ্রশংসার্থেই কথিত হইতেছে। কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—এ কথা বলা হইতেছে না। কিন্তু এই জ্ঞান কর্ম্মশেষত্ববশতঃ জন্মিয়া থাকে। "জ্ঞানাদেব পুরুষার্থপ্রাপ্তির্কর্ম্মণস্তু ফলতিশয়াধায়কেন শেষত্বম্ ইতি" কর্ম্মের পরিণাম জ্ঞান এবং এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্ঞানাদেবাপবর্গোজ্ঞানাদেব সর্ব্বে কামাঃ সম্পদ্যন্তে। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বর্গ, অপবর্গ ও সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞানই কর্ম্মের অপেক্ষা অধিক ফলসাধক। ইহাতে জ্ঞানপ্রাধান্যই প্রমাণিত হইতেছে। জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। এই হেতু পরমাত্মপ্রাপ্তির যাহা উপায়, প্রাধান্য তাহারই; উহা প্রাপ্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বীকার করিতে হইবে। আচার্য্য জৈমিনির প্রথম সিদ্ধান্তের উত্তর

দিয়া, ব্যাসদেব তাঁর পরবর্ত্তী সূত্রের সিদ্ধান্তবিচারান্তে নিম্ন সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

তুল্যদর্শনম্ ॥৯॥

তু (পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) তুল্যং (জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম আছে, তেমন অকর্ম্মের কথাও তুল্যভাবেই) দর্শনম্ (শ্রুতিতে কথিত দেখা যায়)।

পূর্ব্বে আচার্য্য জৈমিনি যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যার্থিগণের কর্ম্ম আছে, শ্রুতিতে ইহা থাকা হেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে শুধু জ্ঞানই দায়ী নয়, কর্ম্মেরও সাহচর্য্য আছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—'জ্ঞানীর কর্ম্ম আছে', এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয় না, পরন্তু কর্ম্মেরও সহভাব আছে, একথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, শ্রুতিতে আবার জ্ঞানীর কর্ম্মবিরুদ্ধ উক্তিও আছে। যথা—শ্রুতি বলিতেছেন "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহু ঋষয় কারবেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" অর্থাৎ ঋষিরা এই বলিয়াছেন 'আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিব? কি জন্য যজ্ঞ করিব? পূর্ব্বব্রহ্মবিৎগণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন নাই। তাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পুত্রেচ্ছা, ধনেচ্ছা ও লোকৈষণা হইতে মুক্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বিচরণ করেন।' আরও আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "ইহাই অমৃত"। ইহার পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য থাকায়, জৈমিনি মুনির উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্ম আচার প্রদর্শিত হওয়ায়, পরস্পর বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতেছে। অতএব এক শ্রুতির প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্ম যে বিদ্যাবেদ্য নহে, পরন্তু কর্ম্মেরও সহভাব আছে—একথা প্রমাণিত হইতেছে না। আচার্য্য মধ্বাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যায় এক নূতন আলোকপাতে করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—ব্যাসদেব "তুল্যন্তু দর্শনম্" সূত্রের অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞানুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তাঁহাদের উভয় অবস্থাতেই তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। আকাশ অনন্ত হইলেও, উহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। জ্ঞানও তদ্রূপ সর্ব্বাবস্থায় তুল্য। ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত—জ্ঞান দ্বারাই সকল লাভ হয়। ইহার অর্থ এমন নহে যে, কর্ম্মের সহভাবে ফলাধিক্যনিষেধ হইতেছে। কেননা শ্রুতিতে আছে "জ্ঞানিনামপি দেবানাম্ বিশেষঃ কর্ম্মভির্ভবেৎ" অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানী দেবতাগণেরও বিশেষ হইয়া থাকে।' আচার্য্য মধ্বদেব—জ্ঞানীর কর্ম্ম আছে, এই কথাই প্রমাণ করিতেছেন। ব্যাসদেব—জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই—একথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে কেবল জ্ঞানই সহায়। পূর্ব্বে যে আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছিলেন—জ্ঞানীর পক্ষে শ্রুতিতে কর্ম্ম বিহিত থাকায়, ব্রহ্মার্থীর জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সহভাব আছে, তিনি এই সূত্রে দেখাইলেন যে, শ্রুতিতে জ্ঞানীর কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম দুইই আছে। অতএব ঐ যুক্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য কেবল জ্ঞানই দায়ী নহে, কর্ম্মও দায়ী, ইহা প্রমাণিত হয় না। তারপর ব্যাসদেব আচার্য্য জৈমিনির তৃতীয় সিদ্ধান্তের উত্তর দিবার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

অসার্ব্বত্রিকী ॥১০॥

অসার্ব্বত্রিকী অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্মের সংযুক্ত ফলাধিক্যের কথা জৈমিনি দেখাইয়া জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের যে সহভাব দেখাইয়াছেন, তাহা উপরোক্ত সূত্রে বলা হইতেছে—ঐ শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যা বিষয়ে প্রযুক্ত নহে। কেননা জ্ঞানীর যখন নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে এবং ঐ ব্রহ্ম-বিদ্যা যখন দ্বিবিধ, এক শব্দব্রহ্ম ও অন্য পরব্রহ্ম, তখন ঐ শ্রুতিপ্রমাণ এই উভয় বিদ্যার পক্ষে প্রযুজ্য নাও হইতে পারে। আর পরব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলের অল্পাধিক্যের কথা কল্পনা মাত্র। এই হেতু ফলাতিশয়ত প্রদর্শন করিয়া 'যদেব বিদ্যয়া' প্রভৃতি যে শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, উহা শব্দব্রহ্মবিষয়ক কেবল উদ্গীথ বিদ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। অতএব আচার্য্য জৈমিনির পূর্ব্বোক্ত যুক্তি পরব্রহ্মপ্রসঙ্গে প্রযুজ্য হইল না।

সর্ব্ববিদ্যার বিষয় নহে। এক অর্থাৎ ইহা সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে। কি সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে? চতুর্থ সূত্রে "তৎ-শ্রুতেঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য জৈমিনির অভিমতে "যদেব বিদ্যয়া করোতি" এই শ্রুতি-প্রমাণে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর

হয়। এই যুক্তিখণ্ডনের জন্য ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন; আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির এই সিদ্ধান্ত।

আমরা এই ব্যাসদেবের রচিত গীতাশাস্ত্রে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে দেখি—যোগমার্গে অধিরোহণের জন্য কর্ম্মই কারণ হয়, আর যোগারূঢ় ব্যক্তির কারণ হয় শম। শম অর্থে সুখ বা শান্তি। এই প্রশান্তির মধ্যেই ব্রহ্মৈক্যযুক্ত জীবে জ্ঞান উপলব্ধিগম্য হয়, ইহা অবধারিত। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়—কর্ম্মশেষত্ব শমগুণ, এই অবস্থায় 'অহং কর্ত্তা' এইরূপ বোধে কর্ম্ম হয় না। যোগারূঢ় হওয়ার জন্য যে কর্ম্ম, যোগারূঢ় হইলে সেই কর্ম্ম নিশ্চয়ই রূপান্তরিত হইবে। পূর্ব্বাবস্থার কর্ম্ম আমার; পরবর্ত্তী অবস্থার কর্ম্ম ঈশ্বরের। পরবর্ত্তী চতুর্থ শ্লোকে আছে—যোগীর ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে এবং কর্ম্ম-সমুদয়ে আসক্তি যখন দূর হয়, তখন সর্ব্ব-সঙ্কল্প বিনষ্ট হয়, তাঁহাকেই যোগসম্পন্ন ব্যক্তি বলা যায়—এই কথায় কর্ম্মকে নাকচ করার কোন কথাই নাই। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। যথা—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী, যিনি কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ না করিলে বা অক্রিয় হইলেই, যোগী হওয়া যায় না।

যাঁহার এই সিদ্ধান্ত গীতাধর্ম্মে প্রচারিত, যাঁহার নিজ শিষ্য জৈমিনি কর্ত্তৃক কর্ম্ম-মীমাংসা রচিত, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য-প্রচারের পক্ষপাতী হইতে পারেন না।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ উপরোক্ত সূত্রকে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ সূত্রের প্রতিবাদ-সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন "বিদ্যা দ্বারা যাহা করা হয়"—এই নিয়ম সার্ব্বত্রিক নহে। উহা উদ্গীথ জ্ঞানে 'ওঁ' অক্ষরে উপাসনা বিহিতের জন্য প্রযুজ্য হইবে। এইরূপ অর্থ সূত্রের পারম্পর্য্য রক্ষা করে না।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞানীদের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা কর্ম্ম করুন আর নাই করুন, তাহাতে জ্ঞানহানির ভয় নাই। কর্ম্ম করিলে জ্ঞানের ন্যূনতা হইবে, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান অটুট থাকিবে, জ্ঞানে এমন পরিবর্ত্তন নাই—কিন্তু জ্ঞান মাত্রই কি এইরূপ তুল্য অবস্থাযুক্ত? তাহা যদি হইবে, তবে শ্রুতিতে কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানবিশেষে পার্থক্যের কথা থাকিবে কেন? এই সংশয়নিরসনের জন্য বলা হইতেছে—সকলেই পুরুষার্থাপেক্ষী, সকলেরই জ্ঞান-সাধনের অধিকার আছে বটে, কিন্তু সাধনকালে উহা সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে—তবে জ্ঞানকে নিরপেক্ষ বলা হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, এই হিসাবে কর্ম্ম নিরপেক্ষ। যন্ত্রবিদ্যায় জ্ঞান না থাকিলেও, যন্ত্রপরিচালন ব্যাপারে অনেকেই সমর্থ—ইহা লোকদৃষ্টান্ত। জ্ঞান ও কর্ম্ম মুখ্যতঃ পরস্পর অনপেক্ষ। কিন্তু পরস্পরের যুক্তিতে ফল বলবত্তর হয়, এই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মানুষের অহংকৃত কর্ম্ম জ্ঞানে গিয়া যখন পরিসমাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানকৃত কর্ম্ম—অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ম্ম প্রকাশ পাইতে থাকে। এই কর্ম্মাধীন স্বয়ং ভগবান—তাই ভাগবতজীবন অমোঘ ও অকাট্য। জীবন থাকিলেই তাহার কর্ম্ম আছে—অভাগবত জীবন এবং ভাগবত জীবনের কর্ম্মপার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানবিশেষ হয় কি হেতু? তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইতেছে।

বিভাগঃ শতবৎ ॥১১॥

বিভাগঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদ) শতবৎ (শতকের ন্যায়)।

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে জৈমিনির সমর্থন পক্ষে বলা হইয়াছে, বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে, তাহা বিভাগক্রমে বুঝিতে হইবে। বিদ্যা ও কর্ম্ম নিজ নিজ ফল দিবার জন্য বিগতাত্মার সহিত গমন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলা হইতেছে—যেমন শতবৎ অর্থাৎ একশত মুদ্রা দিয়া ভূমি ও রত্নবিক্রেতাকে দিতে বলিলে কি করিতে হইবে? একজনকেই কি শতমুদ্রা দেওয়া ঠিক হইবে? অথবা বিভাগপ্রক্রিয়ায় একজনকে পঞ্চাশ ও অন্য জনকে পঞ্চাশ দেওয়া ঠিক হইবে? নিশ্চয়ই শেষোক্ত প্রণালী গ্রহণীয়। এইরূপ নিয়মে বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভাগ-প্রণালীতেই ফল প্রদান করেন—এই মত আচার্য্য শঙ্করের। আচার্য্য রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণও শঙ্করের

মত অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যাসদেবের উপরোক্ত সূত্রগুলিকে পূর্ব্বকথিত জৈমিনির কর্ম্মসমর্থিত উক্তির প্রতিবাদস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য মধ্বদেবের সূত্রব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিতেছেন "অসার্ব্বত্রিকী" সূত্রে পুরুষার্থকামীর জ্ঞানাধিকার থাকিলেও, সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। বলা হইয়াছে, উপরোক্ত সূত্র তাহার প্রমাণস্বরূপ বিরচিত হইয়াছে।

বেদে আছে "নবকোট্যো হি দেবানাং তেষাং মধ্যে শতস্য তু। সোমাবিকারো বেদোক্ত ব্রহ্মণী দ্বে শতাধিকে।" অর্থাৎ নবকোটী দেবতার মধ্যে শত দেবতার সমাধিকার আছে। আবার জ্ঞানাধিকারার্থ ব্রহ্ম দ্বিবিধ—পরা এবং অপরা। যখন দেবতাদিগের মধ্যেও শত দেবতার বিভাগ, ব্রহ্মও বিভক্ত, তখন জ্ঞান সর্ব্বত্র যে তুল্য হইবে না, একথায় সংশয় কি আছে? সকল ব্রহ্মপ্রার্থীর জ্ঞানাধিকার আছে। কিন্তু ঐ জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত শতবৎ বিভক্ত। সিদ্ধান্ত পক্ষে বলা যায়, আচার্য্য জৈমিনি জ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মপ্রাধান্য দেখাইবার জন্য পরলোকগামীর সহিত কেবল জ্ঞান নয়, কর্ম্মও সঙ্গে যায়—এইরূপ শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে যখন উহার প্রকারভেদ আছে, তখন এ বিদ্যা ও কর্ম্মের অনুগমন একপক্ষে হওয়া অযৌক্তিক কথা নয়। অতএব আচার্য্য জৈমিনির উপরোক্ত শ্রুতিপ্রমাণের সর্ব্বত্রতা না হওয়ায়, উহা পরব্রহ্ম পক্ষে গৃহীত হইল না। অতঃপর বলা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

নারীর দায়িত্ব

শ্রীমতী মৃণ্ময়ী রায়

মানুষের ইতিহাসে এমন একটা কালে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যে, আমাদের জীবন গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক প্রদেশে নানা প্রকার স্বতন্ত্র সমস্যা আছে—পুরুষ এবং নারী উভয়কেই মিলে এই সকল সমস্যার সমাধানে চেষ্টিত হতে হয়।

বাংলার আদি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে আমরা এক মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছিলাম—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এই যে মহামানবতার বাণী, এ বাণী শুধু বাংলাদেশেরই বাণী নয়, সমস্ত পৃথিবীর মর্ম্মবাণী।

আকাশ, আলো, বাতাস, অন্ধকার, জ্যোতির্লোক, পাখীর কলস্বর, বেণুবনের গান, সমুদ্রের কলস্বর, বিচিত্র গন্ধসম্ভার—জীবনময়ী ধরিত্রীতে থরে থরে বিকাশলাভ করেছে—তারই মধ্যে ব্যক্ত রয়েছে অব্যক্ত এই শব্দ। এই বর্ণ, এই গন্ধ স্পষ্ট উপভোগ বা উপলব্ধি কর্ব্বে যে মানবাত্মা, সে আজ দৈহিক অন্ন-বস্ত্র বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন।

মানবজীবনের মধ্যেই জীব-জীবনের মনোময় চেতনা প্রকাশমান হয়েছে। মানুষ আত্মাকে চিনে' চিনলে সমস্ত সৃষ্টিকে, অনুভব করলে স্রষ্টাকে। এই সাধনাই ভারতীয় সাধনার স্তরে স্তরে বিকাশলাভ করেছে।

বাংলার মানুষ একদিন এই সাধনায় অপরূপ অরূপের গুণ্ঠন মোচন করে' প্রকাশ করেছিল 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

সেই মানুষই সব সত্যের আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু এই দারুণ সমস্যার দিনে যন্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত হয়ে পড়েছে মানুষের সকল উপলব্ধি। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে, ধর্ম্মবিপ্লবের পর ধর্ম্মবিপ্লব হয়েছে, জাতির পর জাতি এসেছে অভিযানে—হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ; তবুও আমাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গেনি। ইংরাজ আমলেই আমাদের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার মানুষ সামলে উঠেছিল এই সমাজ-ব্যবস্থার গুণে। আমাদের বাংলা-দেশে আমাদের সমাজব্যবস্থা, আমাদের বিবাহ, উপনয়ন, আমাদের আহারাদি, অশন-বসন সমস্ত কিছুর উপরেই বার-বার এই অভিযানের প্রতিচ্ছায়া পড়লেও, আমাদের মূল সংস্কৃতির ভাঙ্গন ধরাতে পারেনি।

আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বাংলাদেশে জীবনস্রোতঃ নতুন খাদ কেটে চলেছে, এই প্রবাহ অত্যন্ত গভীর চঞ্চল, তীব্রস্রোতঃসম্পন্ন। এই স্রোতে তরণীতে আজকের

দিনে দৃঢ়হস্তে ক্ষেপণী চালনা করতে পারেন কেবলমাত্র নারীই। তাই নারীর কর্ত্তব্য আজ এসে পড়েছে বহুমুখী হয়ে'। ঘরে-বাইরে নারীশক্তি আজ যে কত বড় শক্তি হয়ে উঠেছে, তা' আজ প্রত্যক্ষ সত্যরূপেই সকলেই অনুভব করতে পারেন।

পৃথিবীর নব ভাবের সংঘাতে পুরাতনের ধ্বংসের কম্পন আজ সুরু হয়ে গেছে, মানুষ আজ হয়েছে ভ্রষ্ট। শীর্ণ উদরে তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, চক্ষে তার লুব্ধ দৃষ্টি।

বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থার তিনটি কোণ আজ ভেঙ্গে পড়েছে। বাকি আছে শুধু একটি কোণ—এই একটি কোণের ভার নিতে হবে বাংলার নারী-সমাজকে। সুদূর অতীতকাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এসে ভারতবর্ষের আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন স্বীকার করেছে, কিন্তু মানবজাতির এই মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রের তথাপি মর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন খনা, লীলাবতী, সতী সাবিত্রীর দল।

শিব এবং অশিবের দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে, অশিবকে স্বীকার করে' নিলে শিবের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

এত বিপ্লবের ভিতরেও আমাদের ভিতর যা' কিছু ছিল, গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের সময়ে বেশীর ভাগই তা' আমরা হারিয়েছি। দুর্ভিক্ষের যে দারুণ বিভীষিকাময় তাণ্ডব নৃত্য দেশের বুকের উপর সংঘটিত হয়েছিল, তাহা মনে করলে বুক কেঁপে ওঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। লক্ষ, লক্ষ নিরন্ন লোক ক্ষুধার তাড়নায় অকালে মৃত্যুকে বরণ করে' নিল, শত শত পরিবার জগৎ থেকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে' মুছে গেল—এ দেখেও একদল ব্যবসায়ী অর্থের লোভে মুগ্ধ হয়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দিলে। ক্ষুধার্ত্ত নর-নারী শিশু সন্তানকে বক্ষে নিয়ে 'হা অন্ন,' 'হা অন্ন' করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শত শত লোক পথপ্রান্তেই তাদের দুর্ভাগা জীবনের জ্বালা মিটিয়ে গেল—কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে'ও কলিকাতা নগরীর প্রসাধন-বিলাসিতা এতটুকু ম্লান হয় নি—থিয়েটার, বায়োস্কোপের ভীড় এতটুকুও কমেনি!

বিদেশে শিক্ষাকালে একবার দেখেছিলাম, কলেজের মেয়েরা চায়েতে চিনি খায় না এবং এই চিনির সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ দেশের ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হচ্ছে, কোন দিন যদি দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়, তখন এই সঞ্চিত অর্থ সেই দুর্ভিক্ষশান্তির উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। এই পরিকল্পনাটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি যে শুধুই আমার নিজের জন্যেই বেঁচে নেই, দেশের এবং দশের কাজে যে আমার ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োগ করিতে পারি, এই কল্পনা মানুষের কাছে সকলের চেয়ে বড় আর মহৎ।

বর্ত্তমানে আমাদের নারী সমাজ সেই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছে। কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কোন কিছুরই অভাব নেই। আজ যাঁরা বাইরে বেরিয়েছেন, নানা অবস্থার নর-নারীর সঙ্গে নানাভাবে মিশেছেন, তাঁরা শুধু অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেন নি, কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন রূপ তাঁদের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর যাঁরা ঘরে আছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য যাঁরা বাইরে বেরিয়েছেন তাঁদের চেয়ে বুঝি বা বেশীই! আমাদের এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করতে, ভবিষ্যতে মানবজাতিকে শত শত সুসন্তান দিয়ে গঠন করতে, একমাত্র তাঁরাই পারেন।

কুমোর যেমন একই মাটির তাল থেকে নানারকম পাত্র গঠন করে, শিশুর জননী যত্ন নিলে সেই শিশুরূপ কাদার তালকে দেশের ও দশের গৌরব করে' তুলতে পারেন।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তার কোন আদর্শ, মানসিক ভাব-বিপর্য্যয় বা বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে না। এই সব বৃত্তি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে তার চিত্তে জেগে ওঠে। শিশু পশুর ন্যায় আচরণ না করে' মানুষের ন্যায় আচরণ করে এজন্যই যে, তার শরীর এরূপভাবেই গঠিত। শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাই মানুষ অপেক্ষা জিনিষের দিকে আকৃষ্ট হয় বেশী।

মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রী তিনভাগে বিভক্ত—এক ভাগ গ্রহণ করে, এক ভাগ কার্য্য করে, এক ভাগ সংযোগ সাধন করে। চেতনাবোধ ও বুদ্ধিমত্তার জন্য দুই প্রকার স্নায়ুতন্ত্রী কার্য্যকরী থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধিমত্তা এবং তাহার চালনা স্নায়ুতন্ত্রীর অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সেইজন্যই মানুষের প্রকৃতি যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে আগত, তাহা স্নায়ুতন্ত্রীর গঠন ও অবস্থানের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। মানবের শারীরিক গঠন দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক

যাহা নিজ হইতে গঠিত হয় এবং দ্বিতীয় যাহা শারীরিক গঠন ও তাহার কাজ। কাজ করিবার ক্ষমতাও মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম দ্বারা গঠিত। সাধারণ কাজ বলিতে এই বুঝা যায়—হৃৎস্পন্দন, পরিপাক ক্রিয়া, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের কাজ। আলো পড়িলে চোখ কুঁচকান, হাঁচি, কাশি, হাই তোলা প্রভৃতি স্বভাবজাত! অনুকরণ করা, মারামারি করা, ভয় করা—এ সকলও মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু কার্যকরী ক্ষমতা বলতে আমরা এই বুঝি যে, যার দ্বারা একজন লোক সমস্ত ভাষা সম্বন্ধে খুব জ্ঞানী হয়, একজন অত্যন্ত কর্ম্মপটু, আবার আর একজন হয়ত অনেক জিনিষ তৈয়ারী করতে ভাল জানেন। অবশ্য মানুষের ক্ষমতা এক রকম নয়, প্রত্যেকেরই আলাদা, কিন্তু এসব গুণকে খুব সূক্ষ্মভাবে ভাগ করা যায় না। এ বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। একজন যাকে বলবেন জৈব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অপর জন হয়ত তারই বিপক্ষে মত দিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হয় যদি আমরা বলি যে, এই সবেরই প্রকৃতি এক, কেবল প্রত্যেকটীরই ধরণ, গঠন, কাজ আলাদা।

মানবপ্রকৃতির মূলতথ্য অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখি যে, প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি কতকটা এক-রকম। কারণ প্রত্যেক শিশুর শরীরেই স্নায়ু কাজ করছে এবং কাজ অবিরত কলের ন্যায়ই হচ্ছে। এই সকল স্নায়বিক কাজ শৈশবস্থায় আমাদের অজ্ঞাত এবং আয়ত্তাধীন নয়। স্নায়ুতন্ত্রী কলের ন্যায় কাজ করে' যায় এবং কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতানুসারে কাজ করে না। একটী নয় মাসের শিশুর চোখের সম্মুখে একটী ঝকঝকে জিনিষ ধরিলে তাহার চক্ষুতে তাহা প্রতিফলিত হয় এবং তাহার স্নায়ুতে আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হয়ে যায়—শিশু উহা লইবার জন্য হাত বাড়ায়।

শিশুমাত্রেই যে সকল কাজ সাধারণতঃ করে' থাকে, তা দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। রক্ষণশীল প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া,

২। গঠনশীল প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া।

রক্ষণশীল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে পুরাতনকে ধরে' রাখা এবং গঠনশীল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য নূতন কিছু গঠন করা। একদিকে ইহা যেমন সত্য যে, মানুষের ক্রিয়ামাত্রই কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; অপর দিকে ইহাও তেমনই সত্য যে, মানুষের মধ্যে রক্ষণশীল ও গঠনশীল উভয় প্রবৃত্তিই বর্ত্তমান। ছেলের মা তাকে নাইয়ে, খাইয়ে ও গতানুগতিক ভাবে স্কুলে পাঠিয়েই কর্ত্তব্য শেষ না করে' যদি তার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু নজর রেখে চলেন, তা'হলে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

একটা জাতির সম্পৎ-স্বাধীনতা কোনও দানের বস্তু হতে পারে না। ভিক্ষার পথে কখনও মুক্তি আসে না। মুক্তিকে অর্জ্জন করবার একটী মাত্র পথই আছে, সে পথ মানুষ তৈরীর পথ,—সুসন্তান মনে-প্রাণে কামনা করা। তবেই একটা সুস্থ সবল জাতির সৃষ্টি সম্ভব। এই সাধনা—জাতির সৃজন-কামনা,—ব্যক্তিগত নিজের সন্তানই কেবলমাত্র নয়, এই সমস্যার মূলে চাই সকল নারী জাতির সমবেত ঐক্যসাধনা।

আজ আমাদের সার্ব্বলৌকিক প্রীতিকে মর্ম্মের মন্দিরে বসিয়ে পূজা করবার দিন এসেছে। বড় বড় আদর্শের জয়গান কেমন যেন খাপছাড়া শোনাচ্ছে। সুতরাং মহাজাতিত্বের আদর্শ আমাদের হৃদয়ে এখন অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য করুক। যা' কিছু আমাদের সন্তানদের ম্লান করবে, তার কিছুতেই আমরা আমাদের এত বড় দুর্দ্দিনে প্রশ্রয় দিতে পারি নে।

ঐক্যের মধ্যেই শক্তির বীজ নিহিত—একথা যদি সত্যি হয়, তবে আমি আজ যে প্রতিষ্ঠানে এসে দাঁড়িয়েছি, এই প্রতিষ্ঠানের বরণীয় আদর্শ আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে দিকে দিকে আলোকরশ্মি সম্পাত করুক, একান্ত মনে এই কামনাই করি।

* ত্রয়োবিংশবর্ষীয় অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের মহিলাদিবসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী রায়ের (জিতেন্দ্র মেমোরিয়াল ইন্‌ফ্যাণ্ট এণ্ড নার্শারী স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা) অভিভাষণ।

(তৃতীয় খণ্ড : ২৫শ পরিচ্ছেদ)

ঈশ্বর ও তাঁর ইচ্ছাকে রূপ দেয় যে শক্তি, এই দুই লইয়া পুরুষ ও প্রকৃতি। ভারতের দাম্পত্যধর্ম্মে এই নীতি বিগ্রহান্বিত হইতে চাহিয়াছে। ভারতীয় মস্তিস্ক ম্লান অথবা বিকৃত হইলে, ভারতের রক্তধারার যে মৌলিক আদর্শ তাহা আর অবধারণ করা যায় না। "জীবন-সঙ্গিনী"র কথা লিখিতে গিয়া আমি তাই বহুবার বলিয়াছি—ইহা আমারই জীবন কথা। অবশ্য কথাটা সমগ্র বলা সম্ভব হইতেছে না, এক চতুর্থাংশ বলিতেও বাধিয়াছে, তাহার কতকটা কারণ অপ্রকাশ্য রাখিতে আমি বাধ্য। আর ইহার কতক কারণ পররাষ্ট্রাধীনে অনেক কথা বাদ দিয়াই এই জীবন-কথা লিখিতে হইতেছে। কেননা, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, বাংলার রাষ্ট্রবিপ্লবের যে ইতিহাস, তাহার অনেক কথা আমি ভিন্ন অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নহে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কাহারও কাহারও কাছে আমি ভাবপ্রবণ অথবা নাটকীয় চরিত্রের লোক বলিয়া বিশেষিত হইলেও, সেই ভাবপ্রবণতাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রসাধনা বাংলায় একদিন যে রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বস্তুতন্ত্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, সকল কথা প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না। তবুও যে অপূর্ণ জীবনকথা লিখিতেছি, তাহা শুনিবার তাগিদ্ আমার সহতীর্থ ব্যতীতও, দেশের অসংখ্য নরনারীর নিকট হইতে আসিয়াছে। এই লেখার মধ্যেই আমার সাধ্বী পত্নীর যে অতুলনীয় প্রভাব নিহিত আছে, তাহা গভীর চিন্তাশীল দরদীরা বুঝিতেছেন। "জীবন-সঙ্গিনী"র সার্থকতা এইখানেই।

কয়েক ছত্র অবান্তর কথার পর স্মৃতি হইতে পুনরায় মূল প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। করুণা আরোগ্য হইলে, আবার সঙ্ঘসংসার যেমন চলিতেছিল তাহার অন্যথা হইল না। সঙ্ঘসৃষ্টির মূলে যে মহতী প্রেরণা ছিল, তাহা সেদিন অনেকে বুঝে নাই; আমি কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিলাম। যে উৎসর্গের অবদানে মানুষ দেবতা হয়, যে ত্যাগের হোমানলে কর্ম্মক্ষেত্র সমুজ্জল কান্তি ধরে, যে আনুগত্যে বৃহৎ আদর্শ সুসিদ্ধ হয়, তাহার বীজ অনেকের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। চিত্ত, মন, প্রাণ যতই অতিষ্ঠ হউক, পদতলে যত রক্তই ঝরিয়া পড়ুক, কয়েক জন পুরুষ ও নারী বিপ্লবীর মতই আমার সঙ্কেতে প্রাণ বলি দিবে, এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই ছিল না। এই পথে সকলকে ডিঙ্গাইয়া আমার পত্নী এই সময়ে পুরোভাগে দাঁড়াইবার প্রযত্ন করিতেছিলেন, তাঁহাকে সে অধিকার দিতে আমারও কোন কার্পণ্য ছিল না। অন্য সকলেরও ইহাই ছিল অন্তরের চাওয়া। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, ইহার জন্য দুর্জ্জয় তপস্যাই আছে। সেই তপস্যার ইতিহাসই আমার জীবনসঙ্গিনীর ইতিবৃত্ত।

কাম ও কাঞ্চন, এই দুই লইয়া জীবনের সাধনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নী গ্রহণ করিলেও, পত্নীর সহিত সম্বন্ধ মাতৃভাবে উন্নীত করিয়া, কামজয়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কাঞ্চন বর্জ্জনই ছিল তাঁহার তপস্যা। আমার ভগবান ভিন্ন সঙ্কেতে জীবনগতি ছুটাইয়াছিলেন। আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে কাম ও কাঞ্চন উভয়ই। কিন্তু পদে পদে ভোগ করিতে বাধিয়াছে। তাই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম—এই দুইটার শোধন-মন্ত্রই জপিয়া যাইব। বর্জ্জনে শোধন হয় না, তাই গ্রহণ। কিন্তু এই দুই হইতে আসক্তিকে দূরেই রাখিতে হইয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিতেছি। আজ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। এই ২১ বৎসরে সম্পৎ-সৃষ্টি হইয়াছে, নারীর অঞ্চল দুলিয়াছে আমাকে ঘিরিয়া; কিন্তু এই দুইয়ের সহিত আসক্তির সম্পর্ক রাখিতে পারি নাই। অর্থপ্রতিষ্ঠানেও ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ আমি যেমন নিঃসঙ্গ, নারীসংগঠনের কাজে অতিশয় বিব্রত হইয়াও, কোথাও সংলিপ্ত হইতে পারিলাম না। এই সাধনাই ছিল সেদিনেরও লক্ষ্য।

নিজের বসতবাটীটাও করিয়া দিয়াছিলাম অন্যের নামে। কোন সম্পত্তির সহিত নিজের যোগাযোগ রাখিতে বাধিত। ব্যবসাবাণিজ্যসৃষ্টির জন্য আমার শ্রম ও অধ্যবসায় ছিল। কিন্তু কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া রাখার প্রবৃত্তি হইত না। অন্য দিকে নারীর চরিত্র লইয়া যে নিরাসক্ত সংগঠনপ্রয়াস, তাহার পথে যেন শ্রীমতীই বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইলেন। যাহা আমার সাধন, তাহার পথে অন্তরায়-সৃজন হইলে, আমার যেন দম বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে আমি একটু এই দিকে ফাঁক খুঁজিতেছিলাম।

আমার স্ত্রীর দিক্ দিয়া এতদিন এই পথে কোন বাধাই ছিল না। অন্য কোন দিক্ দিয়াও তিনি বাধা প্রদান করেন নাই। তাঁর ভবিষ্যতের চিন্তা এক কথায় শেষ হইয়াছিল। অর্থের আশ্রয় তিনি আর বড় করিয়া দেখিতেন না। পল্লীবধূদের লইয়া আমার আলোচনা-আন্দোলনে তিনি আমায় উৎসাহ দিতেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। কেন না, স্বতন্ত্র স্বার্থ কেন্দ্র করিয়া যে সকল মহিলার জীবন, তাহাদের আত্মানুশীলনের ফল একেবারেই কিছু যে হয় না, এমন না হইলেও, সঙ্ঘকে কেন্দ্র করিয়া একদল তরুণীর জীবন যদি গড়িয়া না উঠে, আমার অভিসন্ধি সফল হইতে পারে না। এই স্বপ্ন-সূত্র আশ্রয় করিয়াই অমিয়বালার পর নির্ম্মলা প্রমুখা অনেকগুলি কিশোরী সঙ্ঘকেন্দ্রে সমবেত হইয়াছিল। অমিয়প্রসূনকে লইয়াই গোল বাধিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি যে কোন হীন মনোভাব লইয়া এই ক্ষেত্রে পরিপন্থী হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিলে অতিশয় ভুল করা হইবে। আমার যে উচ্ছল জীবনপ্রবাহ এই পথে প্রবল বেগে ছুটিয়াছিল, তিনি মাঝে পড়িয়া তাহাকে স্থির ও মন্থর করিতেই চাহিলেন। এতখানি বুঝাবুঝির ব্যাপার তখন না থাকিলেও, আমি জীবনের উদ্দাম গতিটাকে অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও আঘাতের পর আঘাতে যেমন হিসাবের অঙ্কে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতেছিলাম, নারীর জীবনসাধনার সহায় হইতেও নিজেকে অনেকখানি সংযত ও শৃঙ্খলিত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বুঝিলাম। তাই তাঁর বাধাও সহায় হইল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পর এই দিক্ দিয়া আমি নূতন বিজ্ঞান লাভ করিলাম। আমি নারী-সাধনার দুই একটা দিগদর্শন করিলেই আমার তাৎকালীন জীবনসাধনার নিগূঢ় রহস্যের কিছু মর্ম্মভেদ হইবে।

মানুষের জীবন বিচিত্র সমস্যাসমাকীর্ণ। নারী আরও জটিল সমস্যাময়ী। পুরুষের জীবন লইয়া যে অনুশীলন করিবার অবকাশ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, তাহার জীবনের এমন এক একটা দীর্ঘদিনস্থায়ী স্তর আবিষ্কৃত হয়, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া এক একটা যুগের সাধনা চলিতে পারে। প্রকৃতির এই রূপান্তর যদিও চিরস্থায়ী নয়, তবুও পুরুষচরিত্র কোন এক মহান্ আদর্শে ভর করিয়া দাঁড়াইবার দীর্ঘ অবকাশ পায়। নারীচরিত্রের এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তি একেবারেই মিলে না—সব কিছুকে তলাইয়া দিতে পারিলেই তার হৃদয় যেন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। সে নিজেও যেমন অস্থির চঞ্চল, সর্ব্বদা তলাইয়া যাইতেই চাহে, যাহাকে সে আশ্রয় করে তাহাকেও সে স্থির থাকিতে দেয় না—নারীসংসর্গে প্রত্যেক পুরুষ আমার কথা নিশ্চয় অবধারণ করিবেন। এই ক্ষেত্রেই আমি যেন চিরসমস্যায় জড়াইয়া পড়িয়াছি। নারী আশ্রয় চাহে—আশ্রয়বস্তুর পূর্ত্তির জন্য নহে। কেননা, নিজের মধ্যেই তাহার যে অক্ষমতা-বোধ, তাহা পূরণ করার আকাঙ্ক্ষাই অন্যকে আশ্রয় করিতে তাহাকে প্রেরণা দেয়। সঙ্ঘে যখন অনেকগুলি কুমারী জড় হইল তখন তাহারা কোন্ বস্তু আশ্রয় করিয়া আত্মস্থ থাকিতে পারে, তাহারই সন্ধান করিতে আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

আমার স্ত্রী ইহা আমার নিছক দুর্ভাবনা বলিয়াই আমলে আনিতেন না। কিন্তু আমি জানিতাম—পুরুষের ন্যায় নারীকেও শক্ত দেহ ও মন লইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

এইখানে কয়েকজন নারী যদি নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে না পারে, সঙ্ঘের লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ হইবে না। আমি নারী-মন্দির-রচনায় অশেষ শ্রম ও শক্তি ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। কোন ব্যক্তিগত জীবনের দায়ে এই পথে পা বাড়াই নাই, নারীত্বের পূজা ও মর্য্যাদা দিতেই আমার এই আকুলতা।

যোগদর্শনের চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগের উপদেশ তাহার অনুসরণ আমি করিয়াছি; কিন্তু তাহা জীবন-

সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা হইলেও, জীবনের সার্ব্বাঙ্গীন পূর্ত্তি তাহাতে আমি পাই নাই। আমি যোগ চাহিয়াছি একের সহিত অন্যের। এই যোগ নানা সম্বন্ধে সিদ্ধ হইতে পারে, এই প্রত্যয় ছিল সেদিনের গোড়ার কথা। কিন্তু এই সকল সম্বন্ধ প্রাকৃত না হওয়ার দিকে গোড়া হইতেই লক্ষ্য ছিল। সম্বন্ধ রসবস্তু। সখ্য, শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চ রসের মধ্যে মেয়েদের ভাল লাগিত মাধুর্য্য। ইহাকে যতই অপ্রাকৃত করিয়া ধরা হউক, ইহার মধ্যে যে থাকিয়া যাইত একটা পার্থিব সম্বন্ধের অনুভূতি, তাহা হইতে মুক্তি সুসাধ্য ছিল না। সাধনার অনেক পরে বুঝা গিয়াছে যোগসম্বন্ধের ইহা প্রাথমিক পর্য্যায় মাত্র। ইহার উপরে যে উজ্জ্বল-রস-সম্বন্ধ, নারীর চিত্ত যদি সেইখানে উঠিয়া ধরা দেয়, তবেই সে আত্মস্থা হইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া পুরুষের মতই বলিতে পারে, 'আমি নারী হইলেও, আমি মানুষ।' তাহার কণ্ঠে তখনই ঋক্‌ধ্বনি উঠিবে "অহং রাষ্ট্রীসঙ্গমনীবসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাং"। আমি এইরূপ নারীচরিত্র-সংগঠনের লক্ষ্যে সঙ্ঘের নারীমন্দির গড়িতে চাহিয়াছি। কোন বাধায় কোন দিন এই ক্ষেত্রে বিমুখ হই নাই।

ধ্যান, উপাসনা, আহার-নিদ্রার সংযম, উপবাস প্রভৃতি ব্রতাদি অপেক্ষা নিত্য জীবনধর্ম্মে নারীর স্বরূপচৈতন্য জাগ্রত রাখার দৃষ্টান্ত দিতেই বসিয়াছি। যখন দেখিলাম—গৃহদেবীর কড়া শাসনে আমি তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারি না—সর্ব্বসময়ে তাঁহাতেই আমার সবখানি নিয়োজিত রাখিতে আমি বাধ্য হইতেছি, তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার পূর্ত্তির অভাবের কথা আমি ভাবিতেই পারিতাম না। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকাল হইতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যপূত জীবন পূর্ণতার বিগ্রহ বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা ছিল। বৈধী সাধনার এই নির্ম্মম দৃঢ়তা একটা নারীজীবনের সবখানি নাও হইতে পারে, এইরূপ ক্ষুদ্র কল্পনা তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে স্থান পাইত না। তাঁহাকে আমি মহিমাময়ী অপ্রাকৃত জীবনপথের পরম সঙ্গিনীরূপেই দেখিতাম। সেদিন বুঝি নাই বাহিরটা সৌষ্ঠবসম্পন্ন নিখুঁত হইলেও, ভিতরে যে হৃদয়বস্তুটা আছে, সেটা তখনও তাঁহার পূর্ত্তির অভাবে কাঁদিয়া মরিতে পারে, আমার হৃদয়বস্তুটার অন্যের প্রতি সত্য প্রসারণে তাঁহার হৃদয়ে তখনও এই জন্য কম্পন সৃষ্টি করে। কর্ম্মসঙ্গিনী হইলেই অভিন্নহৃদয় হওয়া কোন দিন সম্ভব নহে, এ কথা বুঝিয়াছি। আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে পাইয়াছি, এই বোধে হৃদয় প্রসারিত করিতে চাহিয়াছি। তিনি এইখানেই প্রথমে ক্ষুণ্ণ হইয়া আমায় আঘাত দিতে কুণ্ঠা করেন নাই, কিন্তু এই সময় হইতেই আমার সকল অবস্থাকে স্বীকার করিয়া নিজেকে ভরাইয়া তুলিতে অন্তর-সাধনায় আত্মস্থ হইয়াছিলেন। এ বড় কঠোর সাধনা। এই সময়ে তাঁহাকে আমি অনেক কাজে অপ্রসন্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি তাহা অব্যক্ত রাখিয়াই ভিতরে ভিতরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম "মেয়েদের কাজে-কর্ম্মে তুমি সতত নিযুক্ত রাখিয়াছ, তোমার সজাগ দৃষ্টিও তাহাদের রক্ষা করিতেছে। কিন্তু প্রত্যেকে অন্তরের সংবাদ প্রকাশ করার যোগ্য আশ্রয় যদি না পায়, একদিন তাহাদের সবই বিষাক্ত মনে হইবে।" তিনি তদুত্তরে বলিলেন "ভিতরে ভিতরেই উহারা সবকিছু সমাধান যদি করিতে না পারে, অন্তরের সংবাদ লওয়ার জন্য উহাদের ঘাঁটাইয়া ফল ভাল হইবে না।"

আমার মনে হইল, আমি এই বিষয়ে উপরপড়া হইয়া যেন ব্যস্ত হইয়া না পড়ি, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আমি তাই তাঁহার কথায় সায় না দিয়া বলিলাম "এইরূপ ঔদাসীন্য থাকিলে মেয়েদের প্রকৃতি কোনদিন পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহার জন্য একটা ব্যবস্থা চাই।"

তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন "আজ তুমি আছ, না হয় ব্যবস্থা হইবে ; কিন্তু চিরদিন উহাদের লইয়া কে মনের গহনে গিয়া সমস্যার সমাধান করিবে ? ঐ বিষয়টা উহাদের হাতেই ছাড়িয়া দাও। ঐখানে যে কোন পুরুষ সহায় হইতে যাইবে, তাহারই উপরে নারীপ্রকৃতির যে আক্রমণ আসিবে তাহাতে পুরুষ রক্ষা পাইবে না।"

আমি বলিলাম "এই ভয় আমার নাই।"

তিনি বলিলেন "তোমার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমি মনে করি—উহারা নিজেরাই গড়িয়া উঠুক। তোমার অথবা অন্যের সহায়তা ব্যতীত একটা কিছু তাহাদের

অনুভব করিতে দাও, যাহার উপর দাঁড়াইয়া তাহারা মানুষ হইবে।"

আমার মনে হইল—এই কথাগুলির মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের কার্পণ্য আছে। এতগুলি মেয়েকে গড়িয়া তোলার শিক্ষা আছে। সুনিবিড় সাধনা আছে। গৃহদেবী তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। আমি জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব! আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি দৈনন্দিন জীবননীতির মধ্য দিয়াই উহাদের আত্মিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে চাই।" এজন্য কিছুদিন পরে এক নির্দ্দেশ জারি করিলাম—"তোমরা প্রতিদিন প্রভাতে উপাসনার পূর্ব্বে সঙ্ঘজননীকে প্রণাম করিয়া যাইবে।"

উত্তর আসিল "প্রণামটা শুধু মাকে করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে না, আপনাকেও করিতে চাই।"

তিনি উত্তর শুনিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন "উহাদের জানাইয়া দাও প্রণামটা আমাকে করিতে হইবে না, তোমাকে করিলেই চলিবে।"

আমি বলিলাম "উহাদের স্বভাব-নতি আমার উপরে, ইহা জানা কথা। কিন্তু তাহারা তোমার প্রতি শ্রদ্ধার সাধনা করুক।"

তিনি বলিলেন "আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই। আমাকে কেহ প্রণাম করিলে, সে প্রণতি তোমার কাছে প্রেরণ করিয়া শান্তি পাই। সেদিন * * * আমায় মালা দিতে আসিয়াছিল, আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম। সব কিছু তোমারই প্রাপ্য হউক। ইহাই আমার অন্তরের কথা।"

আমি তাহা জানিতাম। তিনি এই বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাদান কঠোর তপস্যাই মনে হইত। তিনি কাহারও ভক্তিনত শির তাঁহার চরণ স্পর্শ করুক, ইহা চাহিতেন না। তাঁহার কণ্ঠে একগাছি ফুলের মালা দিবারও কাহারও অধিকার ছিল না। কেহ এইরূপ আকূতি লইয়া আসিলে, তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিতেন "এই সকলের মানুষ 'উনি', আমি নহি।"

তবুও আমি মেয়েদের জানাইয়া দিলাম "তোমরা আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া উপাসনায় যোগ দিও।" এই সময়ে নিজে কিছু নিঃসঙ্গ সাধনায় অভিনিবিষ্ট ছিলাম, তাই বলিতে হইল "প্রণাম করিও, কিন্তু কেহ আমার পদস্পর্শ করিবে না, দৃষ্টিও অবনত রাখিতে হইবে।"

মেয়েদের এই কঠোর সাধনায় বহুদিন প্রবৃত্ত রাখিয়াছি। মাসের পর মাস গিয়াছে, আড়াই হাতের অধিক দৃষ্টি তাহাদের সঞ্চালিত করা নিষিদ্ধ করিয়াছি। এত করিয়াও ফল যেটুকু হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। তবে মনে হয়—সঞ্চয়ের যুগে ওগো দেবি, যদি তুমি বিদ্যমান থাকিতে, আমার এই শ্রমের ফসল এত অধিক অপচিত হইত না। দুর্ভাগ্য কাহার, বলিবার ভাষা নাই।

সমুচিত উত্তর পাইলাম—একজন জানাইয়া দিল—"দূরে থাকিয়া প্রণতি জানাই, ইহাই ভাল। নিকটে গিয়া প্রণাম করিব, পদধূলি লইব না, ইহা আমি পারিব না। আপনার উত্তর না পাইলে আমার পক্ষে প্রণাম সম্ভব নহে।"

তিনি এই কথা শুনিলেন, বলিলেন "এইবার কি করিবে?"

আমি বলিলাম "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। উহারা সম্পূর্ণ নিসঃঙ্গ হইয়াই আত্মসাধনায় রত থাকুক।"

সঙ্ঘের নারী বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদের জীবন লইয়া যে কি কঠোর সাধন চলিয়াছিল এবং কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আশ্রয় করিয়া মেয়েদের গভীর আকূতি প্রকাশ পাইত, তাহার আর একটু উদাহরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। কামনার পূর্ত্তি যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহাকে ঈশ্বরের মানুষ করা যায় না। উত্তপ্ত কটাহে সকল ধান কি খৈ হইয়া ফুটিয়া উঠে? আমার আজীবন-তপস্যাও এই ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই। ব্যর্থতার আঘাত চিরদিন পাইয়াছি। প্রতিপদে তাঁহার বাধা ও নিষেধ, সে ছিল, আমি না ব্যথা পাই—এই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু অন্তর্য্যামীর সঙ্কেত আমি কি প্রকারে লঙ্ঘন করিব? কাম ও কাঞ্চনের ক্ষেত্রে তাই আজিও রক্তাক্ত চরণে চলিয়াছি।

প্রত্যেক মেয়েটীর প্রতিদিনের কর্ম্মের পশ্চাতে তাহাকে সচেতন রাখার চেষ্টা করিতাম। কর্ম্ম সাধনার মত করিয়াই সকলে গ্রহণ করুক, এই দিকেই ছিল আমার সজাগ দৃষ্টি। যে মেয়েটী প্রাতঃকাল হইতে গৃহলক্ষ্মীর পশ্চাতে পশ্চাতে একটী টব হাতে ছুটিয়া বেড়াইত আর

তিনি বাড়ীটী ঘুরিয়া তাহাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতেন, তাহাকে বলিয়া দিতাম "এই কর্ম্মটীও ক্ষুদ্র নহে; ইহার মধ্যেও তোমরা আত্মশোধনের চেতনা রক্ষা করিও।" একরূপ একটী তরুণীকে মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে সঙ্ঘ-সন্তানদের অন্নে ঘৃত পরিবেশন করার ভার দিয়া বলিয়া দিতাম, "এই কর্ম্মের মধ্যে শ্রদ্ধার্জ্জনের নীতি নিহিত আছে, এই দিকে সচেতন থাকিও।" এই ক্ষেত্রে একটী ঘটনার বিবৃতি আমার থলির মধ্যে লিখিতভাবে পাইয়া, তাহাই এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে—জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া মেয়েদের আমি কি বৃহৎ আদর্শের পথে লইয়া চলিতে সচেষ্ট ছিলাম। অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে মেয়েদের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মে আমার চিত্ত অবহিত থাকিত। কিন্তু এত করিয়াও এই ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাইলাম না, দেবীর অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে আমার নারীমন্দিরের স্বপ্ন বুঝি অসমাপ্ত হইয়া রহিল!

সঙ্ঘসন্তানদের সহিত একত্র আহারে বসিতাম। সম্ভবতঃ এ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের নাম-গন্ধ নাই। অন্ন-ক্ষেত্রটীকে সৌন্দর্য্যে ও স্বাচ্ছন্দ্যে একটি আদর্শ ক্ষেত্র করিয়া তোলার ইচ্ছা থাকিলেও, ইহা আজিও ঘটিয়া উঠিল না। আমরা ভোজনে বসিতাম—অন্তরেই ছিল তৃপ্তি, নতুবা ভোজনপাত্র দেখিয়া চক্ষে জল আসিত। শালপাতার ফাঁকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অবাধে প্রবেশ করিয়া আমাদের অখণ্ড অন্নক্ষেত্রের স্বপ্নকে উপহাসে উড়াইয়া দিত। এব্ড়ো-খেবড়ো মেঝের উপর আমরা সারি দিয়া বসিতাম। মাথার উপর কড়িকাঠের ফাঁকে অসংখ্য পারাবত পরমানন্দে আমাদের অন্নপাত্রে পুরীষ ত্যাগ করিত। এমনই ছিল আহারের স্থান ও ব্যবস্থা। ইহার উন্নতি করার ইচ্ছা তাঁহারও ছিল। ইহার জন্য আমিও কম উদ্গ্রীব নহি। অবস্থানুসারে অন্নক্ষেত্রের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহা স্বপ্নের তুলনায় গণ্য হয় না। কি জানি কেন প্রতিকারের সাধ্য পাই না। সে দিন ইহার মধ্যেই এই তৃপ্তি ছিল আমাদের অন্নগ্রহণের প্রতি গৃহদেবীর সস্নেহ দৃষ্টি—আর সঙ্ঘকন্যাগণের সশ্রদ্ধ পরিবেশনের আনন্দ। ভোজনাদির অবস্থা-ব্যবস্থার ত্রুটি যতই থাকুক, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না।

আসন বিছাইয়া দিত, জল পরিবেশন করিত, অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিতোষ সহকারে যোগাইত যাহারা, তাহাদের হৃদয়-বস্তুটা এই সকল কর্ম্মে এমন ভাবে সংলিপ্ত হইয়া থাকিত, যাহার স্পর্শে আমরা বেশ তৃপ্তি পাইতাম। প্রত্যেকে নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ কর্ম্ম করিত। কে কোন কর্ম্মের ভার লইয়া ভাবের অনুশীলনে তৎপর আছে, তাহা আমার জানা ছিল। একদিন ঘৃত-পরিবেশনে এই কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট তরুণীকে অনুপস্থিত দেখিয়া আমি একটু বিচলিত হইলাম, আহারাদির পর পত্র লিখিয়া তাহার এই কর্ম্মে বিরতির হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করিলাম। সে নিজেও আমার নিকট অপরাধ করিয়াছে ভাবিয়া একদিন উপবাসে রহিল। এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে লিখিলাম।

"তুমি খাওনি। যা লিখেছি, তার উপর কথা নাই। যে ব্যবস্থার ভার তোমার উপর ছিল, তাহার জন্য তুমিই দায়ী। কিন্তু সে দায় গ্রহণ করার অধিকার যে দিয়াছে, তুমি তাহাতে ব্যর্থ হইলে শাস্তি তাহাকেও লইতে হইবে। তোমার ইচ্ছায় কিছু হয় না; এই জন্য যে কর্ম্মভার আজ লও নাই, তাহার জন্য দায়ী ভগবান। প্রায়শ্চিত্ত এইখানে ন্যস্ত করিয়া অন্ন গ্রহণ কর, ইহাই আমার ইচ্ছা—নতুবা অহংকারই বড় হইবে।"

এই পত্রের উত্তর আসিল। "আমি নিজেকে নির্দ্দোষ, একথা বলিতে পারিতেছি না। আমি শাস্তি চাই। আপনি আমায় যে কাজের ভার যেরূপ ভাবে দিয়াছেন, আমি তাহা ঠিক বুঝি নাই। এইরূপ বুঝিলে আমি কখনই এই ভারটা অন্যের হাতে তুলিয়া দিতাম না। এখন বুঝছি আপনি ব্রত হিসাবে দাদামণিদের পাতে ঘৃত-পরিবেশনের ভার দিয়েছিলেন। সেই ব্রত-ভঙ্গের অক্ষমতা, তার জন্য শাস্তি আমায় নিতে হবে। দাদামণিরা যখন ভোজনে বসেন, তখন কত কথাবার্ত্তা হয়, সেখান ছেড়ে অন্যত্র থাকা সুখেরও নয়, তবুও থাকতে হয় একটা সাধনার প্রভাবে, এই জন্য আমি ঘৃত পরিবেশন করিয়াই অন্যত্র চলিয়া যাই। আজ হইতে আপনার নির্দ্দেশ অমান্য না হয়, তাহার জন্য সচেতন থাকিব।"

ইহার উপর আমি এক দীর্ঘ মন্তব্য করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিলাম—জীবনের প্রতি ছন্দটীর সহিত আমার জাগ্রত চেতনার যোগ থাকে। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভোজনেও প্রবৃত্ত করাইলাম। এই সামান্য ঘটনা লইয়া আমার এতখানি মাথা দেওয়ার মূল্য যে কিছু নাই, এ কথা গৃহদেবী জানাইয়া দিলেন। আমি কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া মেয়েদের চরিত্র সুগঠিত করার দিকে চিরদিন সচেষ্ট থাকিয়াছি।

অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম হইতে বৃহত্তর ক্ষেত্রের আহ্বানেও কাণ দিতে হইত। বাংলার সর্ব্বত্র সংগঠনের প্রেরণা গিয়া পৌছিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্র হইতে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে আমায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। অর্থপ্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত থাকিতাম। "প্রবর্ত্তকে"র ৬৪ পৃষ্ঠা ভরাইবার ভারও আমার উপর ন্যস্ত ছিল। জীবনটার সবখানি অন্তরে বাহিরে কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট রাখিয়া দিন এক প্রকারে কাটিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ শ্রাবণের ধারাবর্ষণ সুরু হওয়ায় মনে পড়িল আবার ১৫ই আগষ্টের কথা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। এই বৎসরের বিশেষত্ব লক্ষ্যে পড়িয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের নামে উৎসব হইল বটে, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারে বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা গান্ধি এই সময়ে যেন আমাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র আহ্মেদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করে। তারপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই খাদি-উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পত্রালাপ হইতে থাকে। তিনি কটিবাস গ্রহণ করিলে, বাংলার দেশব্রতীদের সহিত আমরাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠি। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দোৎসবে চরখা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। উৎসব-মন্দিরে যে সকল বাণী বড় বড় অক্ষরে কাগজে লিখিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে দুইটী শ্রীঅরবিন্দের বাণী ছিল। অবশিষ্টগুলি সবই সঙ্ঘের বাণী। তাহার মধ্যে এই বাণীটী বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল :

"সঙ্ঘের সাধনা জাতির মুক্তির জন্য।"

আমরা ৺শ্যামসুন্দরকে লইয়া শোভাযাত্রায় যে গান গাহিয়াছিলাম, তাহার মধ্যেও ছিল স্বদেশানুরাগের প্রজ্জ্বলিত বহ্নি। তাহার দুই ছত্র এই ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিলাম—

"কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠুক রুদ্র শোণিত ছুটুক অনলস্রোতে।
মর্ম্ম-কবাট আঘাতে আঘাতে নাচুক প্রলয়ঝঞ্ঝাবাতে।"

বহুদিন পরে শত কণ্ঠের এই সঙ্গীতধ্বনি পল্লীবাসীর প্রাণে উৎসবের সঞ্চার করিল।

শ্রীঅরবিন্দের দান প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এইখানে শেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধির সত্য ও ত্যাগের মন্ত্রে অভিষিক্ত হইতে যেন মাথা বাড়াইয়া দিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাত্মা গান্ধির যুগে আমরা নূতন প্রেরণা অনুভব করিলাম। চরখা ও তাঁতের কাজে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাংলা দেশে এক প্রকার অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের খদ্দর-প্রেরণা মহাত্মা গান্ধির আবির্ভাবে নবশ্রী ধারণ করিল। অতঃপর সঙ্ঘের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধির প্রভাব লীলায়িত হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীনবকিশোর মুখোপাধ্যায়

রজনী গো আজি নিও না বিদায়,
শুকতারা আঁখি মেলি' কি যেন কি চায়।
রাতের প্রদীপ হয়ে এল ম্লান
গেয়ো না এখনি বিদায়ের গান
এখনো নিবিড় মায়া আকাশের ছায়।

নীল নয়নে জাগে স্বপন ছবি
এখনি ভেঙ্গো না তারে বিদায় লভি'
মিলনে বাঁধিয়া রাখো প্রিয় পাশে
হৃদয় ভরিয়া মৃদু ফুল বাসে,
তনুর পরশ-সুধা তোমাতে মিলায়!

বাংলাসাহিত্যের শারীরক ভাষ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হ'তে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিষয়ক কোন কুলপ্লাবী আন্দোলন ভারতবর্ষে দেখা যায়নি। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরাট্ দাবাগ্নি অনেক কিছুকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংসের পোষক ছিল না। যা কিছু বর্জ্জিত ও পীড়িত, তাদের ভিতরকার সার-সংগ্রহ সঞ্চিত ক'রে একটা নূতন সৃষ্টির জন্য এই সভ্যতা চিরকাল ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে। ভারতের মধ্য যুগে অর্থাৎ অষ্টম হ'তে দশম শতকের ভিতর একটা আন্তর্জ্জাতিক বোঝাপড়া হয়, তাতে সমগ্র এসিয়ার জীবনতত্ত্ব চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে যায়।* এই সময়ে একটা নূতন প্রেরণায় সমগ্র ভারত আত্মহারা হয়। এই নূতন উপলব্ধি রাষ্ট্রীয় সকল কেন্দ্রগুলিকে বিচলিত ক'রে তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিকে বিস্তৃত করার জন্য সাহিত্য ও কলা-লীলায় সংহত হয় এক বিরাট্ উদ্যম। এই উদ্যমের পরিচয় পাওয়া গেছে ভারতের সমসাময়িক সদ্যবিকশিত সাহিত্য শতদলে ও কলা-রোমাঞ্চে।

এ যুগসন্ধিতে ভারতের সমগ্র দেশ-প্রদেশের কথিত ভাষাগুলিকে দেখা যায় বহু পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায়। প্রাচীন সংস্কৃতভাষা গরুড়ের মত বহু কালের চিন্তার দেবভাব বহন করে' যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃত ভাষা সে সুযোগে সপ্তাশ্বের মত আর্য্যচিন্তাকে চারিদিকে বিস্তৃত করতে থাকে। কিন্তু তাও সীমাবদ্ধ উৎসাহের নাগপাশে সহজেই রুদ্ধগতি হয়ে চিন্তার নব নব রশ্মি-বিস্তারে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের কথিত ভাষাগুলির ভ্রূণ অবস্থা একটা সুস্পষ্ট সৃষ্টির উৎসাহ দ্বারা আকুলিত হয়। এসব ভাষাগুলি ছিল তরল ও গলিত অবস্থার সমগ্র আয়োজনে আকুল। এসব ভাষা সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মত দারুভূত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েনি প্রাচীন চিন্তার রুগ্ন ও পীড়িত আয়োজনে। বিশেষতঃ এই মধ্য যুগের চিন্তার ধারা আর্ষ আর্য্যযুগের পদাঙ্কে চল্‌তে প্রস্তুত ছিল না। এর ধ্বনি ছিল প্রবল, এজন্য এর বাহনও নূতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। মধ্য যুগের নূতন কথিত ভাষা সে যুগের জটিল হিন্দুচিন্তাকে ব্যক্ত করতে দুঃসাহস করেছিল নিজের সুদুর্ল্লভ নমনীয়তা (plasticity)-গুণে। কথিত গণ্‌ভাষা চিরকালই তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার এবং ব্যঞ্জনায় তা' উদগ্রই হয়ে থাকে। এ রকম ভাষাকে আশ্রয় না করলে কোন যুগপ্লাবী আন্দোলন সম্ভব হয় না। প্রাচীন আধারে নূতনকে বহন করা অসম্ভব হয়ে থাকে। এজন্য এই যুগসন্ধিতে সমগ্র ভারতের যে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ঘটে, তাতে চারিদিকে বহু সাহিত্যের পত্তন সম্ভব হয়ে উঠে।

অধ্যাপক Rhys Davids ইন্দো-আর্য্যভাষা পর্য্যায়ে এই রকমের একটি পরিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করেছেন :

(১) আর্য্য বিজেতাগণের কথিত ভাষা

(২) প্রাচীন ভারতের উচ্চাঙ্গ ভাষার বীথিকা অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্য

(৩) আর্য্য ও প্রাক্তন দ্রাবিড় ভাষার মিশ্রণে জাত কথিত ভাষাগুলি

(৪) ভারতের উচ্চাঙ্গ ভাষার দ্বিতীয় বীথিকা— উপনিষদের সাহিত্য

(৫) গান্ধার হ'তে গৌড় পর্য্যন্ত কথিত:ভাষার শ্রেণী-পর্য্যায়।

এর ভিতর কথ্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করে। সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজন্যদের দরবারে এ ভাষাটি বিশেষ অনুগৃহীত হয়। সংস্কৃত যেমন একদা রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করেছিল, প্রাকৃতও অনুরূপ অধিকার লাভ করে ইতিহাসের ঘূর্ণিত ঘটনাচক্রে। কিন্তু তা'তে কালের প্রবহমাণ তরঙ্গভঙ্গের অফুরন্ত আহ্বান নিঃশেষ হয়নি।

* Vide 1. H. G. Well's History of the world. P. 378.

2. Encyclopædia Britanica vol. 12' P. 932.

3. Okakura of the Earth. P. XV. Also P. 77.

আবার স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এই প্রাকৃতও যে বহুমুখী হয়ে পড়েছিল, তা'র নিদর্শনও পাওয়া যায়। বররুচি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে তাঁর "প্রাকৃতপ্রকাশ" গ্রন্থে চার রকমের প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করেছেন, যথা—প্রাকৃত, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী। কাজেই দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই দেশ ও কালের বৈচিত্র্য প্রাকৃতের তরল প্রবাহে উর্ম্মিভঙ্গ সঞ্চার করে। এই বৈচিত্র্য ক্রমশঃ আরও গভীরতর বর্ণ কেলিতে প্রাকৃতের জয়যাত্রাকে ঐশ্বর্য্যবান্ করে। প্রাকৃত বৈয়াকরণিক হেমচন্দ্র* ছয় রকমের প্রাকৃতের উল্লেখ করেছেন, যথা—প্রাকৃত, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকাপৈশাচী, অপভ্রংশ। পণ্ডিত মুকুন্দ শর্ম্মা কাত্যায়নের "প্রাকৃতমঞ্জরী"র ভূমিকায় হেমচন্দ্রনির্দেশিত বিভাগই শিরোধার্য্য করেছেন। এসব আলোচনা হ'তে স্পষ্টই মনে হয় যে, মধ্যযুগের আন্দোলন ভারতের সমগ্র ভাষাসমুচ্চয়কে গুরুভারে পীড়িত করে' নূতন নূতন মার্গ সৃষ্টি করে চিন্তার লঘু ও দূরগামী প্রবাহকে মুকুরিত করতে। তাতে ভাষার ক্ষেত্রে প্রাচীন রাজকীয় পথ ভেঙ্গেচুরে নানা অলিগলির সৃষ্টি হয়—মানবদেহের বিস্তৃত স্নায়ুমণ্ডলীর মত। ভাষা হচ্ছে মনোভাব-প্রকাশের ইঙ্গিতস্থানীয় (suggestive) ব্যাপার। জটিল মনের ও জটিলতর চিন্তাজগতের অফুরন্ত হেরফের ও ধাঁধাঁকে সকল ভাষা আয়ত্ত ও প্রকাশ করতে পারে না। জর্ম্মণ ভাষার সাহায্যে চিন্তার যে কুল-কুণ্ডলিনীকে রূপায়িত করা যায়, ইংরাজীভাষার সাহায্যে তা' সম্ভব হয় না। বহু ভাষার শব্দসম্পদ্ যৎসামান্য, কাজেই অন্তর্ম্মুখী চিন্তার ভ্রূভঙ্গী তাতে বিম্বিত করা চলে না। আবার অপ্রান্ত ব্যবহারে বহু ভাষার অন্বর্থ মলিন ও স্থূল হয়ে পড়ে। ভাষার সম্পদ্ বাড়াতে যখন নূতন শরসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তখন চারিদিক হতে সংগ্রহের ধুম পড়ে সাহিত্য-তূনীর ভর্ত্তির জন্য। এ যুগে প্রাকৃত ভাষার কলেবর সতীদেহের মত ছিন্ন-ভিন্ন, ভারতীয় চিন্তার নূতনতর রূপ বিম্বিত করতে তা ব্যর্থ হয়।

* সিদ্ধান্ত হেমচন্দ্র, অধ্যায় সপ্তম।

মধ্য যুগেই নব নব ভারতীয় পরিক্রমার পথে ভারতীয় ভাষার এক পরীক্ষার যুগ উপস্থিত হয়। ভাবের রাজ্যে এল প্রলয়পয়োধিজলের হিল্লোল যৌবনতরঙ্গের মত! তখন দিগ্বিদিকে খুঁজতে হ'ল উপযুক্ত আধার ও বাহন। বাংলার আদি কবিদের ভিতরই এ ব্যাকুলতা তীব্রভাবে প্রস্ফুট হয়েছে। এসব কষ্টকল্পনা নয়। কবি কহ্ন বলেছেন :

"জো মণ গো অর আলা জালা
আগাম পোথী ইষ্টা মালা
ভণ কইসে সহজ বোলবা জাঅ
কায় বাক্ চিঅ জাসু ন সমা অ"।

অর্থাৎ যাহা মনের ভিতর গোচর তাও জটিল, শাস্ত্রের পুঁথিপত্র ও জপমালাও সেরকম। সহজকে কি করে' বলি বল, কারণ তা'তে শরীর, মন ও বাক্য প্রবেশ করতে পারে না। উপনিষদের "যতো বাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এখানে আরও জটিল গুহ্যধর্ম্মী হয়ে পড়েছে! সহজকে প্রকাশ করাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে পড়েছে ভাষার পক্ষে। কহ্ন আবার বলছেন :

"আলে গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিক কীস
জে হে বোলা তে তরি টাল..."

যে জিনিষ বাক্-পথের অতীত, তাকে কি করে বোঝান হবে? যে বিষয় সে কিছু বলতে যায়, তা অলীক হয়। অথচ আলোচনাপ্রসঙ্গে পরে দেখতে পাওয়া যাবে, বাংলার আদি কবিরা এ অসাধ্য সাধন করেছিল। ভারতের আর কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে এ কাজ সম্ভব হয়নি। এর মুখ্য প্রেরণা ছিল প্রাক্‌ভারতীয় সভ্যতার সৌকুমার্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে এবং এ সভ্যতার বিশ্বসম্পর্কজাত প্রখর নবীনতায়। সে আলোচনা বাংলা সাহিত্যের শারীরক বিচারে অবশ্যম্ভাবী এবং এতকাল যে তা' হয়নি, তা বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত অগৌরবের।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

নূতন পরিস্থিতি

ইউরোপের যুদ্ধান্তের সঙ্গে বৃটেনে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। তথাকার সম্মিলিত জাতীয় শাসন পরিষদের অন্ত হইয়াছে ও একটী "কেয়ার-টেকার" অর্থাৎ তত্ত্বাবধানকারী গভর্ণমেণ্টের অধীনে সংরক্ষণশীল, উদার-পন্থী, সমাজপন্থী ও কমিউনিষ্ট দলের নেতৃবৃন্দ নূতন নির্ব্বাচনের জন্য স্ব-স্ব বাণী ও মত ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সংগ্রামের পরিণামে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় মনোবৃত্তির আসল স্বরূপ ধরা পড়িবে।

ইংলণ্ডের এই রাষ্ট্রীয় সন্ধিক্ষণে, ভারতের ব্যাপার লইয়া স্বতঃই একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে যে বিশ্বজাতি সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে ভারতের কথা লইয়া সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ মলোটভের মন্তব্য ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সময়োচিত আলোচনা আন্তর্জ্জাতিক চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে ও বৃটিশজাতির পক্ষে নিছক চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ভারত সম্বন্ধে একেবারে নীরব নিশ্চিন্ত থাকা আর সম্ভব হয় না। মিঃ চার্চ্চহিলের নেতৃত্বাধীন ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলও ভারতের শাসন-তান্ত্রিক ব্যাপারে যে অশোভনীয় পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটু আধটু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিলে যে স্বজাতি বৃটিশজাতির কাছেও আর তেমন থৈ পাইবেন না, ইহা বুঝিয়াই দীর্ঘদিনের অচল চাকার মরিচা ঝাড়িবার আগ্রহ অনুভব করিয়াছেন। তাই ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর কণ্ঠে নূতন স্বর ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেলের সদিচ্ছাপ্রণোদিত নূতন পরিকল্পনা আজ সকলের প্রাণেই কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিয়াছে।

লর্ড ওয়াভেল স্বয়ং লর্ড এলেনবারীর মন্ত্রশিষ্য। তিনি তাঁহার রণগুরু ও রাষ্ট্রগুরুর মিশর সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই ভারতীয় সমস্যার অনুরূপ সমাধানে আন্তরিক উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি; তাঁহার চরিত্রে ইংরাজের কূটনীতির চেয়ে যোদ্ধজনোচিত ঋজু ও সরল মনোভাবেরই যথেষ্ট পরিচয় মিলে। তাঁর কথা ও পূর্ব্বতন আচরণে অকপট দরদ ও আন্তরিকতার প্রকাশ অনুভব্য। তাই যে প্রস্তাব লইয়া তিনি ভারতে ফিরিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপ্রেরিত কুখ্যাত ক্রিপস্ প্রস্তাবের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নততর সংস্করণ হইলেও, ইহাকে সফল করার জন্য তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যম সহানুভূতি উদ্রেক করিবে ও সর্ব্বত্র সহযোগিতার আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য-গণকে মুক্তিদান ও কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া তিনি এই আব্‌হাওয়ায় আরও আস্থা ও আশা ভাবের সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার এই সাগ্রহ আহ্বানে তাই দেশের প্রায় সর্ব্ববিধ রাষ্ট্র দলের নিকট হইতেই সহানুভূতিপূর্ণ সাড়া পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার আহ্বান-বাণীর মধ্যে যে ত্রুটি-দোষ নাই তাহা নহে; কিন্তু প্রথম ত্রুটি কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদকে আমন্ত্রণ না করা—তিনি মহাত্মা গান্ধীজির পত্র ও তার পাওয়া মাত্রই অবিলম্বে সংশোধন করিয়া শুভবুদ্ধিরই প্রমাণ করিয়াছেন ও ইহাতে তাঁহার পরিকল্পিত সম্মেলনেরও সাফল্যই সূচিত হইয়াছে। অন্য ত্রুটি—বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসকে চিহ্নিত করা—ইহা শুধু অসম্প্রদায়িক ভারত জাতীয়তার প্রতীকস্বরূপ স্বয়ং কংগ্রেসেরই স্বীকৃত হয় নাই তাহা নহে, ইহা হিন্দুজাতির প্রতিভূ-স্বরূপ হিন্দু মহাসভার পক্ষেও বিষম আঘাত, ব্যথা ও অবিচারের কারণ হইয়াছে। এই ত্রুটিও তাঁহার স্বভাব মহানুভবতাগুণে লর্ড ওয়াভেলকে ত্বরিত সংশোধন করিতে দেখিলে আমরা সমধিক সুখী হইতাম। কিন্তু এখানে হয়ত লীগনেতা মিঃ জিন্নার বাধা আছে। তবুও, লর্ড ওয়াভেলের ন্যায় নির্ভীক রাষ্ট্রপুরুষের পক্ষে সে বাধাও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য নহে, ইহাই আমরা অন্ততঃ মনে করি।

কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অপর নিমন্ত্রিতবর্গ সিমলায় পৌঁছিয়াছেন ও মহাত্মা প্রভৃতির সহিত লর্ড ওয়াভেলের প্রাথমিক কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে, এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। অতঃপর, ২৫শে জুন

সম্মেলনের ফলাফল শুনিবার নিখিল ভারত ও বিশ্বমানবের সহিত আমরাও উদ্‌গ্রীব চিত্তে প্রতীক্ষায় থাকিব।

বাংলার শাসনোন্নতি

যুদ্ধোত্তর বাংলার শাসনকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য আর্চিবাল্ড, রাউল্যাণ্ড কমিটীর সভাপতিত্বে এক তদন্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাংলার শাসনব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতর ও সমুন্নত শাসনকার্য্যের পথ নির্দ্দেশ করাই এই তদন্ত কমিটীর উদ্দেশ্য। এই কমিটীর রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা উড়িষ্যা ভিন্ন ভারতের অন্যান্য সর্ব্ব প্রদেশ হইতে কম, বাংলায় মাথা পিছু গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ও অন্য ৪টী বড় প্রদেশ অপেক্ষা কম, যানবাহনের অসুবিধা, রাস্তা ও রেলপথের অপ্রাচুর্য্য, সারকেল অফিসারের অল্পতা, অর্থনীতিক বা সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ লোকের অভাব প্রভৃতি এই প্রদেশীয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটির বিভিন্ন কারণ। ইহা ছাড়া, বড় কারণ—গভর্ণমেণ্টের পিছনে সমর্থন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। ব্যবস্থা পরিষদে পরাজয়ের আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্টকে অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় বিরত থাকিতে হয়। অর্থাৎ সোজা ভাষায় জনমত সমর্থিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই—যাহা না হইলে, উল্লিখিত ত্রুটিগুলি মূলতঃ দূর হওয়ার নহে। কমিটীর সিদ্ধান্ত যদি ইহাই হয়, তবে দেশবাসী যাহা বলিতে চাহে, তাহা হইতে ইহা মর্ম্মতঃ ভিন্ন নহে। এ গোড়ায় গলদ সারিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা কি হইবে?

প্রসঙ্গক্রমে, সাম্প্রদায়িক নীতি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, টেকনিকাল কার্য্যের পদগুলিতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বোত্তম লোক নিয়োগ করা না হইলে অত্যন্ত মারাত্মক ভুল করা হইবে এবং এই প্রদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল আশা বিনষ্ট হইবে। ইহাও প্রণিধান ও সমর্থনযোগ্য।

সিভিল সার্ভিসের চাকুরিয়াদের মনোভাব সম্বন্ধে রিপোর্টে প্রকাশ এক প্রাণহীন মেশিনের যান্ত্রিক পরিচালনার দিকেই তাঁহারা সমধিক মনোযোগী—লোকের মঙ্গলের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা জনগণের সেবক নহে, তাহাদের প্রভুরূপেই নিজেদের মনে করেন। এই মনোভাব অত্যন্ত অন্যায় ও সার্ভিসের নীতির বিরোধী। এই বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারিগণকে তাঁহারা যে জাতির সেবক ও জনসাধারণের প্রতি ভদ্রোচিত ব্যবহার ও সাহায্য করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য—এই শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য একটী ট্রেনিং কোর্সের প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা ইহারও সমর্থন করি।

রিপোর্টের অপর সুপারিশ—উৎকোচ বা ঘুষ সম্বন্ধে। লাইসেন্স প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, অসৎ লোকেরা ঘুষ দিয়া উহা সংগ্রহের জন্য তৎপর হয় ও অস্থায়ী সাময়িক কর্ম্মচারীরা এই অবস্থায় সহজ রোজগারের লোভ সামলাইতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকারের উপায়ও সহজ নহে। ফলে এই দুর্নীতি অতিশয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও এতৎসম্বন্ধে এক প্রকার পরাজিত মনোভাবই আসিয়া পড়িয়াছে। কমিটী তাই কঠোরতম ব্যবস্থায় দুর্নীতি দমনের উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও ইহার সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

দুর্ভিক্ষ-তদন্ত-কমিশনের সিদ্ধান্ত

উডহেড কমিশন বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত-ফল প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কথাগুলি চিত্রগুপ্তের খাতায় অনলবর্ষী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকিয়া বিশ্বমানবের দরবারে বাংলা ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে চিরদিনের জন্যই কলঙ্কিত ও অভিযুক্ত করিবে:—

"About a million and a half of the poor of Bengal died as a direct result of the 1943 famine and the epidemics which followed in its train. Society, together with its organs, failed to protect its weaker members. Indeed, there was a moral, social and administrative break-down.

It has been reckoned that the amount of unusual profits made on the buying and selling of rice during 1943 was Rs 150 crores. Thus every death in the famine was balanced by roughly Rs 1000 excess profit.

The delay in facing the problem of relief and non-declaration of famine were bound up with the unfortunate propaganda policy of 'No shortage', which followed during the months of April to June (1943)

with the support of the Government of India, was unjustified when the danger of famine was plainly apparent.

After considering all the circumstances we can not avoid the conclusion that it lay in the power of the Bengal Government by bold, resolute and well-conceived measures of the right time to have largely prevented the tragedy of the famine as it actually took place."

উডহেড কমিশনের উপরোক্ত অভিমত ও সিদ্ধান্ত তাঁহাদেরই নিজস্ব ভাষায় আমরা সঙ্কলিত করিলাম। ইহার উপর টীকা-টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য কারামুক্ত কংগ্রেস-নেতৃগণ এই দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তিতে যদি উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা লইয়া উষ্মা-প্রকাশের কাহারও কোনই হেতু দেখা যায় না। জহরলালজী সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশবাসীরও লজ্জাজনক আচরণের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই, যাহারা প্রতি মৃত নর-নারীর মৃত্যুর বিনিময়ে ১০০০৲ টাকা অতিরিক্ত রোজগার করিতে ছাড়ে নাই। এ স্বার্থপর কলঙ্কও অনপনেয় ও চিরনিন্দনীয়।

যুদ্ধে শিল্পোন্নতি ও অর্থনীতিক পরিকল্পনা

প্রাচ্যের প্রধান অস্ত্রাগার ভারতবর্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে এদেশের অসামরিক শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির ঐকান্তিক সহযোগিতা ও কর্ম্মপ্রবণতা। ফলে যুদ্ধের সুযোগে কতকগুলি শ্রমশিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত তাঁবু শিল্পে ৪৮ কোটী টাকা উঠিয়াছে ও প্রায় ৫০,০০ শিল্পী নিয়োজিত আছে। তাঁত শিল্প যোগাইয়াছে ২০ লক্ষ কম্বল। রেশমী প্যারাচুটের কাজ বাড়িয়াছে ৩ গুণ। সৈন্যদের পোষাক তৈয়ারী হইয়াছে ১২০ লক্ষ, তজ্জন্য কাপড় বোনা হইয়াছে ২১॥০ কোটী গজ, বোতাম তৈয়ারী হইয়াছে ৫০ কোটী। তাহা ছাড়া, শোলার টুপি ও দড়ির জালও আছে। ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের প্রয়োজনে জাহাজ, নৌকা, মোটর গাড়ীর কাঠাম, রেলের স্লিপার, বারুদের বাক্স প্রভৃতির জন্য কাঠের ব্যবহার হইয়াছে ২,৪১০০০ টন, ১৯৪২-৪৩ সালে ১২,৭৪০০০ টন। সাঁজোয়া গাড়ীও ভারতে নির্ম্মিত হইতেছে।

রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতির কাজ ১০০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোডা, ব্লীচিং-পাউডার, ক্লোরিণ, ট্রিকুণিন্, কেফিণ, বেলেডোনা, কুচি, এমন কি পেনিসিলিন পর্য্যন্ত ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। অস্ত্রোপচার যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে ২,৮৫০০০।

রবারের চাষ এদেশে হইতেছে ও তাহা হইতে টায়ার, নল, গ্যাসমুখোস প্রভৃতি তৈয়ারীও এদেশেই হইতেছে। ঘোড়ার জিন, লাগাম ইত্যাদি কাজে ৩,০০০০ কর্ম্মী, ৭০০ ঠিকাদার নিযুক্ত আছে—উৎপন্ন মাল ১৫ হইতে ২০ কোটী টাকার। ১৯৪৪ এ জুতা তৈয়ারী হইয়াছে ৬০ লক্ষ জোড়া।

যুদ্ধের কাজে উটজশিল্পের দিক্ হইতে ছদ্মবেশের জাল, শোলার টুপি, তাঁবুর বনাত প্রভৃতি রচনায় ১৯৪১-৪২ সালে ৪৯৮ লক্ষ টাকা ও ১৯৪২-৪৩ সালে ৬১০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল শিল্পবিস্তার বর্ত্তমানের চাহিদায় ঘটিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধান্তে উক্ত শিল্পগুলির কি হইবে, তাহার চিন্তা শীঘ্রই আসিবে। তাহা ছাড়া, দেশের আরও বহু শ্রমশিল্প, কুটীরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের উপাদান ও যোগ্যতা ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেগুলি সংহত করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনায় ভারতের অর্থনীতিক পুনর্গঠনই গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কংগ্রেসের অর্থনীতিক পরিকল্পনা অসমাপ্তই রহিয়া গিয়াছে। তাহার পর বৃহৎশিল্পের পক্ষ হইতে ধনপতিগণের বোম্বাই প্ল্যান, র‍্যাডিকেল পার্টির গণ-প্ল্যান ও বিভিন্ন প্রদেশিক গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রভৃতির প্রকাশ ও তাহা লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। স্যার আর্দ্দেশী দালাল ভারত গভর্ণমেণ্টের নিয়োগে ইহারই জন্য কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার পক্ষ হইতে আমরা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ অর্থক্ষেত্রের ধুরন্ধরগণের নিকট এ বিষয়ে যোগ্য আলো ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রত্যাশা করি।

সেল-ট্যাক্স

এক পয়সা, দুই পয়সা, এইবার (২৫শে জুন হইতে) তিন পয়সা টাকা প্রতি বিক্রয়-কর বৃদ্ধি পাইল। ইহা প্রকারান্তরে দরিদ্র জনসাধারণেরই উপর আদায়ী কর। বাংলার বণিক্-মণ্ডলের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আমরাও জনসাধারণের মুখ চাহিয়া এই করবৃদ্ধি যাহাতে অচিরে রোধ হয় সেইদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দাশমিক আন্দোলন

মহাবীর নেপোলেঁয়িন ফরাসী বিপ্লবের শেষে ফ্রান্সে দাশমিক পদ্ধতিতে ওজন ও পণ্যমূল্যাদি প্রথা প্রচলন করেন। উহাই আমরা নেপোলিয়নের সর্ব্বোত্তম স্থায়ী কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি। এই প্রণালী বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবহারেও সহজ-সাধ্য বলিয়াই প্রায় সকল সভ্যদেশে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে নানা কারণে ইহা এখনও গ্রাহ্য হয় নাই।

ভারতে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করার একটা প্রেরণা দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা পূর্ব্বেও এখানে হইয়াছে। সম্প্রতি ২৯।১এ বলদেব পাড়া রোড, কলিকাতায় "ভারত দাশমিক সমিতি" (Indian Decimal Society) নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সমিতির পরামর্শদাতারূপে আছেন। ইহাদের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা এই প্রথার পক্ষপাতী এবং "দাশমিক সমিতি"র প্রেরণার আশু সাফল্য কামনা করিতেছি।

সুপ্তিলোকে

শ্রীনরেন্দ্র বসু

বনানীর বুকে মহাসমারোহ উৎসব রাতে আজ
ফুলের মহলে ভ্রমরের বুঝি সাদর নিমন্ত্রণ!
হাজার ফুলের রূপের দীপালী বঞ্জুল বন-মাঝ
সুরভিমুগ্ধ পুবালী হাওয়ার উতল সঞ্চরণ।
শ্যামল-শ্রীতে উজল গাঁয়ের মেঠো ছন্দের বাঁশী
বাজে মঞ্জুল আহ্বান গানে, বিমনা গাঁয়ের মেয়ে
গৃহস্থালীর কাজের আড়ালে আনমনে উঠে হাসি
দূর প্রবাসীর আমন্ত্রণী যে তা'রো অন্তর ছেয়ে!
সন্ধ্যা না-হ'তে শেষ-করা তাই সংসার-ভরা কাজে,
ভাদ্রের ভরা নদী হতে ফেরা পূর্ণ কলস কাঁখে;
বাঁধি তাড়াতাড়ি এলানো কবরী, সাজি সুন্দর সাজে
পথ-অঞ্চলে চঞ্চলি চাওয়া মুক্ত পথের বাঁকে!
স্মৃতি সুরভিতে প্রণয়-পুলকে ভরা উচ্ছল মনে
নব-মিলনের কামনায় গড়া মধুর স্বপ্নলোক;
তরল জ্যোৎস্না-রজত-যামিনী—মধু কল্পনা বনে
পুলকিত হিয়া শিহরিত তনু—আধ ঘুমন্ত চোখ!
তারপর—ব্যথাছলছল দুটী জলভরা আঁখি বুজে
দূরপ্রবাসীরে সুপ্তিলোকে কি পায়নাকো যেয়ে খুঁজে?

চাতকের তৃষা

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

চাতকের যাত্রা সুরু নাহি জানি কোন সে লগনে
শুভ্র নীলিমাভরা ঐ ফুলহারা অসীম গগনে।
নিঠুর নিদাঘ-তাপে জ্বালাময় শুষ্ক হিয়া নিয়া,
"ফটিকজল" "ফটিকজল" শুধু গেছে ফুকারিয়া।
তৃষিত চাতক সে যে গগনের ঊর্দ্ধপানে চাহি,
দীর্ঘদিন চলিয়াছে তাপদগ্ধ এই পথ বাহি।
ঊর্দ্ধপানে চাহি চাহি আঁখি হতে ঝরিয়াছে জল
কহিয়াছে "কবে প্রভু হবে মোর সাধনা সফল?"
ধরা-বক্ষে ছিল কত নদনদী কত জলাশয়
চাতকের তৃষা হায় তাহে কভু মিটিবার নয়।
করুণা-জলদ আসি বুঝি এই নিদাঘের শেষে
তৃষিত এ চাতকেরে দেখা আজি দিল অবশেষে।
সেথা হতে চাতকের কণ্ঠে এই প্রেমবিন্দু ঝরি
সকল পিয়াসা তার একেবারে লইল গো হরি।
নিদাঘের শেষে প্রভু চাতকের পুরিয়াছে সাধ
আজি তার গেছে মোহ গেছে তৃষা গেছে অবসাদ
শুষ্কতার হাহাকারে ভরা তার সে অতীত ভুলি
তব দান প্রেমগান কণ্ঠে তার লইয়াছে তুলি॥

ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

শ্রীবঙ্কিম ব্রহ্মচারী

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের পরিকল্পনা জাতির আত্মাকে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে ও আনন্দে উন্নীত করিবার প্রেরণায় রচিত। দৈনিক কার্য্যসূচী এই সত্যের প্রমাণ। বাংলার খ্যাতনামা মনীষী, বিদ্বান, বহুদর্শী, ত্যাগী পুরুষগণের শুভাগমনে সাময়িকভাবে ইহা একটী বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ গ্রহণ করে। এতৎসঙ্গে যে প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ, তাহার কৃষ্টি, সংস্কৃতির মর্ম্মপরিচয় দর্শকগণের চিত্তাকর্ষক করিয়া লিপি ও চিত্রসহযোগে ফুটাইয়া তোলা হয়।

১৩৫২ সালের বৈশাখে সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ত্রয়োবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিল। সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যহই সমবেত উপাসনা, পূজা, পাঠ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ডেরাডুন হইতে আগত শ্রীভোলানাথ ঘোষাল ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুজনীয় সঙ্ঘগুরুর নিকট সঙ্ঘ-সাধনায় দীক্ষা লাভ করেন।

৩১শে বৈশাখ অপরাহ্ণে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী স্যার যদুনাথ সরকার জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও প্রেমের আদর্শসমন্বিত প্রবর্ত্তকের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করিয়া বাঙালীজাতিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। তৎপরে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী পুষ্পমাল্যে সভাপতি বরণ করিলে স্যার সরকার উদ্বোধন সভায় পৌরোহিত্য করেন। সঙ্ঘগুরু উৎসবের উদ্বোধন বাণীতে বলেন—ভারত দুইটী পথের সন্ধান দিয়াছে—এক পথ ইহবিমুখ মোক্ষ পন্থা; অন্যটী নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠ জীবনযোগের অনুশীলন। আমি জাতিকে শেষোক্ত পথের অনুবর্ত্তন করিতে বলি। যোগযুক্ত কর্ম্ম মুক্তিরই হেতু। এই যোগ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এককেই আশ্রয় করিতে হয়। একের সহিত পূর্ণ যুক্তিই মানুষের পরম ধর্ম্ম। সভাপতি মহাশয় বলেন, হিন্দুধর্ম্ম অক্ষয় অমর। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। যে পরিমাণ আমাদের ধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনও আমাদের সেই পরিমাণে ঘটিয়াছে। হিন্দু কেবল পৌত্তলিক নহে, হিন্দুর শাস্ত্র অনুশীলন করিলে দেখা যায়, ইহা জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ আত্মবাদী, ভারতের ঋষিগণ জীবমাত্রকেই একই আত্মার প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা লোভ হিংসাকে প্রশ্রয় দেন নাই।

তিনি সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ দর্শন করিয়া বলেন—এখানে মানুষ গড়ার কাজই হইতেছে। এই সকল নারী পুরুষের সুদৃঢ় চরিত্রই জাতির ভবিষ্যৎ।

শিক্ষা সমস্যা জাতির এক প্রধান সমস্যা। পরদিন শ্রীঅনাথনাথ বসুর সভাপতিত্বে এ বিষয়ের আলোচনা সভা হয়। তিনি বলেন, অর্থ, পদ, প্রতিপত্তি লাভই যেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা জাতির কল্যাণ আনে নাই। মূল কথা জাতির শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে ৪০ কোটী লোকের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। পূজনীয় সঙ্ঘগুরু বলেন—সত্যই স্বাধীনতা ভিন্ন সুশিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নহে। তবে ইহা লাভের জন্য এক দলকে সর্ব্বত্যাগী শিক্ষাব্রতী হইতে হইবে। শ্রীমনোরঞ্জন সেন গুপ্ত প্রভৃতি অনেক শিক্ষাব্রতী এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভারতের অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সকলের মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তিনি বলেন, চারিদিকে গিরিনদী পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ চির অখণ্ড। ভাষায়, ধর্ম্মে, সামাজিকতায় ও আচার ব্যবহারে এই দেশ চিরদিন একই ভাবের অনুশীলন ও রক্ষা করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র এক বেদমন্ত্র উচ্চারিত। এই দেশকে খণ্ডিত করার পিছনে নিশ্চয় অভিসন্ধি আছে।

জাতির ভবিষ্যৎ শিশুচরিত্র-সংগঠনে ব্রতী, বিদুষী শ্রীমতী মৃণ্ময়ী রায়ের সভানেত্রীত্বে যে মহিলা সভা হয় তাহাতে তিনি জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে নারীজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন নারীকে মাতৃরূপে শুধু আপন সন্তান নহে, জাতির ভবিষ্যৎ সন্তানদের শিক্ষা ও জীবনগঠনের ভার লইতে হইবে। একটা জাতির সৃষ্টি কখনও দানের বস্তু হইতে পারে না। ভিক্ষার পথে কখনও মুক্তি আসে না। মুক্তি-অর্জ্জন করার একটীমাত্র পথই আছে, সে পথ মনে প্রাণে সুসন্তান কামনা করা। ইহার জন্য চাই নারীজাতির সাধনা।

বিশ্বসমস্যার মূলে যে অর্থনৈতিক সমস্যা—অর্থনীতিবিৎ শ্রীঅনাথ গোপাল সেনের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা সকলকে এ বিষয়ে আলোক প্রদান করে। তিনি বলেন, বর্ত্তমান জগতে ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ, মার্ক্স-বাদ ও গান্ধীবাদ—এই পাঁচটী তন্ত্রের কথা শোনা যাইতেছে। কিন্তু এই "অর্থনীতিক পঞ্চমকার" অর্থাৎ "ইজম" বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব ও যান্ত্রিক সভ্যতার নগ্ন রূপ প্রকট করিয়াছে। বিশ্বের আধুনিক সমস্যায় গান্ধীবাদ সুফল প্রদান করিতে পারে বলিয়া বক্তা অভিমত প্রকাশ করেন।

জ্ঞানপ্রবীণ অধ্যাপক জে, বুকার "আনন্দ" এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক পি, টারমিজ "ভারতীয় সংস্কৃতি" সম্বন্ধে সারগর্ভ দুইটী বক্তৃতা করিয়া সকলের জ্ঞানবর্দ্ধন করেন।

শিশুসাহিত্য মহারথ, শিশুভারতী-সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্য বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বাংলা সাহিত্য ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া কিরূপে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে তাঁহার অভিভাষণে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন। জাতীয় কবি ৺অতুল-প্রসাদ সেনের ভ্রাতা শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ সেন মহোদয় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এই সাহিত্য-বৈঠকে যোগদান করিয়া সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠের সমাপ্তি সভার সভাপতি শ্রীদাশরথি কুণ্ডু অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীশরদিন্দু পালিত সভাপতিত্ব করেন। উৎসবের অন্যতম সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী উৎসব-বিবরণী পাঠ করিবার পর, সভাপতি মহাশয় দাশরথিবাবুর অভিভাষণ পাঠ করিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিয়া উৎসব সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তৎপরে বাংলার গৌরব রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পূর্ণিমা সম্মেলন হয়। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী কর্ত্তৃক সভাপতি বরণ ও মাল্যভূষিত হইলে, শ্রীযুত ঘোষ বাংলা ও বাঙালীর মর্ম্মকথা তাঁর অভিভাষণে ব্যক্ত করেন। অভিভাষণটি অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

অতঃপর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সঙ্ঘগুরুর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কাব্যার্ঘ্য প্রদান করেন :

ভাগীরথি বিধৌত—ফরাসী রাঙা চন্দন চর্চ্চিত করি।
বরিষ শান্তি, অমৃত সুপ্তি ভবদুঃখ পরিহরি।
আজি হে ঋষি, রচিলে পুনঃ
নগরতীর্থে তব তপোবন,
অসতীরে দিতে সতীপথে রতি, অগতিরে দিতে পারের কড়ি।
জানিনা ব্রাহ্মণ, শ্রুতি, সংহিতা,
তোমারেই জানি বেদ রচয়িতা
তব অমর কীর্ত্তি—পতাকা যবে উড়িল বঙ্গোপরি।
হে ত্যাগী, দেশপ্রেমে আত্মভোলা,
দান-ধর্ম্মে তব দ্বার খোলা,
কত নিরাশ্রয়ে দিতেছ স্থান নিত্য কুটির ঘুরি।
হে প্রবর্ত্তক, শত সংবাদ দাতা,
রচনা-কাব্য-নাটক প্রণেতা,
প্রকাশিছ বাণীর কমলরূপে পূতরসে ভরি।
হে আশুতোষ, করহ আশীর্ব্বাদ,
দাও শক্তি, সাধনা, দিব্য অনুরাগ,
যেন মর্ত্তভূমে জীবন মম অমর করিতে পারি।

সর্ব্বশেষে পূজনীয় সঙ্ঘগুরু "ভারতের বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলেন, ভারতের বাণী ব্যথার বাণী। সে ব্যথার মর্ম্ম কি? চরম ও পরম তত্ত্বকে জীবনে রূপ দেওয়াই ভারতের তপস্যা। সে তপস্যা—কঠোর দুঃখঘন আত্মোৎসর্গের অনলে আপনাকে ভাগবৎ ইচ্ছার আশ্রয়রূপে শোধিত ও সংগঠিত করা। নান্নুর, নবদ্বীপ, হালিসহর ও দক্ষিণেশ্বরের দিব্য সাধনার মর্ম্ম বিবৃত করিয়া তিনি আরও বলেন, ইহার পরও প্রশ্ন "ততঃ কিম্?" ভারত চায় দিব্য জাতির অভ্যুত্থান। তার জন্য চাই সর্ব্বস্ব-ত্যাগ, পূর্ণ আত্মসমর্পণ, মহতী আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই ইহা সম্ভব। কল্পিত ভাগবৎ তত্ত্বকে অকল্পিত প্রত্যক্ষ বস্তুতে নামাইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে সাধনা তাহাই এক নবজাতি গঠন করিতে পারে।

ইহা ছাড়া এই উৎসবে কয়েকটী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রত্যেকটী আবশ্যকীয়, শিক্ষণীয় ও আনন্দপ্রদ। ইহার মধ্যে "সংহতি সম্মেলন" ও "ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান সম্মেলন" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংহতি সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীমৃণাল ঘোষ। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের পুরোহিত হন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ। এই সম্মেলনের উদ্বোধনবাণী উচ্চারণ করেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সারস্বত মঠ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিস্বরূপ সুযোগ্য প্রচারকবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌ভঙ্গী হইতে ধর্ম্মভিত্তির উপর ভারতজাতি গঠন সম্বন্ধে মৌলিকতাপূর্ণ বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। প্রত্যেকটি সম্মেলনেই স্থানীয় ও দূরাগত যুবক, কিশোর, বিদ্যানুরাগিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। আনন্দ-পরিবেশনের জন্য বিশুদ্ধ নাটক, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। উত্তরপল্লী ব্যায়াম সমিতির কনসার্ট বাদ্য, করোনেশন ক্লাব কর্ত্তৃক ঐক্যতান বাদন, বরাহনগরের কালীকীর্ত্তন, ইটালী বান্ধব সমিতির 'কেদার রায়' অভিনয় সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। শরীর চর্চ্চা ও ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনে রাসবিহারী ক্যাম্পের কৃতিত্ব স্থায়ী সুনাম রক্ষা করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্ম্মকুশলতা প্রশংসার্হ।

পক্ষকালের উৎসবস্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিবার নহে। যে শিক্ষা, জ্ঞান ও আনন্দলাভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতা, তাঁহাদের গভীর গবেষণা ও অতুলনীয় মননশীলতার কথা ভাবিলে বিস্ময় জাগে। মনে হয় অবিনাশী অধ্যাত্মবীর্য্যসম্পন্ন এই হিন্দুধর্ম্ম। জাতি সাধনার যে ইঙ্গিত এই উৎসবের মধ্য দিয়া প্রকট করা হয়, তাহা যদি সকলে প্রকৃত অনুধাবন করিতে পারে, তবে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের দিগ্‌দর্শন মিলিবে। আমাদের জনসাধারণের বৃহৎ অংশ তাহাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই প্রাচীন দেশের শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না। সঙ্ঘ যে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাতি নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহার পরিচয় মিলে এই উৎসবে।

স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি :

গত ২৫শে মে বাংলার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষের একবিংশ বার্ষিক মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতঃ সাড়ে সাতটায় সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণের উপস্থিতিতে স্যার আশুতোষের মর্ম্মর মূর্ত্তিকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং অপরাহ্নে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের অবদান বাঙালী শ্রদ্ধা ও গৌরবের সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করিবে।

প্রবর্ত্তক পরামর্শ পরিষৎ :

গত ২৩শে জুন কলিকাতা "প্রবর্ত্তক ভবনে" "প্রবর্ত্তক পরামর্শ পরিষদের" একটী অধিবেশন হয়। ডা: শচীন্দ্রকুমার সেন তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। প্রায় ২৬ জন প্রবীণ ও তরুণ দেশকর্ম্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যতম সম্পাদক স্বামী অমৃতানন্দ পরিষদের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। পূজনীয় সঙ্ঘগুরু স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায়, এক লিখিত বাণী প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সংগঠন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দশ হাজার নারী-পুরুষ সভ্য সংখ্যা ও ১০ লক্ষ টাকা লইয়া এক বিরাট জাতি-গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। সভাপতি ও উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই তাহা সমর্থন করেন। অনন্তর সাধক ও কর্ম্মিগণের দেশ-সেবার অভিজ্ঞতামূলক নানা প্রশ্নের আলোচনার পর কয়েকটী কার্য্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার উদ্দেশ্য সর্ব্বদিক্ দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়।

যুবমঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব :

গত ৩রা জুন রবিবার অপরাহ্নে বিস্তৃত ও সুসজ্জিত মণ্ডপে বুড়ুল (২৪ পরগণা) যুবমঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমারোহে সম্পন্ন হয়। গীতিকবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রধান অতিথি হন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় সভার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র রায়, সুলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল প্রভৃতি অনেকেই বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পাঠাগারের উদ্দেশ্য, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। সভায় বহু জনসমাগম হয় এবং রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলে।

দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া :

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ভক্তসাধক দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আজীবন নীরব কর্ম্মী এবং মনে-প্রাণে ও আচরণে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রভাব ও মহাত্মাজীর অহিংসবাদ তাঁর জীবনকে আলোকিত করিয়াছিল। স্বগ্রাম নাটশালে (মেদিনীপুর) তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিকের সেবায় ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন এবং বরাবর স্বহস্তে চরকা কাটিয়া নিজ পরিবারকে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভক্ত সাধকের মৃত্যুতে মেদিনীপুরবাসী একজন সত্যকার মানুষের মত মানুষ হারাইলেন।

শ্রীমান অরুণকুমার দত্তগুপ্ত :

এ বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শ্রীকাইল (ত্রিপুরা) কলেজ হইতে শ্রীমান অরুণকুমার দত্তগুপ্ত প্রথম স্থানাধিকারি করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই কলেজের ও শ্রীমান অরুণকুমারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ব্যায়ামবীর কার্ত্তিকনারায়ণ লাহা :

পাথুরিয়াঘাটা ক্লাবের উদ্যোগে কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যে নিখিল বঙ্গ ব্যায়াম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে চন্দননগর রাসবিহারী ক্যাম্প অফ্ ফিজিক্যাল কালচার-এর সভ্য কার্ত্তিকনারায়ণ লাহা প্যারালাল বার (Parallel bar) প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ইউনাইটেড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

শ্রীযুত অতুলকুমার সুর মহোদয়ের পৌরোহিত্যে গত ২১শে মে ১৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্বোধন উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলা শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে এই নবাগত ব্যাঙ্কটি বিশিষ্ট স্থানাধিকার একদিন করিবে, এই আশা আমরা পোষণ করি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ক্ষুদ্রারম্ভ হয় বাংলার একটি নগণ্য সহর কুমিল্লায়। তার আজিকার সুবৃহৎ রূপ ও প্রতিষ্ঠা সেদিন সম্ভাব্যরূপেই সুপ্ত ছিল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের প্রাণকুণ্ডলীতে। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় শ্রীযুক্ত দত্ত ও তাঁহার সহকারীবৃন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কর্ম্মকুশলতা ও তপস্যার ফলে কোম্পানী আজ শুধু সমগ্র ভারতে নয়, সাগরপারেরও বিভিন্ন স্থানে স্বকীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর গৌরব করিবার মত যে স্বল্প কয়টি সুপরিচালিত নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন তাদেরই অন্যতম। ব্যাঙ্কের ১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়, আলোচবর্ষে আদায়ী

মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ও ২৪ লক্ষ টাকা। ঐ সময়ে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। বিবরণী দৃষ্টে ব্যাঙ্ক-তহবিলের বিধিব্যবস্থার নিরাপত্তাও খুবই সুস্পষ্ট। ১৩৪৪ সালের নিট লাভের পরিমাণ ৫৮০৫৬৭৲ টাকা। এ বৎসরে ব্যাঙ্কের অংশীদারদের আয়কর মুক্ত ৭% লভ্যাংশ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালীকে অগ্রবহ করিয়া লইতে এই প্রতিষ্ঠানটি আরও সফল হোক, এই প্রার্থনা।

বাণীমন্দির :

বিগত ২৫শে মে বুধবার সেণ্ট পলস মিশন স্কুল হলে বাণী মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সভাপতিত্ব ও পারিতোষিক বিতরণ করেন যথাক্রমে বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ, করিম বি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি ও মিস্ এস, কাজী বি-এ, বি-টি। অনুষ্ঠানে ছাত্রীগণ নানারূপ গীত, বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা সমাগত অতিথিবর্গকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। ছয়টি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দ্বারা পরিকল্পিত ঋতু উৎসব নৃত্য-নাট্যটি বেশ উপভোগ্য হয়।

শ্যামনগরে মহিলা-সভা :

গত ১৮ই জুন শ্যামনগর টাউন হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মহিলা-সভায় প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত ব্যাকরণতীর্থা সভানেত্রীত্ব করেন। স্বাগত গীতান্তে শ্রীমতী মনোরমা দেবী যোগ্য ভাষণে সভানেত্রীকে বরণ করিলে, কুমারী নমিতা ভট্টাচার্য্য একটী প্রবন্ধে "গৃহকর্ম্মের বাহিরে নারীর কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন "জাতি গঠনে নারীর প্রেরণা পুরুষের চেয়ে কম নয়, বরং সমধিক কার্য্যকরী। ঘরে ও বাহিরে, সর্ব্বত্রই নারীকে পুণ্যপূত চরিত্র ও জীবন লইয়া দাঁড়াইতে হইবে। ইহার জন্য অগ্রণীরূপে চাই একদল সর্ব্বত্যাগিণী নারী, যাহারা সদ্গুরুর আশ্রয়ে তপস্বিনীবেশে দেশ ও ভগবানের সেবায় আপনাদিগকে ঢালিয়া দিবে—ইহারাই গড়িয়া তুলিবে দেশের মেয়েদের জীবন—সুমাতা, সুপত্নী, সুকন্যা গড়ার শিক্ষা ও সাধনাই হইবে ইঁহাদের জীবনের লক্ষ্য।"

শ্রীমতী কুন্তলা দেবী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী সোম প্রভৃতি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মাতৃজাতি সেবক সমিতি :

সম্প্রতি মাতৃজাতি সেবক সমিতির বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ-উৎসব রঙমহল রঙ্গমঞ্চে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভগীরথ কানোরিয়া মহোদয় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সমিতি-পরিচালিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণ সুদামা' নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয়ের ভূমিকায় ছাত্রীরা যে কুশলতা প্রদর্শন করেন তাহাতে ইঁহাদের সুশিক্ষার পরিচয় মিলে। ইঁহাদের অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য বিদ্যালয়ের অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীযুক্ত সরোজ রায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৬ই জুন :

বাংলা ও বাঙালীর জীবনে ১৬ই জুন ঐকান্তিকভাবে স্মরণীয়। বিভিন্ন বর্ষে হইলেও, এই একই তারিখে বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় ও একান্ত আপনার জন পুণ্যশ্লোক দুইজন মহামানবের তিরোভাব ঘটে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। এই পুণ্য তারিখটিকে বিশিষ্ট ও সার্ব্বিক-ভাবে উদ্‌যাপিত ও স্মরণযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে [illegible] চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমাদেকবেণীং করেণ ॥"

শিল্পী : শ্রীহাসিরাশি দেবী

—মেঘদূত

৩০শ বর্ষ
১৩৫২ বাং
ইং ১৯৪৫

আষাঢ়ঃ
(জুন)
১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

গুরুপূর্ণিমা

প্রতি বৎসর পাঁজি খুলে' দেখি আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা—"গুরু-পূর্ণিমা"। শাস্ত্রেও পড়েছি "গুরৌ মানুষবুদ্ধিন্তু-কুর্ব্বাণোনরকং ব্রজেৎ"। নরোত্তম দাসও বলেছেন—"গুরুতে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন, দারুণ নরকে তার হয় নিপাতন"। গুরুমহিমাপ্রচারে ভারতের হিন্দু পঞ্চমুখ। গুরুগীতা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ভারতের আশ্রমে আশ্রমে গুরুপূর্ণিমা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।

ভারতের ধর্ম্ম অপৌরুষেয় বেদবাদ। সেখানে এই গুরুমূর্ত্তির স্থান কোথায়? তবুও এমন শাস্ত্রকার নাই, যিনি শাস্ত্ররচনার গোড়ায় গুরুবন্দনা না করেছেন। ইহার অর্থ কি?

এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি, যার আত্মা অন্য একজনের সংসর্গ না পেয়ে স্ফূরিত হয়েছে? যাঁর সংসর্গে আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হয়, তাঁকেই আমরা গুরুর স্থান দিয়েছি। তাঁর কাছে মন্ত্র পেয়ে, অশরীরী দেবতাকে তাঁর মধ্যে দেখার তপস্যা করেছি—ঐহিক জীবনে শরীরী দেবতার সন্ধান পেয়ে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। এই জন্য আমরা মানুষের মধ্যেই নারায়ণদর্শনের সাধনায় গুরুর আশ্রয় নিতে যুগ যুগ আকুল হয়েছি। ভারতের সর্ব্বত্র গুরুপূর্ণিমার মহোৎসব তাই আজও বন্ধ নয়। পাশ্চাত্য বুদ্ধি গুরু-শব্দটাকে মুছে দিতে চায়। ভারতের সংস্কৃতির এই মূল বেদী নিশ্চিহ্ন না হ'লে, ভারত সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না। অভিনব গ্রাহ, তাহার প্রতিপত্তির জন্য অতীতকে মুছে দিতে প্রচণ্ড প্রয়াস সে করবেই। কিন্তু ভারতের অমর সংস্কৃতি এই কঠোর পরীক্ষায় অতীতেও আত্মরক্ষা করেছে, ভবিষ্যতেও করিবে।

সাধনায় প্রথম—গুরু। দ্বিতীয়—মন্ত্র। তৃতীয়—প্রতিমা। গুরু নেতা বা উপাস্য মানুষ আশ্রয় করে'ই আবির্ভূত হন। ইঁহাকে আশ্রয় কর সর্ব্বান্তঃকরণে। মন্ত্রে শ্রদ্ধা রাখ। সেই মন্ত্রে যে প্রতিমা বিকশিত হবে, তাহাই অপ্রাকৃত অনন্ত ভাগবত মূর্ত্তি। জীবনের চরম মুক্তি এইখানেই। আর এই যুক্ত জীবন নিয়েই যে সংহতি, তাহা সিদ্ধ ভারতের দিব্যজাতি। বাঙালী, সত্যপূত ভগবানের সহিত যুক্ত-জীবন নিয়ে ভারতের জয় দাও। তোমাদের দেহ-মন ঋতময় সত্যকেই মূর্ত্ত করুক। মনুষ্যজীবনে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কিছুই নাই।—শ্রীম—

বাংলা ভাষায় শাক্ত সাহিত্য

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শাক্ত-ভাব-স্রোতঃ সমগ্র ভারত প্লাবিত করিলেও, বাংলা দেশে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলার ধর্ম্মগঙ্গার বিষ্ণুভক্তি ও দেবী ভক্তি, দুইটী প্রধান ধারা। প্রাচীনকাল হইতে বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় শাক্ত সাহিত্য সমানভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। বহু শাক্ত শাস্ত্র (তন্ত্রগ্রন্থ) বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের সার-স্বরূপা চণ্ডীর অনেক বঙ্গানুবাদ আছে। চণ্ডীর যে সকল বঙ্গানুবাদ বর্ত্তমান কালে হইয়াছে, তন্মধ্যে অবিনাশ শর্ম্মা, প্রাণেশকুমার প্রভৃতি-কৃত অনুবাদ সমধিক জনপ্রিয়। উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত চণ্ডীর অনুবাদের ২য় সংস্করণ নিঃশেষিত ; ৩য় সংস্করণ শীঘ্র ছাপা হইবে। উক্ত অনুবাদের ১ম ও ২য় সংস্করণে মোট সাড়ে সাত হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল। সত্যদেব ঠাকুর কৃত চণ্ডীর বাংলা ভাষ্য 'সাধনসমর' সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের 'মা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানিও শাক্ত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শ্রীমতিলাল রায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত "শক্তিপূজা" পুস্তকখানিও শাক্ত সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-গণের শাক্ত সঙ্গীত বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ্। ভারতের কেন, জগতের অন্য কোন সাহিত্যে এই সম্পদ্ নাই। যে ভাব-সম্পদের বলে বাংলা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, শাক্ত ভাব তাহাদের অন্যতম। বাংলার মুসলমান কবি কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত ভাব ও ভাষায় অভিনব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, গত পাঁচ শত বৎসর বাংলা ভাষায় বিশাল শাক্তসাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে। চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা, অন্নদা, সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্যে এই পাঁচ শতকে বহু কাব্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূজা উপলক্ষে সাধারণ লোকে আগ্রহ করিয়া মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার পাঁচালী শুনিত। বাংলার ঘরে ঘরে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। বাংলার বৃন্দাবন নবদ্বীপেও দেবীপূজা হইত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়াছিলেন। বাংলার বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর অনুরক্ত সেবক ছিলেন। উপরোক্ত ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের কথা'তে লিখিয়াছেন : "সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক প্রায় সকল কাজই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা সপ্তসতী বা চণ্ডী অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।...অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা দুর্গা সপ্তশতী অবলম্বনে রচিত কাব্যের আদর আরও বেশী ছিল।" দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল, অন্ধ কবি ভবানী প্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বসুর দেবীমঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, বলদুর্ল্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, এবং জগৎরাম বন্দ্য ও তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচিত পঞ্চরাত্রি চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি এবং দ্বিজ রাম-নিধির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী দেবী ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের ভারতীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণজীবন মোদকের অম্বিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত, কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল, নারায়ণদেবের কালিকাপুরাণ প্রভৃতি কাব্য শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্গত। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীত কালিকামঙ্গল নামে একখানি কাব্য আছে। উক্ত কালিকা-মঙ্গল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরে রচিত। রামপ্রসাদ হালিসহরের সমীপে কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাধাকান্ত মিত্রের শ্যামাসঙ্গীত কাব্যও উল্লেখযোগ্য। উহা ১৭৬৭—৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। রাধাকান্ত খাস কলিকাতার প্রাচীনতম কবি। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দুর্গামঙ্গল ১৮১৯ খ্রীঃ রচিত।

চণ্ডীমঙ্গল শীর্ষক বহু শাক্ত কাব্য এই সময়ে বিরচিত হয়। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে

রচিত। মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ উত্তর বঙ্গের মালদহ জেলার লোক ছিলেন। সপ্তগ্রামনিবাসী মাধবাচার্য্যের রচিত চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতৃগণের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরাম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পিতা হৃদয় মিশ্র বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে দামিন্যা গ্রামের নিবাসী ছিলেন। শাসকগণের অত্যাচারে মুকুন্দরাম পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। রঘুনাথ রাজা হইবার পর তাঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক্ ধনপতির উপাখ্যান—এই দুইটী স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। এই দেবীমাহাত্ম্যকাহিনী কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে নাই; বাংলা দেশে প্রাচীনকাল হইতেই ইহা প্রচলিত ছিল। কালকেতুর উপাখ্যানটি এইরূপ :

সুদরিদ্র কালকেতু সাধ্বী স্ত্রী ফুল্লরার সহিত ব্যাধবৃত্তি করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চণ্ডীদেবী সুন্দরী বালিকার বেশে তাহাদের গৃহে আবির্ভূতা হইয়া ধার্ম্মিক দম্পতীকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং তাহাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটী মূল্যবান্ অঙ্গুরী উপহার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কালকেতু প্রচুর অর্থ পাইল। তাহার দুর্গতি দূর হইল। সে ধনী হইল। কালকেতু তাহার রাজ্য হইতে বঞ্চক ভাঁড়ু দত্তকে বিতাড়িত করিয়া বিপদে পড়িল। ভাঁড়ু দত্তের ষড়যন্ত্রে প্রতিবেশী রাজার সহিত কালকেতুর যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইল, কিন্তু দেবীকৃপায় কারামুক্ত হইয়া শান্তিতে ও সম্পদে আবার দিনযাপন করিতে লাগিল।

ধনপতির কাহিনীটী এই :—

বণিক্ ধনপতি সিংহল যাত্রা করিল বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে। জাহাজ সিংহলের নিকটবর্ত্তী হইলে, ধনপতি সমুদ্রসলিলোপরি কমলে কামিনী দর্শন করিয়া ধন্য হইল। সে দেখিল—সমুদ্রবক্ষে সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত কমলের উপর এক ষোড়শী কামিনী একটী হস্তীকে গ্রাস করিয়া পরক্ষণে উদ্গীর্ণ করিতেছে। ধনপতি সিংহলে পৌঁছিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে উপঢৌকনপ্রদানান্তে তুষ্ট করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিল। রাজাকে দৃষ্ট 'কমলে কামিনী'র কথা বলিল,—কিন্তু রাজাকে তাহা সমুদ্রগর্ভে দেখাইতে অসমর্থ হইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ধনপতির লহনা ও খুল্লনা নামক দুই পত্নী ছিল। লহনা নিঃসন্তানা ছিলেন। খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত নামক পুত্র জন্মে, ধনপতি তখন সিংহল-প্রবাসী। শ্রীমন্ত বড় হইয়া মাতার নিকট পিতার নিরুদ্দেশের সংবাদ পাইয়া পিতৃ-অন্বেষণে যাইবার সংকল্প করিল। ধনপতির ন্যায় শ্রীমন্ত বাণিজ্য-পোতে সিংহল যাত্রা করিল। সিংহলের উপকূলের নিকটে পিতার ন্যায় পুত্রেরও 'কমলে কামিনী' দর্শন হইল। সিংহল যাইয়া সেও পিতার মতই সিংহল-রাজকে দৃষ্ট অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। কিন্তু দৃশ্য দেখাইতে না পারিলে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—রাজা তাহাকে বলিয়া রাখিলেন। বলা বাহুল্য, রাজাকে শ্রীমন্তও দৃশ্য দেখাইতে অক্ষম হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পাইল। শ্রীমন্ত শূলবিদ্ধ হইবার জন্য মশানে আনিত হইল। এইবার চণ্ডীদেবীর পিতাপুত্রের প্রতি করুণা জন্মিল। দেবী শ্রীমন্তের অতিবৃদ্ধ পিতামহীবেশে রাজার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিল। রাজা অস্বীকৃত হইলেন। দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার ভূত-প্রেত-পিশাচ-সৈন্যকে রাজধানী আক্রমণ করিতে বলিলেন। দেবীসৈন্য দ্বারা রাজার সৈন্যদল অচিরে পরাস্ত হইল। রাজা দৈবী-শক্তির লীলা বুঝিয়া শ্রীমন্তকে কারামুক্ত করিলেন। পুত্র কারাগারে গিয়া পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধ কারাগারে পিতাপুত্রের প্রথম মিলন হইল। রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া শ্রীমন্ত পিতৃ-সমভিব্যাহারে বহু ধনসম্পত্তি লইয়া স্বীয় জন্মভূমি উজানী নগরে ফিরিয়া আসিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলে এবং দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালীতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে; কালকেতুর কাহিনী নাই। শ্রীচারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী গ্রন্থে এই জাতীয় সাহিত্যের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা ভাষার শাক্তসাহিত্যের আর এক আবশ্যকীয় অংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বহু কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামনিবাসী কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণের মনসামঙ্গল ১৭০৩-৪ খ্রীঃ বিরচিত। উত্তরবঙ্গের কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ১৭৪৪-৪৫ খ্রীঃ মনসার পাঁচালী রচনা করেন। পশ্চিম বঙ্গের দ্বিজ রসিকের মনসামঙ্গল সুবৃহৎ কাব্য। সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের মনসামঙ্গল, বীরভূমি-বাসী বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, দিনাজপুর অঞ্চলের অধিবাসী জগৎজীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, রামনারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলের ষষ্ঠীবর দত্ত ও দ্বিজ জানকীরামের মনসা মঙ্গলদ্বয় উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গে রচিত বহু মনসামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে বংশীবদনের মনসামঙ্গলই শ্রেষ্ঠ। উহা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। বংশীবদন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং মনসার পাঁচালী গাহিয়া অতিকষ্টে জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহার নিবাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী গ্রামে। বংশীবদনের পত্নীর নাম সুলোচনা। তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিল কন্যা চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী উত্তরাধিকারসূত্রে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, মনসামঙ্গলরচনায় বংশীবদন কন্যার সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গল-শীর্ষক সমুদায় কাব্যের মধ্যে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গে উক্ত কাব্য এখনও একাধিপত্য করিতেছে। ক্ষেমানন্দ নিজেকে অনেকস্থলে কেতকাদাস (অর্থাৎ কেতকার—মনসার, দাস—সেবক) রূপে পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ে দামোদরের তীরবর্ত্তী কোন গ্রামে কায়স্থবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মনসামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। গ্রামের জমিদার চন্দ্রহাসের পুত্র বলভদ্রের মৃত্যু হইলে, গ্রামে অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হয়। উক্ত উপদ্রব হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য তিনি সপরিবারে গৃহত্যাগ করিয়া জগন্নাথপুরের জমিদার বিষ্ণুদাসের ভ্রাতার আশ্রয়ে বসবাস করেন। মাঠের মাঝে একদিন ক্ষেমানন্দ কার্য্যোপলক্ষে সন্ধ্যার সময়ে যাইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়েন। তখন কতকগুলি সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি মনসা দেবীর স্মরণ করেন। দেবী নানারূপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। দেবী তাহাকে মনসামাহাত্ম্য রচনা ও প্রচার করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত। বরিশাল জেলার গৈলাগ্রামে এক বৈদ্যবংশে বিজয়গুপ্তের জন্ম হয়। মনসা পঞ্চমীর দিন কবি মনসাদেবী কর্ত্তৃক মনসামঙ্গল রচনা করিতে আদিষ্ট হন। তিনি তাঁহার কাব্যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনসামঙ্গল-রচয়িতা কাণা হরিদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাসেরও একখানি মনসামঙ্গল আছে। বিপ্রদাসের নিবাস ছিল ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় নাদুড়া-বট গ্রামে। কবিচন্দ্রের মনসামঙ্গলও পাওয়া গিয়াছে। কবিচন্দ্র মল্লভূমের পান্নুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পিতা ষষ্ঠীবর সেনের সহযোগিতায় গঙ্গাদাসও একখানি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

মনসাপূজা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মনসামঙ্গল কাহিনীও বাংলার নিজস্ব সম্পদ; কোন পুরাণে নাই। বাংলাদেশ হইতে এই কাহিনী বিহার ও মিথিলা হইয়া কাশী পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সব মনসামঙ্গলে একই কাহিনী বর্ণিত। কাহিনীটী এইরূপ :

মনসা সর্পদেবতা ও শিবের কন্যা। জন্মগ্রহণের পরে তিনি সর্পের উপর আধিপত্য পাইলেন। শিবগৃহিণী চণ্ডী মনসার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হন। মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে বিবাদ ও মারামারি হইল। উহাতে মনসা একটী চক্ষু হারাইলেন এবং মনের দুঃখে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। জরৎকারুর ঔরসে মনসার গর্ভে আস্তিকের জন্ম হইল। রাজা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। পিতৃহত্যার পরিশোধ লইবার জন্য রাজপুত্র জনমেজয় সর্পসত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্পকুল নাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। সর্পগণ বিপদ্ আসন্ন দেখিয়া মনসার শরণাপন্ন হইল। মনসা আস্তিককে জনমেজয়ের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর মনসা চণ্ডীর নিকট প্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বীয় মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্য্যে

নেত্রবতী তাহার পরম সহায় হইলেন। অচিরে মনসাপূজা সমাজে প্রচলিত হইতে লাগিল। সেই যুগে গন্ধবণিকেরা সমাজের প্রতিপত্তিশালী ছিল। উক্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় চাঁদ বেণের সহধর্ম্মিণী সনকাকে নেত্রবতী মনসা পূজা শিখাইলেন। উহাতে চাঁদ বেণে বিরক্ত হইল। সনকা একদিন গোপনে মনসাপূজা করিতেছিল; চাঁদ বেণে তথায় আসিয়া পূজার দ্রব্য পায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিল। মনসা ক্রুদ্ধা হইয়া চাঁদকে শাস্তি দিলেন। চাঁদের সাত পুত্র বহুমূল্যের বাণিজ্যদ্রব্য জাহাজে আনিবার সময়ে সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল। কিন্তু চাঁদের মহাজ্ঞান ছিল। সেই মহাজ্ঞানের শক্তিতে চাঁদ সাত পুত্রকে বাঁচাইল। মনসা ছদ্মবেশে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করিলেন। পুনরায় চাঁদের ছয় পুত্র মরিল। তখন আর চাঁদ মৃতপুত্রদের বাঁচাইতে পারিল না। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দর (লখিন্দর) বেহুলাকে বিবাহ করিবে—সব স্থির হইল। মনসার শাপে লৌহনির্ম্মিত ছিদ্রহীন বাসরঘরে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। লখিন্দরের বিধবা-পত্নী বেহুলা তেজস্বিনী বালিকা ছিল। সে মৃতপতিকে বাঁচাইবার দৃঢ়সংকল্প করিল। লখিন্দরের মৃতদেহকে যখন জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, তখন বেহুলা তাহাকে একটী ভেলায় লইয়া একাকিনী ত্রিবেণীর দিকে ভাসিয়া চলিল। ত্রিবেণীতে নেত্রবতী ধোপানীবেশে কাপড় কাচিতেছিল। নেত্রবতীর সহিত বেহুলার পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। বেহুলা তাহার সঙ্গে স্বর্গে যাইল এবং তথায় নৃত্য-গীতাদির দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিল। দেবতাগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মনসার কোপ কমিল এবং বেহুলা শ্বশুর চাঁদের দ্বারা মনসা পূজা করাইবার পণ করিতে মনসা লখিন্দরকে বাঁচাইল। বেহুলা পুনর্জ্জীবিত পতিকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিল। তখন চাঁদ ভক্তিভরে মনসার পূজা করিল। এইরূপে মনসা-মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারিত হইল।

চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল ব্যতীত সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মী-মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য শাক্ত কাব্য এই সময়ে বাংলাদেশে রচিত হয়। গঙ্গাধরদাসের কিরীটীমঙ্গল একখানি উৎকৃষ্ট শাক্তকাব্য। ইহাতে কিরীটকোণার কিরীটেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য বিবৃত আছে। সরস্বতীমাহাত্ম্যবিষয়ক তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি দ্বিজ বীরেশ্বর রচিত সরস্বতী মঙ্গল, দ্বিতীয়টী দয়ারাম রচিত সারদা-চরিত। বাসুদেবের কাব্য অতি ক্ষুদ্র। লক্ষ্মীমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্যের মধ্যে দ্বিজ ধনঞ্জয়ের লক্ষ্মীমঙ্গল এবং গুণরাজ খাঁন-উপাধিক বৈশ্য শিবানন্দ করের কমলামঙ্গল উল্লেখযোগ্য। আহ্মেদাবাদে মহালক্ষ্মীদেবীর সুন্দর মূর্তি ও মন্দির আছে। লক্ষ্মীমঙ্গল ও সরস্বতীমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ একখানি ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করেন। উক্ত কাব্যে ষষ্ঠীর উপাখ্যানের সহিত অন্য দুইটী কাহিনীও আছে। কৃষ্ণরামদাসের একখানি ষষ্ঠীমঙ্গল আছে। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল অতি সুন্দর কাব্য। উহা অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল এবং অন্নপূর্ণামঙ্গল এই তিনটী স্বতন্ত্র কাব্যের সমষ্টি। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁহার অন্নদামঙ্গল উক্ত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবিগণের উপর তাঁহার প্রভাব সমধিক। হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্ত ভুরশুটী পরগণার পেড়ো বসন্তপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার ছিলেন। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইনি দরিদ্র হন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে মূলাজোড়ে বাস করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ আট চল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি গঙ্গামঙ্গল রচনা করেন। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গাবতরণ—এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাই এই জাতীয় কাব্যের মূল কাহিনী। গৌরাঙ্গ শর্ম্মা, জয়রামদাস, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য্য এবং মাধব আচার্য্য ইঁহাদের প্রত্যেকের রচিত এক একখানি গঙ্গামঙ্গল আছে। উলানিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখুটীর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী একখানি সুপাঠ্য কাব্য এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রচিত।

বাংলার শৈব ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ও শাক্তপ্রভাব-মুক্ত নহে। শৈবযোগী সম্প্রদায়ের কাহিনী মতে সিদ্ধ মীননাথ দেবী কর্ত্তৃক মোহপ্রাপ্ত হন এবং শিষ্য গোরক্ষ নাথের সাহায্যে উদ্ধারলাভ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবাদানুসারে আদ্যদেব ও আদ্যাদেবী কর্ত্তৃক দেবাদি-সৃষ্টি হইবার পর গৌরীনাম্নী কন্যার জন্ম হয়। গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ হয়। শিব ও গৌরী ক্ষীরোদসাগরে একটী মঞ্চে বসিয়া তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছিলেন। মীননাথ মৎস্যরূপে সেই তত্ত্বকথা শ্রবণ করায়, গৌরী তাঁহাকে অভিশাপ দেন। বাংলায় বিদ্যাসুন্দর নামে যে সকল কাব্য প্রচলিত, তাহাদের উপাখ্যানে আছে—রাজপুত্র কুমার সুন্দর দেবীর বরপুত্র ছিলেন। রাজকন্যা বিদ্যার পিতা সুন্দরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলে, দেবী

াবর্ভূত হইয়া সুন্দরকে রক্ষা করেন। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা এখনও প্রচলিত। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বিবৃত:—ধর্ম্ম (সনাতন ব্রহ্ম) আদ্যাশক্তিকে সৃষ্টি করিয়া বিবাহ করিলেন। কামপ্রভাবে ধর্ম্মদেব যে কালকূট বিষ উদ্‌গীরণ করেন, তাহা দেবী তিন গণ্ডূষে পান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে প্রসব করেন। ত্রিপুরা জেলার শালগ্রামনিবাসী সিদ্ধ শক্তিসাধক ভুবন রায়ের কালী-সঙ্গীত প্রসিদ্ধ। তাঁহার সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দশমহাবিদ্যার মনোহর গান রচনা করিয়াছেন। ভুবন রায়ের মুসলমান শিষ্য গুল মহম্মদ মিঞ্যা বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন। গুল মহম্মদের অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে। গুল মহম্মদ শেষ বয়সে গেরুয়া পরিয়া গাছতলাবাসী হন। ইহার জামাতা আপতাপ উদ্দিন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশী-বাদক ছিলেন। আপ্‌তাপ উদ্দিনের ভ্রাতাই জগদ্বিখ্যাত স্বরজবাদক আলাউদ্দিন। আলাউদ্দিন নৃত্যকলাবিৎ উদয়-শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আপ্‌তাপ উদ্দিন সাধক মনোমোহন দত্তের শিষ্য। মনোমোহনের সঙ্গীতাবলী 'মলয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত। গুল মহম্মদের বংশধরগণ এখনও কালীকীর্ত্তন করেন। আন্দুলের কালীকীর্ত্তনের নেতৃগণও অনেক কালী-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সকল দেবীগীতি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে, বাংলা ভাষায় শাক্ত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। বাংলার দেবীস্থানের ইতিহাস এবং দেবীসাধক-গণের জীবনীও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। মেহারের সর্ব্বানন্দদেব, ঢাকা জিলার নরসিংহদী থানার নিকট চৌনিলপুরের রামপ্রসাদ, কুমিল্লার রামকুমার মজুমদার, ত্রিপুরা রাজার দেওয়ান রামদুলাল নন্দী এবং ত্রিপুরার বরদাখাতের জমিদার মির্জ্জাহোসেন আলি আধুনিকতম শক্তিসাধকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মির্জ্জা-হোসেনের সাধনার স্থান চাঁদপুরের নিকট মচ্ছাখাল নারায়ণপুরে ছিল। মেহার ও চৌনিশপুরের কালীবাড়ী সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত। রামদুলালের শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন: "ত্রিপুরাতে এত বড় দার্শনিক আছে!"

দুঃসময়

শ্রীমোহিতনাথ ঘোষ

সাতরঙা ভানু ঘুমায় আঁধার কোলে—
আলকাতরায় কাতরায় পৃথিবীটা,
কালো দোলনায় কাল বুঝি ওই দোলে;
ভীত মনে লাগে তুহিনের ঘন-ছিটা!

'ধুপ্-ধুপ্-ধুপ'—চুপ-চুপ চুপ্, শোনো,
ওই শোনা যায় কাদের পায়ের ধ্বনি!
কারা যেন নাচে? উৎসব নাকি কোনো?
মরণোৎসবে মাতে তারা—মনে গণি'।

শঙ্কার মেঘও ঘিরে ক্রমে আশে-পাশে,
দেবতা কোথায়? দেবতা কোথায়?—ডাকি;
অ-দেহীরা শুধু প্রাণপণ 'হো-হো' হাসে;
দেবতা কি তবে নিছক অলীক ফাঁকি?

ধেয়ানের চোখে আজি হায় হায় দেখি—
শিব যে ঝিমায় বিবেরি নেশায়, একি!

কইবে কথা কানে কানে

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম. এ.

তোমার সাথে এমনি ক'রে হোক না আমার পথ চলা,
আমার গানে তোমার বাণী সুরে সুরেই হোক বলা;
জীবন ভরি' তোমার সাথে বাইব তরী দিবস রাতে
তুমি শুধু ফুটিয়ে দিও প্রেমের আলো মোর প্রাণে
দূর সুদূরে চলার পথে কইবে কথা কানে কানে।

জীবন আমার উঠবে হেসে প্রভাত রবি আলোক সম
টুট্‌বে আমার সব দীনতা মলিনতা আঁধার তম।
তোমার সাথে এমনি ক'রে ভরব জীবন তোমার তরে,
চলার পথে তুমি আমি অটুট বাঁধন বন্ধু যে,
তোমার মাঝেই হারিয়ে যাব জীবন তোমার সিন্ধু যে।

বন্ধু আমি এই জীবনে কতই তোমায় দুঃখ দিই,
দুখের সাথে তোমার প্রীতি ততই শুধু কুড়িয়ে নিই।
এই যে তোমার ভালোবাসা, প্রতিদানের নেইক আশা,
ঢেউলে আমার বুকখানিতে পূর্ণ শুধু করেই নিই,
বন্ধু আমার এই জীবনে কতই তোমায় দুঃখ দিই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার জন্মভূমি কুমারখালি থেকে প্রকাশিত ও আমার শিক্ষাগুরু ও জীবনের আদর্শ—কাঙাল হরিনাথ (তখন শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয়) সম্পাদিত "গ্রামবার্ত্তাকাশিকা" পত্রিকার কথা পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ দু' এক স্থলে তার উল্লেখও করেছি, কিন্তু "গ্রামবার্ত্তা"র ধারাবাহিক ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ করিনি। এই স্থানে সেই কাজটা শেষ করি।

আমি আমার সাহিত্যসেবার প্রেরণা পেয়েছিলাম—কাঙাল হরিনাথের কাছে। আর সুযোগ পেয়েছিলাম—"গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা"র মধ্য দিয়ে। "গ্রামবার্ত্তা"র জীবনের শেষ দুই বৎসর আমি নানা ভাবে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং তার অন্তিম সৎকার আমার ও আর দু' চারজন বন্ধুর হাতেই হয়। সুতরাং "গ্রামবার্ত্তা"র কথা বলতে গেলে আমার জীবনের একটা প্রধান কথা।

বড়ই আনন্দের কথা যে, "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা"র বিবরণ প্রকাশ করবার জন্য আমাকে আয়াস স্বীকার করতে হবে না। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক—আমার পরম স্নেহভাজন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়া "বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাস" সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ১৮১৮ থেকে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত বাংলায় মুদ্রিত সাময়িক পত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তিনি প্রকাশ করেছেন। "গ্রামবার্ত্তা" ঐ সময়ের পরে প্রকাশিত হওয়ার জন্য শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রকাশিত ১ম খণ্ডে তার স্থান পায়নি। কিন্তু শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ "সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা"র দ্বিচত্বারিংশ ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডে "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা"র একটী বিবরণ প্রকাশিত করেছেন। এই বিবরণটী উদ্ধৃত করে' দিলেই "গ্রামবার্ত্তা" সম্বন্ধে সকল বিবরণই পাঠকগণ জানতে পারবেন। ইহার সংগ্রহে কাঙালের ভ্রাতুষ্পুত্র পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান্ ভোলানাথ মজুমদার সাহায্য করেছেন। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের বিবরণ যে অভ্রান্ত, এ কথা আমি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি। নিম্নে সেই সঙ্কলিত বিবরণই প্রদত্ত হ'ল :

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭০) কুমারখালীর বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১জুন ১৮৮৩) লেখেন—

"গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা। ইহা অভিনব মাসিক সমাচারপত্রিকা। গত বৈশাখ মাস অবধি কলিকাতা অপর সর্কিউলার রোড বাহির মৃজাপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইতেছে। কুমারখালিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। গ্রামের বৃত্তান্তাদি বাহুল্যরূপে ইহাতে লিখিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখা গেল লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহাতে গদ্য ও পদ্য আছে। সম্পাদক যদি পরিশ্রম করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে। ইহার মাসিক মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩ টাকা।"

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত :—

"গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।"

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পরিচালনা করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হন। এই কারণে নয় বৎসর কায়ক্লেশে কাগজখানি চালাইবার পর তিনি উহার প্রচার বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সহৃদয় বন্ধুরা চাঁদা করিয়া কাগজখানি বজায় রাখেন। ১২৮০ সালের ৬ই

বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৭৩) তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা গত সংখ্যক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক আজ কয়েক বৎসর শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এই পত্রিকাখানি চালান। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হন এবং আপাততঃ তিনি ঋণভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজখানি বন্ধ করার সংকল্প করেন এবং পত্রিকায় সেইরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১লা বৈশাখে তিনি পত্রিকা সম্বন্ধে নিজ গৃহে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এবার সেই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট পত্রিকা রহিত করিবার প্রস্তাব করায়, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একটি চাঁদা করিয়া পত্রিকাখানি আপাততঃ রাখিয়াছেন। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক কুমারখালীতে একটি যন্ত্রালয় [স্থাপন করিবার] উদ্যোগ করিতেছেন।"

এই সংখ্যা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :—

কুমারখালি—প্রতিবাদ।...গতকল্য গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার সমস্ত ব্যয় চালাইতে স্বীকার করায়, সকল সভ্যগণে সেই ভার কুলাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।...কেষাঞ্চিৎ কুমারখালীবাসিনাম্।"

১২৮০ সালের প্রারম্ভে কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র (মথুরানাথ-যন্ত্র) স্থাপন করেন; অতঃপর ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতেই 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' মুদ্রিত হইতে থাকে। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

"সংবাদ।...আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রত্য স্থানীয় সম্বাদপত্র গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।"

১২৮১ সালের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বৈশাখ সংখ্যায় পৃষ্ঠায় "১২ ভাগ—১ম সংখ্যা" লেখা আছে; সংখ্যার উপর লেখা আছে "১২ ভাগ—২য় সংখ্যা"। তবে পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত না হওয়ায়, ১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় লেখা আছে "১৩ ভাগ—১ম সংখ্যা"। ঐ সংখ্যার সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতেছেন :—

"গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশী অবস্থাবলোকনে অনেক গ্রাহক নিদয় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। কেবল দীনপালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্য-দানের উপর নির্ভর করিয়া, সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এতদিন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না।... ... আমরা নানা কারণে আশ্বিন মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তার নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।"

এই ভাবে পত্রিকা দুই বৎসর চলে। তাহার পর পুনরায় বৈশাখ হইতে উহার বৎসর গণনা করা হয়।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বয়স উনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় গ্রাহকগণকে জানাইতেছেন :—

"গ্রাহকগণ! অনুগ্রহপ্রকাশে আমাদিগের মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রাপ্য মূল্যগুলি সত্বরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবেন। মাসিক গ্রামবার্ত্তা যে এই হইতে বন্ধ হইল, ইহার কারণ গ্রাহকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না। তবে গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে গ্রামবার্ত্তার দেয় মূল্য না দেওয়াই যে বন্ধ হইবার প্রধান কারণ, তাহা, বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।"

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র গোড়ায় সম্পাদক লিখিতেছেন :—

নানা কারণে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কখন সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয় নাই;—দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসর তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। এক দিকে ভারতাকাশে মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থার জন্য উদাত্ত বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন* এবং তচ্ছ্রবণে 'বঙ্গভাষার সংবাদপত্র কেবল সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া', অন্যদিকে তাহার প্রতি লোকের অমনোযোগ, গ্রাহকগণেরও মূল্য প্রদানে ঔদাসীন্য অবলম্বন, নানা চিন্তায় উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকের শয্যাশ্রয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার কারণ।...গ্রামবার্ত্তার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু সাপ্তাহিকপত্রিকা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে যত্ন করিতেছেন। যদি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সত্বরেই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা তাহার জীবনাশা আর নাই।"

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হইলে, ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনঃপ্রকাশিত হইতে লাগিল—গ্রামবার্ত্তা'র দরদী বান্ধবগণের যত্ন ও চেষ্টায়। তখন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন রায় বাহাদুর

* বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে।

জলধর সেন ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯৯ সালের* আশ্বিন মাসে।

কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশিকা' সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার সবটুকু উদ্ধৃত করা হইল :—

আমি শুনিলাম, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রতিশ্রুত করাইলাম। (১৯২৪ পৃঃ)

কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায়, (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালায় যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈতৃক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতিপ্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদপত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভগ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান হয়, তবে আমি তখন ভাতাস্বরূপ কিছু কিছু পাইব। (১৪২৫-২৬ পৃঃ)

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বার শত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসর পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য বন্ধ করিলেন; সুতরাং গ্রামবার্ত্তাপ্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তদ্ব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না।...[১৪২৭-২৮ পৃঃ]

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি করমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [১৪৩০ পৃঃ] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।...অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া... পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তাপ্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম [১৪৩২ পৃঃ]

আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন, দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই একজন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকার

* কাঙ্গালের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীভোলানাথ মজুমদার আমাকে জানাইয়াছেন—"আমার পিতৃদেব বিহারীলাল কাঙ্গাল হরিনাথের আমরণ সহচর ছিলেন। তাঁহারও একখানি ডায়েরী আছে। তাহাতে লেখা আছে,—'মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হওয়ার পর, সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা আড়াই বৎসর জীবিত ছিল'।" ইহা সত্য হইলে, সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হয় ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে। কিন্তু রায়-বাহাদুর শ্রীজলধর সেনের মতে "১২১২ সালের আশ্বিন মাসে ২২ বৎসর প্রকাশের পর, গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়।" ('কাঙ্গাল হরিনাথ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫)।

লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী। দীনজনের দীনতার দিন এইভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [১৪৩৯ পৃঃ]

...এতদিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না।...গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান্ কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুই শত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে...... [১২৭৪ ?] সালের বৈশাখ মাস হইতে গ্রামবার্ত্তা পক্ষান্তরে প্রচার করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। [১৪৪২ পৃঃ] প্রায় দুই মাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবনরক্ষা হইবে" অনন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম, সন্দেহ নাই।... কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ একশত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুইশত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি একশত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই একশত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [১৪৪৩ পৃঃ] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে, এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন্ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এস্থলে কেবল এই মাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের—হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রাম বার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রাম-বাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি-সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই [১৪৪৪ পৃঃ] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [১৪৪৫ পৃঃ]... ...

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসরমত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রাম-বার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি ততদূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম। [১৪৬২-৩] ...

চারি দিকে পুস্তকবিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকাস্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি, তবে সে চলিতে পারে না, নিজের নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।...এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায়চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল। [১৪৯১ পৃঃ]...

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [১৬৭৩ পৃঃ] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয়শত টাকা...আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।...উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালিত এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে [১৬৭৪ পৃঃ] 'মথুরানাথ-যন্ত্র' নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতায় বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান। [১৬৭৫ পৃঃ]...

আমি প্রেসস্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬-৭টি পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু

আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তদ্‌সঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [১৬৮১ পৃঃ]

আমি প্রেসস্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি পরে কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০৲ বারশত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। [১৬৮৪ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

সাগর-খ্রীষ্ট

অনাতোলে ফ্রাঁস

সে বছর সাঁ-ভালেরির অনেক জেলেই সমুদ্রে ডুবে মারা গেল। তাদের মৃত্যু-পিঙ্গল দেহ সমুদ্রের ঢেউয়ে-আনা তাদের নৌকার ভগ্নাবশেষের মাঝে সমুদ্রতীরে পাওয়া গেল; এবং তারপর পুরো নয়দিন ধ'রে দেখা গেল সমুদ্রতীর থেকে গির্জ্জা পর্য্যন্ত খাড়া পথ ধ'রে কফিনের মিছিল— তাদের অনুসরণ ক'রে চলেছে বাইবেল-কথিত মহীয়সী নারীর মত কালো গাউনে-ঢাকা ক্রন্দনরতা বিধবারা।

এদের সঙ্গেই গির্জ্জার প্রশস্ত ঘরে শুয়েছিল সর্দ্দার জঁ। লেনোয়েল ও তার ছেলে দেসায়ারে। একদিন এই পূত-সুন্দর ঘরে দাঁড়িয়ে তারাই তাদের ছোট্ট জাহাজটিকে আমাদের মহীয়সী নারীর নামে উৎসর্গ করেছিল। তারা ছিল সৎ ও ধর্ম্মানুরাগী। সাঁ-ভালেরির ধর্ম্ম-যাজক মঁসিয়ে গিলোমে ক্রফেমি মঙ্গলানুষ্ঠান শেষ ক'রে অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বললেন: "এই গির্জ্জার ইতিহাসে জঁ। নেলোয়েল ও তার ছেলে দেসায়ারের চেয়ে ভালো ক্রিশ্চিয়ান এবং এদের চেয়ে মহত্তর মানুষকে ভগবানের বিচারের অপেক্ষায় আর কখনও এই পবিত্র মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়নি।"

বড় বড় নৌকোই শুধু তীরের কাছে ডুবে যায়নি, তরঙ্গোচ্ছল দূর সমুদ্রে বড় বড় জাহাজও ডুবেছিল। তাই এমন একদিনও যেত না, যেদিন সমুদ্রের ঢেউয়ে কোনও জাহাজের ভগ্নাবশেষ তীরে এসে না লাগত।

এমনি একদিন সকালে কয়েকটি ছেলে একটী ছোট্ট নৌকো চালাতে চালাতে সমুদ্রে একটি মূর্ত্তি ভাসতে দেখল। মূর্ত্তিটি প্রমাণ মাপের যিশুখ্রীষ্টের একটি কাঠ-খোদাই—দেখাচ্ছিল যেন এটি বহু পুরাতন এবং জীর্ণ হ'য়ে উঠেছে। প্রসারিতহস্ত মহান্ যিশু জলে ভাসছিলেন। ছেলেরা মূর্ত্তিটিকে টেনে তীরে এনে সাঁ-ভালেরির প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল। তাঁর মাথা ঘিরে তখনও কাঁটার মুকুট ছিল, হাত ও পা তখনও ফুটো ছিল—কিন্তু কাঁটাগুলোর সঙ্গে ক্রুশটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ছেলেরা যিশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তিটি মঁসিয়ে ল্য ক্যুরে ক্রফেমিকে দিল। তিনি তাদের বললেন: "জগৎ-ত্রাতার এই মূর্ত্তিটি পুরাতন শিল্পের মূর্ত্ত প্রতীক। এই অদ্ভুত প্রতিভাবান্ শিল্পীর নিশ্চয়ই বহু পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে। যদিও আজ আমি কিংবা প্যারির দোকানে মাত্র একশ ফ্রাঁ দিয়েই সুন্দর মূর্ত্তি কিনতে পাওয়া যায়—এই মূর্ত্তি দেখে পুরাতন ভাস্কর্য্যের স্বকীয়তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আজ শুধু একটি চিন্তায় আমার সমস্ত হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হচ্ছে—যিশুখ্রীষ্ট যদি সাঁ-ভালেরিতে হস্ত-প্রসারিত ভাবে এসে থাকেন তো সে এই নগণ্যপল্লীতে শুধু আশীর্ব্বাদ করতে, আর জানাতে যে দরিদ্র জেলেরা তাদের জীবন বিপন্ন ক'রে উত্তাল সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তাদের উপর তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনিই সেই ভগবান, যিনি সমুদ্র হেঁটে পার হয়ে সেফাস্‌কে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।"

মঁসিয়ে ল্য ক্যুরে ক্রফেমি যিশুকে গির্জ্জার উচ্চ বেদীতে রেখে সূত্রধর লেম্যারের অনুসন্ধানে গেলেন একটি ওক কাঠের সুন্দর ক্রুশের কথা বলতে।

ক্রুশটি তৈরি হ'লে, জগৎত্রাতাকে নূতন কাঁটায় ক্রুশ-

বিদ্ধ ক'রে ধর্ম্ম যাজকের আসনের উপর সোজা ক'রে রাখা হ'লো। আর দেখা গেল—তাঁর চোখ অনুকম্পায় এবং স্বর্গীয় করুণায় অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছে।

ক্রুশবিদ্ধ করার সময়ে একজন ধর্ম্ম যাজকের মনে হ'ল, তিনি যেন দেখলেন যে, খ্রীষ্টের স্বর্গীয় মুখের উপর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ছে। পরদিন প্রাতে যখন ম'সিয়ে ল্য ক্যুরে আবার গির্জ্জায় এলেন, তিনি দেখলেন যে, ক্রুশটির চিহ্নমাত্র নেই, শুধু যিশু একা বেদীর উপর শুয়ে আছেন।

মঙ্গলাচরণ শেষ হওয়া মাত্র তিনি কাঠের মিস্ত্রিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে যিশুখ্রীষ্টকে ক্রুশ থেকে খুলে নীচে নামিয়েছে! কিন্তু মিস্ত্রি জানাল যে, সে তাঁকে আর একবারও ধরেনি, নামানো তো দূরের কথা! তারপর চৌকিদার ও অন্যান্য সকলের কাছে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, ধর্ম্ম-যাজকের আসনের উপর যিশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ ক'রে রাখার পর আর ও-ঘরে কেউ প্রবেশ করেনি।

তিনি এই ঘটনার অসাধারণত্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন। পর রবিবার সকলকে এই ঘটনা ব'লে তিনি অনুরোধ করলেন, যিশুর ক্রুশ তৈরী করার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করতে। সেই ক্রুশ যেন আরও সুন্দর হয়, যেন জগৎ-প্রভুর নাম আরও মহিমাজ্জ্বল ক'রে তোলে!

স'াভালেরির দরিদ্র জেলেরা তাদের সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করল, বিধবারা তাদের বিবাহ-আঙটি দিল ক্রুশের জন্য। এবারে ম'সিয়ে ক্রুফেমি একটি আবলুস-কাঠের সুন্দর ক্রুশ তৈরি ক'রে এনে যিশুকে কাঁটা-বিদ্ধ করলেন। কিন্তু এবারও আগের মতই যিশু ক্রুশ থেকে নেমে এলেন। রাত্রির অন্ধকার ঘন হওয়ার পর তিনি বেদীর উপর সমস্ত শরীর প্রসারিত ক'রে শুয়ে রইলেন।

ম'সিয়ে ল্য ক্যুরে সকালে তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে নতজানু হ'য়ে অনেকক্ষণ ধ'রে উপাসনা করলেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্যারি ও অন্যান্য জায়গা থেকে আসতে লাগল অর্থ, মণিমুক্তো, এমন কি নৌ-সচিবের স্ত্রী কতগুলো হীরক পাঠিয়ে দিলেন। এক স্বর্ণকার একটি রত্নখচিত স্বর্ণ-ক্রুশ উপহার দিলেন; ইষ্টারের পর দ্বিতীয় রবিবারে আবার স'াভালেরির গির্জ্জায় যিশুকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হ'লো। কিন্তু যিনি দুঃখ ও কষ্টের ক্রুশে প্রতিবাদ করেননি, তিনি স্বর্ণ-ক্রুশ ছেড়ে নেমে এলেন প্রশস্ত বেদীর উপর।

এবারে তাঁকে ওখানেই রাখা হ'ল, নূতন ক'রে ক্রুশ বিদ্ধ করতে আর কারও সাহস হ'ল না। সেখানে ওই বেদীর উপর তিনি ওইভাবেই রইলেন দু'বছরেরও বেশী;—তারপর একদিন পিয়ারে হঠাৎ এসে ম'সিয়ে ল্য বহরে ক্রুফেসিকে সংবাদ দিল যে, সে ওই যিশুর সত্য ক্রুশ সমুদ্র-তীরে পেয়েছে।

পিয়ারে ছিল অত্যন্ত নিরীহ এবং জীবিকার্জ্জন করার মত তার যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকায়, লোকে তাকে দয়া ক'রে রুটি দিত। সকলেই তাকে ভালবাসত, কারণ সে কোনও দিন পরের অমঙ্গল চিন্তা করেনি। তার এলোমেলো কথায় কেউ কাণ দিত না।

ম'সিয়ে ক্রুফেমি কিন্তু এই সাগর খ্রীষ্টের কথা একটুও ভোলেন নি, তাই ওই দরিদ্র নির্বোধের কথায় চমকিত হয়ে উঠলেন। চৌকিদার ও দু'জন সঙ্গী নিয়ে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন, দুটি তক্তায় কাঁটা মারা আছে এবং তা' সত্য সত্যই ক্রুশের মত দেখাচ্ছে।

ওগুলো কোনও জাহাজ-ডুবির ভগ্নাবশেষ। একটি কাঠে তখনও কালো কালি দিয়ে লেখা দুটি অক্ষর পড়া যাচ্ছিল—'জে' ও 'এল'; এবং কারও সন্দেহ রইল না যে, এটি লেনোয়েলের জাহাজেরই ভাঙ্গা এক টুকরো—সে ও তার ছেলে দেসায়ারে আরও পাঁচ বছর আগে জাহাজ ডুবি হ'য়ে মারা গেছিল।

ওই তক্তা দুটো দেখে চৌকিদার ও সঙ্গী দুজন হো-হো ক'রে হেসে উঠল—নির্ব্বোধটি বলে যে জাহাজের এই ভাঙা তক্তা দুটো কিনা যিশুর ক্রুশ! কিন্তু ম'সিয়ে ল্য ক্যুরে তাদের এই আনন্দোচ্ছ্বাস বন্ধ ক'রে দিয়ে সমুদ্রতীরে ভিজে বালির উপর নতজানু হ'য়ে ব'সে উপাসনা করতে লাগলেন—এবারে উপাসনা করলেন সেই হতভাগ্য দু'টি ছেলের জন্য, যারা পাঁচ বছর আগে এই সমুদ্র-গর্ভেই তাদের জীবনের শেষ জলাঞ্জলি ক'রে গিয়েছিল। তারপর

চৌকিদার ও সঙ্গী দু'জনকে বললেন, ওই তক্তা দু'টিকে গির্জ্জায় নিয়ে যেতে। গির্জ্জায় তক্তাদুটি আনা হ'লে পর, তিনি নিজে যিশুকে বেদীর উপর থেকে তুলে ওই ক্রুশের মত তক্তাদুটির উপর রাখলেন এবং সমুদ্রের লোণা জলে ক্ষয়ে-যাওয়া কাঁটা দিয়ে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন।

ধর্ম্ম-যাজকের আদেশে এই ক্রুশই স্বর্ণ-ক্রুশের স্থানে বেদীর উপর স্থাপিত হ'ল। সাগর-খ্রীষ্ট কিন্তু আজও তা' ত্যাগ করেন নি। যে তক্তার জাহাজে তাঁরই একান্ত উপাসকেরা জল-ডুবি হয়ে মারা গেছে, সেই তক্তার ক্রুশে তিনি কাঁটাবিদ্ধ হ'য়ে থাকতেই স্থির করলেন। সেই ক্রুশ-বিদ্ধ হ'য়ে অস্ফুট দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে তিনি যেন আজও বলছেন: "আমার ক্রুশ মানবাত্মার দুঃখ দিয়ে গড়া, কারণ আমিই একমাত্র দরিদ্র ও ভারাক্রান্তের ভগবান।"*

* অনুবাদ করিয়াছেন—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রঃ সঃ

বাংলাসাহিত্যের শারীরক ভাষ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভাষা বিপর্য্যয় আলোচনাপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্র "অপভ্রংশের" নাম উল্লেখ করেছেন। যা' অধোমুখী ও ভ্রষ্ট, তাকেই অপভ্রংশ বলা চলে। সে যুগের অধস্তরের [proletarian] অথবা তারানাথের উক্তি হতে যাকে নাগ-সাহিত্য বলেছি সে সাহিত্যের "অপভ্রংশ" নাম হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী দণ্ডী তাঁর "কাব্যাদর্শে" ভাষাকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। কাজেই 'অপভ্রংশ' কথাটি বহু পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতদের সৃষ্ট উক্তি বলতে হবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পালি, প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নেই। তিনি বলেন:—প্রাকৃত ব্যাকরণে যা' কুলায় না, তা' "অপভ্রংশ"। বস্তুতঃ সে যুগের আদি ভাষাগুলি সহজেই বিদ্রোহী হয়েছিল প্রাক্তন ব্যবস্থার উপর। বাংলার আদি সাহিত্যও ব্যাকরণকে অতিক্রম ক'রেই অগ্রসর হয়েছে। আগে হয় গীতিকাব্যের সৃষ্টি, তারপর নির্দ্ধারণ করতে হয় তার বিধি। কোন ব্যাকরণ অনুসরণ করে' ভগবানের সৃষ্টি যেমন হয়নি, তেমনি সত্যিকার মানুষের সৃষ্টিও শুধু অস্বীকার উপর নির্ভর না করে' আত্ম-সমাহিত অন্তর্দৃষ্টিকেই ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠে। এই সৃষ্টিকে ব্যাপক করা চলে নানা তিলকে, লক্ষণে, আভাষে ও ধ্বনিতে। বলা প্রয়োজন, বাংলার আদি সাহিত্যে এই ব্যাপকতা সৃষ্ট হয়েছে সন্ধ্যা-ভাষার সাহায্যে। সন্ধ্যা-ভাষায় সীমা ও অসীমের মিলন আছে, দৃশ্য ও অদৃশ্যের যোগ আছে। এর ভিতরকার ধ্বনি ও নির্দ্দেশ একটা বিরাটতর জগতের বাণী বহন করে। এ শ্রেণীর সাহিত্যধর্ম্ম জাপান, চীন ও পারস্যেও লক্ষ্য করা যায়। এর বিশিষ্ট কারণও ছিল। বিশেষতঃ, জটিল যুগের বাহন জটিল হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

বস্তুতঃ, অপভ্রংশ ভাষার মর্য্যাদা জগতের ইতিহাসে সব জায়গায়ই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সর্ব্বত্রই একদিকে প্রাক্তন সভ্যভব্য 'ক্লাসিকাল' ভাষার কঠিন দাবী, অন্য দিকে সত্যের নূতন উদয়ের দিগন্তে রক্তমাখা হৃদয়ের ক্ষতবিক্ষত গ্রাম্যভাষার আকুলতা এ দু'টির বোঝাপড়া অবশ্যম্ভাবী হয়। ইংরাজী সাহিত্যে সপ্তম ও পরবর্ত্তী শতাব্দীসমূহে ল্যাটিনের সাহায্যে কবিতা লিখা হ'ত—গীর্জ্জার ল্যাটিন সঙ্গীতের অনুকরণে। জর্ম্মণ সাহিত্যের ইতিহাসে ৭৫০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনতর যে উর্দ্ধ জর্ম্মন যুগের (High German period) খবর পাই, যাকে 'Volker wanderung' বা গণপ্রস্থানের যুগ বলা হয়েছে, তাতে কিছুকাল গ্রাম্য ভাষার চর্চ্চা থাকলেও, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আবার সাহিত্যে ল্যাটিন যুগ এসে পড়ে। কিন্তু ল্যাটিন ব্যবহৃত হয়েছে বলে' সে যুগের রচনা বর্জ্জনের বা ধিক্কারের ব্যাপার হয়নি। কারণ পরবর্ত্তী সাহিত্যে সঞ্চারিত রসস্কন্দের ছায়া এসব

রচনায় পাওয়া যায়।* এজন্য বাংলাদেশেরও তথাকথিত গণসাহিত্যের ধারার পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্য ও তাম্র-শাসনাদির ভিতর সঞ্চিত মণিমঞ্জুষাকে কাদায় ফেলে জয়ধ্বনি করার কোন মানে হয় না। জর্ম্মণ আলোচকগণকে এজন্যই দশম ও একাদশ শতাব্দীতে খাঁটি জর্ম্মণ রচনা দুর্লভ বলে' কৃত্রিম ভড়ং করতে বা হাহাকার করতে দেখা যায় না। সকল শ্রেণীর সাহিত্যেই জাতির হৃদয় মুকুরিত হয়। যতটুকু পাওয়া যায় এ সাহিত্য ততটুকুই অসামান্য। এসব বহুমুখী নির্দ্দেশের সাহায্যেই সুসাহিত্যের বিচারে অগ্রসর হ'তে হয়। ইতালীয় সাহিত্যেও Dante অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার আরম্ভ করেন কিছুকাল পরে। গোড়াতে তিনিও ল্যাটিনে লিখতেন। নব্য ইতালীয় সাহিত্যকে এ ক্ষেত্রে "Vulgar" বলা হয়েছে। 'Vulgar" ও "অপভ্রংশ" এক রকমেরই কথা।†

পূর্ব্বতন ক্লাসিক বা প্রাচীন ভাষায় লিখিত রচনায় জাতির প্রকৃত মানসিক ধারাকে অনুসরণ করতে হয়—এই ধারা না বুঝলে সাহিত্য বা কলা কিছুরই রসভোগ সম্ভব হয় না। মাইকিনীয় সভ্যতা কোন আক্ষরিক লিপি রেখে যায় নি। নোসোস (Knossos) প্রভৃতি জায়গায় যে সব মূর্ত্তি, অঙ্গুরীয়ক ও খেলনা প্রভৃতি পাওয়া গেছে, সে সব বিচার ক'রেই এই সভ্যতার মর্ম্ম ও প্রেরণা অধীত হয়েছে। সমসাময়িক কলাসংগ্রহ, তাম্রশাসন ও মুদ্রাদির ভিতর সঞ্চিত বহু উপাদান জাতীয় সভ্যতা ও শীলতা ব্যাখ্যার সহায়তা করে। গ্রীক, মিশর প্রভৃতি সভ্যতার মর্ম্ম বিচার, এমন কি এসব সভ্যতার সাহিত্যসঞ্চয়ের মর্ম্মোদ্ধারের জন্য, এ শ্রেণীর উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। মিশরের মূর্ত্তিরচনা ও Serdabএর সঞ্চয় "Book of the Dead" ব্যাখ্যার সহায়ক হয়েছে। গ্রীক নাটকের ব্যঞ্জনা মর্ম্মরীভূত দেবমূর্ত্তির অকপট প্রেরণা হ'তে অর্থলাভ করেছে। গ্রীক মুদ্রার বিচিত্র ভাবগমক সমগ্র জাতির হৃদয়কন্দরের উপর বার বার আলোকপাত করে' মুখর হয়েছে। কাজেই জাতীয় মনোজগতের ছন্দ আবিষ্কারে এসব শাস্ত্র অপরিহার্য্য বিবেচিত হচ্ছে বর্ত্তমান যুগে। বাঙালী জাতির মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করতে হলে, এভাবে এসব শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজনীয়। প্রাক্-ভারতের, বিশেষতঃ গৌড়ীয় 'Weltanshang' কি রকম ছিল, তা' না জেনে ও না বুঝে সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত', চর্য্যাপদের অনুশাসন বা জয়দেবের মৃদঙ্গমাধুর্য্য অনুভবের চেষ্টা একটা পরিহাস মাত্র। আধুনিক যুগে সাহিত্যবিচারকের এই ক্ষেত্রে দৈন্য বা অজ্ঞতা অমার্জ্জনীয় বলতে হয়। একটি অলীক অবস্থা স্বীকার করে' করতালি দেওয়ার চেষ্টার কোন মানে হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের একটা অসাধারণ দৃষ্টি ছিল—তাতে ক'রে তিনি প্রাচীনতার মুখোস খুলে তার ভিতরকার রহস্য খুঁজে পেতেন। কিন্তু যাঁরা কথামালার আখ্যানের মত গল্প ফেঁদে বসেন যে, আধুনিক বোষ্টমদের মত খঞ্জনী হাতে ক'রে চর্য্যাপদের রচক বা গায়কেরা অলসভাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াত, তাঁরা চর্য্যাপদের রসসমাবেশ যেমন বোঝেনি, তেমনি সমসাময়িক সাহিত্য ও কলা-কৌলীন্যের মুখ্য প্রেরণাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। সে যুগের বহু হৃদয়বার্ত্তা নানা সমান্তরালক্ষেত্র হ'তে আহরণ অসম্ভব নয়। সে সমস্ত সংগ্রহের বিচিত্র আলোকেই আজ নানা যুগের বাঙালীর হৃদয় পরখ করতে হবে। বাঙালীর হৃদয়ের সহিত পরিচিত না হ'লে বাংলার কাব্য বোঝা যাবে না। প্রাচীন গ্রন্থের ক্যাটেলাগ করা বা করকোষ্ঠী রচনা করা এক্ষেত্রে শেষ কাজ নয়।

বাংলার স্বাধীন পাল ও সেন-যুগের কথা উল্লেখ করা গেছে। তারপর এসেছিল দাসযুগের অধ্যায়—সে অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্য্যায় চলছে'আজ পর্য্যন্ত। প্রমিথিয়সের মত বাংলার সভ্যতা ও শীলতা রুদ্ধ অবস্থায় যা' রচনা করেছে, তার ভিতর ধরা পড়েছে এ জাতির নিষ্পিষ্ট অন্তর্দ্দাহ ও দলিত ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু কঙ্কালসার ইতিহাসের এই অতি ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর বাংলা জাতিকে আবদ্ধ মনে করে' সাহিত্যের পরিমাপ করাও অবিচার। বাঙালীর সাহিত্য কি বাংলা সাহিত্য নয়? এর আধুনিক উত্তর

---

* I. G. Robertson. History of German literature, "The lay of Walters Ruodliel, although not in German. foreshadow the future development of German poetry," P, 270,

† Hammerton, "During more than a thousand years Latin had been in Europe the sole medium for the utterance of what was the highest in human thought. Dante had begun the poem in Latin but was Indeed, later decided to adopt the vulgar tongue." (History of the world P. 3223.)

হচ্ছে 'না'। কারণ একটা বিশিষ্ট সময়ে ও আবহাওয়ায় যে সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে অর্থাৎ মধ্যযুগের সীমান্তে তাকেই বাংলা সাহিত্য বলতে হয়েছে। কতকটা বর্ত্তমান আকারে বাঙালী যে সাহিত্য রচনা করছে, তার ধারাকে অনুসরণ করে' শুধু এই খণ্ড রচনার গঙ্গোত্রীতে গিয়ে সকলকে থাম্‌তে হচ্ছে।

এর ফলে বাংলার সভ্যতারও সঠিক বর্ণনির্ণয় হচ্ছে না। সভ্যতার কুলশীল বা উপাদান ঠিক না জানলে, প্রাচীন বা নব্য বাংলা সাহিত্যের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন আবেশ ও মূর্চ্ছনার রূপরাগই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একেবারে হঠাৎ কিছু জন্মে না—সব সাধনার একটা ইতিহাস আছে—কাজেই বাংলা দেশের সাধনভজন, উপলব্ধি ও অনুভূতির ভিতরকার রঙীন গমকগুলিকে ধরা প্রয়োজন। এ না হ'লে সাহিত্যের ভিতরকার উড়ো গল্প বা কাব্যের গৌণ আধারকে নিয়ে চর্চ্চা করার কোন মানে হয় না।

পাল যুগেই বাংলা সাহিত্যের সীমান্ত আঁকা হয়েছে। তার মানে কি? এর পূর্ব্বতন ঐতিহাসিক অধ্যায়সমূহে কি বাঙালী জাতি ছিল না, বা তাদের কোন আক্ষরিক বিদ্যার সহিত পরিচয় ছিল না? তা' হ'লে সে সব রচনা কি আলোচ্যই হবে না? বাংলা সাহিত্য বল্‌লে বুঝতে হচ্ছে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, যা' প্রাকৃত ভাষাগুলির বিস্তৃতি ও বিক্ষেপের পরবর্ত্তী যুগে অপভ্রংশ ভাষারূপে অতীতের শবদেহের উপর হঠাৎ জেগে উঠেছিল বরাভয়-করে! আলোচকদের মতে হিন্দী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভাষা দশম শতকে আবির্ভূত হয়। হিন্দী ভাষার রকমারি গ্রাম্য বিভাগ অসামান্য ছিল। পশ্চিমে হিন্দীর ভিতর বাঙারা, ব্রজভাষা (মথুরা), কনৌজী, বুন্দেলী এবং পূর্ব্বের হিন্দীর ভিতর আবাদী, বাঘেলী ও ছত্তিসগড়ী হয়েছিল প্রস্ফুটভাবে স্বীকৃত। অপর দিকে রাজস্থানীর ভিতর মেওয়াটি, মাড়োয়ারী, জয়পুরী ও মালবী স্বীকৃত হয়েছে। এগুলিকে এক সঙ্গে ঢেলে একটি হিন্দী ভাষা দাঁড়িয়ে গেল পরবর্ত্তী যুগে যার নমুনা পাওয়া যায় ভামদেব, কবীর, মীরাবাঈ ও মালিক মহম্মদের ভিতর। উর্দ্দু শব্দের মানে হচ্ছে তাঁবু। এই তাঁবুর সাহিত্যও ক্রমশঃ আসরে এসে পড়ল। অপর দিকে প্রাক্-ভারতে ঘটল বিপর্য্যয়ের পরম্পরা। যদিও বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ এই অঞ্চলকে নানা দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল, তবুও ক্রমশঃ এ অঞ্চল নিজের অর্জ্জিত গৌরবে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। তাতে ক'রে যে "অপভ্রংশ" ভাষা এক সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলেও আধিপত্য লাভ করে, তার ভিতর সঞ্চারিত হ'ল নূতন নূতন শাসন ও স্বপ্ন! ফলে পশ্চিমা অপভ্রংশের সমসাময়িক প্রভাব নানা বিচিত্র-ভাবে রঞ্জিত হ'য়ে পড়ে। এ যুগে শতকের পর শতকের কোন ভাষাগত নমুনা পাওয়া যায় না, যার উপর ভিত্তি ক'রে কোন বড় কথা বলা চলে। কাজেই পঞ্জাব হ'তে সুরু ক'রে বাংলা দেশ পর্য্যন্ত কোন একটানা এক রঙীন ভাষার পক্ষে ওকালতী সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত মধ্যযুগে প্রাক্-ভারতের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট হ'লেও, জনগণের ও শাসকগণের নৃ-তাত্ত্বিক পটভূমি এ সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন। কাজেই ভাষাগত বৈচিত্র্য এক্ষেত্রে প্রচুরভাবে থাকা বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

পালরাজগণ রাজপুত ছিলেন না।* কাজেই পশ্চিম ভারতের ভাষার সহিত প্রাক্-ভারতীয় ভাষার অবশ্যম্ভাবী বিভিন্নতা সহজেই অনুমান করা যায়। নৃ-তাত্ত্বিক দিক্ হতেও পশ্চিম ও পূর্ব্বভারতের মাঝখানটিতে দাঁড়ি টানবার অবসর হয়। এ আলোচনাও বিস্তৃতভাবে যথাস্থানে করা প্রয়োজনীয়। পালরাজবংশের গোপাল সাধারণ কর্ত্তৃক দেশের লোকের ভিতর হতেই নির্ব্বাচিত হন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' ও ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' এ বংশের পরিচয় আছে। কমৌলী তাম্রশাসনেও পালরাজগণের বংশবার্ত্তা আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' পালদের সমুদ্র হতে উৎপত্তির কথা আছে। সুতরাং এ বংশ পঞ্জাব বা রাজপুতনা হইতে আসেনি। কাজেই এই বংশের ভাষা পূর্ব্বাঞ্চলের শব্দসঞ্চয়ে ও রীতিতে পূর্ণ হয়। ফলে প্রাক্-ভারতের কথিত ভাষা ও অপভ্রংশে অভিনবত্বের সঞ্চার হয়। এমন কি এ অঞ্চলের সাহিত্য-সৃষ্টির ধ্বনি এবং কলা-লীলায় ছন্দে ছিল নব্য পরিবেশনের অপূর্ব্ব মাদকতা। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হ'তে চর্য্যাপদের ব্যাখ্যা অপেক্ষাও

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৩৬ : পৃঃ ৭০০।

ভাবতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিক্ হ'তে অধ্যয়ন অধিক প্রয়োজন। কারণ সমসাময়িক প্রাক্-ভারতীয় ভাষাগুলির গলিত অবস্থায় প্রাকৃত বৈয়াকরণিকেরা মগধ-চক্রের ভিতর, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্য, উৎকল ও শাবরীর উল্লেখ করেছে যেমন, তেমন মাগধীর ভিতর মৈথিলী, গৌড়ীয় ও আসামী ভাষাকে এক পাংক্তেয় করেছে। জীবন্ত প্রাকৃত ভাষাকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এর ভিতরকার পূর্ব্বাঞ্চলের চক্রের ভিতর সমাহৃত হয়েছে বিহারী, বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসামী ভাষা। কাজেই এসব অঞ্চলের পক্ষে চর্য্যাপদের রচনাকে নিজের মনে করা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয়। সে রচনাকে প্রদক্ষিণ করতে হবে অন্যভাবে এবং অন্যরূপে। অন্যথায় কেউ অবিসংবাদিতভাবে অপ্রামাণ্য ও অস্পষ্ট ভাষাগত পরিমাপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে কিনা সন্দেহ। প্রাকৃভারতীয় ভাষার গমকে নানা সঞ্চয় ছিল। কারণ এ অঞ্চলের সীমান্তও এক সময়ে প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতকে অধিকার ক'রে বিস্তৃত ছিল। ফলে সমগ্র প্রাচীন ভাষার ইতিহাসপুঞ্জই কুজ্ঝটিকায় দুর্লক্ষ্য হ'য়ে পড়েছে। পালরাজগণের আমলের প্রাচীন লেখে দেখা যায়:—

ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ কুরু-যদু-যবনাবন্তী-গন্ধারকীরৈঃ
ভূয়ায়ৈ ব্যালোল মৌলি প্রণতিপাবণ তৈঃ
সাধু সঙ্গীর্য্যমানঃ *

এতে বোঝা যায় ধর্ম্মপাল, কুরু (মধ্যপঞ্জাব), যদু (মথুরা জেলা), যবন (পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত), মৎস্য (উত্তর রাজপুতনার জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য), অবন্তী (মালব দেশ), ভোজ (মধ্যপ্রদেশের বেরার বা বস্তার) গন্ধার (পেশোয়ার ও কাবুল নদীর উপত্যকা) এবং কীর (কড়িডা বা জ্বালামুখ) প্রভৃতি দেশ জয় করেছিলেন। এ যদি অত্যুক্তি হয়, তবুও এতে একটা বিরাট্ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে†। এ রকমের বিরাট সম্পর্কে বাংলা ভাষা যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে উপচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

(ক্রমশঃ)

* R. D. Bannerji, "Dharmapal's sovereignity was, accepted by the Kings of Eastern Afganisthan, Punjab, Rajputana and Kangra Valley."

† History of India P. 103.

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী

স্বনামধন্য দার্শনিক অধ্যাপক পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, এম, এ, গত ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৪৫, পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন প্রকৃত প্রতিভাবান্ শিক্ষাব্রতীকে হারাইল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়—ধ্যানযোগী আর কর্ম্মযোগী। পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ধ্যান-যোগী মনীষী ছিলেন। তিনি কখনও যশের আকাঙ্খা করেন নাই, নীরবে জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর সেবায় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর মধুর ব্যবহার সরল অনাড়ম্বর প্রকৃতি সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। এত বড় পণ্ডিত, অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান বলিয়া কিছু ছিল না। ছাত্র, সহকর্ম্মী এবং সাধারণ জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেই তাঁর নিকট সর্ব্বদা মূল্যবান্ উপদেশাদি লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে। কখনও কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। নিঃস্ব অসহায় ব্যক্তিদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইত, সাধ্যমত প্রার্থীদের কষ্টের ভার-লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—তাঁর মনের প্রসারতা। সাধারণতঃ পণ্ডিতদের আহার, বিহার এবং ধর্ম্মানুশীলনে একটু গোঁড়ামী ভাব লক্ষিত হয়—ইহা যেন পূর্ব্বপুরুষ হইতে তাঁহাদের ভিতর সংক্রামিত হইয়া আসিয়াছে এবং অল্পবিস্তর সকলেই ইহার প্রভাব এড়াইতে পারেন না। পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিস্ময়করররূপে ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁহার শয়নগৃহে শিয়রের নিকট ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের ছবি টাঙ্গানো থাকিত। হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁর উদার মনোভাব

পরিলক্ষিত হইত। তিনি প্রায়ই বলিতেন, মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিবে, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! অথচ হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান তিনি মানিয়া চলিতেন—কোনও দিন ইহার ব্যতিক্রম হয় নি। দেশের সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। পণপ্রথা, বাল্যবিবাহের তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত্ব স্বীকার করিলেও, পাশ্চাত্য প্রথায় নারীশিক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন এবং ইহার বিষময় ফল সমাজজীবনকে কলুষিত করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিছুদিন হইল তিনি নিউমোনিয়ায় ভুগিতেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনকে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার সময় হইয়াছে—এ রোগ-শয্যা হইতে আর উঠিবেন না। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি পুত্র ও পুত্র-বধূকে ডাকিয়া একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেন। গভীর রাত্রে মহাদেবের স্থায় একটি উজ্জ্বল মূর্ত্তি ত্রিশূল হস্তে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিয়া বসিতেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যায়। অন্য একদিন তাঁহার নাম ধরিয়া একটি মূর্ত্তি ডাকিতেছে শুনিতে পান। ইহার পর সত্য সত্যই শিবলোক হইতে তাঁহার ডাক আসে এবং বহু আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিত হইয়া হরি-নাম শুনিতে শুনিতে ৭৬ বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যের শিব অমৃতধামে যাত্রা করেন। মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং প্রখ্যাতনামা দার্শনিক কোকিলেশ্বরের মৃত্যুতে ভারতের পণ্ডিতসমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

১৮৬৯ খৃঃ রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে পণ্ডিত কোকিলেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এই জেলার ইটাকুমারী গ্রামের সুবিখ্যাত প্রাচীন ভট্টাচার্য্য-বংশ। এই বংশে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল, কবি হরিনাথ, উদীচ্য ভট্টাচার্য্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, পণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় রাজকবি সম্রাট্ যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতশিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে ইটাকুমারী সংস্কৃত অধ্যাপনার একটি প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল এবং পণ্ডিতগণের নিকট ইহা 'ছোট নবদ্বীপ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত কোকিলেশ্বরের পিতা পণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার 'বিজয়িনী কাব্য', 'দিল্লীমহোৎসব কাব্য', 'শক্তিশতকম' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের মনীষিগণ গ্রন্থগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের নাম কাহারও নিকট অবিদিত নয়।

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ছাত্রাবস্থা হইতে মেধাবী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, পরে প্রেসি-ডেন্সী কলেজে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পারসিভ্যাল (Percival) এবং ডাঃ পি. কে. রায়ের অধীনে দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহু বৃত্তি-মেডেল প্রাপ্ত হইইয়াছেন এবং এম, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। গভর্ণমেণ্টের উপাধি-পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। ইহার পর তাঁর কর্ম্মজীবন সুরু হয়। প্রায় উনিশ বৎসরকাল কুচবিহার কলেজে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। কুচবিহারের তদানীন্তন মহারাজা তাঁহার অনন্যসুলভ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজদরবারের সভাপণ্ডিত-পদে তাঁহাকে ভূষিত করেন।

১৯১৭ খৃঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি পণ্ডিত কোকিলেশ্বরকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া প্রকৃত গুণীর সমাদর করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্মব্যাপৃত থাকাকালীন তিনি সংস্কৃত

বোর্ডের সভাপতি এবং 'পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল ইন্ আর্টসে'র কার্য্যকরী সভার সদস্য মনোনীত হন।

১৯৩০ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক' সদস্য নিযুক্ত করেন। এই উপলক্ষে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি ১৩টি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহা পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। বিশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অবসর-গ্রহণের প্রাক্কালে সংস্কৃতবিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাংলাভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ডাঃ এ, বি, কীথ (এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়), স্যর এস্, রাধাকৃষ্ণণ, ডাঃ আরকুহার্ট, অধ্যাপক পি, এন, শ্রীনিবাচারী (মাদ্রাজ) প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে একাধিকবার এই সকল পুস্তকের প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় অধিকাংশ পুস্তকেরই কয়েকটি সংস্করণ বাহির হয় এবং কয়েকখানি অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে।

'উপনিষদের উপদেশ' বাংলাভাষায় তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহা তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এগারটি উপনিষৎ সম্বন্ধে শঙ্কর-ভাষ্যের এরূপ বিস্তৃত ও সুচিন্তিত সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার "Introduction to Adwaita philosophy" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছ। প্রধানতঃ শঙ্করদর্শনের বাস্তব দিক্ লইয়া ইহা আলোচিত হইয়াছে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক James H. Woods (U. S. A), Dr. Sten Konow Ph. D. (Norway), Dr. Otto Schrader Ph. D (Kiel University) প্রমুখ দিক্‌পাল দার্শনিকগণ পুস্তকখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত তিনি পরলোকগত পিতা শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'বিজয়িনী কাব্য', 'দিল্লী মহোৎসব কাব্য' 'শক্তি শতকম' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ ইংরাজী টীকা পুস্তক রচনা করিয়া উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন। এই টীকা পুস্তক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড জেকোবির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতের স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিগণ এই সমস্ত পুস্তক তাঁহাদের অধীনস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

বহু স্মারক গ্রন্থে তিনি মূল্যবান্ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'Bhandarkar Oriental Research Society',—'Dr. K. B Pathak Commemoration Volume', 'Ganga Nath Jha Memorial Vol'—'Mahamahopadhaya Kuppusand Shastri Memorial Vol', এবং Dr. Laman (Harvard University. U. S. A)-কে উপহার প্রদত্ত Memorial Vol. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকাদিতেও তিনি ইংরাজী ও বাংলায় নিয়মিত দর্শন-সম্বন্ধীয় সুচিন্তিত গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন, তন্মধ্যে নব্য ভারত, ভারতবর্ষ, বান্ধব, মানসী, দেবনাগর পত্রিকা, পারিজাত, Cosmopolitan, Calcutta Uninersity Arts Journal প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুদর্শনক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক গবেষণামূলক স্মরণীয় দানের কথা স্মরণ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক Hopkings—American Oriental Society-র সদস্যপদের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেন এবং তদনুযায়ী তিনি উক্ত Society-র সদস্য মনোনীত হন।

অন্তরায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৫

দেবকুমারের জন্য সত্য সত্যই তাহাদের ব্যবসায় ঠেকিয়া রহিল না। দুই একদিন পরেই গীতা বিভিন্ন স্থানে লোকের জন্য পত্র লিখিয়া দিল এবং এক সপ্তাহের ভিতরেই একজন দক্ষ পুরোহিতও জুটিয়া গেল।

লোকটির নাম রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বয়স বছর বত্রিশ। চুলগুলি সবদিকে সমান করিয়া ছাঁটা। মাথায় দীর্ঘ শিখা। শিখার সহিত হাল্‌কা গিরা দিয়া বাঁধা একটি পূজার ফুল। কপাল ও বাহুতে গঙ্গামৃত্তিকার রেখা টানা। পায়ে কাল রঙের চটি জুতা। পরিধানে সাদা পাড়ের জাল জাল ধুতি। গায়ে একখানি চাদর। রসিক ভট্টাচার্য্য লেখাপড়া খুব অল্পই করিয়াছে। কিন্তু গীতা দেখিয়া আনন্দিত হইল যে, কাজ চালাইবার মত ইহার বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। তাহা ব্যতীত ইহার ভিতর আলস্য ও জড়তার লেশ মাত্র নাই। কোন কথা বলা মাত্র সে তাহা করিয়া আসে। অথবা তাহার নিজের ভিতরে কাজ করিবার জন্য স্বাভাবিক একটা উৎসাহ আছে।

লোকটি অসম্ভব আলাপী। সে প্রথম দিন আসিয়াই দেবকুমার ও গীতাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরিচিত হইয়া গেল। তাহার পর দুই-এক দিনেই পাড়া-প্রতিবাসী সকলের সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিল।

দেবকুমারকে সে বলিল, রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ তর্কালঙ্কার বাড়ীর ছেলে সে। বারো বৎসর হইতে সে পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, স্তব, কবচ কিছুই তাহার অজানা নাই। একটু হাত দেখিতেও সে জানে। দেবকুমার যদি কাজ না করিতে চায়, সে যেন না করে। সে চায় শুধু একটু উৎসাহ। নাম মাত্র একটু উৎসাহ পাইলে, তাহাদের নড়িয়াও বসিতে হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে অল্প কয়েক দিনের ভিতরেই দেখা গেল যে, এই লোকটি থাকিলে পৌরোহিত্য চালাইবার জন্য দেবকুমারকে কিছু না করিলেও চলিবে। কেবল তাহাই নয়, ইহাকে খাটাইয়া লইয়া অল্প কয়েক দিনের ভিতরে গীতা চারিদিকে ধর্ম্মকর্ম্মের একটা হিড়িক জাগাইয়া তুলিল। শেষে মাসখানেক পর এমন একটা অবস্থা হইল যে, রসিকের একার পক্ষে সকল দিক্ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু তাহার জন্য রসিক ঘাব্‌ড়াইল না। একদিন শনিবার সাত-আট বাড়ীতে শনিপূজা হইবে। ইহার সবগুলিই পার্শ্ববর্ত্তী সহরে; কেবল দুইটি পূজা গ্রামের ভিতর হইবে। গীতা সহরের পূজাগুলির জন্য রসিককে পাঠাইয়া, গ্রামের পূজা দুইটির জন্য তাহাদের পুরাতন লোক অতুলকে পাঠাইল। কিন্তু গীতা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, উভয়ে প্রায় একই সময়ে পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছে।

[illegible] উঠানে বসিয়া তাহার মা ও দেবকুমারের সহিত একটা সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। রসিককে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এত সকালে পূজো ক'রে আসতে পারলেন!

রসিক কহিল, বেশী [illegible] থাকলে আমার পূজো সকালেই শেষ হয়।

তবে মন্ত্র না প'ড়েই পূজো ক'রে এলেন?

মন্ত্র পড়ব না কেন? কোন বাড়ী দু' আনা পড়েছি, কোন বাড়ী সিকি। যারা জানে শোনে, তাদের বাড়ী বার আনা প'ড়ে শেষ ক'রে এসেছি।

দেবকুমার ছেলেবেলা হইতেই এই সব দেখিয়া আসিয়াছে। একবার লক্ষ্মীপূজার সময়ে সে মাতুলালয়ে। ঐ গ্রামের বহু বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা হয়। কিন্তু গ্রামের পুরোহিত সে বার বিদেশ হইতে যথেষ্ট পুরোহিত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, তথাপি এক-চতুর্থ বাড়ীর পূজাও শেষ হইল না। যজমানেরা রাগিয়া আগুন হইয়া গেল। পুরোহিতটি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন একজন আগন্তুক পুরোহিতই অবস্থা আয়ত্তে আনিলেন। যে কয় জন পুরোহিত-সংগ্রহ

হইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিয়া দিলেন, প্রত্যেকখানা পূজা পাঁচ মিনিটের ভিতর শেষ করিতে হইবে। ইহাতেই আশ্চর্য্য ফল হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পূজা শেষ হইয়া গেল এবং তৈল ঢালিলে সমুদ্র যেমন শান্ত হয়, তেমনি সমস্ত গ্রাম শান্ত হইয়া গেল।

দেবকুমার সেই কথা স্মরণ করিয়া কহিল, ঠিক ক'রে এসেছেন ঠাকুর-মশায়! ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মকে যদি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাতেও আমরা কুণ্ঠিত হ'ব না।

কিন্তু গীতা অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, আপনারা এ-সব করেন ব'লেই তো আপনাদের উপর থেকে শ্রদ্ধা উঠে যাচ্ছে।

না দিদিমণি! যদি এ-সব না করি, তবেই শ্রদ্ধা থাকবে না। ভাল ক'রে করতে হ'লে প্রত্যেকটি শনি-পূজায় দুটি ঘণ্টা সময় লাগে। তবে দু' বাড়ী পূজো করার পর আর কারও বাড়ী গেলে মাথায় লাঠী মারবে।

দেবতার নামে সমাজে যে সত্য সত্যই ছেলেখেলা চলিতেছে, গীতার মন কিছুতেই তাহা মানিয়া লইতে চাহিল না। ক্ষীণ প্রতিবাদের কণ্ঠে সে কহিল, তবে আমাদের বেশী ক'রে লোক রাখাই উচিত।

লোক রাখবেন আপনি! দক্ষিণা দেবে চারিটি পয়সা। যদি লোক রাখেন, লোককে কি দেবেন, আপনারাই বা কি খাবেন? আর চারিটি পয়সার জন্য যাবেই বা কে অত শ্রম করতে? শ্রাদ্ধে যদি কেউ দশ হাজার টাকাও খরচ করে, তবুও জাল-জাল ধুতি আর ছয় পয়সার গামছা ছাড়া বামুনকে কেউ কিছু দেয় না। আমাদের দেববাবু কি পৌরোহিত্য ছেড়ে সাধে গেছেন কারবার করতে? আমরা কিছু পাস করিনি, ঘরে খাবার নেই, তাই এসেছি পৌরোহিত্য করতে। পেটে একটু বিদ্যে থাকলে, পাখার নীচে ব'সে চাকরীই করতে পারতাম।

বলিয়া ঠাকুরের সিংহাসন তুলিয়া রাখিবার জন্য সে ঠাকুর-ঘরের দিকে চলিল। দেবকুমার তাহাকে পিছু হইতে ডাকিল, শুনুন ঠাকুর-মশায়।

সে ফিরিয়া কহিল, কি?

দেবকুমার রসিকের হস্তস্থিত সিংহাসনটি দেখাইয়া কহিল, ওর ভিতর কি? শালগ্রাম আছে তো?

রসিক হাসিল এবং তাহার পর বলিল, আজ আছে সত্যই। কিন্তু সব দিন থাকে, তা' মনে করবেন না। তিন গ্রামে যদি কাজ থাকে, আমরা অত শালগ্রাম পাব কোথায়? আমি তো শূদ্র-বাড়ী কখনও শালগ্রাম নিয়ে যাই নে। কোন দিন একটা মাটির ঢেলা, কোন দিন না হয় একটু কাদা-মাটি গোল করে, সালু কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাই।

—আচ্ছা কয়টা পাথর গোল ক'রে তো রাখতে পারেন!

—কেন কাশীতেই কৃত্রিম নারায়ণশিলা কিনতে পাওয়া যায় হাজার-হাজার। পুরোহিতেরা তা' গণ্ডায় গণ্ডায় কিনে নিয়ে যায়। সত্যকার গণ্ডকীশিলা কোথায় পাওয়া যাবে?

—তারই কয়টা কিনুন তবে। ভেক না হলেও ভিখ মেলে? অত সততা করলে পৌরোহিত্য-ব্যবসায় চলে না, কি বল গীতা?

গীতা এইবার কথা কহিল, আচ্ছা তোমার বাবা নিয়ে গেছেন কখনও পাথরের ঢেলা যজমান বাড়ী? আমাদের গ্রামের পঞ্চতীর্থ মশায় কখনও এরকম করেন? তোমরা মনে কর, পৌরোহিত্য একটা ব্যবসা; কিন্তু তা' নয়। এটা একটা ব্রত। সত্যকার পুরোহিত যে, তিনি ধর্ম্ম-জীবন যাপন করবেন এবং পরকে ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করবেন, এই তাঁর তপস্যা। এ-ছাড়া জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য তাঁর নেই। অর্থোপার্জ্জন তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। জীবনধারণের জন্য কিছু প্রয়োজন, তাই দক্ষিণা নেওয়া। আমি আপনাকে বলছি ঠাকুর-মশায়, যদি জীবনের এ-লক্ষ্য না থাকে, যদি দারিদ্র্যের অহঙ্কার করতে না পারেন, তবে এ-পথে আসবেন না। বলিয়া গীতা দেবকুমারের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুত পদে ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল।

দেবকুমার ভাবিয়াছিল, সে গীতাকে খুব আঘাত করিবে। কিন্তু সে দেখিল, গীতাই তাহাকে বুকে-পিঠে চাবুক মারিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৬

দেবকুমার এবার দেশে ফিরিয়াছে—দেশের ভিতর একটা পেন্সিলের ফ্যাক্টরি খুলিবার সঙ্কল্প লইয়া। সে

কয়েক দিনের ভিতর সহরের উপকণ্ঠে একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কারখানাপ্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল।

দেবকুমারদের গ্রামখানি সহর হইতে এক মাইলের ভিতর। এই গ্রাম হইতে প্রতিদিন সহরে যাইয়া ছেলেবেলা সে স্কুলে পড়িয়াছে। গীতাও এই সহরের স্কুলে পড়িয়াই ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে।

এই সহরটি একটি শিল্প-প্রধান স্থান। এই স্থানে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে, দীর্ঘ দিন হইতে ইহাই ছিল দেবকুমারের স্বপ্ন। পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা যাইয়া সে তাহার একজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সহিত স্থির করিয়া আসিয়াছে, তাহারা উভয়েই একত্র হইয়া এই সহরে একটি পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করিবে। দেবকুমার দেশে থাকিয়া কারখানা পরিচালন করিবে এবং তাহার বন্ধু কলিকাতা থাকিয়া বাজারে মাল চালাইবেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার বন্ধু কারখানার জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর যথারীতি কারখানার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এখন যন্ত্রপাতিগুলি বসাইবার কাজ দ্রুতবেগে চলিতেছিল। দেবকুমারের এখন মুহূর্ত্তের জন্য সময় নাই, কেবল একবার বাড়ী আসিয়া সে খাইয়া যায়।

দেকুমারদের বাড়ী হইতে বাহির হইবার দুই তিনটি পথ আছে। তাহার একটি পথ গীতাদের বাড়ীর পাশ দিয়া গিয়াছে। আজ এই পথেই সে কারখানা যাইতেছিল। গীতাদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল, গীতা রান্নাঘর হইতে ঝিকে ডাকিয়া কি বলিতেছে। তখন তাহার অপেক্ষা করার সময় নয়। কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাহার পা দুইটি যেন হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে রান্নাঘরের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। দেবকুমার তখন কহিল, কি রাঁধছ গীতা?

—মাছ ভাজ্‌ছি।

দেকুমার একখানা হাত প্রসারিত করিয়া কহিল, আমাকে একখানা দাও না, গীতা!

—না, আমি তা' দিতে পারব না। বামুনের ছেলে তুমি, এক দুর্ধ্যে দু'বার খাবে!

—আমার কিছু'দোষ হয় না, তুমি একখানা দাও।

—কেন, ভাজা কি খাবে একটা! তার চেয়ে বল, কাল খাবে এখানে, আমি ভাল করে' রান্না করব।

—আচ্ছা খাব, তবে একখানা ভাজা আজ দাও।

—তবে নিশ্চয় খেতে হ'বে কাল।

—নিশ্চয় খাব।

গীতা অনন্যোপায় হইয়া দুই-তিনখানা পনা মাছের টুকরা একটা বাটিতে করিয়া দিল এবং দেবকুমার বাইরে দাঁড়াইয়া তাহা খাইতে লাগিল।

গীতার মা দেখিয়া কহিলেন, এ কচ্ছিস্ কি দেবকুমার! তার চেয়ে ব'সে দুটো ভাত খেয়ে যা না!

না, গীতা নেমন্তন্ন করেছে, কাল খাব। এখন যাই, কত কাজ যে রয়েছে আমার, বলিয়া হাতখানা ধুইয়া দ্রুতপদে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরের দিন পরীক্ষামূলক ভাবে কারখানায় কাজ আরম্ভ হইবে। দেবকুমার আজ অত্যন্ত পরিশ্রম করিল এবং এবং পরের দিন ভোর হইতেই কারখানায় যাইয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু অনেক বেলা পর্য্যন্ত খাটিয়াও সকাল বেলার দিকে সে ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিল খাইয়া যাইবার জন্য।

তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনের ভিতর তখনও তাহার কারখানা চলিতেছে। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল, গীতাদের বাড়ীর ঝিয়ের দর্শনে।

ঝি আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, তুমি খেতে বসেছ!

দেবকুমার অপরাধীর কণ্ঠে কহিল, দেখ ঝি, আমি ভুলে গেছি, তুমি গীতাকে যেয়ে বল।

—বল্লে কি হবে! তুমি খাবে ব'লে দিদিমণি কাল রাত্রি থেকে যা' যোগাড় করছেন! কত পদ রাঁধা হয়েছে, এখন এ-সব খাবে কে বল?

—আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়েছে, তুমি গীতাকে বল।

—দেখ কাল রাত্রি থেকে পিঠা হচ্ছে। আজ বাজার থেকে গলদা চিংড়ি, পাঁঠার মেটে, চান মাছের পেটি, এই সব এনেছি। এখন তুমি না খেলে দিদিমণি কি রকম রাগবে, তা' বলতো!

—আজ তো আমার সময় হবে না, আমি কাল যেয়ে তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা করব। বুঝিয়ে ব'ল, ভুলে গেছি কাজের চাপে।

পরের দিন ভোর বেলা দেবকুমার প্রথমেই গেল গীতাদের বাড়ী। সে খুব ভয়ে ভয়ে বাড়ীর ভিতর যাইয়া ঢুকিল। গিয়া দেখিল, গীতা তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছে। তাহার মা বসিয়া আছেন তাহার মাথার সম্মুখে। দেবকুমার ঘরের ভিতর যাইয়া কহিল, গীতা শুয়ে আছে কেন, কাকীমা?

—গীতার জ্বর হয়েছে।

গীতা দেবকুমারকে দেখিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল। দেবকুমার বুঝিল, গীতা রাগ করিয়াছে। সে কিছু বলিল না। একখানা হাত ধীরে ধীরে গীতার কপালের উপর রাখিয়া জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিল।

কপালের উপর হাত দিতেই দেবকুমার চমকিয়া। জ্বরে দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে। জ্বর তো অনেক কাকীমা, আমি এক্ষুণি একটা থারমোমিটার নিয়ে আসি। বলিয়া ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে একটা থারমোমিটার লইয়া আসিল। কিন্তু গীতা থারমোমিটার দিবে না। সে দেবকুমারকে কিছু না বলিয়া মাকে কহিল, তুমি ওকে ডেকেছ মা?

দেবকুমার কহিল, শরীর জ্বলে যাচ্ছে জ্বরে, এটা হ'ল রাগের সময়! বলিয়া এক রকম জোর করিয়া তাহার জিবের নীচে থারমোমিটার প্রবেশ করাইয়া দিল।

মিনিট খানেক পর দেবকুমার থারমোমিটার টানিয়া তুলিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল, কাকীমা, জ্বর একশত পাঁচ।

—বলিস্ কি!

হাঁ তাই, আমি এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছি, বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পর দেবকুমারের সহিত ডাক্তারবাবু আসিলেন। তিনি সকল কথা শুনিলেন এবং রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর একখানা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া বাহিরে যাইয়া কহিলেন, জ্বরটা খুব ভাল নয়। টন্‌সিলের অবস্থা খুব খারাপ। টন্‌সিল দু'টো পেকে উঠতে পারে। আবার টাইফয়েডেরো লক্ষণ আছে সঙ্গে। এ-জন্য ভাল রকম শুশ্রূষা চাই। তা' না হ'লে একটা বিপদ্ হওয়া সম্ভব।

দেবকুমার ডাক্তার বাবুর সহিত যাইয়া ঔষধ লইয়া আসিল। তাহার পর ঔষধ খাওয়াইয়া, গলায় পেণ্ট দিয়া মাথায় জল দিতে বসিল। ডাক্তারবাবু বলিয়া দিয়াছিলেন, মাথায় জল দিলে জ্বর নামিয়া আসিবে। কিন্তু জ্বরের এত তেজ যে, অনবরত জল দিয়াও সে জ্বরের তাপ বেশী নামাইতে পারিল না।

গোটা বার'র সময়ে নির্ম্মলা দেবী কহিলেন, এখন তুই বাড়ী যা দেবকুমার, খেয়ে আয় গিয়ে। আমি ততক্ষণ জল দিচ্ছি।

আমি বাড়ী যাচ্ছি, কিন্তু তোমার জল দিয়ে কাজ নেই। জল দিতে গিয়ে বিছানা ভিজিয়ে দেবে—শেষে হ'বে নিমোনিয়া। অনেকক্ষণ তো জল দেওয়া হয়েছে, এখন একটু বন্ধ থাকে।

দেবকুমার চলিয়া গেল। কিন্তু খাইয়া-দাইয়া তখনই আবার ফিরিয়া আসিল এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গীতার শয্যাপার্শ্বে কাটাইল। তাহার পর এই ভাবে আরও কয়েক দিন চলিয়া গেল।

প্রতিদিন ভোরবেলা সে আসে এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। কোন দিন বাড়ী যাইয়া আসে। কোন দিন দুপুরে এখানেই দুটি ভাত খাইয়া লয়। ডাক্তারবাবুও প্রতিদিন দুই বেলা আসেন। ঔষধপত্রেরও কোন অপ্রতুল নাই। কিন্তু শুশ্রূষা ও ঔষধ সত্ত্বেও গীতার আরগ্যের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল না এবং দিনের পর দিন তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল। নির্ম্মলা দেবী অত্যন্ত অস্থির হইয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। দেবকুমারও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে গীতা শয্যায় পড়িয়া আছে। তাহার শয্যার সম্মুখে গ্রামের পঞ্চতীর্থ মহাশয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গীতার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চতীর্থ মহাশয় এই গ্রামের একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। এই গ্রামে এমন কেহই নাই, যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করে। তাঁহার অল্প কয়েক

ঘর যজমান আছে। যজমানদের কাজকর্ম সারিয়া যেটুকু সময় তিনি পান, তাহাই পূজা, অর্চনা ও ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। যজমানদের কাজও করিতে হইবে বলিয়াই তিনি করেন। তাহা না হইলে, তাহার কোন লাভ নাই। যে যাহা দক্ষিণা দেয়, তাহাতেই তিনি খুশী। তাঁহার দুই-এক ঘর যজমান খুব গরীব হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণা দিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। তিনি তাহাদের বাড়ী পূজাবন্ধ করেন নাই। একটা হরিতকী লইয়া তিনি তাহাদের কাজ করিয়া দিয়া আসেন।

তাঁহার কিছু শিষ্যও আছে। প্রতি বৎসর একবার করিয়া তাঁহাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে হয়। যে টাকা না দিতে পারে, তাহার বাড়ীও তিনি যান। তিনি প্রার্থী হিসাবে কাহারও বাড়ী যান না। তিনি যান পরিদর্শক হিসাবে। এক বৎসরে শিষ্য সাধন-ভজনের কতটা কি করিয়াছে, তিনি সে-সম্বন্ধে হিসাব চান। যদি কোন শিষ্য মন্ত্র লইয়া কিছুই না করে, পিতার মত তাহাকে তিনি ভৎর্সনা করেন এবং নানাভাবে উপদেশ দিয়া তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করান।

এই সকল কাজকর্ম্মের ভিতরেও যখন তিনি শোনেন, গ্রামে কাহারও কোন কঠিন অসুখ হইয়াছে, অমনি তাহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হন।

গীতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াই পরম উৎকণ্ঠার সহিত তিনি রোগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন। তাহার পর গীতার মাথার কাছে বসিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া বটুকভৈরব স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া তিনি মন্ত্র পাঠ করিলেন। তাহার পর উত্তরীয়ে বাঁধিয়া গীতার জন্ম তিনি যে নির্ম্মাল্য আনিয়াছিলেন, তাহাই গীতাকে দিয়া শেষে উঠিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি অনেক আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইলেন—বলিলেন, তিনি যে মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিয়া গেলেন, ইহার পর রোগ আর কিছুতেই বাড়িতে পারিবে না এবং রোগ আরোগ্য না হইয়া উপায় নাই। গীতা শয্যা হইতে নামিতে পারে না। শয্যার উপর হইতেই গীতা তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় মাখিল। তাহার পর তিনি চলিয়া গেলেন। গীতার মনে হইল—পঞ্চতীর্থ মহাশয় যেন তাহার অর্দ্ধেক রোগ আরোগ্য করিয়া দিয়া গেলেন।

ইহার পর আরও কয়দিন কাটিয়া গেল। শেষে প্রায় উনিশ দিন পরে গীতা অনেকটা ভাল বোধ করিতে লাগিল এবং তাহার জ্বর অনেকটা কমিয়া গেল। প্রথম কয়দিন সে চোখ বুজিয়াই পড়িয়া ছিল। এখন সে দুই-একটা কথা বলিতে পারিল।

সে-দিন দেবকুমার শিশি হইতে ঔষধ ঢালিতেছে। গীতা কহিল, আচ্ছা, তুমি কারখানায় যাচ্ছ না যে?

দেবকুমার একটু হাসিল, আর কিছু বলিল না।

গীতা আবার কহিল, না আজ তুমি কারখানায় যাও। আজ তো আমি ভালই আছি। কারখানা খুলেই, তুমি কামাই দিচ্ছ—সব গোলমাল হয়ে যাবে না?

—আচ্ছা, তোমার জ্বরটা একদম ছেড়ে যাক। তারপর তো কেবল কারখানাই করব।

—না, তবু তুমি একবার ঘুরে এস, লক্ষ্মীটি!

গীতা সেই দিন সত্যই ভাল। দেবকুমার কারখানা দেখিতে গেল। এই কয়দিন কাজ প্রায় কিছুই হয় নাই। এটা নেই, ওটা নেই, চারিদিকে ইহাই কেবল অভিযোগ। দেবকুমার কোন রকম একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

ফিরিতেই গীতা জিজ্ঞাসা করিল, সব বন্ধ হ'য়েছিল তো?

—না, ঠিক বন্ধ নয়।

ইহার পর দুই দিনের ভিতর গীতার দেহের তাপ নামিয়া স্বাভাবিক হইয়া গেল। শেষ দিন ডাক্তারবাবু আসিয়া কহিলেন, শুশ্রূষা ভাল হয়েছিল ব'লেই একুশ দিনে জ্বর কমল, তা' না হ'লে, তিন মাস ভুগতে হ'ত এই জ্বরে।

দেবকুমার হাসিয়া কহিল, জ্বর কি জন্য হয়েছিল জানেন! সে-দিন একজন অতিথির খাওয়ার কথা ছিল। অতিথিটি আসেনি। সব জিনিস ওকে একা খেতে হ'ল। এই জন্যই জ্বর।

গীতা কথাটা শুনিয়া গায়ের উপর চাদর টানিয়া মুখ ও মাথা আবৃত করিল। কিন্তু ঝি কহিল, দাদাবাবু

ঠাট্টা ক'রে বলছেন ডাক্তারবাবু! সে-দিন দিদিমণি কিছু খান নি।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, উনি রাগ ক'রে খাননি তবে! জ্বরের আগে রাগ করা খুব ভাল। ভরা পেটে জ্বর এলে আরও ভুগতে হ'ত।

দেবকুমার আবার কহিল, কিন্তু আরোগ্য ওর কেমন ক'রে হ'লো জানেন?

—কেমন ক'রে হ'বে আবার?

ওর ধারণা, পঞ্চতীর্থ মশায় এসে যে ঝেড়ে দিয়ে গেছেন, তাতেই ওর জ্বর সেরেছে।

ডাক্তারবাবু কোন উত্তর করিলেন না তাঁহার উচ্চ হাস্যরোল ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়: চতুর্থ পাদ

শ্রীমতিলাল রায়

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥১২॥

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন সূত্রস্থ 'মাত্র' শব্দের দ্বারা জ্ঞানের ব্যবচ্ছেদ বুঝাইতেছে অর্থাৎ কর্ম্মের জন্য জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই। উহা অধ্যয়ন অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে মাত্র। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—পূর্ব্বে যে "বেদমধীত্য" এই উপনিষৎ-প্রমাণে বলা হইয়াছে জ্ঞানীর ও কর্ম্ম আছে, ইহা ঠিক নহে। কর্ম্ম জ্ঞানীর জন্য নহে, অধ্যয়নকর্ত্তার জন্য।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, উপনিষৎ জ্ঞান-কর্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক অর্থাৎ যে এক যজ্ঞ করে, তাহার যেমন অন্য যজ্ঞের প্রয়োজন নাই, তেমন কর্ম্ম করিলে তাহার ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন কি? বেদাধ্যয়ন করিলেই যে বেদার্থবোধ হইবে, তাহার কি কথা আছে? বেদের অর্থ কেহ জানুক আর নাই জানুক, বেদমন্ত্র অভ্যস্ত হইলেই সে কর্ম্ম করিতে পারে। অতএব বেদাধ্যায়ী কর্ম্ম করে, এই দৃষ্টান্তে এমন প্রমাণ হয় না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরও কর্ম্ম থাকিতে পারে। মধ্বাচার্য্য এই সূত্রের অন্যার্থ করিয়াছেন—তিনি বলেন, জ্ঞানাধিকার বিভাগ-ক্রমে যখন তুল্য নহে, তখন জ্ঞানাধিকার কোথায় তুল্য হইতে পারে? অবশ্য তিনি দ্বৈতজ্ঞানপ্রচারার্থ বলিয়াছেন, যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই, যাহার গুরুভক্তি নাই, যাহার শমাদি সদ্গুণ নাই, জ্ঞানাধিকার তাহার থাকিতে পারে না। তবে কাহার জ্ঞানাধিকার থাকিতে পারে? যে অধ্যয়নতৎপর, যে বিষ্ণুপরায়ণ প্রভৃতি। আমরা কৌসায়ন শ্রুতিতে দেখি—

"পাঠদ্বেদানার্থানধীয়ীর্থ বিচার্য্য ব্রহ্মবিন্দেদিতি চ" অর্থাৎ বেদ-পাঠ, বেদের অর্থ নির্ণয় ও বিচার করিয়া ব্রহ্মকে বিদিত হয়—এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যায়, কেবল অধ্যয়ন ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু নহে। বেদের অর্থবোধ হইলে, তবেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়। ব্যাসদেব বলিতেছেন, অধ্যয়নমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকার সম্ভব নহে। বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, এই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ভিন্ন অথবা অর্থবোধ না করিয়া কেবল বেদপাঠে জ্ঞানভেদ শতবৎ হইয়া থাকে। কাজেই জ্ঞানাধিকার অবিশেষে হয় না। অতএব বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া কুটুম্বমধ্যে বাস করার শ্রুতি-প্রমাণে বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মবান্ হওয়ার যে সিদ্ধান্ত আচার্য্য জৈমিনি ষষ্ঠ-সূত্রে দিয়াছেন, তাহার পর ব্রহ্মবিদ্যা প্রযুজ্য হওয়া শক্ত যুক্তি নহে।

ন, অবিশেষাৎ ॥১৩॥

ন (না) অবিশেষাৎ (বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই এই হেতু।) পূর্ব্বে যে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" এই শ্রুতি আত্মবিৎকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করিতেছে, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বের সপ্তম সূত্র "নিয়মাৎ" ইহার প্রতিবাদরূপে উপরোক্ত সূত্র গৃহীত হইয়াছে। এই কর্ম্ম, কোন বিশেষ কর্ম্ম নহে। ইহা উপাসনারই

কর্ম হইতে পারে। কর্ম-বিশেষ না থাকায়, পূর্বোক্ত শ্রুতি-প্রমাণ কর্মানুষ্ঠানের পক্ষে সঙ্গত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে কর্ম-করণের নিয়ম, তাহা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই সাধারণ। শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া এইরূপে কর্ম করিবে, ইহাতে জ্ঞানীর পক্ষে কোন বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আচার্য্য মাধ্বাচার্য্য বলিতেছেন—সকলেরই যদি অবিশেষে জ্ঞানাধিকার থাকে, তাহা হইলে ইহা সকলের পক্ষেই সুলভ হয়। এই সন্দেহ-নিরসনের জন্য বলা হইতেছে—জ্ঞানাধিকার অবিশেষে সকলের নাই। তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

"তত্রাধিকারিণো—মনুষ্যা ঋষয়ো দেবা ইত্যুত্তরোত্তরমিতি" অর্থাৎ কি পুরুষার্থসাধন, কি মোক্ষ-ধর্ম, উহা উত্তরোত্তর হইয়া থাকে। মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণ ইহারা উত্তরোত্তর, ইহার অর্থ ক্রমানুসারে—মনুষ্যের অপেক্ষা ঋষি, তদপেক্ষা দেবতাদিগের জ্ঞানাধিক্য হয়।

আমরা দেখিতেছি—বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থোপলব্ধির জন্য গুরু শিষ্যকে কর্ম করিতে নির্দ্দেশ দেন। শ্রুতিতে দেখা যায়—বেদাধ্যয়নের পর কেহ কেহ গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইয়া থাকে। কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুজ্য হইতেছে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ভাষ্যকার স্বীকার করিতেছেন, কর্ম-শেষত্বে জ্ঞানপ্রকাশ হয়। জ্ঞানের পর কর্ম নাই, ইহাই সমস্যার কারণ। জ্ঞানের জন্য যে কর্ম ও জ্ঞানলাভের পর যে কর্ম, এই দুইয়ের পার্থক্যনির্ণয় পূর্ব্বমীমাংসায় বা উত্তরমীমাংসায় হয় নাই। উহার সমাধান হইয়াছে গীতায়; সেইজন্য বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায়, জ্ঞানপ্রশংসায় অভিভূত হইয়া জ্ঞানীর কর্ম নাই, বলিতে পারি না।

তবে উহা অহংকৃত কর্ম নহে, পরন্তু ভগবৎপ্রকাশক কর্ম। এই সিদ্ধান্ত ব্যাসদেবের সূত্রে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না।

পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব ইহা আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

স্তুতয়ে অনুমতিঃ বা ॥১৪॥

বা (অবধারণার্থ) স্তুতয়ে (বিদ্যার প্রশংসা আছে) অনুমতিঃ (কর্ম করিবার আদেশ বা বিধান)।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহকর্ম্মাণি"—এই দেহে এইরূপ কর্ম করিতে করিতে যদি জ্ঞানের সহিত অন্বিত হয়, তাহাও দোষের নহে। ঐরূপ উক্তি জ্ঞান-প্রশংসার্থে বলা হইয়াছে। কেন না, পরেই শ্রুতি বলিতেছেন "ন কর্ম লিপ্যতে নরে।" ইহার অর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কর্মে লিপ্ত হয় না। যাবজ্জীবন কর্ম করিলেও, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী তাহাতে জড়াইয়া পড়েন না। কেননা, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞানের এই স্তুতিবাক্য ব্যাসদেবের সূত্রেই আছে, এ বিষয়ে কিছু বলার নাই। গীতায় আছে "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—এই কর্ম যোগের জন্য নহে, পরন্তু যোগস্থ হইয়াই কর্ম করার কথা বলা হইয়াছে—এবং যোগস্থ হইয়া কর্ম করিলে, সত্যই জ্ঞানমহিমায় সে কর্ম বন্ধন না হইয়া জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। গীতায় তাই বলা হইয়াছে—"কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"। এই কর্মের দ্বারা অভিপ্রবৃত্ত জ্ঞানী কিছুই করেন না, এইরূপ মনে করেন। ইহাই পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কর্মের অবস্থা; কর্ম না করার কথা এখানে আসিতেই পারে না।

কর্ম যখন এইভাবে জ্ঞানীর নিকট ফলশালী নহে, তখন সদসৎ কোন কর্মই তো তাহার নিকট বিচার্য্য নহে। এইরূপ ধারণায় অনেক ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারবিধি প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মযুক্ত ভাগবতপুরুষের কর্ম অহিতকর ও অকল্যাণজনক হয় না। মানবসংস্কার এই কর্মের জন্য দায়ী নহে। ঈশ্বরই মানব-যন্ত্রে কল্যাণমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বর কর্ত্তা, এই কথা শুনিয়া যাঁহারা আঁৎকাইয়া উঠেন, তাঁহারা আপনার সহিত ঈশ্বরকে তুল্য মনে করেন। কর্মসংস্কারে নিজেরা যেমন জড়াইয়া পড়ে, ঈশ্বরকেও সেই মন দিয়া দেখিতে গিয়া "তিনিও কর্ম করিতে গেলে জড়াইয়া পড়িবেন", এই আশঙ্কায় অনেকেই ঈশ্বরকে অকর্ত্তা, নির্ব্বিশেষ মনে করিয়া কল্পিত শান্তি লাভ করেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে।

৮ম সূত্র হইতে ১৪শ সূত্র পর্য্যন্ত আচার্য্য জৈমিনির জ্ঞানের সহিত কর্মের সহভাব প্রাকার যে সিদ্ধান্ত, তাহার বিচারই করা হইতেছে। বিচারশাস্ত্রে জ্ঞানপ্রশংসার্থে

ঈশোপনিষদুক্ত "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্লোকটি প্রমাণস্বরূপ ভাষ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সূত্রে ব্যাসদেবের ইহাই অভিমত। অতঃপর পরবর্ত্তী সূত্রাদি অনুধাবনীয়।

কামকারেণ চ একে ॥১৫॥

এই সূত্র ব্যাখ্যাটী আচার্য্যগণের ভাষ্যে পাঠকের চিত্তে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। "একে" অর্থাৎ কোন কোন ঋষিরা "কামকারেণ" অর্থে স্বেচ্ছাতঃ কর্ম্ম বলিয়াছেন। ব্যাসদেবের সূত্রে এইটুকু আছে। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন যে, কোন কোন বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যত্যাগের উপদেশ আছে। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন —কোন কোন জ্ঞানী জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ করিয়া কামনা-প্রসূত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন—পুত্রকলত্রাদির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে কি আছে? আত্মাই "এতৎসমস্তলোকঃ"—আত্মাকেই লাভ করাতে আমাদের সমস্তই লাভ হইয়াছে। আমরা পুত্রাদি লইয়া আর কি করিব? এই সকল প্রসঙ্গ "কামকারেণ চৈকে" এই সূত্রে টানিয়া আনা কতখানি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য। আচার্য্য মাধ্বদেব বলিতেছেন— "একে" অর্থাৎ কোন শাখাধ্যায়ীরা বলেন যে, জ্ঞানীরা 'কামচারেণ' অর্থাৎ যথেচ্ছচারী হইলেও, তাঁহাদের মোক্ষসাধনতার ব্যাঘাত হয় না। এ কথা খুবই যুক্তিযুক্ত। যদি বলা যায় যে, জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম্মই দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম কিছুই থাকে না। জ্ঞানের উচ্চতর প্রশংসার জন্য ইহা বলা যাইতে পারে। যতকিছু অসৎ প্রবৃত্তি জ্ঞানীরা অনুসরণ করুক না কেন, তাহা মোক্ষ-সাধনের অন্তরায় নহে—জাহ্নবীস্তুতি করিতে গিয়া পুরাণবিৎরা এমন উপন্যাস রচনা করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ পাপ ব্যতীত মাতৃ-গমনরূপ মহাপাপও গঙ্গাজলে বিধৌত হয়, ইহার জন্য গালব-চরিত দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহা স্তুতিমাত্র। এইরূপে যথেচ্ছচারীর পথ রুদ্ধ করিয়া ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জ্বলিল নতুন আলো

শ্রীইন্দু গুপ্ত

জ্বলিল নূতন আলো
মাটীর বুকেতে, জলাশয়ে নদী খালে
সবুজের সমারোহে। লাগে কত ভালো:
পৃথিবী সুস্পষ্ট হোলো তারি রশ্মিজালে।

আঁধারের বুক চিরি' আলোকের মুক্তি:
দিগ্বধূরা অনুরাগে করে ঝলমল:
হৃদয়ে হৃদয়ে হয় অপরূপ যুক্তি:
দূর উদয়ের চক্রে লাবণির ঢল।
বনরাজি নীলা জাগে তারি পদপাতে,
প্রকাশের মাধুরিমা কোথা ছিল জাগি।
রাত্রির দুর্বোধ্য তমঃ লুপ্ত বেদনাতে
বিশ্বের সমক্ষে আলো বরণের লাগি'।

দিবার স্বপন চোখে ঘন তৃণ 'পরি,
আলোর পরশ দেহে পড়িতেছে ঝরি' ॥

মহাকাল

শ্রীউমাপদ নাথ, বি. এ.

একখানি প্রবৃদ্ধ শ্মশানের মতো
মহাকাল প'ড়ে আছে জন্ম হ'তে আজো।
কত যুগ আসিয়াছে, গেছে কত চ'লে;
শুধু রেখে গেছে আপনার অস্থি-দাহ হ'তে
এক মুঠো পাণ্ডু-কৃষ্ণ ছাইএর ধু-ধু বুকে।

তাই নিয়ে আজো ব'সে অজর এ বুড়ো
আনমনে রচে কত স্বর্ণ-শিলা-অট্টালিকা;—
বসায়ে সেথায় আনি' নতুনের অদেখা আলেখ্য,
চেয়ে দেখে নির্নিমিখে তা'র সারা রূপে
নিজ মহা অপরূপের এতটুকু তনু।

আজ যা' চরম ব'লে আমরা নিয়েছি তুলে,
তা'র মতো, তা'র চেয়ে বৃহত্তর কত গেছে চ'লে। মহাস্থবির এ
শুধু চেয়ে চেয়ে একটু হাসিয়া আঁখি মুদেছিল।
বর্ত্তমান একদিকে ভাঙে গড়ে আপনার খেলাঘর,
অন্যদিকে মহাকাল রচে তা'র অনাগত শিশুর কঙ্কাল।

(তৃতীয় খণ্ড : ২৬শ পরিচ্ছেদ)

শ্রীঅরবিন্দের উৎসব শেষ হইলে গান্ধী-যুগের অতুলনীয় প্রবাহে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অন্তরে বাহিরে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। অন্তরে তাহার জ্বলিয়া উঠিয়াছে সত্যের হোমানল। আর ত্যাগের মহিম্ন-মন্ত্রে তাহার আত্মার জাগরণ ঘটিয়াছে। ত্যাগ ও সত্যের জয়চ্ছত্র উড়িয়াছে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে—মহাত্মার মন্ত্রশক্তিতে; এ কথা সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরাঙ্কিত থাকিবে। অতঃপর আমি সেই প্রসঙ্গই বলিতেছি।

অন্তরে অধ্যাত্মশক্তির অনুভূতির সঙ্গে ভারতের জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিত। জাতির অভ্যুত্থানকল্পে যে সত্যনীতি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত, তাহা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া যোগের সহিত জাতীয়তাকে অন্বিত করিয়া সঙ্ঘের অগ্রগতি আনিতে সর্ব্বদাই উদ্যত থাকিতাম। আমার জীবনের গতিপথে সর্ব্বদাই পূজার অর্ঘ্য হস্তে জীবন-সঙ্গিনী আসিয়া দাঁড়াইতেন। এইখানে তাঁহার এক বিন্দু কার্পণ্য ছিল না। এই জন্য চিরদিন অন্তর-সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়াও দেশের সেবায় কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই। তাঁর মহাযাত্রার পর সেই পবিত্র স্মৃতি আমায় উৎসাহ দিয়া লইয়া চলিয়াছে জাতিরই মুক্তি-সাধনায়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট বাংলার একটী স্মরণীয় দিন। ভারতরাষ্ট্রসভা একবার দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হয়—মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর কলহে। কিন্তু তারপর মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রক্ষেত্রে আসিয়া যে ত্যাগ ও তপস্যার যজ্ঞকুণ্ড জ্বালিয়া জাতিকে দেশব্রত-সাধনায় আহ্বান করেন, তাহাতে বাংলার দেশবন্ধু অতুল ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অনুগামী হন। বাংলার রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে নবযুগ আনয়ন করেন দেশবন্ধু তাঁর অসাধারণ আত্মদানে; কিন্তু মহাত্মাজীর আদর্শবাদের সহিত দেশবন্ধু সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। এবারও কংগ্রেসে অসহযোগী ও স্বরাজপন্থী দুইটী লক্ষ্যে পড়িল। মহাত্মাজীর প্রসিদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া দেশবন্ধু ভারতব্যাপী স্বরাজ-দল গঠন করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি সহযোগ অসহযোগ কিছুর বিচার না করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ভুয়া শাসনসংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু তাহা চূর্ণ করিয়াই ভারতের জাতীয় শক্তিকে অভিনব পথ প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হন। ২৬শে আগষ্ট মাত্র দুইখানি ভোটে দেশবন্ধু বাংলার ব্যবস্থাপক সভার কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হন। ডায়ার্কির নামে যে রাজনীতিক ডিপ্লমেসির কুহকে ভারতের এক শ্রেণীর লোক বিমূঢ় হইয়াছিলেন, দেশবন্ধু তাঁহাদের মোহভঙ্গ করিয়া ২৭শে আগষ্ট এক রাক্ষসী মহাসভায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন "Dyarcy was killed yesterday, the Council is destroyed to-day" অর্থাৎ গতকল্য ডিয়ার্কি নিহত হইয়াছে, আজ কাউন্সিল বিনষ্ট হইল। লর্ড লিটন এই সময়ে বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি বাধ্য হইয়া বাংলার ব্যবস্থাপক সভার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া স্বহস্তে শাসনভার তুলিয়া লইলেন। এই প্রসঙ্গে এই যুগের তিনজন ধীরপন্থীর স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় আমরা স্মরণে রাখিব—স্যার পি, সি, মিত্র, রাজা হৃষীকেশ লাহা ও মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী জাতীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া এই যুগের ইতিহাসে বরেণ্য হইয়াছেন।

স্বরাজীদের লক্ষ্য কি ছিল, সে বিষয়ে আমরা দেশবন্ধুর বাণী উদ্ধৃত করিয়া বুঝিয়া রাখিব। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাই। দেশশাসনের অধিকার চাই। ইহা যদি ইংরাজশাসনের অন্তর্গত থাকিয়া সম্ভব হয়—সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে আমার বাধা নাই। যদি বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহার অন্তরায় হয়,

তবে সাম্রাজ্যের চেয়ে মুক্তিকেই আমি অধিক ভালবাসিব।" তাঁহার কথা "My love for my freedom is greater than any love for the Empire—" দেশবন্ধুর কণ্ঠে বাঙ্গালীর মর্ম্মবাণী প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এই ঘোষণার পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন আজিও হয় নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়কণ্ঠ ভারতের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিতে মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুকে উৎসাহ-বাণী প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁত ও চরকাপ্রচলনের ধূম পড়িয়া গেল; বাংলার অসহযোগপন্থীরা দেশবন্ধুর এই জয়ে প্রভাবহীন হইয়া পড়িলেন। দেশবন্ধু ব্যবস্থাপক সভার কর্ম্ম হইতে অবকাশ লাভ করিয়া খাদির কাজে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই অন্তরপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া খাদিব্রতী হইয়াছিলাম। এই সময়ে চরকা-যজ্ঞে প্রবুদ্ধ হইলাম, গৃহদেবী এই কর্ম্মে প্রধান সহায় হইলেন। মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া চরকা কাটিতে সুরু করিল। সঙ্ঘের নারীপুরুষ বাদ কেহই পড়িল না। সর্ব্বত্র চরকার গুঞ্জন উঠিল।

জীবনের প্রতি ছন্দে যে বৈপ্লবিক সাড়া উঠিয়াছে তাহার তাল দিতে হইয়াছে জীবনসঙ্গিনীকে। গৃহ-বধূ হইয়া তিনি একদিনও নির্ঝঞ্ঝাটে দিন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। বাংলার বিচিত্র সাধন-স্রোতে যখন ভাসিয়াছি—তিনি এই সকল পথের মর্ম্ম কিছুই বুঝেন নাই, কিন্তু কখন সকৌতুকে, কখন বা ব্যথার অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছেন। তারপর বিপ্লব-যুগের অপ্রকাশিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর অকাতর অবদানের কথা আমার চির স্মরণে থাকিবে। সেও যে কত উৎকণ্ঠা, কত আশঙ্কা, ব্যথা, কিন্তু কোন-দিন পথের বাধা হইয়া তিনি আমাকে বিচলিত করেন নাই। এইবার গান্ধীযুগে স্বজাতিপ্রেরণায় আমি উন্মাদ হইলাম। আমার অতর্কিতে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষদের যে রোষ-বহ্নি ধিক্ ধিক্ জ্বলিতেছিল, তাহাতে যে ইন্ধন দিয়াছি দুইখানি গ্রন্থে—প্রথম 'কানাইলাল', দ্বিতীয় 'শতবর্ষের বাংলা'। সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। বাংলায় দেশবন্ধুর বিজয়-মূর্ত্তি প্রকটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মাজীর চরকা-খদ্দরের জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় ভারতের জাতীয়-শক্তি পঙ্গুপ্রায় হইতে দেখিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ২১ দিন হিন্দু মুসলমানের ঐক্য-সিদ্ধির জন্য উপবাস করিবেন। মহাত্মাজীর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ইহাতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। আমরা এই সময়ে যে কি করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। সর্ব্বশরীরে যেন তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইতেছিল। যুগের ডাকে যে সর্ব্বহারা হয়, তাহার অবস্থার কথা যে ভুক্তভোগী সেই বুঝিবে। চিরসহচরী গৃহদেবী আমার উৎকণ্ঠা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। কি জানি আবার কি অনর্থসৃষ্টি হয়, এই ভয়ে তিনি আমায় সঙ্গছাড়া করিতেন না। তিনি জানিতেন, হৃদয়ের অদম্য আবেগে আমি এমন কিছু করিয়া ফেলিতে পারি, যাহা সামাল দিতে তিনি নাস্তানাবুদ হইবেন। আমায় লইয়া চিরদিন তিনি এমনই দুঃখ পাইয়াছেন। সুখের ফোঁটা তাঁহার ললাটে আঁকিয়া দিতে পারি নাই। চির ভিখারী আমি, ভিখারিণী হইয়াই তিনি চিরসঙ্গিনী হইয়াছেন। দাবী তো করেন নাই কিছুর জন্য কোনদিন, বুঝি অভাববোধ তাঁহার আদৌ ছিল না, তাই কিছু পাওয়ার কণ্ঠ আমায় আকুল করে নাই। আমার বুকে যখনই যে কিছুর আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা প্রশমিত হইয়া কি পরিণাম সৃষ্টি করিবে সেইদিকেই তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। মহাত্মাজীর অনশন ব্যাপার লইয়া আমার অভিসন্ধি তিনি জানিতে চাহিলেন। আমি উত্তেজনায় অধীর হইয়া বলিলাম, 'কি করিব আমি! ভারতের তপোমূর্ত্তি মহাত্মাজী জাতির পাপ-সংহরণে যে কৃচ্ছ্র-ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার সাফল্যের জন্য কি করিতে পারি ভাবিয়া পাইতেছি না। মনে করিতেছি, আমিও ২১ দিন উপবাসে থাকিব।" কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। কোন কাজে যদি সঙ্কল্প-বাণী উচ্চারণ করি, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সাধ্য আমার নাই। ইহা তিনি বুঝিতেন। তাড়াতাড়ি

সভয়ে তিনি বলিলেন, "পাগল হয়েছ তুমি? তিনি উপবাস করিবেন, সে শক্তি ভগবান তাঁহাকে দিয়াছেন, তাই তাঁর এই ভরসা। তিনি যে জন্য উপবাস করিবেন, তাহা তো তোমার কর্ম্ম নহে, অতএব এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিও না। ইহাতে সকলেরই ক্ষতি হইবে।"

কি সঙ্কোচের সহিত তিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তাহা তাঁহার সেই সময়ের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখখানি হইতে আমার মনে পড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে যে মানুষ আবর্ত্তের পর আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়া লক্ষ্যপথে চলে—হে দেবি, কেন তুমি তাহাকে অনুসরণ করিলে? দুঃখের পাষাণভারে তোমায় নিপীড়িত করিয়াছি চিরদিন, আজ তুমি মুক্তি পাইয়াছ মরণের ফাঁকে! আজ হৃদয় যে হিমালয়ের ভারকেন্দ্র—তাহাকে লঘু করার জন্য তোমার সেই ক্ষিপ্র হস্ত কেন আর দেখি না! ব্যথার অশ্রু দিয়াই তোমায় শুধু স্মরণে রাখি, এই স্মৃতির শক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যে আমায় অটল রাখুক, এই আকুতি অন্তরীক্ষ হইতে কি শ্রবণ করিবে না?

উপবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্তু মহাত্মাজীর কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম। প্রতিদিন চরকা-যজ্ঞের আয়োজন করা হইল। প্রতি রবিবার হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সভা নিয়মিত চলিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর মেসোপোটেমিয়া-প্রত্যাগত বীর সৈনিক ৺মনোরঞ্জন রায় উপবাস সুরু করিয়া দিল। গৃহকর্ত্রীকে বলিলাম "আমাকে তুমি নিরস্ত করিলে, কিন্তু মনোরঞ্জনের এইরূপ কৃচ্ছ্রব্রতের প্রতিকার কি হইবে?" ৺মনোরঞ্জন সৈনিক-জীবন ছাড়িয়া প্রবর্ত্তকের সহীদরূপে জীবনের ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে। এই মনোরঞ্জনই ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রথম পর্য্যায়ের প্রধান সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন—তাঁহার কথা পরে আরও কিছু বলিব। গৃহদেবী মনোরঞ্জনের অকস্মাৎ এইরূপ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বিচলিতা হইলেন। একটা সংস্থার মধ্যে কোন এক ব্যক্তির স্বেচ্ছামত ভাল অথবা মন্দ কোন কাজই তিনি পছন্দ করিতেন না। এইরূপ হইলে তিনি মনে মনে বেশ বিরক্ত হইতেন। তাঁর কথা ছিল "দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ।" তবুও সঙ্ঘের প্রত্যেক অনুরাগীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। তিনি কখন কাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, তাহা আমিও ঠিক করিতে পারিতাম না। তিনি শ্রীমন্দিরে গিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখের অনেকখানি কাপড়ে ঢাকিয়া মনোরঞ্জনকে বলিলেন, "তুমি উপবাস করিলে আমাকে উপবাস করিতে হইবে, সঙ্ঘের সকলেই উপবাসে থাকিবে। ইহা ন্যায্য হইবে না।"

মনোরঞ্জন তার প্রতিজ্ঞার পথে সঙ্ঘজননী যে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন, এরূপ কল্পনাও করে নাই। সে এই মহীয়সী জননীর সম্মুখে মাথা নত করিতে বাধ্য হইল। পরিশেষে মনোরঞ্জনের একান্ত প্রার্থনায়, তিনি তাহাকে দুগ্ধ পান করিয়া উপবাস-প্রতিজ্ঞারক্ষার অনুমতি দিলেন। মনোরঞ্জন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল।

২৪শে সেপ্টেম্বর মহাত্মার জন্মদিনোপলক্ষে আমি সঙ্ঘের প্রত্যেক নরনারীকে উপবাসে থাকিবার আদেশ জারি করিলাম। তিনি ইহাতে অসম্মত হইলেন না, পরমোৎসাহে ইহাতে যোগদান করিলেন। দিনটী একটী উৎসবে পরিণত হইল। ঐদিন অপরাহ্ন ছয় ঘটিকায় আশ্রমে যে সভাধিবেশন হয়, তাহার স্মৃতি ভুলিবার নহে। এই সভায় সঙ্ঘের পরিচিত বহু নর-নারী, বহু কারিগর, ছুতার, তাঁতী প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ সমবেত হয়। এই সভায় মহাত্মাজীর অনশনব্রতের মর্ম্মকথা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বহু মুসলমানও এই সভায় যোগদান করেন। মহাত্মার প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার এইরূপ আন্দোলন-সৃজনের পশ্চাতে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা তখনও আমার বোধে আসে নাই। আমি আগাইয়া চলি নক্ষত্র-বেগে, অসাধারণ কর্ম্মপ্রেরণায়। একজনের অসামান্য জাগ্রত দৃষ্টি আমায় অনুসরণ করে, চিরদিন উহাই অলক্ষ্য শক্তিরূপে আমার রক্ষা-কবচ হইয়াছে। সে নীরব মৌনপ্রতিমা আমার স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রাখিলেই ইহা বুঝিতে বাকী থাকিত না যে, তিনি কি জন্য সতত গভীর চিন্তাশীল হইয়া অবস্থান করেন।

তার পরে ৮ই অক্টোবর মহাত্মাজীর অনশন-ব্রতো-দ্যাপনের দিন। জাতি-মন্দিরে বিরাট্ প্রার্থনা সভার

আহ্বান করা হয়। সভায় আশাতীত লোক-সমাগম হইয়াছিল। শিক্ষিতাশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান, বাংলা-হিন্দি-উর্দ্দু-ভাষাভাষী পল্লীবাসীর সমষ্টি—সে এক গণ-নারায়ণের বিগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চন্দননগরের জীবনে এমন অপূর্ব্ব মিলন-সভা সেই প্রথম। তাহার পরে গণজাগরণের এমন সাড়া আর কখন দেখি নাই। এই সভার সভাপতি ছিলাম আমি। অনেক মুসলমান বক্তা এই সভায় বক্তৃতা করেন। দিল্লীতে মহম্মদ আলির নিকট এই সভা হইতে এক টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। উহাতে লিখিত হইয়াছিল "চন্দননগরবাসী হিন্দু-মুসলমান প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের আহ্বানে সমবেত হইয়া মহাত্মাগান্ধিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে ও ঐক্যসংকল্প গ্রহণ করিতেছে।"

এবার পূজা এইরূপেই অতিবাহিত হইল। ২৬শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। দীর্ঘ ২১শ দিনব্যাপী উৎসাহের পর অবসাদ খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু আমার প্রকৃতি উৎসাহের পর উৎসাহের আগুন জ্বালাইয়া চলিত। তিনি যত বলিতেন, "ওগো একটু স্থির হও, এত বড় কাণ্ড করার পরে তোমার নামে যে রাজনীতিক গন্ধ আছে, তাহার দিকটা একটু দেখিয়া চল।" এই সময়ে স্বদেশযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে আবার উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। মহাত্মাজির নবতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে আত্মদান করিতে প্রবুদ্ধ হইলেও, কিন্তু আমার জীবনগতি ধরিয়া থাকিতেন যিনি, তার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। সংজ্ঞের সংগঠনের স্বপ্ন তাই মনে হয় আমার সহধর্ম্মিনীরই স্বরূপ-ধর্ম্ম। তিনি কোজাগর লক্ষ্মীপুজার রাত্রিতে কয়েকখানা নৌকায় আমাদের লইয়া কয়েক বৎসরের পর আবার গঙ্গাবক্ষে বিচরণে বাহির হইলেন। সেই শারদজ্যোৎস্নাফুল্ল রজনীতে গঙ্গাশীকর-সংযুক্ত সমীরণস্পর্শে আমাদের তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল ও প্রকৃতিস্থ হইল। কণ্ঠে কণ্ঠে সঙ্গীতের ঝরণা ঝরিল, 'আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই তোর জ্ঞানবিচারে।" একখানি তরণীতে আমার শয্যারচনা হইয়াছিল। আমি গৃহদেবীর সুকোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া, আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। মাথার খুলির মধ্যে আন্দোলনপ্রবাহ নিবৃত্ত হইয়া সংগঠনের প্রেরণা প্রবাহিত হইল। সেই সংগঠন পল্লীসংস্কার নহে, সমাজ সংগঠন নহে। মনে হইল "আমার জীবনে লভিয়া জীবন" যদি সহস্র নারীপুরুষ অতীতকে বিসর্জ্জন দিয়া সংহতিবদ্ধ হয়, সেই সংহতির প্রতি ব্যষ্টি যদি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া অপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ হয়, আর ইহাদের প্রতেকের সহিত প্রত্যেকের যদি অনবদ্য প্রেম ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হয়, এই সংগঠনের মধ্য দিয়াই জাতি অবধারিত মুক্তি লাভ করিবে। আত্মসামর্থ্যের বিচার এখানে নাই। ঈশ্বরের সহিত অন্তরের যোগই ইহার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। ভাগীরথীবক্ষে শুইয়া শুইয়া এই প্রতিজ্ঞাই হৃদয়ে দৃঢ়তর হইল। দেবীর কর-সঞ্চালনে আমার তপ্ত মস্তিষ্ক সুখানুভব করিতেছিল; অকস্মাৎ অন্য তরণী হইতে জয়কণ্ঠ শুনিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম আমরা ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছি।

প্রাতঃকৃত্য-সমাপনের পর আমরা প্রায় ৪০।৫০ জন নারীপুরুষ বাজারের পথে চলিলাম। পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পল্লীবাসীরা এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা দেখিল! বিপণিতে বসিয়া বণিকেরা বলিল, "কে এই ভাগ্যবতী নারী—এতগুলি পুত্রকন্যা লইয়া আজ ত্রিবেণীতীর্থ আলো করিলেন। বাজারে সোরগোল পড়িয়া গেল। আমরাই সেদিন ক্রেতা হইয়া যত শাকসব্জি হাটে আসিয়াছিল সব ক্রয় করিয়া লইলাম। জিনিষপত্রে আমাদের নৌকা বোঝাই হইল। নৌকা ছুটিল আবার উত্তরপথে। কণ্ঠে কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি, "মার হাতে খাই পরি, মা নিয়াছেন সকল ভার।"

সে দিন আর ফিরিবে না, সেদিনকার স্মৃতি কিন্তু জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে!

স্বপ্ন রূপ লওয়ার পথে কত বাধা, তাহার ইয়ত্তা নাই। ২৫শে অক্টোবর অকস্মাৎ রাজরোষ সারা সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিল। দেশবন্ধুর অধ্যাত্মসন্তান দক্ষিণহস্তস্বরূপ সুভাষচন্দ্র বন্দী হইলেন। এই একদিনেই কলিকাতায় ও অন্য প্রায় ৫০০ স্থানে খানাতল্লাস হইল। প্রায় ৭২ জন দেশকর্ম্মী বন্দী হইলেন। আমাদের তাৎকালীন এস্প্রেস রোডস্থিত চট্টল আশ্রমও বাদ পড়িল না। এই সংবাদে আমি একটু স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম। দেশের আত্মা যাহাতে জাগ্রত হয়, এইরূপ কর্ম্মে যদি রাষ্ট্রশক্তি

বাধা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে পতিত জাতির অভ্যুত্থানের আর উপায় কি? ২৬ অক্টোবর গর্ভর্ণমেণ্টের এই কর্ম্মের ঘোর প্রতিবাদ করা হইল বঙ্গব্যাপী হরতাল করিয়া। এই দিন বাংলার হাট-বাজার, দোকান-পাট সব বন্ধ ছিল। সারাদিন চতুর্দ্দিক্ হইতে জনগণের কণ্ঠরব উঠিয়াছিল "জয় মহাত্মা গান্ধির জয়।"

এই ঘটনায় আমার স্ত্রীর চকিত দৃষ্টির কথা মনে পড়ে। তিনি আমায় ভীরু দেখিতে চাহেন নাই, তাহার পরিচয় বিপ্লবযুগে পাইয়াছি। কিন্তু যে বিশিষ্ট কর্ম্মটী সিদ্ধ করার জন্য সম্প্রতি আমাদের উদ্যম তাহা অকারণ ক্ষুণ্ণ না হয়, এই দিকেই ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তিনি বলিলেন "যখন চট্টল সজ্যে খানাতল্লাসী হইয়াছে, তখন চন্দননগরেও ইহা হইতে পারে?"

আমি বলিলাম "হইতে পারে বটে, তবে চন্দননগর ফরাসী রাজ্য, হঠাৎ খানাতল্লসী হওয়া সহজ নহে।"

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই জন্যই কি তুমি এই বিষয়ে উদাসীন হইয়া আবার স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়াছ?"

আমি তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিলাম। তাঁহার কথার মধ্যে আমাকে যেন সুবিধাবাদী বলা হইয়াছে, মনে হইল। তিনি মনের ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমি তোমায় কোন বড় কাজ হইতে মুখ ফিরাইতে বলি না। যে কাজে বিপদ আছে, সে কাজ যদি তোমার হয়, সে বিপদ্ মাথায় লইতে আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমাকে আমার বড় ভয়, তুমি অনেক সময়ে এমন কাজে মাতিয়া যাও, যাহা আদৌ তোমার কাজের প্রয়োজন নয়। খাদি, চরকা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ছেলেদের ও মেয়েদের জীবন লইয়া তোমার তপস্যা ও সাধনা, এই কাজটাকে আমি বড় কাজ বলিয়া ধরিতে চাহি। হঠাৎ অন্য কাজে যখন মাতিয়া যাও, আমি যে কোন দিকে সামাল দিব তাহা খুঁজিয়া পাই না। তোমার একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ থাকা দরকার, নতুবা আমায় বড় বিব্রত হইতে হয়।"

তিনি এইরূপ প্রকৃতিরই লোক ছিলেন। আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক। লক্ষ্য স্থির থাকিলেও, লক্ষ্যপথে চলিতে চলিতে এদিকে ওদিকে বড় কাজ দেখিলে কিছুটা ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। তিনি এইরূপ কর্ম্ম অযথা শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই অমোঘ লক্ষ্যটীর দিকে চাহিয়া ঋজু পথে চলা শ্রেয়ঃ করিতেন। আমার গতি হইত তির্য্যক্ ও বক্র। তাই তিনি মাঝে মাঝে বড় বিচলিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে নিরুপায় ছিলাম। গান্ধীযুগের প্রখর স্রোতঃ আমার প্রকৃতির অনুকূল ছিল না। তবুও এই সময়ে এই প্রবাহ অস্বীকার করিতে পারি নাই। তিনি গত্যন্তর না বুঝিয়া নির্ব্বিকারে আমায় অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ সর্ব্বান্তঃ-করণে করিতে গিয়াও আত্মপ্রেরণার গতিপথেই আমায় ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু দেশের এইরূপ বড় বড় ডাকে কাণ দিয়া নিজস্ব গতিকেই পুষ্টি দিয়াছি। আমার বক্র ও তির্য্যক্‌গতির অর্থ অনেকেই অনুধাবন করিতে না পারায়, আমাকে অনেক সময়ে ভুল বুঝা হইয়াছে। আমি সেদিন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, হয়তো বিপদ্ আসিতে পারে। কিন্তু মহাত্মার এই কর্ম্মস্রোতঃ কিছুতেই অস্বীকার করার নয়। ইহার ভিতরই আমাদের আত্মশক্তি বিস্তৃতির পথ খুঁজিয়া পাইবে।

তিনি সতত আমার পৃষ্ঠরক্ষা করিতেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাঁহার গম্ভীর মুখ ও মন্থর গতি তাহার পরিচয় দিত। আমি সেদিন মহাত্মার অনুসরণে উন্মাদ হইয়া ছুটিয়াছি।

সুভাষ প্রমুখ বহুকর্ম্মী অবরুদ্ধ হওয়ায়, দেশবন্ধুর সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গ হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর মেরুদণ্ডে যে অদম্য শক্তির সঞ্চার লক্ষ্য করিয়াছি, অনেক দেশনেতার মধ্যে সে সাহস ও বীর্য্যের অভাবও লক্ষ্যে পড়িয়াছে। মহাত্মা সর্ব্বদাই নিরলস ও অনপেক্ষ। কোন বিষয়ে তাঁর যেন এক বিন্দু আসক্তি নাই। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অমোঘ লক্ষ্যে চালিত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ তীরের ন্যায় তাঁহার স্থির গতি। তিনি দেশবন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে বাংলায় আসিলেন। দূর হইতে মহাত্মার সহিত হৃদয়ের সংযুক্তি হেতু আমাদের যে তপস্যা সুরু হইয়াছিল, তাঁহার এই বাংলা আগমনে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মহাত্মাজীর

সহিত আমাদের মিলন-রহস্যের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা প্রকাশ করা হয়তো এ জীবনে সম্ভব নহে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেছিলাম। 'সংসার নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ তেমন অর্থাগম নাই, এমন করিয়া কতদিন চলিবে?'—আমার স্ত্রীর মুখে এইরূপ কথা বহুবার শুনিয়াছি। চিরদিনই সেই একই উত্তর, 'কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান, অতএব অভাবও থাকিবে, দিনও চলিবে।' তিনি কথা শুনিয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু অন্তরে তাঁর এইরূপ ভরসাই ছিল। দিন তাই কোনদিন অচল হয় নাই। তপস্যাই সঙ্ঘে জয়যুক্ত হইয়াছে। একথা জানিয়া শুনিয়াও আমার মন সংসারের দিকে টানিয়া রাখার আয়াস তিনি করিতেন। অবকাশ পাইলেই ইহা এক প্রকার আমার সহিত তাঁহার সবখানি কাজের সংযোগ রক্ষা করার কৌশল। কিন্তু কথাটা সেদিন আজ তেমন জমিয়া উঠিল না। হঠাৎ সংবাদ আসিল—মহাত্মাজী ষ্ট্র্যাণ্ডের নিকটে গঙ্গাবক্ষে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সংবাদ আনিল একজন ফরাসী পুলিশ প্রহরী। মহাত্মাজীর এই অযাচিত যোগাযোগের আহ্বান আমায় পাগল করিল। এই মহাপুরুষের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আমি নগ্নপদেই ছুটিলাম। আমার অনুসরণ করিল অনেকেই, ক্রমে এক শোভাযাত্রার সৃষ্টি হইল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়া শুনিলাম—মহাত্মাজী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহাকে ব্যথার কথা জানাইলাম। তদুত্তরে মহাদেব দেশাইকে দিয়া তিনি জানাইলেন, 'কলিকাতার ভীড় সামলাইবার জন্য ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে নামিয়া দেশবন্ধুর সহিত লঞ্চে আসিবার সময়ে তোমাদের কথা স্মরণে পড়ে। দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম চন্দননগরেই প্রবর্ত্তক আশ্রম। এই কথাগুলি যখন সহর পার হইয়া আসিয়াছি, তখনই জানায় মনে ক্ষোভের রেখা আঁকিয়া উঠিয়াছে। প্রবর্ত্তক আশ্রমের কথা আমার স্মরণে রহিল।

মহাত্মাজীর সহিত সম্মিলিত হওয়ার আকুলতা আরও বাড়িল। আমি শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র ও নলিনচন্দ্রকে তাঁহার নিকট পাঠাইলাম। ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেন। মহাত্মা তাহাদের যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম:—"আমি তোমাদের ওখানে যাইবার জন্য অন্তরে প্রেরণা পাইতেছি, আমি শীঘ্রই তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইব। সঙ্ঘের ভাবধারার সহিত পরিচয় করা আমারও ঐকান্তিক ইচ্ছা। তোমাদের ভিতরের দিক্ দিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে সত্যই সুখী হই।"

তিনি আরও বলেন—এই সময়ে স্বরাজ্য দলের আহ্বানেই তিনি বাংলায় আসিয়াছেন। বেলগাঁও কংগ্রেসের পর সাধারণ ভাবে বাংলায় যখন আসিবেন, প্রবর্ত্তক আশ্রমে নিশ্চয় আসিবেন। নলিনচন্দ্র মহাত্মাজীর বাণী চাহিলে, তিনি বলিয়া উঠেন, "ওঃ—আমার একমাত্র বাণী—খদ্দর! খদ্দর!! খদ্দর!!!"

তাঁর আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীমান্ অরুণ ও নলিন ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মাজীর কথা আমায় শুনাইল। আমরা চরকা-যজ্ঞে মাতিয়া উঠিলাম। স্বদেশীব্রতের অন্যতম প্রচারক পরলোকগত মিঃ জে, চৌধুরী এইরূপ এক সভার সভাপতি হন। এই দিন আমরা সারাদিন চরকা কাটি। ৩৯৩৬৯ গজ সূতা কাটা হয়। মিঃ চৌধুরীর কথাগুলি আজিও স্মরণে পড়ে। তিনি বলেন "বাংলার স্বাদেশিক অভ্যুত্থানের মূলে বাঙ্গালীর দান অল্প নহে। এই স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী ষ্টোর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে যে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী হয়, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি দায়ী।" মিঃ চৌধুরীর প্রতি আমাদের সম্মান-দান বাংলার স্বদেশসাধনার এক আদি বিগ্রহকে সম্মুখে রাখিয়াই যেন সার্থক লাভ করিয়াছিল। মিঃ চৌধুরীর সহিত আমাদের মর্ম্ম-পরিচয়টুকু চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ইহার পর প্রতি রবিবার চরকা-যজ্ঞে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। চন্দননগরের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত অসংখ্য মুসলমান আমাদের সহিত সংযুক্ত হন। এইরূপ ১১টী সম্মিলনের পর যে প্রচণ্ড বাধা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সঙ্ঘের ইতিহাস তাহাতে বিপরীত ভাবেই

লিখিত হইয়াছে। বিধাতার অলক্ষ্য হস্ত এইরূপ ভাবেই সঙ্ঘকে তার নিজস্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। আমি যতই জাতীয় জীবন ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ উন্মাদ হইয়া ছুটী, ততই কোন এক অজ্ঞাত শক্তি সে গতি রুদ্ধ করিয়া ভিন্ন মুখে পরিচালিত করেন। অন্তরে বাহিরে যত বাধা সকল কিছুরই অর্থ সঙ্ঘকে তার নিজস্ব সত্যের দিকেই পরিচালিত করা। আজিও তাহার অন্যথা হয় না। আমি অতঃপর ফরাসী ও ইংরাজ শক্তির নিকট হইতে যে প্রবল বাধায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, সেই কথা পরবর্ত্তী সংখ্যায় বলিব। (ক্রমশঃ)

সিমলায় তুষারপাত

শ্রীঅরুণকুমার রায়, এম. এ.

[সিমলায় এবারকার বরফপাত সংবাদপত্রের মারফৎ সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমান্ অরুণকুমার রায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এই বর্ণনা হইতে প্রবর্ত্তকের পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার সম্যক্ ধারণা করিতে পারিবেন। লেখাটি এদিক্ দিয়া উপভোগ্য। প্রঃ সঃ]

এ রকম বরফ নাকি গত কুড়ি বছরেও পড়েনি! গত ১০ই জানুয়ারি সিমলায় সব চেয়ে বেশী বরফ পড়েছিল। অবিশ্রান্ত ২৪ ঘণ্টার বেশী বরফ পড়া যে আনন্দের বিষয় নয়, এটা বোধহয় আন্দাজ করা যেতে পারে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! চারদিক একবারে সাদা হয়ে গিয়ে যেন ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষ ঘাবড়ায় নি। নিয়মিত ভাবে দৈনন্দিন কাজ তাকে করে যেতে হয়েছে। অত্যধিক বরফ পড়ায় বাইরের জগতের সঙ্গে সিমলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, রেল, সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুধওয়ালা আসে না, জলওয়ালা আসে না, অনেক বাড়ীতে কল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বরফ গলিয়ে সামান্যই জল করা যায়, এটা বোধ হয় বুঝতে কষ্ট হবে না। ইলেকট্রিক খারাপ হয়ে গিয়েছিল অনেক জায়গায়। রাস্তা এত পিছল হয়েছিল যে, লোহা লাগান লাঠিতেও সামলানো যাচ্ছিল না। আছাড় খেয়ে কেউ হাড় ভেঙেছে—কেউ বা মরেছে। একেই পাহাড়ী জায়গা অসমতল, তারপরে রাস্তায় ২।৩ ফুট করে বরফ জমলে কি অবস্থা হয়, কল্পনা করা শক্ত নয়। বরফ প্রথম যখন পড়ে তখন গরম থাকে এবং তুলোর মতন নরম বোধ হয়। অনেক সময় পর্য্যন্ত থাকলে এগুলো হাল্কা থাকে না, জমে শক্ত বরফ হয়। তখন এর উপর আছাড় খেলে নিশ্চয়ই আনন্দ হয় না। কয়েকটী চাপরাশী এবং ডাকহরকরা এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছিল। কোন এক দপ্তরের সিঁড়ি খাড়া এবং পিছলে যাওয়ার খুব অনুকুল থাকায়, একটী চাপরাশী প'ড়ে মারা যায়। কল্লোলীর দিকে বরফের ঝড়ে বড় বড় ঢিবির সৃষ্টি হয়েছিল এবং কয়েকজন ডাকহরকরা সেই সময়ে ঢিবির মধ্যে আটক পড়ে। কয়েক ঘণ্টা না বা'র করতে পারার দরুণ বরফের সঙ্গে তারা জমে যায়। পথঘাট যথেষ্ট নির্জ্জন ছিল। এমন কি বাজার পাট শুদ্ধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কল্লোলীর দিকে জঙ্গলের বাঘ শুদ্ধ নাকি সহরে চলে এসেছিল। বর্ম্মা সরকারের দপ্তর, ষ্টেশনের অনেক অংশ বরফের চাপে ধ্বসে গিয়েছিল। অনেক বাড়ী কাঁচা থাকার দরুণ ফাটল ধরে ভেঙে পড়েছিল।

এখানে সাহেব এবং সাহেবীমনোভাবাপন্ন দেশী অফিসারদের যথেষ্ট আমদানী হয়েছে। সাহেব-বাচ্চারা অনেকে বরফে sledge গাড়ী চালিয়ে, skating ক'রে এবং snowball ছুঁড়ে আনন্দ করেছে। কিছু snowball দেশী লোকেরাও নিজেদের মধ্যে ছুঁড়াছুঁড়ি ক'রে আনন্দ করেছিল। বরফের নরম অবস্থায় হাতে নিলে সহজেই পিণ্ডের মতন করা যায়। সেটাকে ছুঁড়ে মারলে তখন বিশেষ গায়ে লাগে না। জলের অংশ সামান্য থাকায়, কাপড়-জামাও বিশেষ ভেজে না। গায়ে লেগে বল আলগা হয়ে ধ্বসে পড়ায় একটা আনন্দ হয়।

আগে নাকি সিমলায় শ্বেতনির্বিশেষে এই বরফের বল খেলা চলত। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা হওয়ায়, এটা এখন সার্ব্বজনীন খেলা হিসাবে গণ্য নয়

এবার অবশ্য সিমলায় বরফ ৬।৭ ফুটের চেয়েও বেশী পড়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজে অতিশয়োক্তি হিসাবে বার ফুট ছেপেছিল কোন কোন জায়গায় পাইলট ইঞ্জিন দ্বারা রেলের লাইন পরিষ্কার করা সত্ত্বেও কয়েক-দিন গাড়ী চালানো এবং টেলিগ্রাফের তার সংযোগ ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। শীত এত বেশী পড়েছিল যে, সরিষার তেল পর্য্যন্ত জমে গিয়েছিল—স্নান ঘরের ভিতরের বালতির জলও বাদ যায়নি। রাত্রে বিছানা বরফের মত ঠাণ্ডা বোধ হ'ত এবং যথেষ্ট গরম কাপড় লেপ ইত্যাদি গায়ে থাকলেও ঘুম হ'ত না। দিনের বেলায় দস্তানা এবং মোজা প'রেও হাত পা মরিচবাঁটা-মাখানোর মত জ্বালা করত। ঠাণ্ডায় অনেকে শরীর অসুস্থ বোধ করেছে; অনেকে অসুস্থ হয়েওছে। ঠাণ্ডায় আঙুল ফুলে ঘা হয় অনেকের, চাকরির দরুণ এই দারুণ শীতেও লোকেরা নীচে যেতে পারেনি। যখন বন্যপ্রাণীও এই বিষয়ে চেষ্টা ক'রে থাকে, তখন মানুষ নিরুপায় ছিল। অনেক বাড়ীতে যথেষ্ট কয়লা ছিল না; জল, দুধ, তরকারি, মাছমাংস পাওয়া যায়নি, চাকর-বাকরের অসুখ করেছে—জীবনধারণই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে কষ্টসাধ্য হলেও, শীতে অনেকের আবার স্বাস্থ্যোন্নতিও হয়েছে—কারণ ঠাণ্ডা শরীরের পক্ষে উপকারী। তুষারপাতের সময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। এ যে না দেখেছে, তাকে বোঝানো শক্ত। বাড়ীর ছাদ, গাছপালা, রাস্তাঘাট সব সাদা হয়ে এক অপূর্ব্ব এবং মনোহর দৃশ্য রচিত হয়েছিল। বাস্তবিক তুষারপাত একটী দ্রষ্টব্য ব্যাপার। তাই কষ্টের সঙ্গে আনন্দও যে হয়নি, তা জোর গলায় বলা যায় না। জীবনের সবক্ষেত্রেই বোধহয় এই রকম আনন্দ ও দুঃখের সমাবেশ র'য়েছে। এবারকার সিমলায় তুষারপাত তারই একটা বিশিষ্ট প্রমাণ। জীবনে এ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অতীত

শ্রীসুবোধচন্দ্র পাল বি. এ.

হে অতীত, ক্ষান্ত কর মুখর বচন,
সুপ্ত ক্লান্তি, লুপ্ত সুখ, গুপ্ত আকিঞ্চন।
জাগ্রত করিয়া বুকে, অনুতাপানলে
দগ্ধ করি জীবনেরে প্রতি পলে পলে
ভস্মীভূত করিও না আশা-উদ্দীপনা
না করি সংশয় কিছু না করি ভাবনা
যেতে মোরে দাও তুমি সম্মুখের পানে।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কালরাত্রি কর্ত্তব্যের টানে,
বক্ষে নিয়ে পুঞ্জীভূত দুরন্ত সাহস
শক্তিমান্ করি তোল তেজস্বী তাপস।

সুপ্ত যাহা সুপ্ত থাক্, লুপ্ত হোক লীন
গুপ্ত যাহা গুপ্ত থাক্ চিত্তে চিরদিন
উন্মুক্ত করুক চিত্ত সর্ব্ব সত্য কাজে,
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ অতীতের মাঝে।

যক্ষের নিবেদন

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

পরাণ বন্ধু, ওগো কালো মেঘ
দাঁড়াও ক্ষণেক এসে!
বিরহ-বেদনা কা'রে দিতে যাও
ভুবন-ভোলানো-বেশে?
শোনো, শোনো প্রিয়, প্রিয়ার বিরহে,
নিশিদিন মোর অন্তর দহে
অশ্রু আমার নয়ন ছাপায়ে
ধরার ধূলায় মেশে।
রাখো, রাখো সখা! এ মোর মিনতি,
ব'য়ে নিয়ে যাও বিরহের গীতি—
যেথায় আমার জীবনের সাথী
র'য়েছে অলকা-দেশে।
উত্তর পথে সলিল ছিটায়ে
যাও সুখে ভেসে ভেসে।
সেথায় আমার বিরহিনী প্রিয়া,
নিয়ত কাঁদিছে আমারে স্মরিয়া
বেদনা তাহার মুছাতে যতনে
যাও গো তাহার পাশে।
ব'লো তা'রে প্রিয়! মিলিব দু'জনে
নীরব-বরষ শেষে।

সম্পাদকীয়

সিমলা-সম্মেলনের ব্যর্থতা

বহু-ঘোষিত, বহু-ফল-প্রত্যাশিত সিমলা-সম্মেলনও পরিশেষে ব্যর্থ হইল! এ ব্যর্থতা নৈরাশ্যের হেতু হইবে তাঁহাদেরই, যাঁহারা স্বাধিকার পরকৃত অবদান বলিয়া এখনও প্রত্যয় রাখেন; নতুবা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মত মানিতে হয়, ব্যর্থতা দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু অবসাদ-নৈরাশ্যের কারণ হয় নাই। এই সম্মেলনের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহা অন্তর্নিহিত ব্যর্থতার বীজকে সংহরণ না করিতে পারিলে সিদ্ধ হয় না। এ ক্ষেত্রে কমবেশী সেই শক্তির অভাবই দেখা গেল সংশ্লিষ্ট ত্রিপক্ষেরই অর্থাৎ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং গভর্ণমেণ্ট, তিন দিক্ হইতেই। কেহই, বিশেষতঃ মুসলীম লীগ, জাতির সর্ব্বোত্তম কল্যাণের পর্য্যায়ে আত্মচেতনাকে অর্থাৎ দলবদ্ধ চেতনাকে সমুন্নীত করিতে পারিলেন না। জাতির বিরাট্ স্বার্থ ও কল্যাণের চেয়ে আত্মসংহতির স্বার্থনিষ্ঠা কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের দিক্ দিয়া যেমন সমধিক দেখা গেল, তেমনি লর্ড ওয়াভেলের গভীর অথবা আপাত-প্রতিম সমস্ত অকপট আন্তরিকতা ও উদ্যম সত্ত্বেও, বৃটিশ জাতির স্বার্থের চেয়ে ভারতের স্বার্থ যে তাঁহারও কাছে বড় নহে, ইহাও প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন হইল। অবশ্য বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া, ইহা পরাজয়ের চেয়ে গুপ্ত জয় বলিয়াই পরিগণ্য। কারণ, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সান্-ফ্রান্সিস্কোর পর, ভারত সম্বন্ধীয় নীতির বিষয়ে এমনই একটা সাফাইয়ের সুযোগ বৃটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বরং সিমলা সম্মেলন সফল হইলে, বৃটনকে যে দাম দিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মুখরক্ষা করিতে হইত, উপস্থিত কোনরূপ দাম না দিয়াই এক প্রকার কূটনীতির চালেই তাহার সে উদ্দেশ্য চমৎকার সফল হইল। এ দিক্ দিয়া, সিমলার বৈফল্য ইংরাজের চিরন্তন কূটনীতিরই ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় সাফল্য। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের সময়ে বৃটনের অভিসন্ধি সম্বন্ধে যে সংশয়ের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল, এবার লর্ড ওয়াভেলের সৈনিকোচিত সারল্যে সে অভিসন্ধি তো একেবারে ঢাকা পড়িয়াছেই, উপরন্তু সমস্ত ব্যর্থতার দায় এমন স্পষ্টভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক দলাদলির স্কন্ধে চাপিল যে, বিশ্ব-দুনিয়ার কাছে সে বিষয়ে আর তেমন কিছু কৈফিয়ৎ গাহিবারই আমাদের রহিল না। বৃটনের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে যে, তাহার সম্মুখে এমন সুবর্ণ-সুযোগ পরিবেশন করার ভার বার-বার আমাদেরই এক পক্ষ না এক পক্ষ অবহেলায় গ্রহণ করিতেছে। সে বার সে দায় বহন করিয়াছিলেন স্বয়ং গান্ধী—"অবলীয়মান ব্যাঙ্কের ভবিষ্য চেক-রূপ" বিখ্যাত উক্তি করিয়া; এবার তাহা লইলেন মুসলিম-লীগের গান্ধীস্বরূপ মিঃ জিন্না। আর বেশ একটা রাজনৈতিক প্রহসনের অভিনয় পরিলক্ষ্য করিল—বিশ্বজগৎ।

সিমলা-বৈঠকের ব্যর্থতার অন্যতম বীজ লুকান ছিল—ভুলাভাই দেশাই লিয়াকৎ উদ্ভাবিত "প্যারিটি-তত্ত্বে"। এই গাণিতিক "ফরমুলা"র কষ্টিপাথরে কষিয়া হিন্দু-মুসলমান তথা কংগ্রেস-লীগ ঘটিত যে মিলন-সমস্যা, তাহার সমাধান হইল না। লর্ড ওয়াভেল এইখানেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে "কাষ্ট্ হিন্দু-লীগ" সমাজ নির্দ্দেশ ও হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে হিন্দু মহাসভাকে নিদারুণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই সুফল বা কুফল ভেল্কিবাজীর মত বৈঠকের পরিণতিক্রমে কাহারও না কাহারও উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইবে, একথা না জানা রাজনৈতিক ভাণ বা নিছক মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমাদের শ্রদ্ধেয় সর্ব্বপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দকে এই উভয় বিশেষণে বিশেষিত করার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কার্য্যতঃ কূটনীতির ক্ষেত্রে ভারতনেতৃগণের বারম্বার পরাজয় ঘটিতেছে, ইহা আমরা ব্যথার সহিত পরিলক্ষ্য করিতেছি। গান্ধীজীই হউন, আর জিন্নামহাশয়ই হউন, কংগ্রেস বা লীগ কেহই স্ব-স্ব নীতির দায়ে আসল ব্যথার স্থানটি স্পর্শ করিলেন না, ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! অবশ্য বৈঠক সফল হইলেই আমরা হাতে স্বর্গলাভ করিতাম অর্থাৎ স্বরাজের রুদ্ধ তোরণ খুলিয়া যাইত, এমন কথা বিশ্বাস করার মত মনোবৃত্তি আমাদের এখনও হয় নাই; কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে বুদ্ধির

চালে এজাতি কেবল হারিতেছে, ইহা সুখদৃশ্য নহে। আমরা রাষ্ট্রশিক্ষার পাঠশালায় এখনও শিশু বা নাবালক মাত্র, ইহাই কি পদে পদে প্রতিপন্ন হইতেছে না!

হিন্দুমহাসভার অভিমান স্বাভাবিক হইয়াছিল। উপেক্ষারই প্রতিক্রিয়া অভিমান। বৈঠকের ব্যর্থতায় মহাসভাকে আর কোনও অভিমানের অভিনয় করিতে হইল না। ডাঃ খারে বলিয়াছেন—হিন্দুকে ইহা হইতে শিক্ষা লইতে হইবে যে, তাহার ভাগ্যে কি গুরুতর দুর্ভাগ্য সঞ্চিত আছে। সে শিক্ষা হিন্দুমহাসভা তথা হিন্দু মহাজাতি কোন দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহা চিন্তনীয়। শিক্ষার ব্যবস্থা খুব চমৎকারই পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে আসিতেছে—শুধু মানুষ নয়, বিশ্বপ্রকৃতিও কোমর বাঁধিয়া বাংলার হিন্দুকে আবার একটু বেশী করিয়াই শিক্ষা দিতে কসুর করিতেছেন না। সুতরাং এইবার শেষ শিক্ষার চরম চৈতন্যোদয়ের সম্ভাবনা, এমনও কি আশা আমরা করিব? আজ ভারতে ঐক্যতত্ত্বের শিক্ষা ও সাধনাই সব চেয়ে দুর্ল্লভ ও দুঃসাধ্য। সমষ্টি, গোষ্ঠী, জাতি সর্ব্বত্রই ভাঙ্গনের দেবতা রুদ্র নেত্রে কষাঘাত করিয়া আমাদের অগ্নি-পরীক্ষিত করিতেছেন। এক মুঠা হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী বা যে কোনও তত্ত্বানুকেন্দ্রী সংহতি কি আজ জীবনের রক্তে ঐক্যেরই তপস্যা গ্রহণ করিবেন? যেখানে এই সাধনা হইবে, সেইখানেই মুক্তির আস্বাদ মিলিবে। সেদিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আমরা আবার আকর্ষণ করিলাম।

ইহা দার্শনিকতা, কিন্তু অনিবার্য্য। তবুও নিছক রাজনীতির দিক দিয়া আমরা বলিব, ক্রিপস্ সাহেবের কথা অন্ততঃ একবার শোনা হউক। জাপান আজ অনেক দূরে। সুতরাং নির্ভয়ে একবার "adult franchise"-এর ভিত্তিতে ভারতে রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন হইতে পারে। বিলাতেও তো এই সময়েও রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন হইয়া গেল। অতএব এক রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে সকল দলাদলি নির্ব্বিশেষে শ্রেষ্ঠ যোগ্য প্রতিনিধিগণকে বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হউক। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু-মহাসভা—যাঁহার যাহা শক্তি, তাহা বিলাতী ডিমক্রেসীরই মানযন্ত্রে একবার মাপিয়া স্থির হউক। তারপর প্রত্যেক দলের প্রমাণিত শক্তির অনুপাতে যোগ্য পুরুষেরা প্রতিনিধির আসনে বসিয়া যদি কিছু করিতে পারেন, করুন। এই দিক্ দিয়া কি লর্ড ওয়াভেল একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন? নির্ব্বাচনান্তে যে বৈঠক বসিবে, তাহাতে অন্ততঃ কথা বা নিছক জিদের ধাপ্পাবাজীর আর এমনতর অবসর থাকিবে না। মিঃ জিন্নাও আর যাহাই হউন, ধুরন্ধর রাজনীতিকের মতই এই নির্ব্বাচনের দাবী করিয়াছেন। কংগ্রেসকে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি দান করিলে, তাঁহারাও নির্ব্বচনের সম্মুখীন হইতে পিছাইবেন না। এই দিক্ দিয়া শেষ একটা রাজনৈতিক প্রচেষ্টা করিতেই আমরা লর্ড ওয়াভেলের গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইলাম।

দেশীয় ভারত

দেশীয় ভারত অর্থাৎ রাজন্যগণ কর্ত্তৃক শাসিত ভারতের কথাও এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে। রাজন্যমণ্ডলের সহিত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্যঘটিত যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা এই অবকাশে মিটাইয়া লইয়াছেন। অচল অবস্থা আবার সচল হইয়াছে। পদত্যাগী রাজগণ তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। রাজন্যমণ্ডলের সভায় সভাপতিরূপে ভূপালের নবাব বলিয়াছেন, যে তাঁহারা বৃটিশ ভারতের শুভযাত্রায় পরিপন্থী নহেন, বরং সহায় হইবেন এবং সেই মত নিজেদের রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থারও যথোপযুক্ত সময়ানুকূল উন্নতি ও সংস্কারের প্রেরণা লইয়াই কার্য্যতৎপর হইয়াছেন। এই সব শুভলক্ষণ, সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ভারতের চিরাগত রাষ্ট্রচেতনার অংশতঃ উত্তরাধিকারী, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং তাঁহারা রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ার গতিনির্দ্ধারণে সমর্থ, ইহাও ধরিয়া লওয়া যায়। যুগের রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ে তাঁহারা কোন সুরে সুর বাঁধিবেন, সে বিষয়ে বেশ হুঁসিয়ার আছেন, সে বিষয়েও সংশয়ের হেতু নাই। ইহারা 'এজিটেটার' অর্থাৎ আন্দোলনকারী নহেন—অর্থাৎ হাওয়া বুঝিয়া প্রজাপুঞ্জ ও পরমা রাজশক্তির

(paramount power) সহিত তাল রাখিয়া চলিবার মত রাজনৈতিক বুদ্ধি অবশ্য রাখেন। তাই ইহাদের শাসনক্ষেত্রে আজ উন্নতির চিত্র কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। "চেম্বার অব প্রিন্সেস" হইতে নিয়মিত প্রকাশিত দেশীয় রাজ্যের উন্নতিবিষয়ক নানাতথ্যসম্বলিত প্রচার-পুস্তিকাগুলি পাঠ করিলেও এই কথার প্রমাণ মিলে। এই উন্নতি কৃষি, পল্লী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্রশিল্পাদি সর্ব্ববিষয়েই—তাহা ভাবিতে আনন্দ হয়। একটি কথা শুধু ইহার উপর আমাদের বলিবার আছে—ভারতের রাজশক্তি ভারতের সনাতন ধর্ম্মেরই রক্ষক ও পালক। ইহাই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম-সংস্কৃতির রক্ষণে ও পোষণে রাজন্যমণ্ডলীর প্রেরণা ও সাধনা যুগোপযোগী রূপে ও কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিলেই আমরা সমধিক আনন্দিত হইব। ধর্ম্মশক্তিরই আশীষবর্ষণে তাঁহারা আবার পূর্ব্ব-গৌরবেরও অধিকারী হইতে পারিবেন, ইহা আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনোৎসব এবার ত্রিভঙ্গ হইয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাই সুসম্পন্ন হইয়াছে ঠিক বলিতে পারিলাম না। কারণ — সেনেটে স্থানাভাব। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় তো বাল-মেধ যজ্ঞের কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে; উপাধি-পরীক্ষায় এত পরীক্ষোত্তীর্ণের ভীড় জমিল কিরূপে যে, সেনেটে তিন দিনে ভাঙ্গিয়া সমাবর্ত্তন করিতে হইল! যাহা হউক, এইরূপ অসুবিধাকর ব্যবস্থা যে কাহারও পক্ষেই প্রীতিদায়ক হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং ভাইস-চ্যান্সলার মহাশয়ও সে অনুযোগ করিয়াছেন। এবার চ্যান্সলার, বঙ্গেশ্বর মিঃ কে-সীর ছাত্রদের প্রতি বক্তব্য বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাতঃ-স্মরণীয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি তরুণদের বলিয়াছেন—শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙলার লজ্জা-নিবারণ করার জন্য বাঙালী হইলে তিনি নিজে জীবন-মরণ পণ করিতেন—যতদিন না তাহা সিদ্ধ হইত, ততদিন তিনি কখনও স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই কথায় তিনি উদীয়মান জাতিকে প্রয়োজনীয় সুপথেই পরিচালিত করার অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার মুখর প্রশংসা করিতেছি। বাঙালী কেন মৎস্যের চাষ, ফলের চাষ, দুধের ব্যবসা করে না—ইহাও তিনি ক্ষোভের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। একথার উত্তর নয়, জীবনে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিতে আমরাও তরুণদের বলিব।

ভাইস-চ্যান্সলার শ্রীযুক্ত ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় যুবকদের দেশের মুক্তিসাধনার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন, তাঁহার এই বাণীও কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক হইলেও, প্রণিধানযোগ্য। তাঁর স্বজাতির প্রতি দরদী হৃদয়ের পরিচয় আমরা জানি। নারীদের যে বিশিষ্ট আদর্শের কথা তিনি শুনাইয়াছেন তাহাও খুবই সময়োচিত বলিয়া আমরা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে তাঁহার মুখে কিছু জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্কেত-বাণী শুনিবার আমাদের প্রতীক্ষা ছিল। জাতির ভবিষ্য তরুণদের দেশের মুক্তিসাধনার অধিকারী হইতে হইলে, জাতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতি ও আদর্শেরই অনুশীলনে বিশেষভাবে অনুরাগী হইতে হইবে। এই দিকে শিক্ষাবিৎ প্রধান পুরোহিতগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে দেশের তরুণগণ তথাকথিত শিক্ষা-লাভ মাত্র না করিয়া যথার্থ মানুষ হইয়াই উঠিবে।

বাংলার অবস্থা

বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভর্ণর মিঃ কেসী যে আশাপূর্ণ বক্তৃতা সম্প্রতি দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এই প্রদেশে চাউলের অভাব এবার হইবে না। প্রচুর চাউল কর্ত্তৃপক্ষ সংগ্রহ করিয়াছেন, শুধু তাই নয়, তাহা রক্ষা করারও স্থায়ী এবং বেশ পাকা ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সুতরাং দেশবাসী এখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। কর্ত্তৃপক্ষ যখন বলিতেছেন এবং পাকা ধর্ম্মগোলার উদ্ঘাটনোৎসবও যখন সম্প্রতি হইয়া গেল, তখন তাহাতে আস্থা স্থাপন করা অবশ্যই যাইতে পারে। কিন্তু চাউলের নিম্নতম দর এখনও তো ১০৲ টাকার কম নহে! এ সম্বন্ধে আমাদের গভীরতর সন্দেহ এই যে, এই ১০৲ মণ চাউল মানুষের খাদ্যোপযুক্ত হইবে কি না, অন্ততঃ বিপত্ দিনের

সরকারী কার্য্য কলাপের তিক্ত অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে বাঙালীকে আস্থাহীন করিয়াছে।

ইহাতে কেমন করিয়া বাংলার জনসাধারণ অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জন যাহারা, তাহারা আশ্বস্ত হইবে? বাংলার ১৩৫০এর মন্বন্তর দশা হয়ত না আসিতে পারে, কিন্তু যে অবস্থা আমাদের চলিয়াছে, তাহাও ঠিক বৃহস্পতির দশা নহে। যে বাংলায় টাকায় ৮৴ মণ চাউল বিকাইয়াছে, সেখানে ৮৲ টাকার মণ চাউলের দর নামিলেও, খুব সান্ত্বনার কারণ নাই।—বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগেও বাঁচার মত বাঁচিতে হইলে, দেশের অধিকাংশ অধিবাসীকে ৪।৫৲ টাকার মণ চাউল পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য আমদানীর উপর নির্ভর মাত্র না করিয়া, বাংলায় স্বয়ংপূর্ণ হওয়ার জন্যই রাজা-প্রজা উভয়ে মিলিয়া অন্নসৃষ্টির যোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তারপর, পঞ্চাশের অন্ন-মন্বন্তরের মতই যে বাংলায় আজ বাহান্ন সনের বস্ত্র-মন্বন্তর চলিয়াছে! অবশ্য ইহা আজ জগদ্ব্যাপী বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যাপারের মূলেও যুদ্ধের ফল ও কয়লার অভাব, তাহাও কাহারও অজানা নহে। কিন্তু সে জ্ঞানে কাহারও অভাব দূর হইতেছে না। তাই প্রতিকারের চিন্তা ও চেষ্টার প্রয়োজন ফুরায় নাই। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কিছু কয়লা ছাড়িবেন—কাপড়ের কলগুলির জন্য এবং তজ্জন্য আশ্বাসও দিয়াছেন যে, কয়েক হাজার গাঁট বেশী কাপড় এবার পাওয়া যাইবে। ইহাতেও যথালাভ বলিয়া হাঁফ ছাড়িবার কারণ নাই। এই বাড়তি উৎপাদন অভাবের সমুদ্রে গোষ্পদের মত আশা সৃষ্টি করিলেও, আরও কাপড় চাই—ধুতি চাই, শাড়ী চাই। তজ্জন্য তাঁত ও কলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। বাংলায় এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সেদিক্ দিয়া একটা উন্নতিকর পরিকল্পনা লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। রাজশক্তিকে এখানে প্রজার সাহায্যার্থে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—সুযোগ, সুবিধা ও মূলধন লইয়া। তবেই আশা প্রকৃত আশ্বাসে পরিণত হইবে।

ইতিহাস গড়া ও লেখা

জাগ্রত রুশের ২২০ তম বিজ্ঞান-পরিষৎ অধিবেশনে আমন্ত্রিত সকল দেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ যোগদান করিয়াছেন। ভারত হইতে গিয়াছিলেন বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা। নিমন্ত্রিতগণ সকলেই সোভিয়েট রুশের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সাধনা ও সাফল্যের উল্লেখ পূর্ব্বক শতমুখে তাহার প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিতেছেন। পরিষদের অধিবেশনের সহিত যে ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে "লেনিনগ্রাডের আত্মরক্ষা"-বিষয়ক তথ্য-চিত্রাদি বিশেষভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই প্রদর্শনী দেখিয়া ডাঃ সাহা প্রকাশ করেন যে, জীবনে তিনি এরূপ রোমাঞ্চকর ও হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শনী আর প্রত্যক্ষ করেন নাই। আর একজন বৈদেশিক বিজ্ঞানবিৎ, পোলেণ্ডের অধ্যাপক লুডউইগ হির্জফেল্ড উদ্যোক্তৃগণকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন "আপনারা এই মাত্র ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য পৃষ্ঠা রচনা করা সমাপন করিয়াছেন অথচ এই বিরাট্ প্রদর্শনীতে তাহার প্রতিলিপিরক্ষারও শক্তি আপনারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আপনারা যুগপৎ ইতিহাস গড়িতেছেন ও লিখিতেছেন। প্রদর্শনী আপনাদের শক্তি, আপনাদের অপরাজেয় গুণেরই নিদর্শন।"

যে জাতি এত বড় মহাযুদ্ধ-জয়ের সমকালেই ভারতের মহাভারতখানি সংস্কৃত হইতে রুশীয় ভাষায় অনূদিত করিয়া যুগপৎ নবীন রুশের সাহিত্য সাধনা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাহার অকৃত্রিম সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের পরিচয় অকাট্যভাবে প্রদান করিয়াছে, সে জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির প্রতি স্বতঃই মাথা নত করিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে হয়। এশিয়ার নব অভ্যুদয়ে স্বাধীন চীনের শক্তি স্বাধীন ভারত আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যদি এই উদীচ্য মহাশক্তিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের সেতুস্বরূপ সংযুক্ত করিতে পারিত, নিখিল বিশ্বমানবের জীবনে সত্য সত্যই নব যুগান্তর আসিত। এখনও ইতিহাসের গতি সেই দিকেই হয়ত অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারতকেও আজ নূতন ইতিহাস গড়িতে ও লিখিতে হইবে।

দক্ষিণ-ভারত বনাম উত্তর ভারত

ওয়াভেল সম্মেলনের ব্যর্থতার পর, এক মহিলাসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া এক স্থলে

বলিয়াছেন, এই ব্যর্থতার মূলে যে সাম্প্রদায়িক জটিলতা, তাহার আশ্রয় উত্তর ভারতই। তাই উত্তর ভারতের ভ্রাতৃবর্গকে আজ দক্ষিণ ভারতের পক্ষ হইতে এই কথাই জানাইয়া দিবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উত্তর ভারতবাসী স্বকীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইয়া না লইলে, দাক্ষিণাত্যবাসী ভারতীয়গণ অতঃপর আর উত্তরাপথের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে না, তাহারা নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইবে স্বরাজের জন্য। উত্তম পরামর্শ বটে!

রাজনীতিবিদের কথা হয়ত আমরা ঠিক বুঝি না। কিন্তু কথাটা শুনিয়া মনে প্রশ্ন হইতেছে—উত্তরাপথে না হয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রবল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও কি হিন্দু সমাজের মধ্যেই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সমস্যাও কম উগ্র, কম জটিলতাময়?

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি

নিঃ ভাঃ হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সিমলা-সম্মেলনের ফলাফল বিষয়ে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা একাধিক কারণে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত সম্মেলনে হিন্দুমহাসভার কোন প্রতিনিধিকে আহ্বান করা হয় নাই, ইহা হিন্দু জাতির প্রতি ঘোরতর অবিচার, সে কথা আমরা অবশ্য আলোচনায় বলিয়াছি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও বলিয়াছেন, এই একটি প্রধান ব্যাপারই সম্মেলনের ব্যর্থতার পক্ষে অন্যতম যথেষ্ট কারণ হইলেও, সে বিষয়ে আমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ অতি ক্ষীণ অনুচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ওয়াভেল প্রস্তাবে ভারতবাসীকে ক্ষমতার হস্তান্তর অত্যল্পই করা হইলেও, সে ব্যাপার লইয়াও বেশী উচ্চবাচ্য কেহই করেন নাই। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে এইরূপ স্থায়ী সংখ্যালঘুতে পরিণত করার দুরভিসন্ধি লইয়া কিংবা যথার্থ স্বাধিকারের সুযোগ না দিয়া যে কোনও রাষ্ট্রপ্রস্তাবই ভবিষ্যতে আসুক না কেন, তাহা এইভাবেই ব্যর্থ হইতে বাধ্য, ইহা অতঃপর আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের এই মন্তব্য আজ সুধীমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

তাঁহার এই কথাও স্বীকার্য্য যে, বৃটিশরাজের মিঃ জিন্নাকে মাথায় তোলার ন্যায় কংগ্রেসের দিক্ হইতে তাঁহাকে খোশামোদ করার প্রচেষ্টাও শুভদায়ক হয় নাই এবং এই নীতির ফলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে জিন্নার কাছে কংগ্রেস-নেতৃগণকে পদে পদে হার মানিয়াই হটিতে হইয়াছে ও হইতেছে! ফলতঃ, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি-পরিবর্ত্তন ও যথার্থ গণতান্ত্রিক অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্রের আদর্শ-গ্রহণের কালোচিত কথাই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বিবৃতিতে কহিতে চাহিয়াছেন এবং এই সমীচিন আদর্শই হিন্দু মহাসভার হওয়ায়, মহাসভার নৈতিক মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি ইহাতে ব্যাপ্তিলাভ করিবে বলিয়াই আমরা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিতেছি।

রূপ-জ্যোৎস্না

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল, এম. এ,

অন্তর মাঝে বিকশিত রূপ বাহিরে যায় না দেখা,
ফুটেছে হৃদয়ে দূর রূপসীর শুভ্র চরণ-রেখা।
কুসুম-বক্ষে গন্ধ সমান
চিত্ত জুড়িয়া বঁধুর বয়ান;
নিঃশ্বাসে তার সুরভিত প্রাণ মোহিত সকল হিয়া,
বাহির বিশ্বে না পাই খুঁজিয়া অন্তরে জাগে প্রিয়া।

আকাশ তারার যত ঝলমল যত সে রূপসী আলো
আমার প্রিয়ার আঁখি-জ্যোৎস্নায় নিভে তারা হয় কালো।
রূপে টলটল কাননের ফুল
যতই করুক পরাণ আকুল,
মোর প্রেয়সীর নম্র তনুর পুষ্প-মাধুরী-ঘায়ে,
ঝরে পড়ে সব কানন-লক্ষ্মী ধূসর সন্ধ্যাছায়ে।
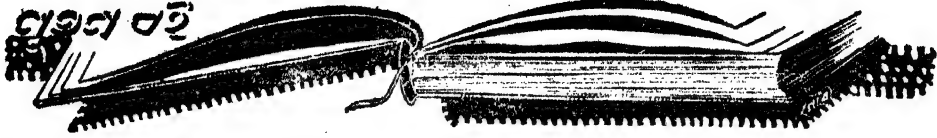
শ্রীশ্রীসরস্বতী বিজয়—১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার হইতে প্রকাশিত।

গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ৺শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের ও তদীয় গুরুবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদো সংক্ষিপ্ত জীবনী। অন্যান্য পুণ্যচরিত প্রসঙ্গও আছে। ভক্তগণের আদরণীয় হইবে। মূল্য লেখা নাই।

মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর—শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত।

কটকের প্রখ্যাত অধ্যাপক সান্যাল, যিনি পরে গৌড়ীয় মঠাচার্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও সাধনমার্গে উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর নামে সুপরিচিত হন, তাঁহারই সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও স্বলিখিত দিনপঞ্জী। রোজনামচাগুলিতে সাধকবরের অন্তরের ব্যাকুলতা ও তত্ত্বান্বেষণক্ষুধার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সাধকগোষ্ঠীর উপভোগ্য। ইহারও মূল্য লেখা নাই।

আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান—(রামকুটীরের ইতিবৃত্ত ও শোক-সান্ত্বনা শীর্ষক রচনা সহ)। শ্রীশ্রীঅপূর্ব্ব ঠাকুর (স্বামী সচ্চিদানন্দ) প্রণীত। শ্রীগোবিন্ চট্টোপাধ্যায়, রামকুটীর, ২০ হাজরা লেন, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

শ্রীশ্রীঅপূর্ব্ব চরিত (?)—শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

উভয় গ্রন্থ রামকুটীরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅপূর্ব্ব বা স্বামী সচ্চিদানন্দজীর সাধন-জীবন বা তাঁহার আশ্রমসংক্রান্ত কাহিনী। যাঁহাদের এ বিষয়ে জানিবার আগ্রহ আছে, তাঁহারা জ্ঞাতব্য তথ্য পাইবেন। সিংহ মহাশয় ভক্তের চক্ষে গুরু-চরিত্র আঁকিয়াছেন, সাধারণের নিকট তাঁহার ভাব-ভাষার উচ্ছ্বাস তাই মার্জ্জনীয় হইতে পারে।

ব্রহ্মচারী—শ্রীরাজেশ্বর গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, চট্টগ্রাম। মূল্য ।৵৹ আনা।

ধারাবাহিক প্রতিজ্ঞাচ্ছলে ব্রহ্মচারীর ব্রতবৈশিষ্ট্যের পরিচয় বই-খানিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংরাজ-ভক্তি ব্রহ্মচর্য্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ-স্বরূপ মনে করা হইল কেন? আর সব প্রসঙ্গ ভালই লাগিল।

গার্হস্থ্যম্—স্বামী বেদানন্দ প্রণীত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵৹ আনা।

গৃহস্থ সমাজের মেরুদণ্ড। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য অভিনন্দনীয়।

The Search—By Tridandi Swami (B. H. Boon.)

ইংরাজীতে কিছু সাধনার অনুভূতি। কৌতূহলী যাঁরা, তাঁরা পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন।

Agonies of a Bereaved Soul—By Debbrata Chakravarty.

অন্তর-সাধনার ইংরাজীতে অভিব্যক্তি। অত্যন্ত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তরানুভূতি বেশ আবেগপূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীকলিঙ্কনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত। মূল্য ৵৹ আনা। আচার্য্য রায়ের ভূমিকাসহ।

শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে উভয় মহাপুরুষ সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা। সুপাঠ্য ও চিন্তাযোগ্য।

ভাষণ—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

কাব্যপ্লাবিত বাংলা সাহিত্যে 'ভাষণে'র নবীন কবি সুস্থ, তাজা মনের রস-ঘন যে সমৃদ্ধ নৈবেদ্য লইয়া আসরে নামিয়াছেন, তাহা আনন্দের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। অনেক দিন পরে, একটু খাঁটি, মৌলিক কবিত্বের স্ফূরণ সুচয়িত শব্দে ও সুনিয়ন্ত্রিত সাবলীল ছন্দে অনুভব করা গেল। আর্ত্ত, বিমথিত, প্রপীড়িত ধরণীর ও মানবপ্রকৃতির বিকৃতি-কদাচারে কবির আশাবাদী মন বিষাইয়া উঠে নাই—জমাট অন্ধকারের বুকে উষার সম্ভাবনা তাঁর প্রাণে জাগিয়াছে ও সেই আলোকের লাগিয়াই তাঁর কণ্ঠে বন্দনা ফুটিয়াছে—তাই 'দুঃখে ও সুখে অজেয় মানবজীবনের যে গান' তিনি গাহিতে পারিয়াছেন, তাহার মধ্যে রসপিপাসু চিত্ত কিছু তৃপ্তি ও আনন্দের সুর খুঁজিয়া পাইবে। আর ইহাতেই তো কবির সাফল্য! কবির স্বভাব-লজ্জাভীরু চিত্ত কম্পমান দীপশিখার মত আত্মপরিচয়—ধীরে ধীরে সাধনায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠুক—ইহাই কামনা করি।

বুকের ঋণ—শ্রীগৌরগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। বরেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

ছোট গল্পের বই। প্রথম গল্পটাই গ্রন্থের নাম যোগাইয়াছে; কিন্তু উহা গল্প হিসাবে উত্তীর্ণ হয় নাই। "স্বপ্নই সত্য" গল্প লেখকের হৃদয়রসে কিঞ্চিৎ জীবন পাইয়াছে। "ঐতিহাসিকে" উহা আরও পরিণত। অন্যান্য চিত্রগুলি বড় জোর চলন-সই বলা যায়। নবীন লেখকের সাহিত্য-সেবায় নিষ্ঠা আছে। তাঁহার সাধনা উত্তরোত্তর সফল হউক, এই কামনা আমরা করিতেছি।

আচার্য্য-স্মরণে

শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আজ ইহজগতে নাই। তিনি শুধু নিজ গৃহকোণে আত্মার রূপে আবদ্ধ ছিলেন না, বিশ্বজনের হৃদয়ে পরমাত্মীয়ের আসন পাতিয়াছিলেন। কত অমায়িক মধুর ব্যবহার, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কত খুঁটিনাটিই না আজ স্মৃতিরূপে মনোমুকুরে ভাসিয়া উঠে, তা প্রকাশের ভাষা আমার কই!

১৬ বৎসর পূর্ব্বে এক শীতকালে রাড়ুলী যাইবার পথে খুলনা জেলায় শ্রীপুর গ্রামে অরবিন্দ সর্দ্দারের বাটীতে কিছুদিনের জন্য তিনি বেড়াইতে যান। সে সময়ে নদীতে বোটে বাস করিতেন। ঠিক শ্রীপুরের পরপারে ২৪ পঃ জেলার সৈদপুর গ্রাম। এই গ্রামে আমার মামারবাড়ী। নদীর নাম যমুনা। যমুনার তীর দিয়া বরাবর লাল সুরকীর পথ টাকী রেলষ্টেশনে গিয়া শেষ হইয়াছে। ঐ পথেরই এক শাখা গিয়াছে গ্রাম পর্য্যন্ত। গ্রামে বাড়ী বাগান-পুকুর সবই যেন থরে-থরে সাজানো। এ গ্রামের দু' এক ঘর ব্যতীত সবই যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর গুহরায় চৌধুরীবংশ। বংশধারা বাড়িয়া চলিলেও, এ পল্লী-সজ্জার শ্রীহীনতা কোথাও লক্ষ্যে পড়ে না।

নদীর তীরে বহু পুরাতন বটগাছের তলায় বোট থামাইয়া আচার্য্য রায় আমার মাতুলালয়ে বেড়াইতে আসেন এবং আসিবার সময়ে পথের চারিদিকের দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলেন "এরূপ মনোরম পল্লী আমার চোখে এর পূর্ব্বে আর পড়ে নাই"।

সেবারে তিনি যে ক'দিন ছিলেন, প্রায় প্রতিদিন প্রত্যুষেই বোট হইতে উঠিয়া খুব খানিকটা নদীর ধারে বেড়াইয়া আমাদের বাটীতে যাইতেন এবং আপামর সাধারণ সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। সে সময়ে সৈদপুর গ্রামের প্রাণস্বরূপ, ঋষিচরিত্র আমার দাদামশাই জীবিত ছিলেন।

বলিতে ভুল হইয়াছে—ছোটমামা (নিমাইদাস রায়) আচার্য্য রায়কে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন। কয়েকদিন খুবই আনন্দ পরিবেশন করিয়া এবং পল্লীর প্রত্যেককে বিশেষতঃ মেয়েদের চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত করাইয়া, বিভিন্নরূপ কর্ম্মের দ্বারা পুরমহিলারা গৃহের এবং সমাজের কি উপকার করিতে পারেন, তাহাই তিনি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আলস্য-জড়িমা ভাঙ্গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিতেন। বিগত পনের ষোল বৎসর ধরিয়া নানা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ হইতে প্রতিদিনের সান্ধ্যভ্রমণ পর্য্যন্ত তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন আমার এই ছোট মামা।

দ্বিতীয়বারে যখন আমার মামার বাড়ীতে আচার্য্য রায় যান, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রত্যেকটী জিনিষ আমার মা, মাসীমা, মামীমা ও ভাই-বোনদের হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন "আমাদের রান্না ঘরের জিনিষ লও।" বরাবরই তাঁকে রসিকতার সহিত কথা বলিতে দেখিয়াছি।

তৃতীয়বারে সৈদপুরে আমার মাসতুতো ভাইপোর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সরস্বতী পূজার সময়ে ওখানে তিনি যান এবং ঐ উপলক্ষে শুভকাজ তিনিই সম্পন্ন করেন। এ সময়ে আমাদের দাদামশাই জীবিত না থাকায়, তিনি স্বয়ং ইহা সম্পন্ন করেন এবং শিশুর "বাণীপ্রসাদ" নামকরণ করেন।

ভবানীপুরে আমাদের পরিবারে দু'টী বিবাহ উপলক্ষে যোগদান করিয়া তিনি বর-কন্যাকে আশীষ জানান ও তাঁর বিদায়-বেলা মটরে খাবার দেওয়া হইলে সহাস্যে বলেন, "ও এক ঝুড়ি দু' ঝুড়িতে হবে না; আমার কলেজের প্রত্যেকের হয়, এরূপ দিতে হ'বে।" এবং তা দেওয়াও হইয়াছিল।

সান্ধ্যভ্রমণ সমাপনান্তে আচার্য্য রায় প্রতিদিন ইংরাজ কবিদের লেখা সাহিত্য শুনিতে ভালবাসিতেন—সর্ব্বাপেক্ষা সেক্স্‌পিয়রের লেখাই তাঁর বেশী প্রিয় ছিল। ইদানীং ছোট মামা পড়িয়া শুনাইতেন। আমার স্বামী এবং ছোট মামা সমবয়সী হিসাবে উভয়ের প্রগাঢ় মনের টান ছিল, সে জন্য প্রতি রবিবারে ছোট মামা সায়ান্স কলেজ ফেরতা বরাবর আমাদের টালার বাসায় আসিতেন। যেদিন রাত্রি বেশী হইত, আচার্য্য রায় তাগিদ দিয়া বলিতেন "উঠে পড়। এত রাত্রে গেলে আর তোর ভাগ্নী দরজা খুলে দেবে না।" এরূপ কতদিন তিনি তাগিদ দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। পরে আমরা তিনজনে মিলিত হইয়া আচার্য্য রায়ের কথা লইয়া আলাপ-আলোচনায় অনেকটা সময় আনন্দে কাটাতাম। আজ সে স্মৃতি বড় করুণভাবে মনে জাগে; এ বিঘ্নসঙ্কুল সংসার-পথের সহযাত্রী আমার প্রিয়তম স্বামীও আজ পরলোকবাসী।

তিন বছর পূর্ব্বে শেষ পল্লীভবনে তিনি যখন বিশ্রাম করিতে যান, এক মাস সৈদপুরের বাটীতে থাকেন। এ সময়ে তিনি অন্নাহার করিতেন না। ঘরে তৈয়ারী নানাবিধ খাবার ও ফল খাইতেন। এই নদীপথ দিয়াই তাঁর জন্মস্থান রাড়ুলী এবং আরও অখ্যাত পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে যাইয়া ব্যথিত, দুঃখিত, সর্ব্বহারাদের ব্যথার সাথী তিনি হইতেন।

তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল লোকের সঙ্গে মিশিবার। সৈদপুরের জেলে, ক্যাওরা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের বাড়ীতে যাইয়া যখন প্রত্যুষে তিনি উপস্থিত হইতেন, তারা তো অত বড় নামকরা লোককে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; কিন্তু আচার্য্য রায় তাদের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই টানিয়া বসিয়া তাদের সঙ্গে গল্প করিয়া সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তবে আসিতেন।

সৈদপুরে প্রতিদিন দুপুরে বিশ্রামের সময়ে তিনি কত দেশ-বিদেশের গল্প করিতেন এবং আমরা কিরূপ ভ্রান্তভাবে অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলি, ইহা বিশদভাবে বুঝাইতেন। আমরা ইহা লইয়া কতদিন তাঁর সঙ্গে তর্কও করিয়াছি।

উনপঞ্চাশ সালের আষাঢ় মাসে সৈদপুর কলাশালায় আচার্য্য রায়কে দেখিতে ভাই, বোন, মা ও ছোট মামার সহিত সকলে গিয়াছিলাম। সে সময়ে তিনি দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা শুনিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া খুবই তৃপ্তিপূর্ণ হাসিমুখে তাঁর খুব নিকটে যাইতে বলিলেন। আমায় অনুযোগ করিলেন, কেন এই বিপদের সময়ে (সে সময়ে সিঙ্গাপুরের পতন হয়) পলতায় স্বামীর কাছছাড়া হইয়া কলিকাতায় আছি। আমি বলিলাম—"সেখানে একটীও মহিলা নাই, সকলেই বোমার ভয়ে দূর পল্লী-নিবাসে চলিয়া গিয়াছে, আমার যথেষ্ট সাহস থাকিলেও, স্বামী যদি বিশেষ অমত করেন, তবে কিরূপে থাকা সম্ভব হয়? তবে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া দূরে যাইব না।" তখন তিনি হাসিয়া কথা উঠাইয়া লইলেন। আমিও সত্য সত্যই ইহার পরে পীড়িত স্বামীকে দেখিতে পলতায় গিয়া আর ফিরি নাই।

দুপুরে ওখানেই বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়ার পর বেলা শেষে আচার্য্য রায়কে দেখিতে তাঁর কামরায় গেলাম। তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আহারাদি যত্নের কিছু ত্রুটি হইয়াছে কিনা। বলিলাম "আপনাকে দেখিতে আসিয়া খাওয়া ত উপরি মিলিল!" তিনি হাসিয়া আমার ছোট বোন অমিয়াকে গান করিতে বলিলেন। অমিয়ার কণ্ঠসঙ্গীত শুনিয়া খুবই প্রশংসা করিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। তিনি দুর্ব্বলবোধে কোনরূপ যন্ত্রের সহিত গাওয়া কেহই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। বিকালে আপনভোলা, নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ দাসগুপ্তের দেওয়া ফুল ও ফল গ্রহণ করিয়া আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম।

কলিকাতায়ও মা প্রায়ই তাঁকে দেখিতে যাইতেন। যে দিনের যে খাবার ও নানাবিধ জেলি আচার সবই তাঁকে পাঠান হইত। তিনিও মা'র হাতের খাবার খুবই ভালবাসিতেন। তাঁর শেষ অসুখের অব্যবহিত পূর্ব্বেও আমের আচার পাঠানো হইয়াছিল। নিরামিষ "গোটার ঝোল" তিনি প্রায়ই আগ্রহসহকারে চাহিয়া পাঠাইতেন। বরাবর তাঁর শরীরের বিষয় বিবেচনা করিয়া অবশ্য আমরা খাবার পাঠাইতাম।

মুরারির মত নিরলস, নির্ব্বিকার, নম্র স্বভাবের সেবক পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁর সেবা-যত্নের দোষ-ত্রুটি কখনও হয় নাই। আর তাঁর অগণিত পুত্রসম ছাত্রদের সেবাও তিনি পাইয়াছেন। তথাপি মাঝে মাঝে তাঁকে বলিতে শুনিয়াছি, "মা লক্ষ্মীদের হাতের সেবা পাওয়ার জন্য মন এক এক সময়ে বড় চঞ্চল হয়।" তিন বছর পূর্ব্বে এ কথা শোনার পর হইতে মা সময় পাইলেই তাঁর কাছে যাইতেন। আমাদের সংসারের শিশু, গরু সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ মা নিজ হাতে করেন বলিয়া তিনি মার কর্ম্মের কত সুখ্যাতিই না তৃপ্তির সঙ্গে করিতেন! তবে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে পীড়িত হইয়া পড়ায়, মা আচার্য্যের মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছু দিন আর সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। বিজয়া দশমীর প্রণাম ও নিজ হাতে মিষ্টিমুখ করিয়া মার সহিত তাঁর চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার শেষ হয়।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তিনি আর বেশী ইংরাজী সাহিত্য শুনিতে চাহিতেন না। তাঁর আজীবন প্রিয় ইংরাজ কবির লেখা সাহিত্য-শোনা ছাড়িয়া দিয়া তিনি মনোমোহন বসু কৃত পদ্যমালা ১ম, ২য় ভাগ ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য বই খুব তৃপ্তির সঙ্গে একমনে শুনিয়া আবার নিজেই আবৃত্তি করিতেন।

শেষ বয়সে আচার্য্য রায়ের যেন একেবারে শিশুভাব আসিয়া গিয়াছিল। অনেক সময়েই আচরণ ব্যবহারে তাঁকে বালকের মত মনে হইয়াছে। এই সময়কার তার শিশু মন আমায় সবচেয়ে মুগ্ধ করিত।

তিনি কর্ম্মপাগল মানুষ ছিলেন। আমাদের প্রায়ই বলিতেন, "বিশ্রাম নিলেও কর্ম্ম বদল করে নাও, কর্ম্মের রূপের শেষ নাই, কর্ম্মছাড়া কখনও হ'য়ো না। এ কাজ ভাল না লাগে, অন্য কাজ হাতে নাও।" আজ কেবলই তাঁর প্রীতিপূর্ণ হাসিমুখ ও সরল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ উপদেশ মনে পড়িতেছে। অনাসক্ত, বিলাসাড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা তাঁর। তিনি আমাদের যে পবিত্র নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, তা এ জীবনে পরম সম্পদ হইয়া আছে। তিনি যে কি ছিলেন তা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি আর ভাবি, হায়রে, জীবনে যাঁরে পাই নাই, মরণে তাঁকে পাইয়াছি।

সাময়িকী

পুনর্গঠন ও পুনর্বসতি সঙ্ঘ:

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পুনর্গঠন ও পুনর্বসতি সঙ্ঘ সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছেন। তাঁদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভারতের সাংবাদিকগণ ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সমিতির সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছেন। পৃথিবীর বিশেষ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীকরণ এই সঙ্ঘের মুখ্য কাজ। জানা গিয়াছে, গত জুন মাস পর্য্যন্ত সাড়ে বারো লক্ষ টন অতিপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ভারত হইতে ইউরোপে চালান হইয়া গিয়াছে। বস্ত্রহীন অন্নহীন ভারতবর্ষের বদান্যতার সীমা নাই বলিয়াই এখনও সে এই পরোপকার করিতে পারিতেছে।

পরলোকে শ্রীশচন্দ্র বসু:

চন্দননগরের সুসন্তান, সুসাহিত্যিক ও সুদক্ষ অভিনেতা ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসু গত ২৩শে মে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। শ্রীশবাবু স্বাবলম্বী ও স্ব-ভাগ্যস্রষ্টা ছিলেন। বিনা সহায়সম্বলে স্বকীয় চেষ্টায় বিলাতগমন করেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সেখানকার রয়েল কোর্টে 'বুদ্ধে'র ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতে ফিরিয়াও তিনি ইংরাজ দলে ইংরাজীতে অনেকবার অভিনয়চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন। শেষ জীবনে তিনি চন্দননগরে থাকিয়া সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং 'নল-দময়ন্তী', 'সন্দিগ্ধা', 'বুদ্ধ' প্রভৃতি রচনা ও 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রভৃতি গল্প লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শ্রীশবাবু তাঁর 'জীবনস্মৃতি'ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে প্রবর্ত্তক প্রকাশ বিভাগকে তিনি তাঁর একখানি ছোট গল্পের বই প্রকাশের ভার দিয়া গিয়াছেন।

গত ৩রা জুন চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এল এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় চন্দননগরবাসী বিগতাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

বৃটেন-ভারত বিমানপথ:

বৃটিশ সাম্রাজ্যে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে বিমানপথই সবচেয়ে বেশী—প্রায় কিঞ্চিদধিক ৬ হাজার মাইল। যুদ্ধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য ও সমরোপকরণ এই পথে আমদানী রপ্তানী হইয়াছে। সম্প্রতি 'ডেইলি মেল' পত্রিকায় প্রকাশ, আগামী শরৎকালে রাজকীয় বাহিনীর তিন শত যাত্রীবাহী বিমান এই পথে নিয়মিত যাতায়াত করিবে এবং ইহাতে প্রতিমাসে দশ হাজার যাত্রী যাতায়াত করিতে পারিবে।

ইহাতে ক্রমশঃ কলিকাতা ইংলণ্ডের প্রায় শহরতলী হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে মিঃ ম্যাকইনস্:

গত ৮ই জুলাই 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার' জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এ, এ, ম্যাকইনস্ চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কেন্দ্রতীর্থ পরিদর্শনে আসেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি সঙ্ঘের দ্বিপ্রাহরিক উপাসনায় যোগদান ও সভ্যগণের সহিত একত্র মাধ্যাহ্নিক আহার করিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আত্মীয়তার পরিচয় দেন। সঙ্ঘের সমস্ত বিভাগ, কার্য্যকলাপ ও জীবনধারণের প্রণালীর সহিত পরিচয়েও তিনি বিশেষ তৃপ্ত হন। সঙ্ঘ-গুরুর সহিতও নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া তিনি বিশেষ আলো পান। অপরাহ্নে এক সভায় মিঃ ম্যাকইনস যুদ্ধপরবর্ত্তী নববিধান সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যান্ত্রিক জীবনের পরিবর্ত্তে মানুষের শ্রম ও অধ্যবসায় মানব-কল্যাণের হেতু হইবে।

প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচার:

গত ৩০শে জুন শ্রীযুত নলিনচন্দ্র দত্তের পৌরোহিত্যে চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমের রবীন্দ্র মেমোরিয়াল হলে প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচারের ৫ম বার্ষিক সেশনের সমাপ্তি উৎসব হয়। এবার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫জন। সভায় ছাত্রগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধ বিষয়ে অভিব্যক্তি দেন। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণও বিদ্যার্থিদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত অভিভাষণের শেষে বলেন, শিক্ষার পর সাধনা। সাধনা আশ্রয়ের। জীবনের সুর খুঁজে পেতে হলে ঠিক ঠিক আশ্রয়ের প্রয়োজন।

পরবর্ত্তী সেসন আরম্ভ হইবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। যে সব ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাহারা ইহার পূর্ব্বেই দরখাস্ত করিবেন: অধ্যক্ষ প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচার, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর। দশ মাস শিক্ষা কালে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞানার্জ্জনের সহিত মনোরম ভাগীরথী তীরে পূত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সঙ্ঘের নিত্য জীবনধারার আনুকূল্যে তরুণ-তরুণীর জীবন গঠনই এই কলেজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শাখা-প্রতিষ্ঠা:

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক স্বামী অমৃতানন্দজীর ঐকান্তিক উদ্যম ও প্রচেষ্টায় দেরাদুন ও ডুমকায় সঙ্ঘের শাখা-প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙেও সঙ্ঘের নিজস্ব ভূমিতে সঙ্ঘ-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চলিতেছে। সম্প্রতি স্বামীজী এই তিনটি স্থানই ভ্রমণ করিয়া সঙ্ঘের ষট্‌বার্ষিক গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই সভা করিয়া অমৃতানন্দজী

সঙ্ঘের আদর্শ, শিক্ষা ও জীবন-সাধনার তথা ভারতীয় সাংস্কৃতিক শাসন ও নীতির উপর কল্যাণমূলক ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনগঠন ও আত্মিক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভূমকা—রসিকপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্ম্মসিদ্ধির জন্য জমি দান করিয়াছেন। গত ৯ই জুনের সভায় রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ সিংহ (সভাপতি), শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী (সহঃ সভাপতি), স্বামী অমৃতানন্দ (সম্পাদক), শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার ও শ্রীশ্রীপতি দে (সহঃ সম্পাদক), শ্রীনবীনমাধব চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সভ্যগণকে লইয়া একটি পরামর্শ সমিতিও ভূমকায় গঠিত হইয়াছে।

দেরাদুনে সঙ্ঘ-দীক্ষিত স্থানীয় সাধক কর্ম্মী শ্রীভোলানাথ ঘোষাল ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক সাধনায় সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়াছে।

কে, এম, ব্যানার্জ্জির লোকান্তর :

গত ২৯শে জুন পুরীধামে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ব্যানার্জ্জি পরলোক গমন করায় ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হইল। বিগত ৩৫ বৎসর ধরিয়া তিনি 'ইণ্ডাষ্ট্রী' পত্রিকা অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদনা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ১২ বৎসর ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘেরও সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত ব্যানার্জ্জি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংযুক্ত ছিলেন। এক নম্বর ওয়ার্ডের করদাতা-সঙ্ঘের সহঃ সভাপতি হিসাবে তিনি করদাতাদের স্বার্থসংরক্ষণে বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে শ্রীযুত ব্যানার্জ্জি 'ইণ্ডাষ্ট্রী' পত্রিকা মারফৎ নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা যোগাইয়া গিয়াছেন।

৺ভোলানাথ দত্ত :

গত ৭ই আষাঢ় ২১নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ 'কুসুম স্মৃতি' আলয়ে ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহোদয়ের পৌরোহিত্যে ৺ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীযুত অশোক শাস্ত্রী, ডাঃ কে, কে, সেনগুপ্ত, সজনী দাস প্রমুখ মনীষীগণ ও বিভিন্ন প্রেস ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ কাগজ-ব্যবসায়ে অগ্রগামী হিসাবে তিনি যে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন বিষয়ের দিক্‌পালদের মতই তাঁহাকেও বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া লিঃ :

গত ২৫শে জুন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির পৌরোহিত্যে ৩৬নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া লিমিটেডের উদ্বোধন-উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্‌দের চেয়ারম্যান মিঃ জগন্নাথ কোলে এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ ব্যানার্জ্জি। বাংলার ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কটির নব আবির্ভাব সার্থক হোক এবং দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি করুক, এই প্রার্থনা।

হাতে-গড়া (হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক) :

হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হাতে-গড়া'র দ্বিতীয় সংখ্যা দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা বসন্ত ও বাদল সংখ্যার একত্র সমাবেশ। হিরণ্ময় সমাদ্দার (সম্পাদক), সোমনাথ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, সমীর ঘোষ, শরৎ নন্দী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উত্তর কলিকাতার কয়েকটি তরুণের আন্তরিক শ্রম ও উদ্যম এবং কল্যাণী ঘোষের স্নিগ্ধ অনুপ্রেরণা এই সুবেশিত পত্রিকাখানির সাফল্যের জন্য দায়ী। আমরা আরও সুখী হইলাম, প্রসিদ্ধ শিল্পী ও লেখকের রচনা যাহা সচরাচর মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকায় দেখা যায়, এইরূপ ছবি বা লেখার সঞ্চয়ন 'হাতেগড়া' নহে, পরন্তু উদীয়মান তরুণদের চিন্তা ও হাতের কাজ তাহাদের অকৃত্রিম প্রাণের স্পর্শে পত্রিকাখানিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়াছে। উত্তরোত্তর ইহা আরও সুন্দর ও ত্রুটিহীন হইয়া উঠুক, ইহাই কামনা করি।

কাদম্বিনী শিল্ড ফাইনাল প্রতিযোগিতা :

ক্রীড়াজগতে 'ফুটবল' খেলার জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। এদেশেও সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত ফুটবল খেলা প্রসার লাভ করিয়াছে। ডাঃ অনিলচন্দ্র বসু আলগী (ফরিদপুর) পল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কাদম্বিনী শিল্ড প্রতিযোগিতার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ওখানকার পল্লীবাসীর উদ্বুদ্ধতার বেশ প্রমাণ মিলে। স্থানীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু-ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের বিদেহী মাতৃদেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রতি বৎসর বিজয়ী দলকে শিল্ড ও খেলোয়াড়গণকে কাপ ও মেডেল দিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকেন। এবারকার বার্ষিক অনুষ্ঠান শ্রীযুত বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কাদম্বিনী শিল্ড ফাইনাল প্রতিযোগিতায় এবার 'সাগরদি' ও 'মালিকদি' দলের মধ্যে যে শেষ খেলা হয় তাহাতে 'সাগরদি' দুই গোলে বিজয়ী হইয়া শিল্ডপ্রাপ্তির সম্মান লাভ করে।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩০শ বর্ষ
১৩৫২ বাং
ইং ১৯৪৫

শ্রাবণঃ
(জুলাই)
১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

ভারতের দিবার কিছু আছে, তাই অকথ্য অনর্থের মধ্যেও আমরা টিকিয়া আছি—এই কথাটাই আমাদের রক্তধারার ইতিহাসে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, আর এই কথারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে "প্রবর্ত্তকে"র পাঞ্চজন্য দীর্ঘদিন। ৫ হাজার ৪৫ বৎসর যে বাণী মূর্ত্তি গ্রহণ করিল না, এই ৩০ বৎসরে "প্রবর্ত্তকে"র স্বপ্ন সফল হইবে, এমন দুরাশা আমরা রাখি না! মনীষিরা প্রশ্ন তুলিবেন, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরে সিদ্ধ হয় না, তাহার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয় নিষ্ফল হইবে। কিন্তু সৃষ্টিকালের অনুপাতে কয়েক হাজার বৎসর অতি তুচ্ছ। ভারতের বাণী সফল করার জন্য দীর্ঘ দিন দিতে আপত্তি নাই। ভারতের রক্তে এই সাহস ও ধৈর্য্য নিহিত আছে। তাই আমাদের মরণ নাই। মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের মত চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া শ্মশান-ভারতে আজিও রুদ্রের নৃত্য হয়। অকাতর নৃত্য। এই নৃত্যচ্ছন্দে অপার্থিব সৃজনের শতদল বিকশিত হইবে। তাই ভারতে পুনঃ পুনঃ এই স্বপ্নবিভোর পাগলের মেলা লক্ষ্যে পড়ে।

রাজা নহুস স্বর্গবাসী হইলে, তাঁহার যান বহন করিয়াছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। অহংকার অত্যাচারের মূর্ত্তি ধরিয়া দেবচরিত্র মানুষের কাঁধে ভর দিয়া জাহির হইয়াছে বার বার। তবুও ধৈর্য্য, তবুও প্রত্যয়; আসিবে সে দিন, নিশ্চয় আসিবে, যেদিন অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে মানুষ লাভ করিবে স্রষ্টার সহিত পরিপূর্ণ ঐক্য। সে ধারণ করিবে তাহার দেহ-মন-বাক্য দিয়া সেই ঋতকে, যাহা অহঙ্কারের প্রকাশমূর্ত্তি নহে, পরন্তু ঈশ্বরের দিব্য রূপ। এই স্বপ্ন-বিভোর নয়নের দৃষ্টি দিয়াই এই থাকের মানুষ অনাচার অত্যাচার সহিয়া চলে—স্বপ্ন সার্থক করার সুদিনের প্রতীক্ষায়।

যদি শুধু স্বপ্ন হয়, চেতনার জগতে এই কথার সাড়া না মিলে, পাগলের প্রলাপ বলিয়া কথা উড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, কবীর, নানক, রামানুজ, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক-অধ্যুষিত এই ভারতে গভীর চিন্তাশীলতার একেবারেই অভাব হইতে পারে, এই কথায় প্রত্যয় হয় না। তাই উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের বাণী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করি 'যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ'। আমরা যোগ চাই। এই যোগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই আমরা যে চাহিয়াছি অসাধারণ শ্রী, জয়, সম্পদ্ এবং ঋতময় সত্য। আমরা যে অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে নব বিধানের প্রবর্ত্তন করিব, সে অস্ত্র আসুরিক নহে—দিব্য। বৃহত্তর রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমরা মহাত্মা গান্ধি কর্ত্তৃক ভারতের মুক্তি-সাধনায় এই সকল দিব্যায়ুধ লইয়া অপূর্ব্ব রণকৌশল লক্ষ্য করিতেছি। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এই ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখা বুকে উৎসাহের সঞ্চার করে; কিন্তু ইহা কেবলমাত্র সঙ্কেত ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভারতের সত্যকে মূর্ত্তি দিতে চাহে একটা গভীর অধ্যাত্মচেতনায় আস্থাবান্ জাতি। সেই জাতি গড়ার কাজেই প্রেরণা পাই, জাতিকেও দিয়া যাই। গঙ্গা-ভাগীরথী-অধ্যুষিত পবিত্র বাংলাদেশ—এই দিব্য ভবিষ্যতের মহাতীর্থ। তাই এইখানে প্রেম, ভক্তি, শক্তি ও বীর্য্যের লীলাতরঙ্গ বহিয়া যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানের অলৌকিক প্রবাহ বহিয়া আনে যুগের ভগীরথ; তাহাতে অভিষিক্ত হইয়া বাঙ্গালীর কণ্ঠেই যে ইরম্মদ-গর্জ্জন উঠিবে দিগ্বিজয়ের! সে জয়-স্বার্থের নয়, ক্ষুদ্র অধিকারবাদের নয়। সে আলো ও আনন্দের রাজ্য আশ্রয় করিয়া ভূমার চেতনায় নিখিল মানবজাতিকে সে দীক্ষা দিতে চাহে। শিখ গুরুর ন্যায় তাহার কণ্ঠেও এই বাণী উচ্চারিত হয় "শান্ত, ফিরে যাও ঘরে, এখনও সময় নয়।"

সে সময় কবে আসিবে, তাহা আমরা জানি না। তবে যোগপ্রতিষ্ঠ একটা সংহতির আবির্ভাবও যদি বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্যে পড়ে, তবে বাংলায় সে দিব্য জাতিগঠনের শক্ত ভিত্তি যে গড়িয়া উঠিল, এই প্রত্যয়ের অবধিহীন আনন্দ লইয়া মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করিয়া লইতে পারি।

এই পথের প্রথম পাঠ—প্রত্যয়। প্রত্যয় আত্মপুত্তির দায় নহে। তাহা প্রত্যয়ের প্রেত-মূর্ত্তি। প্রত্যয় ইষ্ট-প্রত্যয়। তবেই যোগের ভিত্তি দৃঢ় হয়। যোগ যেখানে নাই, সেখানে যে কর্ম্ম, শ্রী ও সম্পদ্, তাহা নশ্বর, অচিরস্থায়ী। যোগের ভিত্তিতে যে কর্ম্ম, তাহাই ভারতের চির আরাধ্য যজ্ঞ—যাহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা। এই যোগপ্রতিষ্ঠ জীবনের সংহতিই সঙ্ঘ। যেখানে যোগ নাই, সেখানে সঙ্ঘ নাই। আর সঙ্ঘ যদি গড়িয়া না উঠে, যে জাতির স্বপ্ন দেখিতে চাহি, তাহারও আবির্ভাব নাই। যোগবিহীন জীবনের ঘোষণা জাতিকে শ্রীও দিবে না, জয়ও দিবে না। ভারতের ভাগ্যে এই বিধানই যে পরম প্রসাদরূপে তাহার ললাটে সুলিখিত। ইহা ব্যতীত যে যত্ন ও অধ্যবসায়, তাহা এ জাতিকে কোন মতেই শ্রেয়ঃ দিবে না ; তাই আমাদের কর্ম্মবহুল জীবন পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়া যায়। যোগ নাই যেখানে, সেখানে যজ্ঞও নাই। তবুও যে কর্ম্ম, তাহা তুচ্ছ আত্মপূর্ত্তি। বিশাল মানবতার সেখানে ছোঁয়া নাই। যাহা ভূমা নহে, ভারতের তাহা অস্পৃশ্য।

ভারতের শ্রেয়ঃ-স্বাধীনতা ঈশ্বরবিধানে বাঙ্গালীর সাধ্য। এই অদৃষ্ট বহু তপস্যায় সে পাইয়াছে। সে এই স্বপ্নের দায়ে ডোর-কৌপীনে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। মাধুকরী মাগিয়া সে দিন গণিয়াছে। এই স্বপ্নের দায়েই সে গৈরিকের উত্তরীয় উড়াইয়া বাংলার বুকে বিশ্বমানবের তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। সেই স্বপ্নের আপনহারা কাঙ্গাল মূর্ত্তি ধরিয়া যুগের বাঙ্গালী নব নব তীর্থরচনায় সমুদ্বুদ্ধ। এখানে মন রাখিয়া চলা যায় না। এই যোগ ও সঙ্ঘ বিচারের বস্তু নহে। মন থাকিলেই বিচার ও বিতর্ক। মনের উপরে বিজ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্র বাঙ্গালীজাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ। যোগপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘাত্মাদের এই চেতনায় উন্নীত হইতে হইবে। মনের জগতে ক্ষয়-ক্ষতি-অপচয় বিঘ্ন-বিপদ্-প্রলয় সৃজন করে ; মানুষ এইখানে ধূলি খাইয়া মরে। মনের উপরে যে বিজ্ঞান, সেইখানে অনুকূল-প্রতিকূল, সম্পদ্-বিপদ সমতার চক্ষে অবধূত হয়। এইখানেই যোগী অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া নির্ম্মম হইতে পারে। এইখানেই নিরাসক্তির আগুনে নির্ম্মল হইয়া, পরস্পর মিলিত হইয়া তাহারা সঙ্ঘশক্তির বনিয়াদ রচনা করে। সে কত দীর্ঘ দিনের সাধনা, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই পথ। ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সংস্কৃতিরক্ষার এই পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই। গভীর আত্মবিশ্বাসী—আকাশের জল ব্যতীত চাতকের যেমন আর কিছুতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, সেইরূপ যাহাদের অন্য রুচি নাই—আগাইয়া আইস বাংলার যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ! জন্ম-জন্ম ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধির মায়াস্বপ্ন ছাড়িয়া সমষ্টিবদ্ধ হও। বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাংলার শতদল কমল জাতিচক্র নির্ম্মাণ কর। ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। ইহাতে আমি নিঃসংশয় হইয়াছি। বার বার বোধনের পূর্ব্বে রাক্ষস মঙ্গল-ঘট ভাঙ্গিয়া দেয়। বার বার ভারতের পূজা দিতে ঘট-নির্ম্মাণের প্রয়াস চলে। কত ব্যথা, কত অশ্রু! বেদনার রঙেই ভবিষ্য ভারত নবশ্রীমণ্ডিত হইবে। বাঙ্গালী, তুমি তার অগ্রণী হও।

গান

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমায় দিয়ে যাহার পূজা
কর্‌লে তুমি ও পূজারী,
সে পূজা তো আমার হ'ল
মিথ্যে বোঝা বইলে ভারী।
আমি তবে কাহার লাগি
দিবস রাতি আছি জাগি—
ল'য়ে দিনের দহন জ্বালা;
রাত্রে লয়ে শিশির বারি।

প্রেম যদি তোর থাকে প্রেমিক
শূন্য হাতেই হ'বে পূজা,
নইলে যে তোর মিথ্যা হ'বে
আমায় দিয়ে নয়ন বুজা।
ফোটার সাথে ঐ চরণে
বিলিয়ে দিছি তনু-মনে
আপন হাতে সেই রতনে
তোমায় কি গো দিতে পারি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ কাঙাল হরিনাথের স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরী থেকে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করেছেন! কাঙালের এই বিস্তৃত ডায়েরী আমাদের এক অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু সেই ডায়েরী আদ্যোপান্ত প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাহাতে নানা বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে। সেই কারণে কাঙালের অপূর্ব্ব ডায়েরী তাঁর পরলোকগমনের পর এই সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে'ই রয়েছে। আমরা কেউই সেই ডায়েরী আমূল প্রকাশের চেষ্টা করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না। সেই ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে, শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক স্থল বাদ দিয়া প্রকাশ করেছেন।

ঐ ডায়েরীর উদ্ধৃত অংশের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু'একজন বন্ধু 'গ্রামবার্ত্তার' শেষ ভার গ্রহণ করেছিলেন। সেই আরও দু'একজন বন্ধুর মধ্যে আমিও একজন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। "গ্রামবার্ত্তা"র যা কিছু কাজ, পূজনীয় প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয়ই করতেন। আমি প্রতি শনিবার রাত্রে গোয়ালন্দ মেলে কুমারখালিতে আসতাম, পরদিন রবিবারে পণ্ডিত মহাশয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। পণ্ডিত মহাশয় সম্পাদক পদ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হননি। তাই শেষের দু'বৎসর আমার নামই সম্পাদক হিসাবে ছিল। কাজ যা কিছু পণ্ডিত মহাশয়ই করতেন—এবং গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন বাড়ীতে থাকিতেন তখন তাঁর মূল্যবান্ সাহায্য পণ্ডিত মহাশয় পেতেন।

এইখানে আর একটী কথার উল্লেখ করে'ই "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা শেষ করব। আমি যখন "গ্রামবার্ত্তা"র তথাকথিত সম্পাদক, তখন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন এদেশ ত্যাগ করে' যান। তিনি দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কলিকাতায় ফিরে এসেই দেশে চলে যান।

যেদিন তিনি দার্জ্জিলিং থেকে কলিকাতায় যান, সেদিন আমরা একটা গান ছাপিয়ে নিয়ে সদল-বলে পোড়াদহ ষ্টেশনে যাই। লাট সাহেবের স্পেশাল ট্রেণ পোড়াদহে দু' মিনিট থামবার কথা—কিন্তু গাড়ী পৌঁছতে না পৌঁছতেই, আমরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সেই গান গাইতে আরম্ভ করি। স্পেশাল ট্রেণের সাহেবরা, হয়ত লাট সাহেব স্বয়ংও, গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে থাকেন। তাতে স্পেশাল ট্রেণ আরও তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা গানটী বাংলায় ছাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তার ইংরাজী অনুবাদও ছাপিয়েছিলাম। স্পেশাল ট্রেণের প্রত্যেক কামরায় সেই ইংরাজী-বাংলা-ছাপানো কাগজ আমরা ১৫।২০ খানা ফেলে দিয়েছিলাম। তার পরদিনই আমি কলিকাতায় গিয়ে একখানি আবেদনপত্রের সঙ্গে ছাপানো গান গেঁথে নিয়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়ে বড়লাট বাহাদুরের চীফ্ সেক্রেটারির নিকট পাঠাই।

কয়েকদিন পরেই প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে' আমাদের সেই পত্রের উত্তর দেন। নিম্নে সেই বাংলা গানটী উদ্ধৃত করে' দেবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পারলাম না।

"দেশে চলিলে মহামতি রিপণ!
রাম-রাজ্য-সম প্রজা করিয়ে পালন।

১। সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি)
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

২। আমরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে, এসেছি তব উদ্দেশে,
(হের কৃপানয়নে, সাধারণ দেশের দশা)
দেশের দশা প্রকাশ বেশে কর নিরীক্ষণ।

৩। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, দেখাতে নাহি ক্ষমতা,
(আমরা পল্লীবাসী হে), (জ্ঞান-অর্থহীন)
(ধর চক্ষের জল হে), (অন্য সম্বল নাই)
রাজভক্তি সরলতা ভারতবাসীর ধন।

৪। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে বল তখন
(কেবল নাম রয়েছে, সোণার ভারত)
(সকল হারায়েছে)
সোণার খনি নাই আর এখন ভারত-ভুবন!

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্ন বিনা প্রজা মরে,
(মায়ের কাছে বল এই, ভিক্টোরিয়া)
ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে নাশে প্রজাগণ।

৬। সহায়হীনা শুকরমণি, পরম সতীরমণী,
(তার কি দশা হল হায়!) (বল্‌তে হৃদয় ফাটে)
হারিয়ে সতীত্বমণি বধিল জীবন।

৭। আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর,
(কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান)
দেশে গিয়ে গুণাকর, করিবে স্মরণ।

৮। ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ,
(তাদের এ কি দশা হে) (মহারাণীর প্রজা হয়ে)
পশুহস্তে প্রজাবৃন্দ হারায় জীবন।

৯। রাজরাজেশ্বরী হয়ে, থাকুক মাতা ভিক্টোরিয়া,
(প্রার্থনা করি এই বিভুপদে)
এ অত্যাচার দয়া করে' করুন নিবারণ।

১০। তিনি তোমায় করুন রক্ষে, স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে,
(যিনি আত্মাতে আত্মাতে, এ চরাচরের)
কাঙ্গাল ফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন।

এই খানে ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউলের দলের একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করছি। (১৭—২৯ পৃষ্ঠা)

একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময়ে শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে (কুমারখালিতে) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি, এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুল-মাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তা প্রবেশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময়ে আমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, 'গ্রামবার্ত্তা'র কাপি লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত-পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান 'গ্রামবার্ত্তা'র অফিস অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান অক্ষয়কুমার, 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রিণ্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালি বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতেরা ব্যাকরণে বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য। সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কি করা যায়, ইহা লইয়াই তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে, তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে "একটা বাউলের দল করিলে হয় না!" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙ্গালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। লালন ফকির কুমারখালির অদূরবর্ত্তী কালীগঙ্গার তীরে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা বলা বড় কঠিন; কারণ তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্ম্মকথাও বলিতেন না। তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল, তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুটিতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল; ইহার মধ্যে কেহ স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই লালন ফকির কাঙ্গালের কুটীরে আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেইদিনই আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটী গান করিয়াছিলেন। সব কয়টী গান আমার মনে নাই; একটী গান মনে আছে, যথা—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে;
আমার ঘরের কাছে আরসী-নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে।

গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি,
তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারের ;
আমি মনে দেখ্‌ব তারি,
আমি কেমনে সেথা যাই রে !
বলব কি পড়সীর কথা তার,
হস্ত, পদ, স্কন্ধ কিছুই নাই রে ;
সে যে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক থাকে নীরে।
সেই পড়সী যদি আমার হ'ত
তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে ;
আবার, সেই আর লালন এক স্থানেই রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু আমরা সে গানের মর্ম্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে শ্রীমান্ অক্ষয়ের মনে হয়ত হঠাৎ সেই লালন ফকিরের গানের কথা উদিত হইয়াছিল। তাই সে বলিয়া বসিল "একটা বাউলের দল করিলে হয় না?" সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ!"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ ; কিন্তু গান কোথায়? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই। ক্বচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।" শ্রীমান্ অক্ষয় কুমার না পারেন, এমন কার্য্যই নাই। তখনও তিনি যেমন ছিলেন, এখনও তাই। বয়সের পরিণতিতে সে ভাবটা এখনও যায় নাই। তিনি যাহা ধরেন, তাহাই করিতে পারেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তার জন্য ভয় কি? ধর্‌ত জলদা, কাগজ্; বাউলের গানই লেখা যাক্!" আমি তখন কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম। 'গ্রামবার্ত্তা'র কাপি লিখিবার জন্য যে কাগজ গুছাইয়া বসিয়াছিলাম, তাহারই শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। অক্ষয়কুমার বলিলেন—

"ভাব মন দিবানিশি, অশিবনাশি,
সত্য পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর-ডাকাতে কোনমতে,
ছোঁবে না রে সোণাদানা॥
সেই পথে মনোসাধে চল্‌রে পাগল,
ছাড়, ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকাপথে দিনে রেতে,
চোর-ডাকাতে দেয় যাতনা ;
আবার রে ছয়টা চোরে ঘুরে ফিরে
লয়রে কেড়ে সব সাধনা॥"

এই পর্য্যন্ত লেখা হলেই অক্ষয় বলিলে "এতদূর তো হল, তার পর?" তারপর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কথাটি বুঝলে না! বাউলের গানের নিয়ম হচ্ছে এই যে গানের শেষে একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয় বলিলেন, "সেই কথাই ত ভাবছি!" তখন এক এক জন এক একটা নাম বলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনটাই 'ভোটে' টিকিল না। আমি বলিলাম, "অত লোকে কাজ কি! গানটি নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তর এবং ভণিতা ঠিক ক'রে নেবেন।" অক্ষয় বলিলেন "তা হবে না; তাঁকে একবার Surprise (অবাক) করতে হবে। রও না, আমিই একটা নূতন নাম ঠিক করেছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন "লেখ জলদা"। আমি কলম ধরলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা ধরিলেন

"ফিকির চাঁদ ফকির কয় তাই,
কি কর ভাই, মিছামিছি করি ভাবনা—
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে,—
এ যাতনা আর রবে না।"

বাস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন "ফিকির চাঁদ নামটি ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকির চাঁদ নামের ইহাই ইতিহাস। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন সপ্তগ্রাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"মহাশয়, বাগ্‌বৈদগ্ধে আমার পরিচয় লইলেন,—আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন।...যেই গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

সেই সপ্তগ্রাম কেমন ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়ই বলিতেছি:—

"সকলেই অবগত আছেন যে পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে নবদ্বীপ হইতে রোমন পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই—যে, তন্নগরে প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু নগরের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।"

ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়া আমি সর্ব্বপ্রথম সপ্তগ্রামের নাম শুনি। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার নায়ক নবকুমারের বাসস্থানের পরিচয় দিতে গিয়া সপ্তগ্রামের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কথা ও ইতিহাসের কথাও বলিয়াছিলেন। শৈশবে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আমার সেই সপ্তগ্রাম দেখিবার সুযোগ দুইবার মাত্র ঘটিয়াছিল। প্রথমবার সে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে দেখিয়াছিলাম; পরে বেশীদিন নয়, অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবার সপ্তগ্রাম দেখিয়াছিলাম।

সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম নামটি হইতেই বুঝিতে পারি যে, সাতটি গ্রাম লইয়া সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম শুধু বাঙ্গলারই নহে, ভারতবর্ষেরই একটি প্রাচীন নগর। তাহার নাম ও নাগরিক সমৃদ্ধি এখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সপ্তগ্রাম রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। রাঢ় বলিতে—এক সময়ে হুগলী নদীর মোহনা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়া জেলাকে বুঝাইত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সপ্তগ্রাম প্রাচীন গঙ্গরিডি জাতির ছিল রাজধানী। এই জাতি গঙ্গানদীর মোহনার চারিদিক বেড়িয়া বাস করিত। ৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্চনদ জয় করিয়া বিপাশা-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার শিবিরে 'প্রাসিই' এবং 'গণ্ডরিডয়' নামক দুইটী রাজ্যের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সেকেন্দারের ইতিবৃত্তলেখকগণ যে ভাবে এই দুইটি রাগের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে গণ্ডরিডয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। ইহার কিছুকাল পরে, গ্রীক্ দূত মেগাস্থানিস্ পাটলিপুত্র নগরে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র যে জনপদের রাজধানী ছিল, তাহাকে 'প্রাসিই' প্রাচ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণসম্বলিত মূল "ইণ্ডিকা" গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অবলম্বন। ডিওডোরাস্ মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, গঙ্গানদী গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গারিডইনিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকারের হস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কারণ অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা গঙ্গারিডইগণের অসংখ্য এবং দুর্জ্জয় রণ-হস্তীনিচয়কে ভয় করে! বাঙ্গালার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাহা এখন 'রাঢ়া' নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে এই প্রদেশ 'সুহ্ম' নামে পরিচিত ছিল। 'রাঢ়া' নাগরিও অচোরঙ্গ সূত্র' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন জৈনগ্রন্থে লাঢ়া বা রাঢ়াদেশ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

অষ্টম শতাব্দীর কিছু পরে যখন সরস্বতী নদীর প্রবাহধারার পরিবর্ত্তন ও উহা জলশূন্য হইতে লাগিল, তখন তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যসম্পদ্ হ্রাস পাইল, নাগরিক সমৃদ্ধি কমিল, দেখিতে দেখিতে তাম্রলিপ্ত তাহার গৌরব হারাইল। সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বা প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম প্রসিদ্ধ হইল, কেননা তখন নদীর মোহনার নিকটে বলিয়া জলপথে যাতায়াতের ও বাণিজ্যতরী আসিবার সুযোগ ছিল বলিয়া সাতটিগ্রাম সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম মুসলমান রাজত্বকালে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইল দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগীরথীর প্রধান স্রোতোধারা হুগলীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সপ্তগ্রামের গরিমা হইল লুপ্ত—তাম্রলিপ্ত গেল, সপ্তগ্রামও গেল; হুগলী ও কলিকাতা একটির পর একটি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়ে সরস্বতী মরা নদী। ভাগীরথী বা হুগলী নদী আদি গঙ্গার গতি ছাড়িয়া সাঁকরাইলের নীচে—সরস্বতীর প্রাচীন প্রবাহমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

বাঙ্গালা নদনদীর দেশ। নদ-নদীর গতিপরিবর্ত্তনের ফলে, কত প্রাচীন নগর ও পল্লীর যে ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রামের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তেমনি কৌশিনদীর গতি পরিবর্ত্তনের দরুণ নানা অস্বাস্থ্যকর জল, বন্যা ইত্যাদির ফলে গৌড়ের মত প্রসিদ্ধ নগরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। মোগলসম্রাট হুমায়ুন, আকবর ও সেরশাহের সময়ে যে গৌড় নগরী ছিল লক্ষ লক্ষ লোকের বসতিস্থল, তাহার পরিণাম কি হইয়াছে তাহা আমরা বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

হিন্দু রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড় বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তগ্রামের প্রাধান্য ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

সাতগাঁ ছিল একবারে রাজকীয় বন্দর বা Royal Port of Bengal নামে পরিচিত ছিল। পর্ত্তুগীজেরা সপ্তগ্রামের নাম দিয়াছিলেন—Porto Piquene কিন্তু সরস্বতী নদীরভরণ আরম্ভ হইল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে, সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে সরস্বতীর সলিলপ্রবাহ সপ্তগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইত। কোন্ পথে সমুদ্রে মিলিত হইত, বলা সহজ নয়—কেহ কেহ বলেন:—গঙ্গার স্রোতোধারা সপ্তগ্রাম হইয়া আন্দুলের নিকট গিয়া বহির্গত হইত। আবার অন্যমত এই যে, পূর্ব্বকালে সরস্বতীর একটি শাখা আমতার নিকট দামোদরের সহিত মিলিত হয় এবং প্রধান স্রোতটি বোটানিকেল উদ্যানের নিম্ন ভাগে সাঁখরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়।

সরস্বতী নদী এক সময়ে যেমন ছিল বিশালকায়া তেমনি ছিল পরাক্রমশালিনী; এখন উহার পরিণতি হইয়াছে শীর্ণকায়া খালের আকারে। এখন ভাগীরথী-স্রোতঃ হুগলী প্রভৃতি হইয়া প্রবাহিত। আর পূর্ব্বে সরস্বতী নদী সপ্তগ্রাম বিধৌত করিয়া আদমপুর, আমতা, আন্দুল এবং তমোলুক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ভীষণ বেগে বহিয়া যাইত—এইজন্যই সেকালের ইউরোপীয় লেখকেরা সরস্বতী নদীকে সাতগাঁ রিভার বা সাতগাঁয়ের নদী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সীজার ফ্রেডারিক (Ceasar Frederick) সাতগাঁ আসেন! তিনি লিখিয়াছেন:— "আমি উড়িষ্যা থেকে বাঙ্গলায় আসি। সপ্তগ্রাম পূর্ব্ব দিকে ১৭০ মাইল দূর। সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া আমাদের তরী গিয়াছিল। সমুদ্রের মুখ হইতে সাতগাঁ ৫৪ মাইল দূর। সাতগাঁ বন্দরে নানা দেশের বণিকেরা বাণিজ্য করেন। জোয়ারের সময়ে ১৮ ঘণ্টা বাহিয়া সাতগাঁ পৌছিলাম। বন্দরে প্রতি বৎসর ছোট-বড় প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা জাহাজ যাতায়াত করে। চিনি, চাল, লঙ্কা, তেল, কাপড় এই সব নানা জিনিষ-পত্রাদি আমদানী ও রপ্তানী হয়।" ফ্রেডারিক বলেন: "সাতগাঁ সহরটি বেশ বৃহৎ ও সুন্দর। মূরেরা অর্থাৎ মুসলমানদের অধীনস্থ সহরের মধ্যে সাতগাঁ বেশ একটি সুন্দর সহর এবং সব জিনিবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাটনার রাজা এদেশ শাসন করেন। প্রকৃতপক্ষে মোগল অধীন। আমি প্রায় চারি মাসকাল সাতগাঁ ছিলাম।"

বিখ্যাত ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচ্ লিখিয়াছেন: "আমি

আগ্রা হইতে বাঙ্গালা দেশের সাতগাঁ যাই। আমার সঙ্গে ১০০ খানা মালবোঝাই নৌকা ছিল। সে সব নৌকাতে ছিল লবণ, আফিং, হিং, সীসা, কার্পেট ইত্যাদি। আমরা যমুনা নদী বাহিয়া চলিলাম। সাতগাঁ সহরে হিন্দু এবং মুরেরাই ছিল প্রধান ব্যবসায়ী। আমি সেখান হইতে হুগলী আসিলাম। হুগলী তখন পর্ত্তুগীজদের দখলে ছিল। সাতগাঁ হইতে হুগলীর দূরত্ব মাত্র এক লীগ: পর্ত্তুগীজেরা সাতগাঁর নাম দিয়াছে Porto Piqueno."

রেভারেণ্ড জে, লং সাহেবের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের Calcutta Review পত্রে "The Banks of the Bhagirathi' নামক প্রবন্ধে Dr. Barrowএর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্যারো বলেন—"Satgaw is a great and noble city, though less frequenuted than Chittagons, on account of the Port not benig so convenient for the entrance and departure of ships" অর্থাৎ সাত গাঁ বেশ বড় ও সম্পদশালী নগরী হইলেও, বাণিজ্যতরীর যাতায়াতের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নহে। এজন্য চট্টগ্রাম অপেক্ষা অল্প সংখ্যক বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিলেও, সাত গাঁ একটি বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ নগরী।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী মোগলসম্রাট্ সাহজাহানের অধিকারে আসিল। বাঙ্গলার সুবাদার কাসিম খাঁর ভীষণ আক্রমণে বহু সহস্র পর্টুগীজ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। প্রায় চারি পাঁচ হাজার পর্টুগীজ বন্দী হয়ে আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল। পর্টুগীজেরা আনুমানিক ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা বাণিজ্য-সম্পর্কিত যে অধিকার ও সুযোগ লাভ করিয়াছিল, যদি তাহা অনুসরণ করিয়া সাধুতার সহিত বাণিজ্য করিত, তাহা হইলে তাহারা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ এবং প্রভাবশালী হইতে পারিত; কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পর্টুগীজ বণিক্‌গণের অত্যাচারে দেশবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সাহজাহান এই অত্যাচারী নৃশংসপ্রকৃতির দস্যুদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্যই সুবাদার কাশিম খাঁর উপর পর্টুগীজদের দমন করিবার ভার দিয়াছিলেন।

হুগলী মোগলসম্রাট্ শাহজাহানের অধিকারে আসিলে পর, রাজকীয় বন্দরে পরিণত হইল এবং সমুদয় রাজকীয় কাছারী, আদালত প্রভৃতি সাতগাঁ হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হইল। রাজশক্তি বিরূপ, নদী বিরূপ, কাজেই সাতগাঁ ক্রমশঃ পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

লঙ্গ সাহেব ওয়ারউইক্ (Warwick) নামে একজন ওলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষের (Dutch admiral) লেখা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়াও ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও পর্টুগীজদের সাতগাঁ ছিল একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র।

সরস্বতী নদী এক সময়ে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া কথিত আছে—সে কোন্ সত্য যুগে, সে কথা বলা কঠিন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গালায় সুবাদার বা শাসনকর্ত্তা, সে সময়ে তিনি আফগানের বিরুদ্ধে এক অভিযানকালে বর্ষাকাল বলিয়া জাহানাবাদে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। জাহানাবাদ বর্ত্তমান আরামবাগ। ১৫৯২ সালে আফগানেরা সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া নগরবাসীদিগকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তৎকালে উড়িষ্যার সীমা মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানে হওয়ার সম্ভাবনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক সমৃদ্ধিশালী ওলন্দাজ বণিকের সাতগাঁতে বাগান বাড়ী ছিল। তাঁহারা চুচুড়া হইতে ছয় মাইল হাঁটিয়া সে সব বাগানবাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সাতগাঁয় কাগজ প্রস্তুত হইত এবং সে কাগজ ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে সময়ে সাতগাঁর রাজপথ সকল বনেজঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্কিমের ভাষায় বলিতে পারি:—"সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্য সমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল।" আর তখন বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা নির্ভয়ে সেই রাজপথ দিয়া বিচরণ করিত।" কর্ণেল ক্রফোর্ড বলেন:—"The last report of a tiger being seen here was in 1830."

(আগামীবারে সমাপ্য)

অন্তরায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৭

রোগশয্যায় থাকিতে ইহাই ছিল গীতার প্রধান উৎকণ্ঠার কারণ যে, তাহার পরিদর্শনের অভাবে তাহাদের পৌরোহিত্য ব্যবসায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। রোগশয্যায় থাকিয়াও পৌরোহিত্যের কথা সে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু আরোগ্য-লাভের পর সে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল যে, ইতিমধ্যে তাহাদের কোন ক্ষতি তো হয়ই নাই, বরং রসিক ভট্টাচার্য্য সকল দিক্ দিয়াই ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছে।

রসিক ভট্টাচার্য্য গীতার নিকট হইতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইত। কিন্তু পাঁচ টাকার লোভেই সে চাকুরী গ্রহণ করে নাই। দেবকুমারের পিতার পসারের উপর বসিয়া সে উপরি আয় করিবে, ইহাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। সে ইহা খুব ভাল করিয়াই জানিত; কেবল পৌরোহিত্যের আয় কখনই খুব বেশী হইতে পারে না। যদি ইহার সহিত হাত-দেখা, তাবিজ, কবজ, জলপড়া, দৈব্য ঔষধ ও ঝাড়ফুঁক চালান যায়, তবে অন্য অনেক ব্যবসায়ের মত পৌরোহিত্যেও বেশ দু' পয়সা আয় হইতে পারে। গীতাকে সে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিল, এই সকল আয়ের সবটাই সে চায় না। তাহারা অর্দ্ধেক নিয়া বাকী অর্দ্ধেক যদি তাহাকে দেয়, তাহা হইলেই সে খুশী হইবে।

রসিককে অল্প কিছুদিন দেখিয়াই গীতা বুঝিয়াছিল, আয়ের অর্দ্ধাংশ দেওয়ার কথাটা রসিকের ভদ্রতা মাত্র। কোনরূপ একটা অনুমতি নেওয়াই রসিকের উদ্দেশ্য। তথাপি গীতা আপত্তি করিতে পারে নাই। সে অনুভব করিল—এই সকল ব্যবসায়ের সহিত পৌরোহিত্য ব্যবসায়ের যেন একটা ছন্দোগত ঐক্য আছে। সে ভাবিল, এই সকল বিষয়ের আলোচনা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে; রসিক যদি ইহা লইয়া আলোচনা করিতে চায় তো ক্ষতি কি?

রসিকের অনুক্ষণ প্রচারের ফলে, তাহার এই ব্যবসায় দ্রুত জমিয়া উঠিতেছিল।

বহুরোগ আছে, প্রকৃতিই আরোগ করে। এই সকল রোগ রসিকের জলপড়ায় আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হয় এবং একটি রোগী আরোগ্য হইলে, আরোগ্যের গল্প সে এক শত লোকের কাছে বলিয়া থাকে! এক গ্লাস জলপড়া নিতে রসিককে দুই আনা দিতে হয়। অনেকেই অসুখ-বিসুখে সামান্য দুই আনার পয়সা খরচ করিতে কুণ্ঠিতও হয় না। অনেক সময়ে ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করাইলেও, লোকে জলপড়া একটা লইয়া যায়।

জলপড়া সাধারণতঃ দেওয়া হয় তরুণ রোগে। পুরাতন ব্যাধির জন্য রসিক তাবিজ দেয়। এমন কোন রোগ নাই, যার তাবিজ সে না জানে। রোগীর আর্থিক অবস্থানুসারে তাবিজের মূল্য হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সে তাবিজের মূল্যগ্রহণও করে না। অন্য ভাবে সে পোষাইয়া লয়। এই সব ব্যাপারে কখনই কোন গোলযোগ হয় না। পুরোহিতের সহিত গোলমাল করিতে আসিবেই বা কে? তথাপি একদিন একটা গোলমাল হইল।

একটি গৃহস্থের স্ত্রী বহুদিন হইতে পিত্ত-পাথুরী রোগে ভুগিতেছিলেন। রসিক গৃহস্থটিকে বলিল যে, সে পিত্ত-পাথুরীর অব্যর্থ তাবিজ জানে। কৃষ্ণপক্ষের পুষ্যা নক্ষত্রে রাত্রিতে তৃতীয় প্রহরে উঠিয়া একটা গাছের শিকড় তুলিয়া তাহাকে তাবিজ দিতে হইবে। তাবিজের জন্য সে কিছু চায় না। কিন্তু এই উপলক্ষে তাহাকে স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে এবং তাহার জন্য সোয়া পাঁচ টাকা তাহার লাগিবে।

লোকটি স্ত্রীর অসুখের জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়াছে। এখন কিছুতেই তাহার আর বিশ্বাস নাই। তথাপি শেষ চেষ্টা হিসাবে পাঁচ টাকা দিয়া, রসিকের নির্দ্দিষ্ট তারিখে আসিয়া তাবিজ লইয়া গেল।

ইহার মাসখানেক পর একদিন দেবকুমার কারখানা হইতে ফিরিয়া দেখিল, তাহাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে একটা গণ্ডগোল হইবার উপক্রম হইয়াছে। কয়েক জন লোক জমা হইয়াছে এবং রসিকের সহিত তাহাদের বচসা চলিতেছে। দেবকুমার ইহাদিগকে চিনিল। ইহারাই রসিকের নিকট হইতে তাবিজ লইয়া গিয়াছিল। সে সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার?

যে-লোকটি তাবিজ লইয়া গিয়াছিল, সেই কলহের কারণ জানাইল। সে দিন রসিক বলিয়াছিল যে, তাহার তাবিজ অব্যর্থ। কিন্তু এক মাস পরেই রোগ ফিরিয়া আসে। তখন তাবিজ খুলিয়া দেখা যায়, তাবিজের ভিতর কোন শিকড় নাই। এক টুকরা কাগজ মাত্র রহিয়াছে। সুতরাং যখন কাজ হয় নাই, তখন তাহাকে তাহার টাকা ফেরত দিতে হইবে।

গীতা তখন কি একটা কাজে দেবকুমারের মায়ের কাছে আসিয়াছে। সে এতক্ষণ ঘরে থকিয়াই তাহাদের আলোচনা শুনিতেছিল। এখন দেবকুমারকে দেখিয়া তাহার একটা ভয় হইল। দেবকুমার যদি হঠাৎ একটা বিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, এই ভয়ে দেবকুমার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গীতা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল। গীতা আসিতেই গোলমালটা বন্ধ হইয়া গেল। গীতা সম্মুখে আসিয়া আগন্তুকদের কহিল, আচ্ছা কবচ নেওয়ার পর রোগিণী এক মাস ভাল ছিলেন?

গৃহস্থটি বলিল, মিছে কথা বলব কেন? তা' ছিলেন।

তবে হঠাৎ রোগ ফিরে আসার কারণ কি হ'ল?

উনি খাঁটি জিনিষ দেননি, না হয় স্বস্ত্যয়ন করেন নি, তাই ফিরে এসেছে।

না, তা' নয়। আমি জানি একজন মহিলা হিষ্টিরিয়ার জন্য কোথা থেকে তাবিজ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কোন রকম অনাচার করা নিষেধ ছিল। খুব সাবধানে থেকে দুই বৎসর তিনি ভাল রইলেন। তারপর একদিন কার পাতের এঁটো তুলে ঘাটে যাচ্ছেন, অমনি হাত থেকে মাদুলী ছুটে কোথায় চলে' গেল! উনিও আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

রসিক এইবার কহিল, আমিও কতগুলি বিধি-নিষেধের কথা বলেছিলাম। সেগুলি পালন করা দূরের কথা, আমাকে বলতে পারলে না, কি কি নিষেধের কথা বলেছিলাম। আমার শিকড় তাবিজ থেকে ছুটে চলে' গেছে।

তখন গীতা রায় দিয়া কহিল, তবে আর তুমি রাগ করছ কেন বাছা! তোমাদের নিজেদের যখন ত্রুটি রয়েছে, তখন তুমি আর টাকা ফেরত পেতে পার না, বরং ইচ্ছে হয় টাকা দিয়ে নূতন আর একটা তাবিজ নিতে পার।

গীতার এই অকাট্য যুক্তি এবং এই অমোঘ রায়ের পর তাহাদের আর নূতন করিয়া কিছু বলিবার রহিল না। তাহারা নিজেদের মধ্যে অল্প কতক্ষণের জন্য পরামর্শ করিয়া পুনরায় তাবিজ নেওয়ারই সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু রসিক বলিয়া বসিল, আমি আর এদের তাবিজ দেব না। যারা শ্রদ্ধাহীন, এ দৈব জিনিষের তারা অধিকারী নয়।

যাহাদের টাকা দিবার কথা, তাহাদের পুনরায় টাকাগুলি ফেলিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। এইবার তাহারাও রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে দেবকুমার কহিল, আচ্ছা, আপনি ফিরে টাকা নিলেন না কেন?

কেন নিলাম না, তা' তো শুনলেন!

কিন্তু আসল কথা কি এই নয় যে, আপনি একটা লোককেই বার বার ঠকাতে চান না? এ-দুনিয়াটা এত বড় যে, একজন লোক যদি কেবল ঠকিয়েই খেতে চায়, তবুও একজনকে দু'বার না ঠকিয়েই বেশ চলে যেতে পারে—বলিয়া দেবকুমার হাসিতে লাগিল।

রসিক কহিল, আপনার বিশ্বাস নেই, তাই আপনি এই কথা বলছেন। রোগ আরোগ্য হওয়া কি, জানেন একটা তাবিজে অনেক সময়ে অদৃষ্ট ফিরে যায়।

পরেরটা ফেরে না। নিজেরটা বরং ফিরতে পারে। এক পয়সার মাদুলি যদি পাঁচটাকা দশটাকায় বিকায়, তবে অদৃষ্ট ফিরতে কতদিন লাগে?

গীতা এইবার কথা কহিল, যে-সম্বন্ধে তোমার ধারণা নেই, সে-সম্বন্ধে তোমার মত প্রকাশ না করাই ভাল।

ধারণা নেই মানে?

তুমি জানো না, এ-তাবিজের ভিতর কি ছিল। তবুও একটা মত দিচ্ছ! এ রকম মত-প্রকাশে অপরাধ হয়।

দেবকুমার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, এক জনের রুগ্ন অবস্থার সুবিধা নিয়ে, তাকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে' তাবিজ, কবচ, শান্তি, স্বস্ত্যয়নের ভাঁওতা দিলে অনেক বেশী অপরাধ হয়।

তাবিজ, কবচ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন যে বৈজ্ঞানিক নয়, তা' তুমি কেমন করে' জানলে?

এ যা' করেছে, তা তো নিছক জুয়াচুরি। আমি শপথ করে' বলতে পারি, এ-মাদুলির ভিতর কাগজ ছাড়া আর কিছুই দেয় নি; স্বস্ত্যয়নও করেছে কিনা, সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ আছে। যদি ঠিক-ঠিক সব হ'তও, তবু তুমি কি কখনও প্রমাণ করতে পারতে, পিত্ত-পাথুরী রোগটা রসিক ভট্টাচার্য্যের তাবিজেই ভাল হয়ে গেছে বা যেত?

জান 'ফেইথ কিওর' বলে একটা চিকিৎসা আছে। একজনের ঠিক-ঠিক যদি বিশ্বাস থাকে যে, তাবিজে রোগ সেরে যাবে, তবে তার রোগ সারে। ঔষধের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি সারে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, সাপে কামড়ালে যদি কেউ জোর করে' বলে বিষ নেই, তবে বিষ কেটে যায়। বিশ্বাস একটা প্রকাণ্ড জিনিষ। ভুল বিশ্বাস থেকে অনেক রকম রোগ হ'তে পারে, আবার সুস্থ বিশ্বাস থেকে রোগ আরোগ্যও হ'তে পারে। তাবিজ, কবজ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন সূক্ষ্ম দেহের উপর কাজ করে' এই ভাবেই রোগ সারায়।

তার অর্থ—বিশ্বাস উৎপন্ন করাই বড় কথা। আর সব ভাঁওতা। সরল লোকদের ঠকিয়ে অর্থোপার্জ্জনের একটা সহজ উপায় বটে!

ভাঁওতা হবে কেন? যারা এই সব লিখে গেছেন, তুমি কি মনে কর, তারা কোন গবেষণা না করে'ই লিখেছেন! আমাদের ঋষিরা বি-এ পাস করেন নি বলে' তাঁরা মূর্খ ছিলেন, এই তোমার ধারণা?

সংস্কৃত ভাষায় যা' লেখা আছে, তাই আমাদের ঋষিদের লেখা, ঋষিদের এতটা অপমান করতে আমি অক্ষম। দ্রব্যগুণ আছে, তা' প্রমাণ কর, তবে বুঝব, এ-সব ঋষিদের ব্যবস্থা।

এ-সব সম্বন্ধে গবেষণা করার উপযুক্ত লোক ছিলে তুমি। তা' করলে না। এখন অপরে যারা জিনিষটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাদের তুমি ধিক্কার দেবে। ভারতে কত অমূল্য জিনিষ ছিল, তা' সব নষ্ট হয়ে গেছে অনুশীলনের অভাবে। যারা নিজেরা কিছু করে না এবং অপরকেও বাধা দেয়, তারা কেন তা' করে, আমরা তা জানি।

কেন করে?

করে হিংসায়। ভেবেছিলে—আমরা কিছু করতে পারব না। এখন দেখছ, তোমার জন্য তো কাজ বন্ধ হয়ে নেই। তাই তোমার অসহ্য হয়েছে।

দেবকুমার সে-দিন কারখানা হইতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ওকে আমি ক্ষমা করি, কারণ ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ওর নেই। কিন্তু যে জেনে শুনে ভুল সমর্থন করে এবং নিজের স্বার্থের জন্য পরের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে চায় না, তার চেয়ে হীন নীচ আর নেই।

গীতা ক্ষোভের কণ্ঠে কহিল, আমি হীন! আমি নীচ! তুমি কি, আমি তা' বলতে চাইনে। পৃথিবীতে এমন কোন হীন কাজ নেই, টাকার জন্য যা' তুমি না করতে পার।

গীতা ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবকুমারের মা এতক্ষণ ঘরে থাকিয়া ভাবিতেছিলেন, সাধারণ কথাবার্ত্তা হইতেছে বুঝি। এবার গীতাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, কি রে দেবকুমার, তুই ওকে গাল-মন্দ দিলি কেন? তোর কি অধিকার আছে ওকে গাল দেবার? তুই সংসার ডুবিয়ে দিয়েছিলি, ও তা' ভাসিয়ে তুলেছে। তুই ওকে গাল দিতে আসিস, তোর লজ্জা করে না? পাজী হতভাগা, আর কখনও ওকে তুই কিছু বলবি! চল মা, তুমি আমার কাছে এস, বলিয়া গীতাকে নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

কিন্তু গীতা নিজকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না জেঠাই-মা, আমি এখন বাড়ী যাই।

(ক্রমশঃ)

কুক্ষণের যাত্রী

জগদীশ গুপ্ত

বক্তা আশুতোষবাবু—আশুতোষ নাগ ;
শ্রোতা জ্ঞানাঙ্কুর সেন, কবি, মহাভাগ।
জ্ঞানাঙ্কুর কবি নহে চাহনি ও চুলে—
উড়ুউড়ু মনে, আর, কাণ্ডজ্ঞান ভুলে' ;
আসন পাতিয়া ক্ষেত্রে বসে' গেছে চেপে'···
বিরাটেরে দেয় অর্ঘ্য, কখনো সংক্ষেপে,
কখনো বিস্তৃত গদ্যে মার্জ্জিত ভাষায়—
কখনো প্রাঞ্জল করি', যা' বোঝে 'চাষায়'।
কবির কর্ত্তব্যে জ্ঞান খুব সচেতন,
সনাতন প্রাণশক্তি করে আহ্বান—
যেই শক্তি যুগে যুগে ভেঙেছে শৃঙ্খল ;
সত্য, শিব, সুন্দরের ধ্বজা সমুজ্জ্বল
বহন করিছে যেই অধীর যৌবন—
যার লক্ষ্য চিরকাল সত্য উদ্‌ঘাটন,
আমন্ত্রিয়া সে-যৌবনে করিয়া জাগ্রত
জ্ঞানাঙ্কুর পালিতেছে সাহিত্যিক ব্রত।
খণ্ডিত, জীবনে রস যদিও বিস্তর,
তথাপি তা' অসম্পূর্ণ স্বল্প ও নশ্বর।
বৃহত্তর পটভূমি করি' অধিকার
চেয়েছে সে সর্ব্বলোকে আত্মার প্রসার—
নব-নব প্রাণময় রহস্য-সন্ধান,
দুকূলপ্লাবিনী ধারা জয়-অভিযান ;
কল্পনালোকের রূপ অপরূপ হ'য়ে
উত্থিত প্রকাশমান সহজ নির্ভয়ে।
সমগ্র দেশ ও যুগ, মানব, কল্যাণ,
জাতীয় জীবন তার লক্ষ্য আর ধ্যান ;
মিলন—আনন্দধ্বনি বাজা'য়ে সে চলে···
এ দেশ জাগিছে তার প্রচেষ্টার ফলে ;
'অঙ্কুর-সাহিত্য' বলি' স্বতন্ত্র আখ্যায়
অতুল সাহিত্য-জ্ঞান সৃষ্টি' করে' যায়···
গর্ব্ব নাই সে কারণে—সাদাসিদে লোক,
সহজে বিশ্বাস করে মানুষের স্তোক।

যা' হোক্, এখন বক্তা আশুতোষ নাগ—
শ্রোতা কবি-সাহিত্যিক জ্ঞান মহাভাগ।
চেয়ার পাতিয়া সুখে উভয়ে আসীন—
কহিতেছে আশু : "নহি দৈবের অধীন।
আগ্রহ, নিগ্রহ আর বিগ্রহ, কুগ্রহ
এই চারি গ্রহ মম চিন্তা অহরহ।
কাজেতে আগ্রহ, মানে, চেষ্টা অবিশ্রাম
থাকে বলে' পূর্ণ হয় সর্ব্ব মনস্কাম ;
নিগ্রহ অনেক আসে, বচসা, ভর্ৎসন—
শুনে' যাই কাণে শুধু, ভাঙে নাকো মন ;
সে-গুলোকে মনে করি অঙ্গ ব্যবসার,
যেমন শরীরে রোগ—আসে বারবার !
মাড়োয়ারী মহাজন, ভাটিয়া দালাল
খেতে চায় বাঙ্গালীর ইহ-পরকাল ;
মুখে কয় কটু কথা, কষে' দেয় ফাঁকি—
আমিও কঠিন বান্দা, পিছু লেগে' থাকি ;
না দিয়ে পারে না টাকা ; হো'ক ধড়িবাজ,
হাতে পায়ে ধরে' আমি বাগাবোই কাজ।
বিগ্রহের কথা এই : আছেন গৃহেতে—
বসায়েছি রাধানাথে সিংহাসন পেতে' ;
স্নানান্তে প্রণাম করি বসি' কুশাসনে—
চাই তাঁর অনুগ্রহ সর্ব্বান্তঃকরণে।
ভাগ্যের কুগ্রহ কারা শোন' যদি তবে,
রোমাঞ্চিত কলেবরে হতবাক্ হবে।
কুগ্রহ ঘটাতে পটু দেশী লোকেরাই—
না-দিবার অছিলাই বদনে সদাই।
ঢের-ঢের দেখা গেছে ধূর্ত্ত নীচাশয়—
ভোগা দিয়ে টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়,
কেহ যায় বেহালায়, কেহ জয়পুর···
ঠকাবেই ঠকে যত হই না চতুর।
আমি ত' দেবতা বলি বিলিতী সাহেবে—
প্রাপ্য যা' তা' বিনাবাক্যে 'পাই' 'পেনি' দেবে।

একটা হাসির কথা শোন, ভাই, বলি :
অনেকে জানিতে চায়, ভারি কুতূহলী,
জমায়েছি কত টাকা, লাখ হ'ল কিনা!
কি হবে তা' জেনে'! আমি তাহাই বুঝি না।
বায়ান্ন হাজার টাকা পেলাম দালালি
ও বছর চটকলে পাট বেচে খালি ···
দর নিয়ে কষাকষি দরের বেলায়—
তারপর সাহেবেরা আর না জ্বালায়—
দিশীর ঝঞ্ঝাট ঢের—কচালে' স্বভাবে,
বাহানায়, গা-ঢাকায় কেবলি জ্বালা'বে।
সত্যই 'হোরেস্' নাম প্রাতঃস্মরণীয়—
কাটে না 'বিলের' টাকা একটি "আনি-ও"।
এতগুলি কথা আশু কহি' অল্পক্ষণে
নিঃশব্দে রহিল চাহি প্রদীপ্ত আননে···

কবির সহজ চিত্ত শুভাকাঙ্ক্ষাময়—
মানুষের আনন্দ সে সদর্থেই লয়।
আনন্দ দুর্লভ বস্তু; যে যেমনে পারে
করুক না আনন্দ এ কঠিন সংসারে।
একটু বিকৃতি ফাঁকি না করিলে ক্ষমা
ঘোলা হ'য়ে থাকে মন, দুঃখ হয় জমা।
কিন্তু কবি-সাহিত্যিক স্বষ্টু জ্ঞানাঙ্কুর
সুখ দিতে আসে নাই হেঁটে' এত দূর—
কথা ছিল; আশুতোষ থামিতেই জ্ঞান
সুরু করে' দিল তার নিজের আখ্যান :
"আমার একটি কথা শোন, আশুতোষ—
জানি না কথাটা বলা হ'ল কি না দোষ!
তোমার ভাড়ার বাড়ী খালি হ'য়ে আছে—
যদিও দক্ষিণ বন্ধ বড়-বড় গাছে;
ভাড়া নিতে চাই আমি, তবে কি না, ভাই,
বেশী ভাড়া দিতে পারি, হেন সাধ্য নাই।
শুনিয়াছি, বাড়ীটার ভাড়া দশ টাকা—
আটটি টাকায় দিলে হ'তে পারে থাকা।
কি বল হে? আমরা ত বাল্যবন্ধু দু'টি—
রাজী হ'লে আটে আমি কাল(ই) এসে উঠি।"

গম্ভীর হইল আশু, স্তিমিত নয়ন—
কহিল : "কথাটা নয় মনের মতন।
রাজী হ'লে এ প্রস্তাবে, বছরে আমার
করা হয় চব্বিশটি টাকার সৎকার;
পারিলে তা', গেরস্তালি ও-ভাবে করি না—
দিয়ে থাকি, নিয়ে থাকি উচিত দক্ষিণা।
কত বার সাহেবেরা বলিয়াছে ডেকে' :
বাঙ্গালীরা মুক্ত নয় চক্ষুলজ্জা থেকে—
অনেক অনেক টাকা গচ্চা দিতে হয়;
মনে রেখো উপদেশ, নাগ মহাশয়।
টাকা নাই যথোচিত, এই ত' নালিশ!
না-থাকাটা অনেকেরি জীবনের বিষ।
তুমি নাকি সাহিত্যিক! কিন্তু উহু সাজে—
চটপট্ লেগে' যাও দালালির কাজে;
ভিড়ে যাও পাকা কোন দালালের সাথে—
ভাল বাড়ী ভাড়া নিয়ে ঘৃত খাবে ভাতে।
অত্যল্পের উমেদারি তোমার কি সাজে!
টাকা কর, স্থান পাবে সম্ভ্রান্ত সমাজে···
উঠিলে যে"?—জ্ঞানাঙ্কুর কহিল হাসিয়া :
"কি হবে বাড়ীর স্থানে উপদেশ নিয়া?"

ভাবি মনে মনে

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

ভরে না তৃষিত বক্ষ, হায় মরিচীকা,
ললাটের স্বেদবিন্দু অশ্রুতে মিলায়;
ক্লান্ত পদ ছন্দহারা, অর্থহীন গতি,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মোর উষ্ণ সাহারায়।
জীবনে আসিবে নাকি স্নিগ্ধ মেঘমালা,
নয়নে অশ্রুর মত কভু শুভক্ষণে;
রিক্ত পথিকের লাগি আঁখি-দীপজ্বালা,
কোন্ বাতায়নে, তাই ভাবি মনে মনে॥

"সাম্যবাদী" বনাম "সাম্যসাম'

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

'সাম্যবাদী' কাজি নজরুল ইসলামের সাম্যবাদমূলক কবিতার সমষ্টি; 'সাম্যসাম' কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাম্যমূলক কবিতা। প্রথমটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হওয়ায়, অনেকেই ইহার সহিত পরিচিত; শেষোক্তটি কবির 'হোমশিখা' নামক পুস্তকের শেষ কবিতা এবং এই পুস্তকখানিও বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া অনেকেরই ইহার সহিত পরিচয় নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই দুইটি সাম্যবাদমূলক কবিতার আলোচনা করিতেছি।

গোড়াতেই বলা প্রয়োজন যে, ৺সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' পুস্তকের কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের একটা অচ্ছেদ্য ধারা রহিয়াছে এবং পুস্তকের শেষের এই 'সাম্যসাম' কবিতাটিতে কবি যে সাম্যের পরিকল্পন করিয়াছেন, সেই সাম্যভাবের একটা ক্রমপরিণতি এই সকল কবিতার ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য এই আলোচনাপ্রসঙ্গে অন্যান্য কবিতাগুলিও একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সাম্য পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং সেইজন্যই জ্ঞানের দেবতা সবিতার বন্দনা করিয়া জ্ঞানপথে বিশ্বের সমস্যাসমূহ-সমাধানের চেষ্টায় যাত্রা সুরু করিয়াছেন। কবি এই পুস্তকের ভিতর দিয়া একটা নূতন জগতের গোড়াপত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আত্মিক মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করিয়াছেন। এই অংশে মানুষকে আত্মোপলব্ধির ধারণায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি 'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্র দিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন এবং জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া মহাসাম্যের দিকে চলিয়াছেন। এই পুস্তক পড়িলে দেখিতে পাই, কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথের সাম্য আত্মিক মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমপ্রাণতার দাবীতে ইহার গোড়াপত্তন এবং বিশ্বমানবতার পরিকল্পনায় ইহার পরিণতি।

কাজি সাহেব ঠিক এইভাবে সাম্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই; সেইজন্য দুইজনের সাম্যবাদ আপাত দৃষ্টিতে একই বিষয় হইলেও, ভাবের একরূপ উৎস হইতে প্রবাহিত হয় নাই। কাজি সাহেবের সাম্যবাদ অনেকটা কমিউনিষ্টিক, অনেকটা রাজনৈতিক বলিয়াই মনে হয়। বৈষম্যমূলক অবস্থা অবহিত করাইয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার দিক্‌টাই তাঁহার মধ্যে বেশী পরিস্ফুট—সাম্যপ্রতিষ্ঠার কোন পন্থানির্দ্দেশের প্রতি কোনরূপ গভীরতর ইঙ্গিত নাই বলিলেই চলে। মানুষের কল্যাণের প্রকৃত পথ কি, বিশ্বের সমস্যাসকলের সমাধান কোনপথে পাওয়া যাইবে, তাহার কোন আলোচনা কাজি সাহেবের মধ্যে নাই। কি কারণে, কি ভাবে মানুষের প্রাণে সাম্যের বাণী বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা ৺সত্যেন দত্তের ন্যায় কাজি সাহেব বিবেচনা করেন নাই। তিনি বস্তুতান্ত্রিক জগতের বাহ্য বৈষম্যগুলিকেই ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র—আত্মিক মিলন প্রতিষ্ঠার কোনরূপ আভাস তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বক্তব্য বিষয় এক হইলেও, দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

এইবার কবিতাগুলির আলোচনা করিতেছি। কাজি সাহেবের সাম্যবাদীর প্রথমেই আমরা শুনিতে পাই তিনি বলিতেছেন :—

> "গাহি সাম্যের গান
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।"

কাজেই তিনি প্রথমেই সাম্যপ্রতিষ্ঠিত একটা অবস্থার বর্ণনা দিয়া 'সাম্যবাদী' আরম্ভ করিয়াছেন—কবি ৺সত্যেন দত্তের মত বৈষম্যমূলক সমাজের সাম্যের দিকে কোনরূপ গতিবিধি তিনি দিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, এই প্রথম কবিতাতেই তিনি বলিয়াছেন—

> "মিথ্যা শুনিনি ভাই
> এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা নাই।"

কথাটা খুবই সত্য; কিন্তু এই হৃদয়ের সন্ধান কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, তাহার কোন নির্দ্দেশ তিনি দিতে পারেন নাই। অথচ তিনি সকল ধর্ম্মমত, সকল শাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদি বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন। আত্মোপলব্ধির পথে সেই সকল অনুশীলন করাও তিনি প্রয়োজন মনে করেন না। ৺সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু এই হৃদয়ের সন্ধান নিতেই ব্যস্ত, তিনি 'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্র সার করিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এই ভাবেই তাঁহার ভাবধারা সাম্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং 'হোমশিখা' পুস্তকখানা পাঠ করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে—আর 'হোমশিখা'র কবিতাগুলিকে আমি অচ্ছেদ্য মনে করি বলিয়াই আমি এই ভাবে বিচার করিতেছি। এই 'হোমশিখা' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমি এই প্রসঙ্গে করিব না; তবে একথা বলিতে পারি যে, তিনি কাজি সাহেবের ন্যায় বর্ত্তমান সমাজের ধর্ম্ম ইত্যাদির বিধি-বিধান একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি জ্ঞানের পথে ভাল-মন্দ বিচার করিয়া চলিয়াছেন। যদিও তিনি বলিয়াছেন—

> "মেকির উকিল মেকলে আর ভারমেস্ত্য মনুর পুঁথি
> স্বার্থক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য—বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।"

তবুও একথাও তিনি প্রচার করিয়াছেন যে,

> "সমাজ, ধর্ম্মের বিধি
> মমতা শিখায় যদি
> তবে তার কাছে সার্থকতা।"

কাজেই তিনি ধর্ম্মের সঙ্গে বিদ্রোহ করেন নাই। তিনি মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতির প্রচলিত ধর্ম্মমত বিকৃতরূপ ধারণ

করিয়াছে বলিয়াই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চলিতেছে। তিনি এই সকলের যথাযথ অনুশীলনের সার্থকতা অস্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গেও কাজি সাহেবের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া কাজি সাহেবের নির্দ্দেশমত যদি আমরা সকল ধর্ম্মপুস্তক ইত্যাদির জঞ্জাল উড়াইয়া পুড়াইয়া দিয়া, যাঁহারা হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাদের নামমাত্র অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা কখনও আমাদের অন্তর্নিহিত সত্তার সন্ধান পাইতে পারি কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাঁহাদের আচরিত পথের সন্ধান লাভ করিয়া আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত বা লিখিত পুস্তকের সাহায্য আমাদের লইতেই হইবে। সেইজন্য কবি যখন এই সকল পুস্তক-পাঠকে পণ্ডশ্রম বলিয়া বর্ণনা করেন—

"কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?"

তখন কবির সঙ্গে আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না। "তোমাতে রয়েছে সকল কিতাব"—ইহা সত্য; কিন্তু নিজের অন্তর্নিহিত এই কিতাবগুলিকে নিজের মধ্যে সার্থক করিতে হইলে, আত্মোপলব্ধির ধারণা নিজের মনে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, 'কিতাব'-পাঠের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য্য। আর 'কিতাব' পাঠ করা যদি পণ্ডশ্রম, তবে জানিয়া শুনিয়া কবি নিজেও একটি 'কিতাব' রচনা করিয়া পণ্ডশ্রমের উপকরণ বাড়াইলেন কেন, এই প্রশ্নের জবাব একমাত্র কাজি সাহেবই দিতে পারেন। আমি শুধু এই দুইজন কবির ভাবগত পার্থক্যটা দেখাইবার জন্যই এই সকলের উল্লেখ করিলাম মাত্র।

কাজি সাহেব 'ঈশ্বর' নামক কবিতায় শাস্ত্রবিদ্‌দিগকে "খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী ত নয়" বলিয়া বক্রোক্তি করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাও তাঁহার নিজস্ব কিছুই নয়—সেই 'প্রাইভেট সেক্রেটারীদেরই' কথা :

"বুকের মাণিকে বুকে ধ'রে' তুমি খোঁজ তারে দেশে দেশে"

অথবা

"সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি"

ইত্যাদি আমাদের শাস্ত্রবিদ্‌দেরই অতি পুরাতন কথা, যা' কাজি সাহেব অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে বলিয়াছেন। শ্বেতকেতু যখন ভগবানের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, তখন শাস্ত্রবিদ্‌দেরই মুখেই আমরা কি শুনিতে পাই নাই যে, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ?" আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিদেরা কি বলেন নাই—"সোঽহং"—আমিই সেই ? কবি নিজে কোন ভূয়ো ব্যক্তিকে "খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হইতে পারেন; কিন্তু তিনিও শেষ পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিদ্‌দের নির্দ্দেশই প্রচারিত করিয়াছেন এবং ইহা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, এইটুকু শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে "সত্যসিন্ধুজলে"—কবি যেরূপ বলিয়াছেন—ডুব দেওয়া যায় না। কবি যদি এইটুকু স্বীকার করেন, তবে কিতাব পড়া সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন নিজেই তাহার তিনি প্রতিবাদ করিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি ৺সত্যেন দত্তের মতামতের জন্য 'কোন ধর্ম্মধ্বজের প্রতি" কবিতাটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কাজি সাহেব যাহাদের নিকট প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ৺সত্যেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

তারপর কাজি সাহেবের 'বারাঙ্গণা' শীর্ষক কবিতাটির কথা বলিতেছি। সেখানে কবি প্রথমেই লিখিতেছেন :—

"কে বলে তোমায় বারাঙ্গণা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে ?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে !"

এই প্রসঙ্গ পড়িয়া মনে হইতেছে যে 'সীতা সম সতী' মায়ের সন্তানেরও যে অধঃপতন হইতে পারে, একথা কবি সাময়িকভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন। তা'ছাড়া 'মাতা ভগিনীরই জাতি' হইলেও, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবেগে তাহারা যে সেই স্থান হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথাও তেমনি বলা চলে যে, দেশের এবং সমাজের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের ছেলেদের—কবি যেরূপ অনুমান করিয়াছেন—দ্রোণ, কর্ণ হইবার আশাও সুদূরপরাহত। আর যদি তাহারা সেইরূপ গুণী হইতে পারে, তবে কেন যে তাহারা শ্রদ্ধার্হ হইবে না, তাহারও কোন কারণ নাই। তবে শুধু পৌরাণিক কাহিনীর দোহাই দিলেই কেহ আর তাহাদিগকে ভাবী দ্রোণ, কর্ণের সম্মান দিবে না :—যাহাতে তাহারা প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশই এক্ষেত্রে সমধিক প্রয়োজনীয় ছিল। এই প্রসঙ্গে কবি ৺সত্যেন্দ্র নাথের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া কাজি সাহেবকে আশ্বস্ত করিতে হয় :—

"প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচি মুনি মহৎ বলে' অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে ?
* * * *
বেশ্যাও সে নৈবেদ্য নেবে, অর্পিত যা নিবেদিতায় ?
* * * *
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার প্রেমী হিস্টিরিয়া ?
* * * *
কালিদাসের কাব্য অমর, তার গুণে দেশ আছেই কেনা,
তাই বলে পাঁউরুটিওলার পায়ের ধুলা কেউ নেবে না।"

তবে 'বিমল সত্য সেবি' তাহারা পূজ্য হইতে পারে বটে; কিন্তু সেই সত্যই বা কি এবং ইহার সন্ধানই বা তাহারা পাইবে কিরূপে, সে বিষয়ে কাজি সাহেব একেবারে নীরব। ৺সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে আগাগোড়া ইহার সন্ধান প্রচেষ্টা আছে এবং এই অংশেও কাজি সাহেব ৺সত্যেন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত।

আর একটা কথা। কাজি সাহেব সকল সময়েই পৌরাণিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেই ব্যস্ত। অতীতের নিদর্শন দেখাইয়া তিনি

বর্ত্তমানের অসম্মানিত জিনিষকেও সম্মানের স্থানে আরোপ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু তাহা সকল সময়ে সম্ভবপর নহে এবং সকল সময়ে সমর্থনও করা চলে না। উদাহরণস্বরূপ ৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলের একটি কাহিনী বলিতেছি। সেখানে নয়ান দত্তের পরিণীতা বধূ অপরিচিত যুবক লাউসেনকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য এই সকল পৌরাণিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছে। সে বলিতেছে

"পরের পুরুষে যদি কেহ নাহি ভজে।
তবে কেন গোবিন্দে গোপিকা মন মজে।
পবন পুরুষে কেন ভজিল অঞ্জনা।
কে কোথা সে সব লোকে দিয়াছে গঞ্জনা॥
কুন্তীসম কেহ সংসারে নাই সতী।
অবিবাহকালে কেন হল গর্ভবতী॥
তারা মন্দোদরী কেন ভজিল দেবরে।
কি কাণ্ড না হল মুনি গৌতমের ঘরে॥
সংসারে সবার বটে এই নায়েতে ভরা।
কুলবতী বটি, কিন্তু শীল স্বতন্তরা॥"

সমাজের ভিতর থাকিয়া এবং সমাজের বৃহত্তম মঙ্গলকামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কোন কুলকামিনীর এইরূপ আচরণ ব্যক্তিগত কিংবা সমাজগত-ভাবে সমর্থন করা চলে কি? এই জন্য বলিতেছিলাম—পৌরাণিক কাহিনীগুলির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া শুধু পৌরাণিক দৃষ্টান্তের খাতিরেই কোন বিষয়কে গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি না। 'মাতা-ভগিনীর জাতি' বলিয়া মহামানবতার দিক্ হইতে তাহাদিগকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আনা যায় বটে, তবে উদাহরণের তিক্ততায় সেরূপ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এইরূপ আচরণে শ্রেণী-বিদ্বেষই কায়েম হয়, সাম্য তখন হইয়া পড়ে সুদূরপরাহত। এই পতিতোদ্ধারের ব্যাপারে ৺সত্যেন্দ্রনাথের 'পথের পঙ্কে', 'কুস্থানাদপি' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা, বিশেষ করিয়া 'নষ্টোদ্ধার' নামক কবিতাটির উল্লেখ করা চলে। সেখানে কবি বলিতেছেন:—

"মন করেছি আমরা ক'জন
নষ্ট মানুষ তুলতে,
পঙ্কে আছি নাবতে রাজী
মনের চাবি খুলতে।
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ, তবু মানুষ, ওগো
পারব না তাই ভুলতে
মন করেছি—পণ করেছি
হারা হৃদয় তুলতে।"

তারপর 'নারী' কবিতাটির কথা বলিতেছি। এইখানে দেখিতে পাই—নারীদের প্রশংসায় তাঁহারা দুইজনেই প্রায় একরূপ। কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে বলিয়াছেন—

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী,
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তা'রি—তা'রি।

সেখানে কাজি সাহেব বলিতেছেন—

জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্যলক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি'।

কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথের নিকটও "নারী পুষ্পপ্রতিমা সুষমা পড়িছে ঝরি"; কিন্তু কাজি সাহেব এই প্রসঙ্গে বর্ণনার আতিশয্যে নারীকে 'গানের লক্ষ্মী' এবং 'জ্ঞানের লক্ষ্মী'রূপেও বর্ণিত করিয়াছেন। লক্ষ্মী চিরকালই ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—গান বা জ্ঞানের নহেন। নারী হইলেও, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এক নহেন এবং এই জন্য এই অংশে কবির বর্ণনায় ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া নারীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যখন বলেন

"শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল,
নারী সে মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোণালী ধানের শীষে।"

তখনও আমি কবির সঙ্গে একমত হইতে পারি না। কারণ সকল দেশেই আর নারীগণ শস্য রোপণ বা মাঠে জল সেচন করে না। এমন কি বাংলাদেশেরই কোন অঞ্চলে নারীগণ কৃষিকার্য্য করে বলিয়া আমার জানা নাই। অত্রাবস্থায় সকল নারী সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে কি?

কবি নারীদের সাম্য দাবী করিতে যাইয়া আরও বলিতেছেন—

"বিশ্বের যা' কিছু মহান্ সৃষ্টি, চিরকল্যাণকর
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর,
বিশ্বে যা' কিছু এল পাপ, তাপ, বেদনা, অশ্রুবারি
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী।"

ইত্যাদি বর্ণনা আধুনিক নারী সমাজের সমানাধিকার দাবীর মতই নেহাৎ যেন Socio-political ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মানবতার দিক্ হইতে ৺সত্যেন্দ্রনাথের ভাবধারা কিন্তু অন্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন—

"জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীরে বল হেয়,
অর্দ্ধ জগতে ক'রো না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো!
স্নেহবলে নারী বক্ষ-শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে কোন মূঢ় অবনীতে!"

এবং এইভাবের বিভিন্নতার জন্যই বোধ হয় কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া মানুষ হিসাবে তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইয়াই সাম্য দাবী করিয়াছেন। যেমন—

নারী ও শূদ্র নহে গো ক্ষুদ্র, হেলার জিনিষ নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মত দহে ;
তাহাদের রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদের আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয় আছে, আছে অভিমান।
তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্ত্য মানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;
ওগো ধনবান্, ওগো বলবান্, জেন তোমাদের আছে
তাহাদেরি মত গ্রন্থি অপটু—স্কন্দ মাথার মাঝে।"

কাজি সাহেব এই সমস্যাটার দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি নারীসমাজের নিকট পুরুষের ঋণের দাবীতেই সেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নারীসমাজের প্রতি পুরুষের অবিচার বর্ণনা করিতে গিয়া এমন হুমকীও দেখাইয়াছেন যে, যে নিগড়ে পুরুষ এখন নারীদিগকে বন্দী করিয়াছে, অদূরভবিষ্যতে পুরুষেরাই সেই নিগড়ে বন্দী হইবে। ইহার পরেই তিনি নারীসমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ,
দূর করে' দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।"

অথচ একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই প্রসঙ্গে কবির চিন্তার কোন স্থিরতা নাই। কারণ নারীদের 'হাতে রুলি, পায়ে মল' ইত্যাদিকে কবি বর্ত্তমানে 'দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং নারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—'ভেঙ্গে ফেল ও শিকল'। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কবি বলিয়াছেন—

"স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গপরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।"

এই অলঙ্কার যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য বা সৌষ্ঠব বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কবি যেমন জানেন, সমগ্র নারীসমাজও তেমনি জানে। কাজেই ঘোমটা যদি বা তাহারা কবির প্ররোচনায় উড়াইয়া দিতে পারে, অন্যান্য যে সকল আভরণের কথা কবি লিখিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দিবার মত প্রবৃত্তি তাহাদের হইবে কিনা, তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ। যাহা হউক, কবির নির্দ্দেশ পালন করিয়া তাহারা যদি কবি-কল্পিত পুরুষের গড়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং সেই নিষ্ক্রমণও যদি কবিকল্পিত "নাগিনীর মত" হয়, তাহা হইলে মানব-সমাজের পক্ষে ইহা কতটুকু মঙ্গলপ্রদ হইবে এবং নারী ও পুরুষের সাম্যের পথে কতটুকু অগ্রগতি হইবে, তাহা অনুমান করিতেও সাধারণ মানুষের কল্পনা পরাভব স্বীকার করে। কবি নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিয়াছেন—

"এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে,
যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সেই হাতে কূট বিষ দিতে হবে।"

এতদিন কবিকল্পিত অমৃত পান করাইয়া যদি নারী পুরুষকে অমরতার সন্ধান দিতে না পারিয়া থাকে, তবে এ কথা বোধ হয় অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, সে এতদিন যাহা দান করিয়াছে তাহা ঠিক অমৃত নয়। মদিরার নেশায় যে-মানুষকে নারী মুক্তিমস্ত কামনা করিয়া তুলিয়াছে, দেহের এবং মনের বিলাসে যে-মানুষের অন্তরাত্মাকে নারী নিৰ্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে যদি এমন কূট বিষ দিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহা দিতে পারে এবং ইহার জন্য যদি পুরুষেরাই দায়ী হয়, তাহা হইলেও "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতম্" বলিয়া আমরা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু এতদিন অমৃত-বিতরণের ফলস্বরূপ যদি বর্ত্তমানে হলাহল-বিতরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা নারীসমাজেরও গৌরবের পরিচায়ক অবশ্য নহে এবং এই পণ্ডশ্রমের প্রতি আমরা শুধু করুণাই প্রদর্শন করিতে পারি মাত্র।

'মানুষ' কবিতায় কাজি সাহেব চণ্ডীদাসের

"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

এই বাণীর ধুয়া ধরিয়া বলিয়াছেন—"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান্।" এই প্রসঙ্গে কবি সকল মানুষের মধ্যেই দেবতার আরোপ করিয়াছেন (ইহাও অবশ্য প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্দেরই অনুকরণ) এবং ভুখা ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা না দিবার অপরাধে সকল ভজনালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও বলিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মনীষার একটা সম্ভাবা থাকিতে পারে; কিন্তু সেই মনীষার বিকাশ না হইলে, কেহ আর তাহাকে সমাদর করে না। কাজেই চণ্ডালের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র, কৃষকের মধ্যে বলরাম বা জনক কিংবা আমার মধ্যে কল্কি অবতার বা আপনার মধ্যে 'মেহেদি-ঈশা' সুপ্ত থাকিবার সম্ভাবনাতেই কেহ আর চণ্ডালকে, কৃষককে কিংবা আমাকে আপনাকে সেই সম্মান প্রদর্শন করিবে না। বিপ্লবী কবি নজরুলের মধ্যে 'বুলবুল' নজরুলের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া যদি কাজি সাহেবকে দেশবাসী বিপ্লবী কবির সম্মান না দেখাইত, তাহা হইলে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান' প্রভৃতির প্রণেতার প্রতি অবিচার করা হইত না কি? প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান ঘটনাবলী বা বর্ত্তমান অবস্থা নিয়াই আমাদের কারবার—সেখানে যাহার যেটুকু ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাকে সেটুকু আমরা দিয়া থাকি—ইহাই ব্যবহারিক জগতের নিয়ম। আর সমগ্র সংসারটা একটা ধর্ম্মের 'আখড়া' নয় বলিয়াই 'যত্র জীব, তত্র শিব' ব্যাখ্যা আমরা বাস্তব জগতে কখনও মানিয়া চলিতে পারি না। আমাদের এই অবস্থা নিয়া রাগ করা কিংবা অভিমান করা চলে না। যিনি এরূপ করিবেন, তাঁহাকে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়াই আমি অভিহিত করিব।

কবির নিকট "বিশ্ব পাপস্থান"; তাঁহার নিকট—

"সুন্দরী বসুমতী
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়—কামরতি।"

এই সকল বর্ণনা অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তার কোন স্থিরতা নাই। কাজি সাহেবের ধর্ম্মবিবেক সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়াও শুধু এই কথা আমি এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, কিভাবে "বিশ্ব পাপস্থান" হইয়া উঠিয়াছে, কিভাবে মানুষের বাস্তবতা পশুর বাস্তবতায় নামিয়া আসিয়াছে এবং এই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় কি, তাহা কবি বিচার করেন নাই। প্রকৃত জীবন কাহাকে বলে, প্রকৃত মানুষের অর্থ কি, তাহারও সন্ধান-চেষ্টা কাজি সাহেবের মধ্যে আমরা পাই না। যাহা কীটের বাস্তবতা, যাহা পশুর বাস্তবতা, তাহা মানুষের বাস্তবতা নয় এবং কাম-রতি প্রভৃতির প্রভাব-মুক্ত হইয়া যে মানুষ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসনায় জীবন কাটাইয়াছে—যে মানুষ আত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইতে পারিয়াছে—সে মানুষের অস্তিত্বও কবি স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য তিনি শুধু অধঃপতিত মানুষের ক্লেদাক্ত কাহিনী নিয়াই বহ্বাড়ম্বর করিয়াছেন এবং এই জন্য মানুষের বর্ণনা তাঁহার পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মান্ধদিগকে উপদেশ দিয়াছেন "অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোণ।" তিনি মানুষকে অভিযোগ জানাইয়াছেন—

"বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলী,
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।"

কিন্তু তিনি নিজেও মানুষের কথা বলিতে গিয়া সমগ্র মানুষের কথা বিচার করেন নাই, মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতেও চেষ্টা করেন নাই। তিনি শুধু কতকগুলি শ্রেণীকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—পাপী সয়তানকেও তিনি সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। এই সকলে সাম্যের যে অংশটা আছে, অর্থাৎ

"সাম্যের গান গাই
যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।"

ইহা অন্তঃসারশূন্য। কারণ তিনি উদাহরণ দেখাইয়া প্রবীণ ব্যবহার-জীবীর মত তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাদিগকে ভাইবোন বলিয়া আলিঙ্গন কিংবা আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ জানান নাই। তাহাদের জন্য যেটুকু অশ্রু তিনি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে প্রাণের দরদ অপেক্ষা স্নায়বিক উত্তেজনাই বেশী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ কোনরূপ উদাহরণের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই এবং কাহারও ভিতর দেব-মানবের কিংবা অতিমানবের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সকল মানুষকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করিতে চাহেন নাই। তিনি মনে করেন—

"মানুষ মানুষ, শক্তি-মূরতি, বহ্নি ধরে সে বুকে,
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তার মুখে।
সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তারে ছিঁড়িয়া লবে!
সে যে দিনে দিনে হয়েছে মানুষ, তারে ঠাঁই দিতে হবে,
তার বাঁচিবার, তার বাড়িবার অধিকার আছে, আছে—
কা'র চেয়ে দাবী কম নহে তার, এ বিপুল ধরা মাঝে।"

এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি উদাহরণের সহায়তা বর্জ্জন করিয়াই তাহাদিগকে মানুষ করিতে চাহিয়া গাহিয়াছেন—

"দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আতুরে দুষি না তাই।"

এবং সকল মানুষকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বন্দনা করিয়াছেন—

"অভিষেক যারে করেছে তপন আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্নামদিরা যে করেছে পান, সেই সে আমার ভাই;
সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল, সে আমার দুঃখেসুখে;
কুসুমসরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি
জীবনে মরণে কাছে আছে তারা, মনে মনে তাহা জানি।"

এবং এইরূপ ভাবধারার ভিতর দিয়াই সকলকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন—

"কে রয়েছ বলী, আর্ত্ত অবলে হাতে ধরি লও তুলি',
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নীরব নূতন দুয়ার খুলি';
মানুষেরে যদি মনে জান পর, শিক্ষা বিফল তবে
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়ঃ ভবে।"

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবধারার ভিতর দিয়াই এই দুইজন কবি সাম্যের দিকে চলিয়াছেন। এই সাম্যের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়াই কাজি সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন—

"বন্ধু, এখানে রাজাপ্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
হেথা পায় নাকো কেহ ক্ষুদ-ঘাটা, কেহ দুধ, সর, ননী;
অশ্বচরণে, মোটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে নাকো সাদাদের মনে দেখে হেথা কাল দেহ।

* * *

পায়জামা, প্যাণ্ট, ধুতি নিয়ে হেথা হয় নাকো ঘুষাঘুষি,
ধূলায় মলিন দুঃখের পোষাকে এখানে সকলে খুসী।"

ইহাই কাজি সাহেবের কল্পিত সাম্য। কিন্তু কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, কি মহান্ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সাম্য আত্মরক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কবি কিছুই বলেন নাই। মানুষের বড় হইবার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, তাহা যখন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে এবং 'ধূলায় মলিন দুঃখের পোষাকে' তৃপ্তি বোধ করিবে না, তখন কিসের প্রভাবে এই উদ্বেলিত হৃদয় প্রশমিত হইবে? একটা মহান্ আদর্শের অনুপ্রেরণা ব্যতীত এই সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না; কিন্তু এই আদর্শের কথা আমরা কাজি সাহেবের মধ্যে পাই না। কবি সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা পুরাপুরি বর্ত্তমান। পূর্ব্বেও বলিয়াছি—তিনি জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া মানুষকে সত্য পথে চালিত করিতে

প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সত্যের বিমল জ্যোতিতে মানুষের মধ্যে পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় অবহিত করাইয়া সকলের মহামিলনের মধ্য দিয়া যে বিশ্বমানবতার প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন—কাজি সাহেবের সাম্যবাদে তাহার নিতান্ত অভাব।

কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ যখন অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মহাসাম্যের সময় আগতপ্রায়, তখন সেই শুভ সময়ের উদ্দেশ্যে তিনি যে অকপট আবেদন জানাইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সাম্যের আন্তরিকতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে :

"হে শুভ সময়! গাহি তব জয়, আন বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী করে' তুমি, দাও মানুষের মন;
কর নির্ম্মল, কর নিরাময়, কর তারে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জ্জয়ে কর জয়।
ভাই সে আবার আসুক ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ-বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে;
সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায়;
সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হোক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্তালোক।"

কাজেই দেখিতে পাইতেছি, কবি সত্যেন্দ্রনাথ মানুষের আশা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, মানুষের মত, পথ, মন সকলকে এক সুরে ফেলিয়া সর্ব্বতোভাবে সাম্য চাহিতেছেন—প্রেমের ভিত্তিতে, মিলনের ভিত্তিতে, সমপ্রাণতার ভিত্তিতে। কাজি সাহেব পরস্পরবিরোধী শ্রেণী-গুলিকে পরস্পরের প্রতি উত্তেজিত করিয়াছেন—ইংরেজিতে যাহাকে বলে class-struggle, তাহার দ্বারাই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল কবিতা বিলেতী কপচানিমূলক রাজনৈতিক পোষাকী বক্তৃতার ন্যায় সাময়িকভাবে আমাদিগকে উত্তেজিত করে মাত্র, আমাদের স্বভাবকে, আমাদের বিচারবুদ্ধিকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করিয়া কোন মহত্তর কল্যাণের দিকে নিয়োজিত করিতে পারে না। সেইজন্য গোড়াতেই বলিয়াছি—এই সকল নেহাতই রাজনৈতিক ব্যাপার, কমিউনিষ্টিক গন্ধ ইহাতে অত্যন্ত বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের "ডুবা-জাহাজে তুলার" মত পণ ইহাতে নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে কাজি সাহেব বিপ্লবী কবি—তিনি সাম্যের কবি নহেন। তাঁহার 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান' এবং 'অগ্নিবীণা' প্রভৃতি যে বিপ্লবের উত্তেজনা মানুষের মনে বিস্তার করিতেছিল, তাঁহার 'সাম্যবাদী'ও সেই উত্তেজনারই ইন্ধনস্বরূপ। সাম্য তাঁহার উপলক্ষ —বিপ্লব ছিল তাঁহার লক্ষ্য। ৺সত্যেন্দ্রনাথ অপরপক্ষে প্রকৃত সাম্যের কবি। তিনি মানুষের মধ্যে একটা আত্মিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বমানবতার গোড়াপত্তন করিতে চাহিয়াছেন—মানুষকে একটা স্থায়ী সাম্যের দিকে গতি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "সমীর" কবিতায় তাঁহার যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা এই আদর্শেরই সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে। বিদ্রোহের কবিতাও তাঁহার কম নয়—তিনি জগতের যত কিছু অন্যায় অসত্যের সঙ্গে আজীবন বিদ্রোহ করিয়া চলিয়াছেন—অত্যাচার অবিচার তিনি কখনও সহ্য করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সকল বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত আদর্শ সাম্য এবং ইহা আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচিত 'সাম্যসাম' ছাড়া আরও বহু কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই দুইজনের প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও, দুই জনের দৃষ্টিভঙ্গী এক নহে এবং সেই হেতুই দুই জনের সাম্যের কবিতা আমাদের হৃদয়ে দুইটি বিভিন্নরূপ ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে।

অত্যাচারীই গুরু

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

তুমি অত্যাচারীই গুরু—
চিত্ত দুয়ারে আঘাত হানিয়া ভাঙ্গিতে করেছ সুরু।
আঘাতে দাহনে লোহাপাতখানি ইস্পাত তুমি কর,
খান খান করি লাঙ্গল প্রহারি মাটিরে করিছ দড়।
তুমি অন্দর খুলে অন্তর তলে জাগায়েছ মহাপ্রাণ,
তার সঞ্চিত ব্যথা পুঞ্জিত হ'য়ে ঘোষিয়াছে অভিযান।
দহিয়া কুটিয়া সুচের জীবনে যে ব্যথা দিয়েছ রেখে,
জ্বালায় জ্বালায় সে ব্যথা আগারে জমায়ে রেখেছে এঁকে।
তব অত্যাচারে মৃত্যুর দ্বারে নব জীবনের সঞ্চার—
তুমি সুপ্তিরে ভেঙ্গে শক্তিরে লয়ে খেলায়েছ কতবার।
তুমি অন্ধের আঁখি খঞ্জের পদ বৃদ্ধের চির-যৌবন,—
মহামরু পথ দরি-পর্ব্বত ভেদিয়াছে কত বন;
(যবে) ঝঙ্কার মাঝে এক সুরে বাজে সাত সাগরের গান,
দুর্ব্বার স্রোতে নির্ব্বাণ পথে করিয়াছে অভিযান।
ওগো অত্যাচারি! মন্ত্র ফুকারি শিষ্যে করেছ হেঁট,
তাই ভক্তসাধক রক্তমাদক চরণে দিতেছে ভেট।
জ্বালি হোমানল দীক্ষিতজন ভস্ম করিছে যজ্ঞস্রুতে
সর্পের মুখে চুম্বন এঁকে লাঞ্ছিত করে মৃত্যুদূতে।
ওরে অভাগার চেতনাপ্রদীপ নিদাঘের ধারাজল—
মহাপ্রলয়ের যুগ অবতার সেবকের বৎসল।
ভক্তের দুর্গতি হেরি দুই কর জুড়ি কাঁদিয়াছ কতকাল—
শিষ্যের আসনে বসি পুজিয়াছ তারে সন্ধ্যা সকাল।
যত মহাধমে করিয়াছ শুর গরীয়স্ সবাকার—
বীরপ্রধামত দক্ষিণা দেছে সায়কের নমস্কার।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

শ্রীমতিলাল রায়

উপমর্দ্দং চ ॥১৬॥

চ (আরো) উপমর্দ্দং (কর্ম্মের উপমর্দ্দন অর্থাৎ বিনাশশীল)।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—ক্রিয়া ও কারক সমুদয় অবিদ্যাজনিত। বিদ্যার উদয়ে সবই বিলীন হয়। উপনিষৎ বলিতেছেন—

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ
তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ।"

—অর্থাৎ যে সময়ে জ্ঞানীর এই সমস্ত আত্মভূত হয়—কখন কি দিয়া, কি দেখিবে? অতএব আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্মাধিকার দূরে থাকুক, তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। এই কারণে জ্ঞানের বা বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধ হয়।

আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

—অর্থাৎ সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় বিনষ্ট হয়, সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের যখন এই অবস্থা, তখন জ্ঞানীর কর্ম্ম থাকিবে কি প্রকারে?

মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। তিনি বলিতেছেন—জ্ঞানীদের যথেচ্ছচরণ বিধান শ্রুতিতে থাকায় কোন কোন শাখাধ্যায়ীরা যে বলেন, ইহাতে জ্ঞানীদের মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না, তাহার হেতু-নিরশনের জন্য "উপমর্দ্দং চ" সূত্রের অবতারণা। জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বকর্ম্ম যখন বিমর্দ্দিত হয়, তখন জ্ঞানীদের সৎ অথবা অসৎ যে কর্ম্মই হউক, তাহা মোক্ষ-পথের প্রতিবন্ধক হইবে কেন? সর্ব্বশ্রেণীর ভাষ্যকারের মতেই জ্ঞানোদয়ে কর্ম্মক্ষয়ের কথা আছে। প্রশ্ন হইতেছে—ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্ম করিবে কিনা? আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ বলেন—জ্ঞান হইলে কর্ম্মের মূলোচ্ছেদই যখন হইয়া যায়, তখন কর্ম্ম হইবে কি প্রকারে? শ্রুতি যখন স্পষ্টই বলিতেছেন—আত্মজ্ঞান হইলে, কে কি দিয়া কি করিবে, আত্মার ত আর হাত-পা নাই! অথচ আমরা দেখিতেছি—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥"

ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। সর্ব্বভূতে আত্মভূত আত্মা কর্ম্ম করিয়া লিপ্ত হন না। এই আত্মা যোগযুক্ত তো বটেই, পরন্তু বিশুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি। ইহার সহিত উপরোক্ত ভাষ্যের সামঞ্জস্য কোথায়?

গীতায় আরও স্পষ্ট আছে—

"ব্রহ্মণ্যাধায় তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

যে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গৃহীত-ব্রহ্ম হইয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সেও কর্ম্ম-জনিত পাপে লিপ্ত হয় না।

যোগযুক্ত ব্যক্তির যদি কর্ম্মই না থাকিবে, তাহা হইলে গীতায় এমন কথা থাকিবে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর পূজনীয় আচার্য্যগণ দিয়াছেন যে, এই সকল জ্ঞান-প্রশংসার জন্য হইয়াছে। এই উত্তর বর্ত্তমান যুগের কাছে সান্ত্বনার হেতু হয় না। পরন্তু এই সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। "কামকারেণ" অর্থাৎ কোন কোন শাখাধ্যায়ীরা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন—জ্ঞানশক্তির আধিক্যের প্রশংসায়। ব্যাসদেব বলিতেছেন—ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের যথেচ্ছাচার উপমর্দ্দিত হয়। ঈশ্বরের সহিত যুক্তপ্রাণ হইলে, যুক্তির লক্ষণ-স্বরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই তো প্রকাশ হইবে। মানুষের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইলে, সর্ব্বসংশয় নষ্ট হইলে, সর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কার শেষ হইলে, সে নির্ভীক চিত্তে বলিয়া উঠে যে বাণী, তাহা গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৭৩তম শ্লোকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া কি দেখান হয় নাই? আমরা শ্লোকটী এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

—অর্থাৎ আমার সংশয় দূর হইয়াছে। তোমার কৃপায় স্মৃতি-লাভে আর আমি মোহগ্রস্ত নহি। তোমার বাণী এই জীবনে সিদ্ধ করিব।

উপরোক্ত শ্লোকের "করিষ্যে" এই শব্দটী ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার প্রদান করে। ইহা স্পষ্ট দিনের মত সত্য।

এই ক্ষেত্রে এইরূপ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। বিদ্বানের যখন কর্ম্ম আছে, তখন আচার্য্য জৈমিনির সূত্র-ব্যাখ্যার বিচারে বেদব্যাসের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানই কেবল প্রয়োজন, এই কথা বলার কি হেতু আছে? ব্যাসদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য কেবল জ্ঞানই দায়ী, এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই, এরূপ কথা তিনি বলেন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির আশ্রয়ে আমাদের বুঝিতে হইবে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানই সহায়। কিন্তু জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই, ইহার প্রমাণের জন্য উপরোক্ত সূত্রগুলির অর্থ করা সঙ্গত হইবে না।

ঊর্দ্ধরেতঃ সু শব্দে হি ॥১৭॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু (চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস) শব্দে হি চ (বিদ্যাশ্রুতি দেখা যায়, এই হেতু।)

আচার্য্য শঙ্কর উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন— ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমে বিদ্যারই শ্রবণ আছে। কর্ম্মের শ্রবণ নাই। বেদে ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা নাই, এমন অনেকে বলেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে এই শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"য ইমং পরমং গুহ্যমূর্দ্ধরেতঃ সু ভাষয়েৎ" অতএব ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম বেদবিরহিত নহে। শ্রুতিতে ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা থাকায় এই কথাই কি প্রমাণিত হইতেছে না যে, যাঁহারা ব্রহ্মযুক্তি লাভ করেন তাঁহাদের অহঙ্কার ও কামনা বিমর্দ্দিত হইয়া যায়। এক অখণ্ড ব্রহ্ম-রসে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন অভিষিক্ত হয়, ইহাই মানুষের দেবজন্ম। এই ব্যক্তির রেতঃ ঊর্দ্ধমুখী হইয়া থাকে। জীবের এই অভ্যুত্থান ব্রহ্মযুক্তির নিশান। যতক্ষণ জীবের স্বাতন্ত্র্যবোধ, ততক্ষণ সে কামাচারী, সে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে পারে না। শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন যোগাধিকারপ্রাপ্তির প্রকরণ, কিন্তু যুক্তের লক্ষণ ঊর্দ্ধরেতঃ। ঈশ্বর-আনন্দ ব্যতীত এই রেতের অবতরণ হয় না। সূত্রের পারম্পর্য্য-রক্ষায় এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মসাধকের প্রাণে দিব্য জন্মের প্রেরণাই সঞ্চার করে। এই জন্যই চৈতন্য-জগতে আমরা ভেদ-ত্রয় কল্পনা করি—মনুষ্য, ঋষি ও দেবতা। যথেচ্ছাচারী বা কামাচারী মানবতা। দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা ঋষিত্ব এবং ব্রহ্মে চৈতন্য-সংযুক্তি দেবজন্মের স্বপ্ন সফল করে। মানুষ দেবতা হওয়ারই সাধনা করিতেছে—ভারতের গুরুমূর্ত্তি ব্যাসদেব বেদাদি দোহন করিয়া এই অমৃতই আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রি-সাধনায়।

ব্রহ্মসূত্রে আদি ও মধ্যভাগে নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া উত্তর ভাগে বেদান্তের পরম সঙ্কেত দিয়াছে "দেবায় জন্মনে।" এই শ্রুতিবাণী সিদ্ধ হইবে—আমরা পাঠকদের এই দিকে অবহিত হইতে বলি।

আমি পূজনীয় আচার্য্যগণের ভাষ্যের সহায়তা পাইয়াই ব্যাসসূত্রের মর্ম্ম অনুভবে সমর্থ হইতেছি। এক যুগে ব্রহ্মসূত্রের ঐরূপ বিচার-বিতর্ক যদি না হইত, ব্রহ্মসূত্র বর্ত্তমান যোগজীবনের পক্ষে কি অমৃত, তাহা উপলব্ধিগম্য হইত না। ভারতের বেদ চিরযুগের জন্য; কিন্তু যুগে যুগে তাহার অর্থভেদের প্রয়োজন হয়, তাই ব্রহ্মসূত্র আশ্রয় করিয়া একদিন নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রচারের প্রয়োজন ছিল। এইরূপ না হইলে, একটা জাতি শাস্ত্রাবধারণে স্থৈর্য্যের অভাবে অপরিণত অবস্থায় আপনাকে ঈশ্বরযুক্ত পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিত। ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে না হইতেই তার প্রারব্ধ কামাতিশয্যে অবতরণ-স্পৃহাকে ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া পদে পদে পরিহাসাস্পদ করিত। পরিপূর্ণ কর্ম্মচাঞ্চল্য স্থির না হইলে, আত্মকাম উৎসর্গের অনলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হইলে, জীবনপ্রবাহের নিম্নমুখী গতি স্তম্ভিত না হইলে, ভারত-ধর্ম্মের অমৃতাস্বাদ সম্ভব নয়। এই জন্য বর্ত্তমান যুগের পশ্চাতে ত্যাগবৈরাগ্যপ্রদীপ্ত আচার্য্যগণের নৈষ্কর্ম্ম্য-মূলক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আমাদের স্থৈর্য্যহীন কর্ম্মপ্রভাবের মুখে বাঁধের পর বাঁধ দিয়া স্থিতধী হওয়ার সুযোগ দিয়াছেন। কতখানি অন্তরে অন্তরে কর্ম্ম করিয়াও, আমি কিছু করিতেছি না—"ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত···এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহা সাধক মাত্রেরই বিচার্য্য।

(ক্রমশঃ)

ক্রন্দসী

শ্রীরবীন বর্দ্ধন

আসলে ব্যাপারখানা কিছুই নয়। দীর্ঘ দুই বৎসর চাকুরী অন্তে, দুলে মালীর ছেলে নিমু কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়াছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ খবর বাতাসের মত মালীপাড়া ছড়াইয়া পড়িল। দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি করিয়া বাড়ীর বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত নিমুর পেছনে পেছনেই দুলে মালির ছোট উঠানখানা ভরিয়া তুলিল।

ঘটনা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নহে। আজ অনেকদিন হইতে নিমু আসে-আসে করিয়া চিঠির পর চিঠি দিয়াছে, কিন্তু আসিতে পারে নাই। আজ সত্য-সত্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই। ক্ষ্যান্তর দিদি বুড়ো হইয়াছে—লাঠী ছাড়া হাটিতে পারে না। এ দুর্ভেদ্য জনতার ভেতর পথ না পাইয়া বাড়ীতে ঢুকিবার মুখ হইতেই ডাকিতে লাগিল—

—"দুলাই!—ও দুলাই!"

দুলাই বাহিরে আসিল। সকলকে এখন আসিতে দেখিয়া পুত্র-গর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু এমনি-এমনি বলিল—"আঃ রামা, ওরে হারান, ওরে তোদেরই তো নিমুদা! ওকে কি আর দেখবি! এখন বাড়ী যা, পরে আসিস্, কেমন?"

অবশ্য তাহারা যে সত্যই চলিয়া যায় সেটাও দুলের আন্তরিক ইচ্ছা নয়।

—"হাঁরে নিমু! তোর দয়াখুড়োকে প্রণাম করলি নে? আরে! ত্রিনাথ দা যে! এস এস—ও যে তোমাদেরই নিমু—এই মাত্র এল কিনা!

রান্নাঘরে নিমুর মা রাধা উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া, বাহিরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইল। ত্রিনাথকেও এত লোকের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া তাহার স্বেদসিক্ত মুখমণ্ডলও হাসির আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এত সব লোকের মধ্য পাড়ার যোগীনের মাও কেন আসিয়াছে?

তারপর আর বিশ্রাম নাই। কত শত! ছেলেদের তো কথাই নাই—বুড়োদেরও যেন কৌতূহলের অন্ত নাই।

আকাশে এরোপ্লেন ভেসে যায়—হারানের বাপ নিমুকে প্রশ্ন করে—"তোরাই বুঝি এসব বানাস-টানাস, হাঁরে নিমু? দু'একদিন চড়েছিস্ ওর উপরে উঠে?"

এখানে বলা আবশ্যক—আজ মাস কয়েক হয় নিমু কলিকাতায় যুদ্ধের কারখানায় চাকরী পাইয়াছে। গ্রামে খবরটা না জানে—হেন লোক নাই। যুদ্ধের কি কারখানা, কিসের কাজ—সে সব খোঁজ নেওয়া কেহ প্রয়োজন মনে করে নাই;—শুধু জানে সে কাজ করে।

সন্ধ্যার পর এক ফাঁকে রামকানাই আসে—"হাঁরে, যুদ্ধের খবর কি বলতে পারিস্ নিমু? তোরাই তো সে সবের খবর-টবর পাস্। একটা গুড়ের ব্যবসা করতে চেয়ে ছিলাম। ব্যবসায় নামব এখন?"

ও-পাড়ার মধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—"হাঁ, নিমুদা, তুমি বোমা তৈরী করতে পার? তোমাদের কারখানায় ওসব বানায় না? কেহ প্রশ্ন করে—"জার্ম্মাণ কেমন? জাপান কেমন? হিটলার মানুষ কি না?"—নানা উদ্ভট প্রশ্ন-যখন যার মনে যা আসে।

নিমু সঙ্গে করিয়া কয়েকখানা সিনেমার বই আনিয়াছে;—সমবয়সীদের তাই দেখায়—ছবির গল্প বলে। অবশ্য সে নিজে পড়িতে পারে না। নিজে সে যে ছবি দেখিয়াছে, সেই গল্পই বলে।

জহর, কানন, ছবি কে বা কি করে? এসব সমবয়সীদের কেহই বোঝে না—তবু প্রশ্ন করিয়া নিজেরা যে এক-একটা এত বড় অপদার্থ, সেটা প্রকাশ করিতে সাহস পায় না। কলিকাতায় চাকুরী করে—তাহার চোখে ছোট হওয়া! ছিঃ! ছিঃ! বড় ভাই শম্ভু মাটি কাটে সরকারী সড়কে। কোদাল-মাথালি নিয়া কাজে যাইতেছিল—পথে দেখে, সামনে নিমু আসিতেছে। সে তখনও শম্ভুকে দেখে নাই; তাড়াতাড়ি শম্ভু বৈদ্যনাথের বাড়ীর ভেতর ঢুকিয়া পড়ে—ছোট ভাইএর সামনে এখন কোদাল-কাঁধে হাঁটিতে

লজ্জা করে। কলিকাতায় চাকুরী করে নিমু—সে এভাবে দেখিলে ভাবিবে কি!

সন্ধ্যাবেলা ঢুলাইকে লইয়া বুড়োদের আড্ডা বসে ঢুলের উঠানেই। নিমু তখন বাড়ী নেই—কে জানে কোথায় গেছে—কখন ফিরবে!

নিতাই বলে—"এও হ'ল তোর নিমুর কল্যাণেই ঢুলাই—। আগে কলকাতার বাবু এলে—দু'ক্রোশ পথ হেঁটে চলে গেছি দেখতে। আর আমাদের ঘরেই তো আজ কোলকাতার চাকুরে!

গর্ব্ব সবারই—পাড়ার। তাদের পাড়ারই আজ কলকাতার চাকুরে।

বিনয়ের হাসি হাসে ঢুলাই—"তোমাদের আশীর্ব্বাদে ও এখন বেঁচে বর্ত্তে থাকুক—"

মাঝখানে নন্দাই প্রশ্ন করিয়া বসে—"আরে ঢুলাই! তোমার নিমুর হাতে দেখছ কেমন সব বই। কি সব ছবি! চমৎকার! মেয়েনোকে নাচে—দশের সামনে। তাজ্জব ব্যাপার! ছবি আমি কাল দেখেছিলাম—কিন্তু বুঝলাম না। নিমু বুঝিয়ে বল্লে—হলে কি হয়—কিছু বুঝিনে। বুড়ো হয়েছি, ওসব আমাদের মাথায় আর গেলে তো?"

ঘরের ভেতর বসিয়া রাধা শোনে। তার ছেলে নিমু বোঝে সব, আর কেউ বোঝে না। কিন্তু ইহাও যেন আজ রাধা পরিষ্কার বোঝে—নিমু যেন ওদের চেয়ে অনেক বড়। তাহারা যা' বোঝে না, নিমু বোঝে। হয়তো তাই—নিমু তাহার সেই নিমু যেন আজ ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে—সরিয়া যাইতেছে সবার ভিতরে! তার নিমু এত আদরের নিমু!

গর্ব্ব—আনন্দ আর বিয়োগের ব্যথা—সব কিছুর সংমিশ্রণে দু'ফোঁটা অশ্রু রাধার দু'গাল বহিয়া গড়াইয়া পড়ে। নিষ্পলকে চাহিয়া রাধা কত কি ভাবে!

নিমুর বাক্স খুলিয়া রাধা একে একে সেই বহিগুলি বাহির করে। কত কত ছবি—কি সুন্দর! এগুলির কথাই হয়তো তাহারা বলিয়াছে—কেবল এক নিমাই বোঝে আর কেহই বুঝে না। রাধাও চাহিয়া থাকে অনেকক্ষণ—কিন্তু একটি কথাও বুঝিতে পারে না। রাধার মনে হইল, আজ এ বইগুলিই তাহার নিমুকে এত বড় করিয়াছে। এইগুলি হাতে করিয়াও সত্যই আজ তাহার ভারী তৃপ্তি, বড় আনন্দ! কিন্তু এ আনন্দের অন্তরে বসিয়াই আজ কে যেন তবু অশ্রুপাত করিতেছে। গর্ব্ব-দীপ্ত চোখ দুটিও বারে বারে সজল হইয়া উঠে। বইএর ছাপানো অক্ষরগুলিতে মনে হয় যেন অশ্রুর ছোঁয়া লাগিয়াছে। নিমু—তার নিতান্ত আপনার নিমু! কিন্তু আজ সে সবার নিমু! সে কি গর্ব্ব! কি আনন্দ! তবু যেন অন্তরের অজ্ঞাত এক কোণে হারানোর ব্যথা।

কই! সে নিমাই তো আর নাই; ছোট সেই নিমাই—মায়ের মুখের দিকে কারণে অকারণে তাকাইয়া হাসে। ডাকে—মা! মা!

সে দিন কি আর ফিরিবে না—কোন দিনও না! সেই নিমাই—তারই একান্ত আপনার নিমাই!

কোজাগরী রাত! কথক ঠাকুর ঢুলে মালীর ছোট উঠানে বসিয়া কৃষ্ণলীলার পালা গায়।

তারি পাশে মাদুর পাতিয়া ছেলেবুড়ো নির্ব্বিশেষে বসিয়া গেছে। সবাই নিস্তব্ধ। আকাশে পূর্ণিমার জোৎস্না—কুহেলীমায়া।

সাতকড়িই একদিন প্রথম প্রস্তাবটা তুলিয়াছিল—"ঢুলেদা! ছেলে তো তোমার কামাই করে' ঘরে এল। এবছরও কি কোজাগরিটা অমনি যায়?"

প্রস্তাব সমর্থন করে নিতাই: "কিহে ঢুলাই, সত্যিই তো"—সেই আবার বুদ্ধি দেয়: "এক কাজ কর বরং—বেশী কিছু করতে বলব না—নূরনগরের কানাইঠাকুর ভাল পালা গায়—এক পালা এনে গাওয়াও—সবারই শোনার ইচ্ছে গানও শোনা হবে—রাতও জাগা হবে। আজ ক'বছর ধরে তো ও কম্ম আর করিনি!"

ঢুলে আসিয়া এক ফাঁকে সলজ্জ হাসিয়া রাধার কাছে কথাটা পড়িল—"সবাই ধরেছে! নিমুকে বল্লে হয় না?"

রাধাই হাসিতে হাসিতে ছেলের কাছে কথাটা পাড়িল।

কানাই ঠাকুর গাহিতেছে—

ব্রজের সেই ননীচোরা কানু সেই চঞ্চল-চপল কানু—আজ মথুরায় রাজা হইয়াছে। আজ তাঁহারই যজ্ঞোৎসব।

উৎসবে আসিয়াছে সবাই—কিন্তু দ্বারে আসিয়া আটকাইয়াছে—দ্বারী পথ ছাড়ে না।

আসিয়াছে যশোদাও—পুত্রশোকাতুরা যশোদা—শুধু একবার ছেলেকে—তার অত আদরের কানাইকে একবার দেখিয়া যায়—চোখের দেখা।

দ্বারী দ্বার ছাড়ে না।

যশোদা বোঝায়—সে তো তাদেরই কানাই—ননী-চোরা কানাই—কানাই রাজার যজ্ঞে তাহারা যাইবে না!

দ্বারী তবু দ্বার খোলে না।

যশোদা কত অনুনয় করিয়া বলে—সেই চঞ্চল কানাই, তার কত বাল্যকথা—একে একে কহিয়া যায়—

মাতৃহৃদয়ের বেদনা বুকে লইয়া কথক ঠাকুর দরদীকণ্ঠে গায় সকলকে কাঁদাইয়া। চোখের জলে সকলেরই বুক ভাসিয়া যায়!

রাধাও শোনে—কাঁদে—আর কাঁদে!

*   *   *   *

যেন নিমাই চলিয়া যাইতেছে। ওই যে পালতোলা নৌকা—নীল পাল—ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছে নীল আকাশের গায়।

—"নিমাই! নিমাই"—রাধা প্রাণপণে ডাকিতে চায় —"নিমাই, নিমাই"—রাধা ডাকিতে পারে না—ডাকিয়া নিমাইকে ফিরাইতে পারে না।

মুখে শব্দ ফোটে না। আবার ডাকিতে চায়— "নিমাই! নিমাই!" না—পারে না এবারও!

নৌকা চলিয়া যাইতেছে। ওই-যে দূরে—আরও দূরে!—"নিমাই! নিমাই!"

না-না, পারে না! রাধা আর ডাকিতে পারিতেছে না। বিমূঢ়ের মত রাধা চাহিয়া থাকে দিগন্তের দিকে! "নিমাই!" ও-কে পেছন টানে! কে ও!

রাধা পেছনে তাকায়—ছোট একটা ছেলে; যেন নিমাই—ছোটবেলার সেই নিমাই—ঠিক সেই—রাধার আঁচল ধরিয়া টানিতেছে—"আম্মা! আম্মা!"

রাধার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

*   *   *   *

কথক ঠাকুর গাহিতেছে, দ্বারী দ্বার খুলিল না। যশোদা কত করিয়া কাঁদিল, কত বোঝাইল, কত আশীর্ব্বাদ করিল—

দ্বারী তবু দ্বার ছাড়িল না।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি। কবি-উচিত ভাবাদি-অনুভূতি তাঁহার রচনাবলীতে পরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবাবেশে অভিভূত হয় নাই। সুষ্ঠু অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার কবিতাকে উচ্চাঙ্গের দর্শনে পরিণত করিয়াছে।

প্রকৃত দার্শনিক সত্যদর্শী। তাঁহার অনুভূতি দৈনন্দিন ক্লেদ-ক্লান্তি ভেদ করিয়া প্রকৃত রসগ্রাহী এবং জীবনকে সকল অনুভূতি সাহায্যে সম্পূর্ণ ভোগক্ষম। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম যুক্তিজাল অবলম্বনে নহে, পরন্তু অন্তঃস্থ প্রজ্ঞা অবলম্বনে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

কবি ও দার্শনিক আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নপন্থী। কবির ভাবাবেশ ও অলঙ্কারজাল দার্শনিকের চিত্তগ্রাহী নহে। দার্শনিকের ভাবলেশহীন বিচার ও বিশ্লেষণ কবির মনঃপূত নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই দুইটী ভিন্নমুখী প্রকৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ভারতীয় অন্যান্য কবিতেও এইরূপ সমন্বয় বিরল নহে।

মানবের দৈনিক জীবনযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন ও তাহার প্রচার করিয়াছেন। আনন্দ-অনুভূতি যাহাতে সকল কর্ম্মচেষ্টায় সব সময়ে পরিস্ফুট থাকে, এই লক্ষ্য তিনি সম্মুখে রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার আদর্শ ছিল—

নয়ন দুটী মেলিলে কবে পরাণ হ'বে খুশী,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।

আনন্দ উপভোগ ও আনন্দবার্ত্তাপ্রচারে উপনিষদের শান্তিপাঠ মনে পড়ে—

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥"

বুদ্ধিবৃত্তি মানবের উদ্ভব-মূল। সংস্কারাধীন অন্যান্য জীব হইতে মানব এই বৃত্তির কারণেই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিবৃত্তি বিচারক্ষমতার উৎস। মানবপ্রকৃতির বিকাশ এই বিচারক্ষমতার যথার্থ নিয়োগ ও তদনুযায়ী জীবনযাত্রা-নিয়ন্ত্রণ-অবলম্বনে। আমাদের মনোবৃত্তি এই পথে চালিত হইলে, সত্যদৃষ্টিলাভ হইবে। সংসারে যে সব দুঃখ, অশান্তি, দৈন্য, সংকীর্ণতা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির জড়তাপ্রসূত। এই সকল অপূর্ণতা মানবের প্রকৃত পরিচয় নহে। নগরের আবর্জ্জনাস্তূপ নগরীর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। উহা বর্জ্জনীয় অংশ মাত্র। তবে উহার বর্জ্জনীয়তা অনুধাবনযোগ্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহা এ জীবনে সত্য ও নিত্য, তাহা সুন্দর, আনন্দময়। সন্ধান করিলেই তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় এবং এই সুন্দরের সন্ধান আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তেরই কর্ত্তব্য। আমাদের কবি এই বার্ত্তাই প্রচার করিয়াছেন—

"আনন্দেরি সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বস্‌রে সবাই
টানরে সবাই টান।

* * *

আকাশ-জল-বাতাস আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া সবায়
বাসিবে নানা সাজে।"

বিচার যে ক্ষেত্রে ভাবাবেগ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে উহা দুর্ব্বলতার ফল। বিধাতার সৃষ্টিতে দুর্ব্বলের স্থান নাই। দুর্ব্বল জীবনস্রোতে ক্রমশঃ পার্শ্বক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হয়। মানবের বুদ্ধিবৃত্তিই এই দুর্ব্বলতাপরিহারের অবলম্বন। কিন্তু এই বৃত্তির নিয়োগ মানবেরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং মানব স্বেচ্ছায় পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ, এবং স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথেও চলনে সমর্থ। নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাবেগই মানবের বিকাশ-পথ। রবীন্দ্রনাথে এই সত্যটার চমৎকার উপলব্ধি পাই:

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে।

* * * *

এ যে তব দয়া জানি, জানি হায়,
নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে' এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে
আধা-ইচ্ছার সংকট হ'তে বাঁচায়ে মোরে।"

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগ ছিল নৈরাশ্যবাদী ও ব্যর্থতাধর্ম্মী। এ সময়ের অধিকাংশ সাহিত্যই "করুণ রস" অর্থাৎ দুঃখ-বর্ণনাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ যুগেও সে প্রভাব সম্পূর্ণতঃ দূরীভূত হয় নাই। এই কারণে এ দুঃখবাদীর দেশে দুঃখ-কাহিনী লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ ও উহার সমাদরও সহজলভ্য। তাই শ্রাবণে বর্ষার জলধারা দেখিয়া মৃত শিশু ক্রোড়ে মাতার অশ্রুধারা রবীন্দ্রনাথের মনে উদয় হয় নাই। তিনি গাহিয়াছেন—

"ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্গল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল পাগল
আজি ভাদরে।"

নিরানন্দ, সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর প্রতিও কবির কোন সহানুভূতি নাই:

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ......"

মরণের সম্ভাবনাও কবিকে অভিভূত করিতে পারে নাই। সেখানেও তিনি আনন্দের স্পন্দন পাইয়াছেন—

"জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানবজীবন।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটী নয়ন মেলে।"

কবির আনন্দোপলব্ধি যেন উপচিয়া পড়িয়াছে এই কয়টী ছত্রে—

"যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটেছে হাসি'
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী
কাটবে সকল বেলা।"

সমপিত কবির মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁর কয়েকটী প্রার্থনায় সুস্পষ্ট পরিস্ফুট—

"আমারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে,
তোমার ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথের বার্ত্তা যুগপ্রবর্ত্তক। ভারতীয় চিন্তাধারার এইরূপ বিবর্ত্তন নূতন নহে। যত দূর দেখা যায়—প্রথম উদাহরণ উত্তরমীমাংসা বা উপনিষদ্‌গুলি। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আতিশয্য-ফলে উপনিষদের প্রতিষ্ঠা। আবার উপনিষদ্‌মূলক যুক্তিতর্কের ক্রমবর্দ্ধী জটিলতার প্রতিক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধ চিন্তাধারায় দার্শনিক বিচার সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সম্যক্‌ জীবনযাত্রাবলম্বনে মুক্তিই লক্ষ্য। সংসারের অসারতা প্রচারিত হইল। জীবনের আনন্দ অপকৃত ও পরিহার্য্য বলিয়া ধার্য্য হইল। ক্রমে ইহার কুফল ফলিলে, কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের যুগে বেদান্তদর্শনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এই চিন্তাধারার বিবর্ত্তনে চৈতন্য যুগে ভক্তিমার্গের প্রতিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত ও মানবীয়তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল। কিন্তু সহজ-জীবনযাত্রার আনন্দ তখনও উপলব্ধ হয় নাই। ফলে মনোবৃত্তিতে ক্রমে বিকার সঞ্চারিত হইল। এই বিকৃত জড়ত্ব বহুদিন ছিল। অবশেষে রামমোহন রায় পুনরায় বেদান্তমূলক চিন্তাধারা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বেদান্ত-মতের সার্ব্বভৌমিকতা ও ঔদার্য্য প্রচার করিলেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সাধনা ও বার্ত্তা রামমোহন রায়প্রবর্ত্তিত চিন্তাধারারই ক্রমবিকাশ। বর্ত্তমান যুগে ইহার পরিণতির প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, প্রধান প্রচারক রবীন্দ্রনাথ। মানব-ধর্ম্ম তাঁহার নিকট মূর্ত্ত হইয়াছে। শ্রেণীভেদ ও মানবে-মানবে ব্যবধান কবির অসহনীয়। দীন-দরিদ্র সামান্য মানবে কবি ভগবানের সন্ধান পাইয়াছেন—

"যেথায় থাকে সবার অধম
দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পাছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে
অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না
নমস্কার।
তবু নত করি' আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে
হীন-পতিতের ভগবান।"

দার্শনিকের পরিণতি ঈশ্বরানুভূতিতে। এই অনুভূতির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি নানা দৃষ্টিকোণ হইতে স্রষ্টার উপলব্ধি প্রচার করিয়াছেন।

"এ যে তব দয়া জানি, জানি হায়,
নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে।
* * *
তোমারে চিনিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হ'বে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আত্মসমাধি ও প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা; দৈনন্দিন ধূলা-মলিনতার আচ্ছাদন ভেদ করিয়া চিরসুন্দরের উপলব্ধি, পরমত-সহিষ্ণুতা, ঔদার্য্য, মানসিক সংকীর্ণতাত্যাগ, দৈনন্দিন জীবনে উপনিষৎ ও গীতার বার্ত্তা প্রচার—এই নব আদর্শ বাঙ্গালী ভদ্র সমাজের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছেন :

"নিশীথ শয়নে, ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তর্য্যামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমারি চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী।
সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসি' ঘরে,
তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে,
আমার শ্রান্ত মনের ভাবনা, বেদনা
তোমারে সঁপিব আমি।"

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যুক্তি-সূক্ষ্মবিচারের নিবিড় জাল-বেষ্টনী হইতে দর্শনতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া গানের সুরে বাঙ্গালীর অন্তরে তাহা প্রচার করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতে বসিয়া যেন তাঁহার এই বার্ত্তা বিস্মৃত না হই।

"তোমারে দূরে সরিয়ে মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কাণ্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।
আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমার সত্য হ'বে,
বাঁচব তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।"*

* কার্কী (বোম্বাই) রবীন্দ্র-জন্মতিথি সভাতে ৬ই মে তারিখে পঠিত।

(তৃতীয় খণ্ড : ২৭শ পরিচ্ছেদ)

বিপদ্ যখন ঘনাইয়া আসে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত, সে বড় ভীষণ এবং প্রলয়ঙ্কর মনে হয়। কিন্তু কালের সঙ্গে বিপদের অন্তর্দ্ধানে আবার পথ বাহির হয়। পথিক চলে অভীষ্টপূরণের লক্ষ্যে। যাত্রা আমার চির দুর্গম। বাহির হইতে ইহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রতিপদে আমি সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছি।

যাহা ঘটে, তাহা অঙ্কের অংশে তত অনুকূল কোন দিনই নয়। সব কিছুর প্রতিকূলে থাকিয়া আমার পথ কঠোর তপঃসাধ্য করিয়াছে। আমাকে মানুষ আজ যাহা মনে করিয়াছে, কাল তাহা হইতে ভিন্ন দেখিয়া কেহ বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়াছে; কেহ বা বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে নাই। দুই দিন পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম, দুই দিন পরে তাহা থাকিতে পারি না। আমার অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনের পথে অনেকেই ক্লান্ত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা আমার সাথী রহিয়া শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইল, সঙ্ঘের ইতিহাসে তাহারাই ধন্য হইল, অমর হইয়া রহিল।

এই আবর্ত্তময় পথের অনুসরণ-প্রবৃত্তি অনেক নারী-পুরুষের জন্মিয়াছে। অনুসরণ-প্রয়াস কোথাও অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হয় নাই, অক্ষমতাই ইহার জন্য দায়ী মনে হইয়াছে।

অনির্দ্দিষ্ট জীবনের পথে আমরণ চলার প্রথম প্রতিশ্রুতি মূর্ত্ত করিয়া চিরকীর্ত্তি রাখিয়াছেন আমার জীবন সঙ্গিনী। নিঃসঙ্কোচে আত্মকথা ব্যক্ত করিয়া, তাঁহারই অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছি "জীবন-সঙ্গিনী"র কথা লিখিতে গিয়া।

জীবনের সূত্র সুরু হইল কেমন করিয়া কোন লক্ষ্যে? আর তাঁহার কল্পসৃষ্টি পদে পদে ভাঙ্গিয়া আমার অনুসরণ তাঁর পক্ষে কি কঠোর তপস্যা, তাহা যখন ভাবিতে বসি, তখন তাঁর প্রেমোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি আজিও আমায় বিমোহিত করে। আকুল হইয়া ভাবি—সে দিনের বাধা-বিঘ্ন আজিকার ন্যায় এত কঠিন ক্লেশসাধ্য নহে। আজ যদি তিনি সঙ্গে থাকিতেন, অনেক সান্ত্বনা পাইতাম।

সে দিন ছিল যে জীবনের সমস্যা, তাহা আজিকার ন্যায় দুর্ভেদ্য জমাট অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। বাহিরের ঘটনা পথ আগুলিয়া ধরিত, অন্তরের সাধনা জটিল সমস্যাপূর্ণ মনে হইত, কিন্তু সবই ছিল নিজেরই করায়ত্ত। ইচ্ছায় সব অতিক্রম করিতাম। কিন্তু আজ নিজের ইচ্ছায় সমস্যা অতিক্রান্ত হয় না। প্রতীক্ষা করিতে হয়—অলক্ষ্য শক্তির অনুগ্রহের। এ যে কি কঠোর তপস্যা, সে কথা গুছাইয়া বলা যায় না। রাজশক্তি—ইংরাজ ও ফরাসী—দুই দিক্ হইতে আঘাত দিয়া আমায় নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছে। আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহা নিবারিত হইতে দেখিয়াছি।

কিন্তু এই সকল কথা বলার পূর্ব্বে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভবিষ্যৎ যুগের জন্য যে দিব্য সঙ্কেত লাভ করিলাম, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে সেই অনুভূতির কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর সঙ্ঘের অন্যতম ছাত্র ও সাধক শ্রীমান্ অদ্বৈতচরণ রায় মাতৃহারা হইয়া নবজীবনের দীক্ষা প্রার্থনা করে। আশ্রমে শ্রীমান্ অদ্বৈতের মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হইলে, তাহার কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত হয় তাহার প্রতিধ্বনি আজিও কাণ পাতিয়া শুনিতেছি। অদ্বৈত আজিও সঙ্ঘতীর্থে আত্মবলি দিবার কঠোর সঙ্কল্প বুকে লইয়া দৃঢ় পদে দাঁড়াইয়া আছে।

সেদিন সে বলিয়াছিল, "দেখিলাম সন্তানের উপর করুণ কটাক্ষ করিয়া মা চিরপ্রস্থান করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে একটা দিব্য ইঙ্গিত ফুটিল। মায়ে-সন্তানে নিত্য সম্বন্ধের সুর শুনিয়া এইখানে পাইলাম নবজন্মের আস্বাদ। এমন নবজন্ম লাভ হইয়াছে যাহাদের অন্তরে, অন্তরে তাহারা মিলিত হইয়াছে। এস, আমরা একটা ভাগবত সন্তান-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ স্থাপন করি।"

শ্রাদ্ধসভায় বহু নারীপুরুষ একত্র হইয়াছিল। পূর্ব্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে সকল সন্তান নবজন্ম-লাভের অগ্রণী, অদ্বৈত তাহাদের অন্যতম। সে আসিয়া যখন আমার পত্নীর চরণ অশ্রুসিক্ত করিল—আমি দেখিলাম, সেই মৌন নীরব মূর্ত্তি অদ্বৈতকে অলক্ষ্যে বুকে তুলিয়া লইলেন। সঙ্ঘের ইতিহাসে অদ্বৈতের জন্মান্তর ঘটিল এই দিন। স্বামী চিদানন্দ মাতৃহারা হইয়া দিব্য জননীর হৃদয়ে যেমন স্থান করিয়া লইয়াছিল, অদ্বৈতকেও এই পথ অনুসরণ করিতে দেখিলাম। সঙ্ঘসৃজনের পরিকল্পনা কিছুই ছিল না। শ্রীহট্ট হইতে এই সন্তান মাতৃতীর্থ-রচনায় আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হইল। আমি তার পরলোকগতা জননীর উর্দ্ধগতি কামনা করিয়া শ্রাদ্ধসভা সমাপন করিলাম।

অন্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের প্রতি তরঙ্গ সর্ব্বপ্রথম আমার পত্নীকেই বুক পাতিয়া ধরিতে হইত। তারপর সেই ভীমজলোচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত হইত একদল পুত্র-কন্যা। সঙ্ঘের এই অনবদ্য ইতিহাস মুছিবার নহে। আমি জীবন-সঙ্গিনীর কি কথা লিখিব? ধীরে ধীরে পতি-পত্নীর মধ্যে যে লৌকিক সম্বন্ধ, তাহার চিহ্ন নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেন আমার সাধনপথে। দুইজনেই নীরবে চলিয়াছি অনাগত অধিকতর কঠোর যুদ্ধের প্রতীক্ষায়। অদ্বৈতের মাতৃশ্রাদ্ধের পর কি এক গুরুতর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন যেন হইতে চলিয়াছি। এ পথের সহায় কিছুই নাই, কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাই না। পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখি—তিনি অপলকে আমার দিকেই চাহিয়া থাকেন। আমার মাথার খুলির মধ্যে বহু সঙ্গত অসঙ্গত ঢেউ উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। স্বপ্নের রঙে চক্ষে ফুটিয়া উঠে অপার্থিব দীপ্তি। তিনি চাহিয়া চাহিয়া কখনও পুলকিত, কখনও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কি করিতে চাহ তুমি—পাগলের মত তোমার দৃষ্টি আমার বড় ভয় হয়। কি করিলে তোমার সহায় হইব, ভাবিয়া পাই না!"

বলিবার কিছু নাই, করিবার যাহা তাহা স্বতঃই হয়। মাথার মধ্যে যে ঝড় বহিয়া চলে, তাহা কোন পথে আমায় লইয়া চলিবে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারি না। বাংলার চতুতীর্থের কথা আমিই অধিক করিয়া প্রচার করিতাম। নান্নুরের প্রেম মন্ত্ররূপ লইয়া দেখা দিয়াছে নবদ্বীপে, কল্পনয়নে তাহা দেখিয়া আনন্দে হৃদয় উথলিয়া উঠে। নান্নুর-নবদ্বীপ দর্শন করা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সেদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান, শক্তি, প্রেম চাহিয়াছি অলক্ষ্য দেবতার নিকটে। লক্ষ লক্ষ বার মন্ত্রের ন্যায় জপিয়াছি 'জ্ঞান শক্তি, প্রেম দে!' প্রেমের মাধুর্য্যে হৃদয় ভরিয়াছে। শক্তির ঐশ্বর্য্যে সবখানি পূর্ণ করার সাধ আছে। জ্ঞানের দেবতাকে খুঁজিয়া পাই না। তিনি বুঝি কেবল চৈতন্য। শুনিয়াছি—শক্তির সাধনায় নিত্য শাশ্বত জ্ঞানলাভ হয়। প্রেমের জন্য সহজিয়া, শক্তির জন্য তন্ত্রসাধনার সীমা পার হইয়া আসিয়াছি। পিরীতি-মন্ত্রের মূর্ত্ত দেবতা নবদ্বীপচন্দ্রের অশরীরী নূপুর বাজিয়াছে আমারই প্রাঙ্গনে। তাঁহার কনককান্তি অন্তর ভরিয়া দেখিয়াছি। নান্নুর ও নবদ্বীপ আমার মধ্যে চিরমূর্ত্তি লইয়া বিরাজ করে। শক্তির মন্ত্র উদ্গীত হইয়াছিল হালিসহরে। দক্ষিণেশ্বরে তার অনুবাদ রামকৃষ্ণে। সাধ হইল দেখিয়া আসি হালিসহর। শক্তি-মন্ত্রে সিদ্ধ রামপ্রসাদের পদরজঃপূত তীর্থে ধূসরিত অঙ্গে শক্তির অনুভূতি-লাভের আকাঙ্ক্ষায় পত্নীকে বলিলাম "চল, হালিসহর ঘুরিয়া আসি।" নিত্যসঙ্গিনী তিনি মহানগরীর ধূলিসমাচ্ছন্ন রাজপথে তাঁর ভ্রমণ-সাধ ছিল না। আমরা দুই জনে ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে চলিলাম হালিসহর লক্ষ্যে। সঙ্গে ছিল সেদিন সাধের কৃষ্ণচন্দ্র। সে আজ ইহ-জগতে নাই। সেও নবজন্ম লইয়াছিল সেই দেবজননীর পবিত্র অঙ্কে। তাঁরই পায়ে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া সার্থক হইয়াছে।

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় রামপ্রসাদের সাধনপীঠে আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। বৃক্ষশাখায় শীতের ম্লান রৌদ্র লুকোচুরি খেলিতেছে। অতি নির্জ্জন স্থান। জনমানবের সাড়া নাই। চক্ষে পড়িল তিনটী বৃষের সহিত একটী গাভী দাঁড়াইয়া তৃণ চর্ব্বণ করিতেছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

"চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে।
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরই বাংলা রে॥"

দেড় শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, রামপ্রসাদের কণ্ঠ আজিও বাঙ্গালী শুনে। কিন্তু রামপ্রসাদকে কেহ চিনে না। সেদিন দেখিয়াছি—রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য দুইটি কুঠরী ও একটি মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তাহা অর্থাভাবে অসম্পন্নই রহিয়া গিয়াছে।

গৃহদেবী চারিদিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন "তুমি চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ বলিয়া এমন আকুল হও, রামপ্রসাদের ভিটা এমন অনাদৃত থাকে, সেদিকে তো লক্ষ্য দাও না!"

হায় উন্মাদিনী! স্বামী যে তোর ভিখারী, সাধ্য তার কিছুই নাই। বাঙ্গালীর আত্মা সচেতন হইলে এই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। আজ শুনি রামপ্রসাদের ভিটা সংস্কৃত হইয়াছে।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রামপ্রসাদ মানুষ-গড়ার মন্ত্র বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠেই শুনিয়াছি—

"মন, তুমি কৃষি কাজ জান না!
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোণা।"

এ পথে বিনাশের ভয় পদে পদে, তাই তিনি মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া ঘেরা দিয়া ফসল বোনার নির্দ্দেশ দিয়াছিল। নির্ম্মাণযুগের আদি পুরুষ রামপ্রসাদের বাণী যদি আমরা শুনিতাম—সন্তানব্রতীতে এ দেশ ছাইয়া যাইত। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি সার্থক হইতেন।

স্বদেশী যুগের আবির্ভাবে বাংলার কয়েক জন মনীষী এই দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজপতি সুরেশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম যেন আমরা স্মরণে রাখি। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমোৎসব ও হালিসহরে রামপ্রসাদের হাট বসাইয়া তাঁহারাই বাঙ্গালীর দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যোগতত্ত্ব রামপ্রসাদের কণ্ঠে সহজ সুরেই বাজিয়াছে। তিনি শয়নে প্রণাম, নিদ্রায় ধ্যান, ভোজনে আহুতি, সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মময়ীকে স্মরণে রাখার জীবন-যোগের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমি আকুল হইয়া এমন কত কথা পত্নীকে শুনাইলাম। তিনিও আত্মহারা হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ এক ভৈরবী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যদেব প্রায় অস্তাচলে। রক্তরাগে সন্ন্যাসিনীর ললাট প্রদীপ্ত। আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইলাম। ভৈরবীর নয়নে অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল। ভাবাবেগে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওরে ডাকার মত ডাক দিতে পারিস্? তোকে দেখে ছুটে এলাম। ডাকার মত ডাক দিলে মা এসে বেড়া বাঁধেন। গাব গাছে জবা ফুল ফোটান। সংসারে কিছুরই অভাব রাখেন না। তুই ডাক্‌বি?"

ভৈরবী হয়তো উন্মাদিনী। কিন্তু ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে তাঁহাকে অসাধারণ রমণী বলিয়াই মনে হইল। তিনি হঠাৎ বলিলেন "প্রসাদের আসনে বস্‌বি? বস্ না?" আমি বলিলাম "প্রসাদের আসনে বসিলে অপরাধ হইবে না তো?" ভৈরবী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন "আসন তো বসার জন্যই রে! প্রসাদ বসেছিল মাকে ডাকতে, তুই মায়ের ছেলে কেন বস্‌বি না? আয়, আয়" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

আমার স্ত্রী হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি বস্‌বে নাকি?" আমি বলিলাম "কেন, তোমার ভয় হচ্ছে?" তিনি আর কিছু বলিলেন না। আমরা দুই জনে গিয়া পঞ্চবটীর মূলে বসিলাম। কি জানি চক্ষু কে যেন জোর করিয়া মুদিয়া দিল। কি এক ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের শান্তিশীতল ছায়ায় হৃদয় তলাইয়া গেল। যেন কর্ণে বাজিল সুমধুর স্বরে কে গাহিতেছে—

"ডুব দে মন কালী ব'লে
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।"

দমসামর্থ্যে এক ডুবে কুলকুণ্ডলিনীর কূলে গিয়া পৌছিতে হয়। এই দম আর কিছুই নহে। জ্ঞান আর শক্তি। এইখানেই প্রেমের শতদল-শোভা। "জ্ঞান-শক্তি-প্রেম দাও" বলিয়া মন্ত্র-জপের সার্থকতায় কে যেন হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিল। কতক্ষণ নিমীলিত নেত্রে ছিলাম জানি না, গৃহদেবী আমার দিকে অপলকে চাহিয়া আছেন। চক্ষু চাহিয়া ভৈরবীকে আর দেখিলাম না। দেখিলাম—আর এক অপরূপ দৃশ্য। যে তিনটী বৃষভ ও গাভীটীকে তৃণ চর্ব্বণ করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে দুইটী বৃষ পঞ্চবটীমূলে আসিয়া আমাদের দুইজনের দুই দিকে কি

এক অপার্থিবভাবে নিস্পন্দ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। অপর বৃষটী আগতযৌবনা গাভীর সঙ্গে রিরংসার তাড়নায় উন্মাদ। আমাদের দুই জনের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হইল। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম—কি এক অলৌকিক প্রভাবে তাহারা রিরংসার উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্তব্ধ-স্থির, পরস্পরের প্রতি প্রেম-সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর নিস্তব্ধতা। কৃষ্ণচন্দ্র আসনের কিছু দূরে বসিয়া রঙ্গ দেখিতেছিল। সন্ধ্যার আকাশে অন্ধকারের আঁচড় পড়িয়াছে। আমাদের চক্ষে এই রিরংসা প্রতিনিবৃত্ত স্থিরপ্রতিষ্ঠ বৃষ-দম্পতীর যুগল মূর্ত্তি তন্ত্রসাধনার দিব্য রহস্য পরিস্ফুট করিয়া দিল। দূর হইতে গৃহস্থের অঙ্গনে সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিল। আমরা প্রস্থানের উপক্রম করিতেছি—এক কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ যষ্ঠী হস্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গলিত দন্ত, কেশহীন মস্তক। নাম তাঁর সারদাচরণ বাচস্পতি। তিনি এক নিঃশ্বাসে রামপ্রসাদের জীবনকথা শুনাইলেন। কথা শেষ করিয়াই তিনি যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন, তেমনভাবেই প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মুখের শেষ কথাটী মনে আঁকিয়া আছে। তিনি বলিলেন "রামপ্রসাদের শেষ কামনা ছিল—

"প্রাণ যাবার বেলায় এই করো মা
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।"

সে সাধ জগদম্বা অপূর্ণ রাখেন নাই। গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াই রামপ্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদ হইয়া তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার শেষ সঙ্গীত যেন এখনও বাতাসে ভাসিয়া যায়:

"নিতান্ত যাবে দিন, এ দীন যাবে, কেবল
ঘোষণা রবে গো!"

আমরা নৌকায় আসিয়া বসিলাম। সারা পথে আমাদের মুখে কথা ছিল না। সকলেই প্রসাদের প্রভাব-মুগ্ধ হইয়া অপার্থিব মাতৃপ্রেমে অভিষিক্ত হইয়াছিলাম।

ডিসেম্বর মাসের শেষ হয়, মণীন্দ্রনাথ কংগ্রেসই-জেনারেল হইয়া এই সময়ে পণ্ডিচেরীতে যায়। এই সন্ধিযুগে শ্রীঅরবিন্দের সাড়া যদি পাই, জীবনের পথ সহজ হয়। এই প্রত্যাশায় তাঁহাকে এক পত্র দিলাম। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব অসামান্যরূপে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। চলার পথ পাই, কিন্তু আশ্রয়-চিন্তা হইতে মুক্তি পাই না। যাহা যায়, তাহা যদি সত্য না হয়, তাহা তো আর ফিরিবে না! একমাত্র সত্যই শত শতাব্দীর অন্ধকারে লুপ্ত হয় না। তাই যাহা যায়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ পাওয়ার প্রয়াস হয়। মণীন্দ্রনাথকে পত্র দেওয়ার মূলে এই সত্যই নিহিত ছিল। মণীন্দ্রনাথ জানাইল "সব কথা জানাইয়াছি। আপনি যেমন ভারতের যাহা সনাতন সেই পথের যাত্রী হইতে চাহেন, শ্রীঅরবিন্দও তাহাই চাহেন। কিন্তু তিনিও বলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া যতদিন না উঠে, ততদিন সে পথে চলা সম্ভব নহে। ভারতের সনাতন—তিনি তার আভাস মাত্র পেয়েছেন, কিন্তু কি ভাবে উহার মূর্ত্তি দেওয়া হইবে, তাহার নির্দ্দেশ দিতে পারেন না।"

মহাত্মা গান্ধির সহিত আমাদের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া তিনি বলেন 'আমাদের কাজ দেখিয়া তাঁহার মনে হয় যেন আমরা একটা movement-এ যোগ দিতে চলিয়াছি। ঐরূপ কাজ তাঁহার নহে। উপর হইতে নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা তিনি করিতেছেন। Spiritual এবং economy-র মধ্যেই তাঁহার কাজ আছে, কিন্তু কতকগুলি general ideas ছাড়া এখনও কর্ম্মের definite কোন ideas তিনি পান নাই।' তাঁর আরও কথা ছিল "Vital, physical এবং intellectual পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ না হ'লে, এই সকল ক্ষেত্র হইতে বিপদ্ ও ভ্রান্তি আসিবেই। গান্ধির প্রধান কাজ অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া স্বরাজানয়ন। চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন পন্থায় কার্য্য করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের সনাতন যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। স্বরাজ অর্থে ভারতের সনাতনকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠ করা। যতদিন ইহার পরিপন্থী conflicting elements কার্য্য করিতেছে, ততদিন কর্ম্মসাফল্য সম্ভব নহে। তবে ইহা চিরদিনই থাকিবে, এই সবের harmony-র প্রতিষ্ঠা না হইলে, কর্ম্ম সম্ভব নহে।" তারপর তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন "মতি কাজে নামিয়া গিয়াছে। কি ভাবে কাজ হইতেছে, তাহা দেখি নাই; কাণে শুনিয়া যে idea হইতেছে, চক্ষে না দেখিলে কিছু বলিবার নাই। তবে আমি যখন বাংলায় কাজ সুরু করিব, মতির সঙ্গে বুঝাপড়া করা হইবে।"

মণীন্দ্রনাথের পত্র পাইলাম ২৯শে ডিসেম্বর। আমার রক্তধারায় ভারতের প্রাণস্পন্দন শুনিতেছি। বাংলার ধূলিকণায় অতীতের সমস্ত সাধনাই অনুস্যূত ছিল, তাহা যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে সংলিপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাণ, মন ও বুদ্ধির শোধনের যে প্রতীক্ষা, তাহার কল্পনাও করিতে পারি না। জ্ঞানঘন চৈতন্যলাভ নৈষ্কর্ম্যে হয়, তাহা অপরীক্ষিত। এতদ্ব্যতীত ভারতের শাস্ত্র কষ্টি পাথরের মত—কর্ম্মের যাচাইয়ে মানুষের শুদ্ধির পরিমাপ ধরা পড়ে। গীতায় নির্ধূম অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের সম্ভাবনা না থাকারই কথা আছে। বেদান্তের বাণী বুকে হাতুড়ি মারিয়া বলে—কর্ম্ম ও জ্ঞানের তীর্থ ভারতবর্ষ। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর নিরপেক্ষ। কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞানে অন্বিত হইলেই জীবন সার্থক হয়। কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করাই জ্ঞানসম্বলিত কর্ম্ম। তাহার একমাত্র উপায় চিত্ত নিরাসক্ত করা, নিষ্কাম কর্ম্মে অবহিত হওয়া। কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে করিতেই প্রাণ, মন ও বুদ্ধির শোধন হয়। যেখানে কর্ম্মফল ব্যক্তিত্বের সীমায় আটক পড়ে, সেইখানেই সঙ্কট ও ভ্রান্তি। মানুষের দ্বারা সনাতন ভারতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সেই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর। আজ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সে যুগের কথা লিখিতেছি। কর্ম্মমাত্রের অধিকারটুকু রাখিয়া সমস্ত ফলই ঢালিয়া চলিয়াছি ভারতের বেদীমূলে। ব্যক্তিত্বের অহমিকা নিষ্কাম কর্ম্মের হোমানলে দগ্ধ হয়। আজিও সর্ব্বহারা ভিখারী কর্ম্মক্ষেত্রে উত্থানপতনের রঙ্গ দেখি, কিন্তু চলিয়াছে যাত্রী ভারতের সনাতনপ্রতিষ্ঠায়। সঙ্গী যারা—তাদের সংখ্যা অল্প হউক, ক্ষতি নাই। ভারতের সনাতনকেই প্রতিষ্ঠা দিয়া প্রকৃত স্বরাজের সাধনা চলিয়াছে, এ কথা বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয় না। সঙ্কট ও ভ্রান্তি প্রতি পদে; কিন্তু সমুজ্জ্বল হুতাশন ধূমাচ্ছন্ন হইলেও, সে রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ভারতের স্বরাজ চাই। দাবীর কণ্ঠে নয়, আন্দোলনসৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই। ভারতের সনাতনকে আবিষ্কার করিতে হইবে। ভারতীয় রক্তধারার অনুসরণ ভিন্ন ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। বাংলার একদল মানুষ নিষ্কাম কর্ম্মের যদি সন্ধান পায়, এই সনাতনের দিব্যশ্রী তাহাদের লক্ষ্যে পড়িবেই।

লক্ষ্য ক্রমেই অটল স্থির হয়। কর্ম্মের অধিকার রাখিয়া সকল কর্ত্তৃত্বদায়িত্ব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছি। অহমিকাকে অপসৃত করিতে করিতেই কাজ আমার সুরু হইয়াছে। অনেককে এই পথের যাত্রী করিতে হইবে। অবকাশ নাই জীবনের। সে পুরুষ অথবা নারী যেই হউক, সঙ্গী হইতে চাহিলেই 'চল' বলিয়া তাহাকে আগাইয়া দিই। কেহ চলে, কেহ পিছাইয়া পড়ে, কেহ পাশ কাটায়। নির্ভয়, নিঃশঙ্ক চরণে চলিয়াছে অনন্ত পথের যাত্রী। লক্ষ্য তাহার স্থির। ভারতের সনাতন! তুমি আমার জাহ্নবী, যমুনা, গোদাবরী—বিন্ধ্য, মন্দার, হিমালয়—কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়—গুরু, মন্ত্র, প্রতিমা। ভারতেরই ব্যাস, বাল্মীকি, যাজ্ঞবল্ক্য। ভারতের রক্তধারায় সব যেন সমীকৃত হইয়া ইরম্মদ গর্জ্জন তুলে। উন্মাদ চলিয়াছে পরশ-পাথরের সন্ধানে। সে আমার ভারতের সনাতন ধর্ম্ম।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ শেষ হইল অভাবনীয় ভাবান্তরে। হৃদয়ের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া চলিতেন গৃহলক্ষ্মী। সর্ব্ব কর্ম্মে কঠোর ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি আকুলকণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করেন "ওগো বল তোমার কি চাওয়া, আমার ভয় হয় বুঝি কিছু দূরে গিয়া আমায় ছাড়িয়াই চলিবে। আমার ভয় দূর কর।" আমি তাঁকে বুকের কাছে লইয়া বলি "আমি কিছু দেখি না, সম্মুখে আমার অন্ধকার-যবনিকা—উহা বিদীর্ণ করিয়াই পথ বাহির হইবে। আসন্ন ঝড় অলক্ষ্যে, জীবনের সঙ্গিনী, তুমি সে পথে সহায় হইও।"

প্রত্যাশিত ঝড় উঠিল। যাহা অপ্রত্যক্ষে থাকিয়া বিভীষিকার আভাস দিতেছিল, তাহা বিকট আকৃতি লইয়া প্রত্যক্ষ হইল।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ এক ফরাসী পুলিস আমায় এক বিজ্ঞপ্তিপত্রে জানাইল, অদ্য ১০ ঘটিকার সময়ে বড় সাহেব বাহাদুরের সহিত আমায় সাক্ষাৎ করিতে হইবে। যে শিক্ষা ও সাধনায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে একদল তরুণতরুণী গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার ইতিবৃত্ত এখানে দিব না; কিন্তু নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক যে নির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা কর্ম্মে পরিণত করার জন্য ঋণভারে জড়িত হইয়াও সঙ্কল্প ছিল—আমাদের প্রত্যেককে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। তাই প্রতি সঙ্ঘসভ্য নানারূপ কর্ম্মক্ষেত্রে

ব্যাপ্ত থাকিত। সহরের দক্ষিণপ্রান্তে এইরূপ একটী বৃহৎ কাঠের কাজ চলিতেছিল। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রপরিদর্শনের অছিলায় বাহির হইলাম। যথাসময়ে বড়সাহেব বাহাদুরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময়ে মঁসিয়ে স্যাম্পিয়ঁ চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর ছিলেন। তিনি বরাবরই আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। স্বদেশী যুগের রাজনীতিক আবর্ত্ত হইতে দূরে থাকার জন্য তিনি আমায় অনেক উপদেশ দিতেন। সেদিন কিন্তু তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

তিনি কড়া গলায় আমায় বসিতে বলিলেন।

মঁসিয়ে স্যাম্পিয়ঁ পরিষ্কার ইংরাজী কথা বলিতেন। কিন্তু ফরাসী রাজকর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ক্রোধ প্রকাশ করিবার সময়ে ফরাসী ভাষায় কথা বলিতেন। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহাশয়কে দোভাষী-রূপে মোতায়েন করা হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় করমর্দ্দন না করিয়াই তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে আমার তিনটী অভিযোগ আছে।" অভিযোগ তিনটী মূলতঃ একটী অভিযোগেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী। তাঁর প্রথম অভিযোগ, আমি এড্‌মিনিষ্ট্রেটর সম্মান রক্ষা করি নাই। কেন না তিনি আমায় বহুবার বলিয়াছেন "প্রবর্ত্তকে"র ভাষা সংযত করার জন্য, কিন্তু 'শতবর্ষের বাংলা' ও 'কানাইলালে'র ন্যায় পুস্তক দুইখানি লিখিয়া তাঁহাকে অমান্য করা হইয়াছে। অন্য অভিযোগ, তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আমি বিপ্লববাদীদের অবাধে আশ্রয় দিয়া থাকি।"

আমি উত্তর দিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম—তিনি মেঝের উপর জুতা ঠুকিয়া বলিলেন "কোন উত্তর আমি শুনিতে চাহি না, তুমি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত যদি হও—'হাঁ' বল, নতুবা 'না' বলিতে পার। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা আমি শুনিতে চাহি না।" আমি তবুও কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আমায় চেয়ার হইতে উঠিয়া যাইতে বলিলেন এবং ফরাসী ভাষায় অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আচরণ নীরবে সহিবার মত ধৈর্য্য আমার ছিল। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিলাম—"আমি আপনার কথার কোন উত্তর দিব না। আমি ভগবানের আদেশ শুনিয়া চলি। আমি বিবেকের পথ অনুসরণ করিব।" তিনি এইবার টেব্‌ল হইতে দৃঢ় মুষ্টিতে একটা রুল ধরিলেন এবং কঠোরকণ্ঠে নির্দ্দেশ দিলেন, "এখনই সম্মুখ হইতে দূর হও।" আমি তাঁহার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম "আমি নির্দ্দোষ, আপনার প্রতি সম্মানও রাখি, কিন্তু আমায় ডাকিয়া আনিয়া আমার প্রতি যে অসম্মান করিতেছেন, তাহার আমি প্রতিবাদ করিতেছি।"

আর রক্ষা নাই। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় মধ্যবর্ত্তী না হইলে যে কাণ্ড ঘটিত, তাহাতে ফরাসীর শ্রীঘরে নীত হইতাম। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া একজন অস্ত্রধারী পুলিস প্রহরীকে বলিলেন "এখনই ইহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও।" আমি পুলিসপ্রহরীর হস্তক্ষেপের প্রতীক্ষা না করিয়াই ঘরের বাহির হইলাম। বিদায়কালে কাণে পৌছিল—'সহর হইতে আমায় তিনি দূর করিবেন অথবা নিঃসঙ্গ করিয়া রাখিবেন।'

আমি হাসিলাম। ৪০ বৎসর বয়সে এই প্রলয় ঝড়ে আমি বিপন্ন হইলেও, মাথা নত করি নাই। ভগবান ভিন্ন দ্বিতীয় আশ্রয় অস্বীকার করিয়াছি। ভগবানের মানুষ আমার চিরসঙ্গী হইবে। কিন্তু রাজরোষে পড়িলাম। ঈশ্বর এমন করিয়াই তাঁহার যন্ত্রকে বিশুদ্ধ করেন। কর্ম্মই জ্ঞানের অগ্রদূত।

এ সংবাদ আশ্রমে যখন পৌছিল, সকলেই চিন্তিত হইল। গৃহদেবী মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি করিবে তুমি?" আমি হাসিয়া বলিলাম "দুদ্দিন সম্মুখে, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র আশ্রয় হইতে দূর করিবে কে? ঈশ্বর-পথের যাত্রী আমার সঙ্গেই থাকিবে; আমি নিঃসঙ্গ কোন দিন হইব না।"

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়
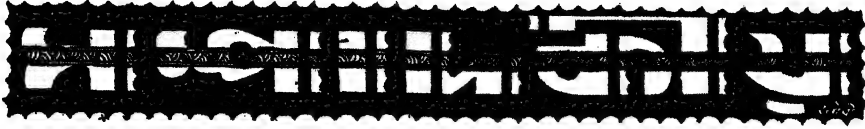
মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল—জাপানের আত্মসমর্পণে। অক্ষ-চক্রের ত্রিশক্তি—ইতালী, জর্ম্মণী ও জাপান—একে একে তিন দুর্দ্ধর্ষ শক্তিই সম্পূর্ণ পরাজয় ও অসর্ত্ত নতি স্বীকার করিল। প্রথমে ইতালী মিত্র-শক্তির উত্তর আফ্রিকাজয় ও ইউরোপের তটভূমি অধিকার করার পর যখন বিনা সর্ত্তে যুদ্ধবিরতি করিতে বাধ্য হইল, তখন জর্ম্মণী স্বয়ং উত্তর ইতালীর রক্ষাভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ চালাইলেও, অক্ষচক্রের বজ্র বন্ধনে সেই ক্ষণেই প্রথম ভাঙ্গন ধরিল। তারপর, মহারুষের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও ডি-ডে'র বিস্ময়কর সমরাভিযান—এই সম্মিলিত উভয় ঘটনায় জর্ম্মণীর অভাবনীয় ভাগ্য-পরিবর্ত্তন। হিটলার ও মুসোলিনী উভয় অক্ষনেতার রঙ্গমঞ্চ হইতে তিরোধান—নাটকীয় বিস্ময় ও রোমাঞ্চে পূর্ণ। কোটী কোটী নরকঙ্কাল ও ধ্বংসস্তূপের শ্মশান দৃশ্য এবং নরশোণিতের সমুদ্রপ্লাবন অবদান রাখিয়া এই দুই রাষ্ট্রনায়কের জীবননাট্য বিশ্বের ইতিহাসে যে বিয়োগান্ত চিরস্মৃতি হইয়া থাকিবে, তাহার চেয়ে শোকাবহ ও মর্ম্মান্তিক চিত্র আর চিন্তা বা কল্পনাও করা যায় না। ইহার পর, শেষ পর্ব্বে প্রাচের উদীয়মান সূর্য্য জাপানের অস্তগমন। ইঙ্গ-আমেরিকার নবাবিষ্কৃত পরমাণু-বোমা ও রুষের যুদ্ধঘোষণা ও সমরাভিযান জাপানের এই শোচনীয় পরিণতি আরও দ্রুততর ও অনিবার্য্য করিয়া তুলিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহাই যবনিকাপাত। ইহা যদি চরম শান্তির সূচনা হয়, মানবজাতি আজ স্বস্তিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। মহাকালীর প্রলয়নৃত্যাবসানে নিরুদ্বিগ্ন শঙ্কামুক্ত বিশ্ববাসী অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে গাহিবে—

> জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ।
> উৎপাতমেঘা সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
> সরিতোমার্গবাহিন্যস্তথা সংস্তত্র পাতিতে॥
> জজ্জ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌ জনিতস্বনাঃ।

নূতন ব্রহ্মাস্ত্র

মহাযুদ্ধের সর্ব্বান্ত প্রকাণ্ড বিস্ময়—পরমাণু-বোমা। এই অভিনব ব্রহ্মাস্ত্র—পরমাণুশক্তিরই অভিব্যক্তি। জড় পরমাণুর তনুত্যাগে যে মহাশক্তির উদ্ভব হয়, ইহা সেই মহাশক্তিরই এক বিশেষ প্রকরণ। বহু বর্ষ যাবৎ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এই পরমাণু-নিহিত অতুলনীয় শক্তির সন্ধানে রত ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের পরেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক লর্ড রদাফোর্ড পরমাণুর অন্তর-বস্তুর বিদারণ ও রূপান্তরের প্রথম প্রমাণ দান করেন। কিন্তু এই শক্তি প্রচণ্ড হইলেও, বহু সহস্র পরমাণুর বিদারণে হয়ত একটী মাত্র পরমাণুর রূপান্তর সম্ভব হওয়ায়, উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ অধিক হইতে পারে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে এক রুষিয়ায় জাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পিচার কুপিৎজা চুম্বকশক্তির প্রয়োগে পরমাণুর বিদারণে চেষ্টা করেন ও তাঁহার জন্য ১৫০০০ পাউণ্ড সাহায্যদানে রয়াল সোসাইটী কর্ত্তৃক কেমব্রিজে এক নূতন গবেষণাগার নির্ম্মাণ করা হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি রুষিয়ায় চলিয়া যান, কিন্তু কার্য্য বৃটনে চলিতে থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর অধ্যাপক হান বার্লিন সহরে তাড়িৎহীন নিউট্রন কণার সাহায্যে ইউরেনিয়ম ধাতু লইয়া পরীক্ষা করিয়া পরমাণুবিদারণে কিয়ৎপরিমাণে সফল হন। ইহা লইয়া তখন বৈজ্ঞানিক জগতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার পর, ১৯৪০ সালে কোপেন-হেগেনে অধ্যাপক বোর ও আর দুইজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জর্ম্মণ রাষ্ট্রপতি হিটলারের নির্দ্দেশে পরমাণুবিশ্লেষণঘটিত গবেষণায় সহায়তা করার জন্য আহুত হন। কিন্তু তাঁহারা বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিদ্ বোর—হিটলারের ধ্বংসযজ্ঞে তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিক্রয় করিতে সম্মত না হইয়া প্রথমে গোপনে মিত্রপক্ষকে তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল প্রেরণ ও পরে ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিয়া সাক্ষাৎভাবে সহযোগিতা করেন। অধ্যাপক বোরই ইউরেনিয়াম ধাতুর ২৩৫ আইসোটপ বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহা হইতে ক্রমিক নিউট্রনের উদ্ভব ও তাহার সহযোগে ইউরেনিয়ামের ধ্বংসে এমন পারমাণব শক্তি মুক্ত করেন, যাহা বিশ্বের সব চেয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরক T. N. T. র চেয়ে ২০,০০০ হইতে ৮০,০০০ হাজার গুণ সমধিক। ইহাও সমগ্র পরমাণুশক্তির

পরিমাণ নহে। সে যাহা হউক, ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল এই আবিষ্কারের কার্য্য অতঃপর বোমাবিপর্য্যস্ত ইংলণ্ড হইতে স্থানান্তরিত করিয়া আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের মুখেই প্রকাশ, ৫০ কোটী পাউণ্ড ব্যয়ে এই পরমাণুশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশ্বের ভয়াল বিস্ময় এই পরমাণু ব্রহ্মাস্ত্রের আবিষ্কার সিদ্ধ হইয়াছে। জাপানের হিরোশিমা বন্দরে প্রথম ও তৎপরে নাগাসাকো বন্দরে দ্বিতীয় বার এই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগও নাকি অতিশয় সন্তর্পণে করা হইয়াছে। কিন্তু যতই সাবধানে করা হউক, এই ব্রহ্মাস্ত্রক্ষেপণের যে ভয়াবহ, বীভৎস পরিণাম, তাহা জাপ জাতির ন্যায় বীর জাতিকেও কয়েক দিনেই যুদ্ধক্ষান্ত হইতে বাধ্য করিয়াছে, অন্ততঃ সেই সঙ্কল্পে উপনীত হইতে ইহা অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। দুইটি সহরের রাক্ষসী নির্ম্মমতায় নিশ্চিহ্ন বিলোপসাধনের বিনিময়ে যদি এই বোমা বিশ্বযুদ্ধের শেষ চিতানল সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার নিষ্ঠুরতা হয়ত ক্ষমার্হ হইতে পারে। কিন্তু নিখিল বিশ্বমানব এই ভয়ঙ্কর মরণাস্ত্রের আবিষ্কারে আজ উল্লাসের চেয়ে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মানবের বিবেক আজ স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত। বিজ্ঞানের এই ধ্বংসকারী মহা-শক্তিকে শাসনের বাগ মানাইয়া রাখিবে কে? এই আকুল-চিন্তা আজ সকলেই করিতেছেন। মানবাত্মার শুভবুদ্ধিতেই এই দুশ্চিন্তার নিরসন করিতে হইবে। না হইলে মানব-সভ্যতাই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে।

কথা উঠে—মিত্রশক্তি জয়ের মুখে এই দুর্ব্বার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া হৃদয়হীন যে নির্ম্মমতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা কি নাজিদেরও হার মানাইল না! হিটলার বিষবাষ্পের ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রয়োগ না করিয়াই পরাজয় বরণ করেন। ইহার কারণ —প্রত্যুত্তরে বলা যায়—মিত্রপক্ষও পাল্টা বিষবাষ্পপ্রয়োগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তাই এখানে ভয়ই সংযমের হেতু হইতে পারে। পরমাণু-বোমা না ঝাড়িয়াও মিত্রপক্ষ জাপ-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতেন। রুষের ষ্ট্যালিন নাকি এই বোমার সংবাদ পাইয়াই জাপযুদ্ধে তাড়াতাড়ি নামিলেন। কারণ যাহাই হউক, শত শত অতিদূর্গ উড়ন্ত বিমান হইতে দিনের পর দিন অগ্নিবর্ষণ করিয়া অগণিত নরশোণিতপাত ও নগর-নগরীর ধ্বংসবিধানও কি কম নিষ্ঠুর ব্যাপার! হিংসার উদগ্র জ্বালা সর্ব্বত্রই সমান। তবে যদি দীর্ঘ যাপ্য যন্ত্রণার কালসংক্ষেপ করার জন্য নবীন ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার সফল হইল বলা হয়, সেখানে আমাদের বলিবার নাই। স্বয়ং মহাত্মাজীকেও রোগকাতর গোশাবককে হত্যা করিয়া যে অহিংসারই জয়োচ্চারণ করিতে আমরা শুনিয়াছি। মিত্র শক্তির যুক্তিও তাহাই। আমরা ভাল-মন্দ বিচার দূরে রাখিয়া, আজ বিশ্বনিয়ন্তা মহাদেবতাকেই আকুল কণ্ঠে আহ্বান পূর্ব্বক যেন বলিতে পারি—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি!"

ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তন

মহাযুদ্ধের অপর বিস্ময়—ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন। ভারতের এক জ্যোতিষীর লেখায় যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী বাহির হইয়াছিল, তাহাতে রুষিয়ার হাতে জর্ম্মণীর পরাজয়, জাপানের বিষম শক্তিক্ষয় ও বৃটনের সমাজনৈতিক বিপ্লবের কথা ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। তিনটি কথাই ফলিয়াছে, দেখা গেল। কিন্তু ইংলণ্ডের এই শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্ত্তন রাজনীতিক মহলে অনেকে সম্ভব মনে করিলেও, এতখানি সাফল্য বোধ হয়, কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। এমন কি, স্বয়ং বিজয়ী শ্রমিক পক্ষও ইহা আশা করেন নাই। অন্ততঃ টোরী-নেতা চার্চ্চিল প্রধানমন্ত্রী হইয়াই যুদ্ধ শেষ করিবেন, এই ধারণা সকলেই মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটনের জনসাধারণ তাহাদের প্রিয়নেতা ও সঙ্কটত্রাতা চার্চ্চিলকে চাহিলেও, চার্চ্চিলের "কুকুরগুলিকে" আর চাহে নাই। কথাটা জনৈক ইংরাজেরই মুখে শোনা—তাই আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম। তিনি বলেন "We want Churchill, but we don't want his dogs!" এই ইংরাজ বন্ধুর মুখে সমগ্র ইংরাজ জাতিরই মর্ম্মভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজ জনসাধারণ আজ তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার আর সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের হাতে রাখিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা চাহে পরিবর্ত্তন—

যুগের সহিত অগ্রগতি। এই অগ্রগতিরই লক্ষণ—ইংলণ্ডের বিগত রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এবার শ্রমিক শাসনাধীন ইংলণ্ড মিত্রশক্তি আমেরিকা ও রুষের সহিত সমধিক আদর্শ ও নীতি মিলাইয়া চলিতে পারিবে। দুই বৎসর পূর্ব্বে, আমরা "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছিলাম—জর্ম্মণীর সহিত রুষের অনাক্রমণ-চুক্তি অসবর্ণ পরিণয়ের মত; কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত রুষিয়ার যতই আদর্শভেদ থাকুক, তাহাদের অন্তরের সম্বন্ধ—সবর্ণ সম্বন্ধ। এই মিলন সমধিক স্থায়ী হওয়ারই সম্ভাবনা। যুদ্ধের চাপে, প্রকৃতির অগভীর শক্তির ক্রিয়া নিরসিত হইয়া গূঢ়তর শক্তি ও সম্বন্ধগুলিই ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে। ইংলণ্ডের শ্রমিকতন্ত্র এই যুগশক্তিরই ইঙ্গিতে আসিয়াছে। ইহা এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনেরই প্রাথমিক সূচনা।

শ্রমিকতন্ত্র ভারত সম্বন্ধে কি করিবে? ইহাই আমাদের স্বাভাবিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সদুত্তর এখনও কেহ দেন নাই—এত তাড়াতাড়ি তাহা আশা করাও যায় না। ইতঃপূর্ব্বে মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনেল্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বে যেবার শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান শ্রমিকতন্ত্রের তুলনা হয় না। তখন শ্রমিক শক্তি অন্য দলের কুক্ষিগত ছিল; এবার তাহা মুক্তি পাইয়াছে, নিজের কোটে দাঁড়াইবার সংখ্যা ও গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। এবার দৃক্‌ভঙ্গীর কিছু পরিবর্ত্তন তাই কেহ কেহ আশা করিতেছেন। কিন্তু অভিমত ও শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করার যে প্রাণ ও পরিস্থিতি, তৎসম্বন্ধে আমরা এখনও সন্দিহান। দেখা যাক, এই নবোদীয়মান যুগশক্তি দীর্ঘ দিনের জাতীয় সংস্কার ও স্বার্থপ্রেরণাকে বিদীর্ণ করিয়া কতখানি উদার ও নিঃস্বার্থ হইয়া আত্মপ্রকাশের সত্যই ইংরাজকে যোগ্য করিয়া তুলে। স্যার পেথিক লরেন্স ভারতসচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আযৌবন ভারত-প্রেমিক। তিনি স্বকীয় পদের দপ্তরগুলি অধ্যয়ন করিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। দপ্তরের অক্ষরে যে চেতনা, তাহার সঙ্কীর্ণ প্রভাবমুক্ত না হইলে কিন্তু তাঁহার চিত্তে উদার শুভবুদ্ধি যথার্থ রূপ লইতে পারিবে না।

"নমস্কার করিও না"

পণ্ডিত জহরলাল বিরক্ত হইয়া বন্দনালোলুপ জনসাধারণকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়াছেন, "ঘাড় নোয়াইয়া নোয়াইয়া তোমরা পরাধীন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ—আর কাহারও নিকট মাথা নত করিও না—নেতাদের—আমাকেও তোমরা নমস্কার করিও না।"

স্বাধীনতার পূজারীর মুখে দীন-দুর্ব্বলের আত্মচেতনা জাগাইবার জন্যই এরূপ কথা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দও তামসমোহাচ্ছন্ন দেশবাসীকে জড় দেওয়ালের ন্যায় নিষ্কর্ম্মা হওয়ার চেয়ে বরং চুরি করা, পাপ করাও ভাল বলিয়াছিলেন—যুবকদের গীতা ছাড়িয়া ফুটবল খেলিতেও কখন কখনও উদ্বুদ্ধ করিতেন। জহরলালজী যদি সেইভাবেই কথাটী বলিয়া থাকেন, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বামীজির এতদিন পরে, ভারতের জনসাধারণ, বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়ের উপর দিয়া অনেক রাজস উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে—তাহারা আজ আর ততখানি অলস, নিরীহ, "গো-মাতার যথার্থ সন্তান" (স্বামীজিরই অপর উক্তি, তাঁহার কথাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) নহে। এই অবস্থায় নিছক রজোগুণ উদ্দীপন করার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা সম্বন্ধে স্বতঃই মনে একটু দ্বিধা জাগে। তাহা ছাড়া, পণ্ডিতজীর নিজের মনোবৃত্তি যেন একটু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সাধনার আদর্শে গড়িয়া উঠায়, হয়ত তৎসুলভ দৃক্‌ভঙ্গী ও চেতনাই তাঁহার এই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে। এরূপ যদি হয়, আমরা আপত্তি তুলিয়া বলিব—এ দেশ ইউরোপ নহে, তাহা পণ্ডিতজী যেন মনে রাখেন। মাথা নত করার সঙ্গে স্বাধীন চেতনার অনিবার্য্য সম্বন্ধ আছে, ইহাই ভারতের ধারণা। আমরা স্বাধীনচেতাঃ হইয়াও গুরুজন, পূজ্যপাদগণের চরণে মাথা নোয়াইয়া শুধু প্রণাম নহে, আত্ম-সমর্পণ করিতেও পারি। এই আত্মসমর্পণ—সত্য আত্মচেতনার উদ্ধারের জন্যই। সমগ্র গীতার শিক্ষাই এই আত্মসমর্পণ যোগ—যাহার অন্যতম মন্ত্রাংশ "মাং নমস্কুরু।" অতএব খাঁটি ভারত-সন্তান জহরলালজীর কথার চেয়ে গীতাকার ভগবান ব্যাস বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাকেই চিরদিন

অধিক মর্য্যাদাদান করিবে। একবার "Statesman" পত্রিকায় পণ্ডিত জহরলালকে একজন খাঁটি বৃটেনের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া সম্পাদক উল্লেখ করিয়াছিলেন—আমাদের মনে পড়িতেছে। পণ্ডিতজী ভারতের শ্রদ্ধার্ঘ্য ও নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভারত-বিরোধী মনোভাবের পোষকতা করিলে, তাহা ঠিক শোভা পাইবে না—উহা শ্রেয়স্করও নহে।

মহামানবের স্মৃতি-পূজা

২২শে শ্রাবণ বাংলার তথা বিশ্বের মহাকবির চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতিপূজা হইয়া গেল। কবি তাঁর অমরস্মৃতি স্বরচিত সাহিত্যের অতুলনীয় আবেদনের মধ্য দিয়াই শুধু বাংলা ও বাঙ্গালীর নিকট নয়, ভবিষৎ বিশ্বমানবের হৃদয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। তবুও স্বজাতি হিসাবে কবির কাব্যকীর্ত্তি ছাড়া যে জীবনকীর্ত্তি, তাহার রক্ষা ও পুষ্টিকল্পে বাঙ্গালী জাতির কিছু কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্যপালনে বাঙ্গালী এবার কিঞ্চিৎ অবহিতও হইয়াছে—মনে হইতেছে। রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করা বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। দরিদ্র, নিরন্ন, উলঙ্গ দেশবাসী, দেশের শতকরা ৯০ জন যে গণ-নারায়ণ—তাহারা আর এ বিষয়ে কি করিতে পারে? তাহারা তাহাদের উদারান্ন হইতে না হয় এক মুঠা বাঁচাইয়া, তাহার অবদান কবির স্মৃতি-ভাণ্ডারে অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞ অন্তরে উপহার দিবে—কিন্তু এবিষয়ে বাংলার কমলার বরপুত্রগণ ও বাংলাদেশের বুক চিরিয়া যে সকল অবাঙালী ধন সঞ্চয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য গুরুতর আমরা বলিব। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, কি কয়েক জনে মিলিয়া তাঁহাদের এক মাসের উপার্জ্জনের আয় দান করিয়া কবির কীর্ত্তি-গুলিকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে পারেন না! মহামানবের স্মৃতিপূজায় এই অংশটুকু পালন করিলে, তাঁহাদের সমুচিত কার্য্যই হইবে—দেশলক্ষ্মীর অকুণ্ঠ স্নেহের কথঞ্চিৎ ঋণ-শোধ হয়ত হইবে।

কবির কীর্ত্তিরক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য—মহাত্মাজীর নির্দ্দেশে কস্তুরীবাঈ স্মৃতিভাণ্ডারের কিঞ্চিদধিক কোটী টাকা যেমন ভারতের পল্লীনারীর সেবা ও উন্নতিকল্পে সুব্যবহারের এক সুচিন্তিত স্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মূলে কবির যে সংগঠনপরিকল্পনা, তাহারই সুপ্রতিষ্ঠা ও চিরন্তন ব্যাপ্তির জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনীয়, তৎসম্বন্ধে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ও দেশের মনীষিমণ্ডলীকে আমরা চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের যদি এবিষয়ে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকে, তাহা দেশবাসীর নিকট বেশ স্পষ্ট করিয়া পরিদর্শন করিলে ভাল হয়। দেশবাসীকে এই ব্যপারে বিশ্বাসে লইলে, তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আরও নিবিড়ভাবে কার্য্যকরী হওয়ারই সুযোগ পাইবে।

ভুলাভাই-লিয়াকৎ ফর্মূলা

ভুলাভাই-লিয়াকতের গোপন চুক্তির ক্ষীণ সূত্র ভরসা করিয়া যে ওয়াভেল-পরিকল্পনা, তাহা সেই সূত্রচ্ছেদেই নাকি ভাঙ্গিয়াছে, এমন একটা সন্দেহ ও জল্পনার অবকাশ রহিয়া গিয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। আমাদেরও সংশয় হইয়াছিল—উভয় নেতা কংগ্রেস লীগ প্যারিটির পরিবর্ত্তে হিন্দু লীগ প্যারিটির ফর্মূলা উদ্ভাবন করিতে গেলেন কেন? এইখানেই গোল বাধিয়াছিল। সম্প্রতি "Peoples war"এ ইঁহাদের চুক্তির প্রকৃত পাঠ মিঃ সাজাদ জাহীর প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নাকি সেন্ট্রেল ব্যাঙ্কের গুপ্তকক্ষে নিরাপদে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল, একথাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পাঠে নিম্নোক্ত কথাগুলি দেখা যায়—

(১) কংগ্রেস ও লীগ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে সম্মত তজ্জন্য (ক) কংগ্রেস ও লীগ নূতন শাসন পরিষদে সমসংখ্যক আসন লইবেন (খ) তাহাতে শিখ ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের দাবীও উপেক্ষিত হইবে না, (গ) ভারত-সেনাপতি তাহার অন্যতম Ex-officio সদস্য থাকিবেন। (২) এইরূপ গঠিত শাসনপরিষৎ কেন্দ্র-ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন ভিন্ন কোনও কাজ করিবেন না। (৩) এই নূতন গভর্ণমেণ্ট শাসনরজ্জু গ্রহণ করিয়াই সকল কংগ্রেসবন্দী গণকে ছাড়িয়া দিবেন। (৪) কেন্দ্রপরিষদের সকল প্রদেশে ৯৩ বিধির পরিবর্ত্তে কংগ্রেস-লীগ সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে।

(৫) বড় লাটকে উপরোক্ত ধারায় ভারতের নিকট প্রস্তাব করার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

এই পাঠ যদি সত্য হয়, দেখা যাইতেছে, গোড়ায় হিন্দুমুসলিম নয়, কংগ্রেস-লীগ প্যারিটি নীতিই গৃহীত হইয়াছিল। তবে লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবে কেমন করিয়া কাষ্ট-হিন্দু-লীগ প্যারিটি নীতির উদ্ভাবনা হইল? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর বড়লাট বাহাদুরের দপ্তর হইতে পাওয়া যাইবে কি? এই উত্তর পাইলে, দেশবাসী ও বিশ্বজাতি বুঝিতে পারিবে—আসল গলদ কোথায় ঘটিয়াছিল।

মার্শাল পেতঁ্যার বিচার

মহাযুদ্ধে ফরাসী জাতিই সব চেয়ে অদ্ভুত অংশ অভিনয় করিল। ফ্রান্সের আকস্মিক পরাজয় ও আকস্মিক যুদ্ধবিরতি জর্ম্মণগণিকা-প্রভাবিত মঃ রেণল্ডের মন্ত্রিসভার পতন হইতে আরম্ভ করিয়া কুখ্যাত লাভাল-দার্লাঁ-পেতঁ্যার ভিসি-গভর্ণমেণ্ট, পরিশেষে সিরিয়া-লেবানন সমস্যা ইত্যাদি—সবই যেন এক একটা পচনশীল জাতীয় অন্তরের একটানা অভিব্যক্তি—যাহা করুণ হাস্য রসেরই উদ্রেক করে। মার্শাল পেতঁ্যার বিচার এই সিরিও-কমিক নাট্যেরই যেন শেষ সুকরুণ অধ্যায়। অশীতিপর অভিমানী বৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতি আজ মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষায় স্বজাতির বিচারাধীন! ভার্দ্দুনবিজয়ী বীরের কি বিসদৃশ পরিণাম! আমাদের মনে হয়, দীর্ঘ দিন ধরিয়া ফরাসী জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিলাসিতার পচন-ক্রিয়া সুরু হইয়াছিল, তাহারই অব্যর্থ পরিণামে ফ্রান্সের ভাগ্যলিপি আপনি ঘন মসীবর্ণে লাঞ্ছিত হইয়াছে। "দোষ কারও নয়, স্বখাত সলিলে"ই ফ্রান্স ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছিল। আজ যদি বাঁচিবার প্রেরণা সত্যই জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যবাদের অন্তঃসার-শূন্য হুঙ্কার ছাড়িয়া পুনঃ শুদ্ধ ও সুস্থভাবে আত্মগঠনেরই তপস্যা গ্রহণ করিতে হইবে। বেচারা মরণযাত্রী মার্শালকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া জাতীয় মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি?

খেলা-ধূলা

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বার-এ্যাট্-ল

লেখকের নিবেদন—প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবর্ত্তক'-এর গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট যখন বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই 'খেলাধূলা' লইয়া ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহাদের সম্মুখীন আমাকে হইতে হইবে। খেলাধূলার আদিকাল হইতে আমার অবসর গ্রহণকাল পর্য্যন্ত খেলাধূলা সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরে বহু সংবাদ পত্রাদিতে এবং অবশেষে সে সকল বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া মৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত হওয়ার পরে, এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়াই আমার মনে হয়। অবশ্য খুঁটিনাটি আরও অনেক বলিবার যে ছিল না তাহা নহে, তবে ইতিহাসের কাঠামো যে খাড়া হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দ্বিমত কাহারও আছে, কোনও সংবাদপত্রে তাহা দেখা যায় নাই বা কাহারও মুখে কখন শুনি নাই। বরং অনেকের 'পূজা সংখ্যায় বা সুভেনারে' মৎপ্রদত্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া (মূলের স্বীকারোক্তি না রাখিয়া অবশ্য) প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ কর্ত্তৃক। নগেন্দ্র-প্রসাদ ও কালীমিত্র তখন বর্ত্তমান। প্রকাশিত তথ্যাদিতে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে কখনও তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে 'স্টেটস্‌ম্যান্' স্বীকার করিয়াছে ইহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদার। নবীনের দলের আমার আশীর্ব্বাদ-ভাজন শ্রীমান পঙ্কজ গুপ্ত দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আপশোষ করিয়াছেন যে, আমার লেখার এক পাণ্ডুলিপি না পড়িয়া তিনি তাহা হাতছাড়া হইতে দেন পত্রান্তরের সৌভাগ্য অর্জ্জনে। খেলাধূলার ইতিহাস আমার পূর্ব্বে লেখার চেষ্টাও কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। সে যাহা হউক, ইতিহাসে মৎপ্রদত্ত সাল তারিখ এবং ঘটনাবলীর উল্লেখ পরবর্ত্তী কোনও লেখকের প্রবন্ধাদিতে যদি পাওয়া যায় এবং আমার পূর্ব্বে আর কোনও ইতিহাসকার যদি না থাকে, তাহা হইলে কোথা হইতে কে কি লইয়াছে নির্ণয়

করা যে কোনও সহজবুদ্ধি সম্পন্নের পক্ষে খুবই সহজ। ছয় সাত বৎসর কলিকাতা হইতে বহুদূরে আমার অবস্থানকালে একাধিক ব্যক্তি আমাকে জানাইয়াছেন যে, ইতিহাসের নাম করিয়া আবল-তাবল বকা বাড়িয়া যাইতেছে খুব, সুতরাং ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি একাধিকবার। সম্প্রতি কিন্তু একটী ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায় থাকিলে। সেকথা

ভারতের 'ব্লু রিবণ্ড'—আই-এফ্-এ শীল্ড
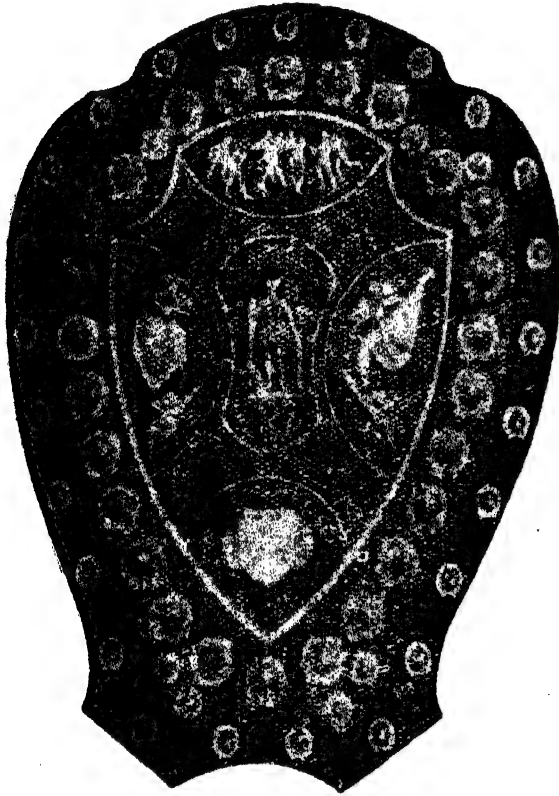
পরে বলিতেছি। আমার স্নেহভাজন প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর আগ্রহে প্রবর্ত্তকে খেলাধূলার যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণরূপ (এ পর্য্যন্ত) দিবার জন্য এ লেখনী ধারণ।

সুবর্ণ জয়ন্তী—১৮৯৩এ স্থাপিত আই-এফ এর সুবর্ণ জয়ন্তী হইয়া গিয়াছে ১৯৪৩ শেষ করিয়া। শুনিয়াছি মহাসমারোহেই ইহা হইয়া গিয়াছে—চক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। সমারোহের ব্যাপারে আহুত না হইলেও, যথাসময়ে আই-এফ-একে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনে বিলম্ব আমার ঘটে নাই। আশীর্ব্বাদ গ্রহণের স্বীকারোক্তি অবশ্য পাইয়াছি। বলিয়া রাখা ভাল ডালহাউসীর পিক্ (আই-এফ-এর পূর্ব্বতন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট) বা রেঞ্জার্সের আপকার অথবা ন্যাশনালের ক্ষেত্র মিত্রের অপেক্ষা আমি বয়সে বা খেলার মাঠে প্রবীণ অধিক। জয়ন্তী উপলক্ষে 'মার্চ্চ পাস্টে' আমার যোগদান শোভন হইবে না বলিয়াই বোধহয় আমি অনাহূত থাকিয়া যাই। জয়ন্তী সমারোহে আমার কাছাকাছি বয়সের খেলোয়াড়দের একত্রিত করাইয়া দল গড়িয়া পাঁচ মিনিটের জন্যও খেলাইলে আই-এফ-এর মর্য্যাদা বাড়িত সহস্রগুণে। উদ্যোগীরা আই-এফ-একে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত করিল? ইহার উত্তর পাওয়া যায় ভাল; না পাওয়া যাইলে লেখকের মতে ইহা না করার কারণ যাহা তাহা ব্যক্ত করিতে লেখক কুণ্ঠিত হইবে না।

'জয়ন্তী-সংখ্যা'—আই-এফ্-এ কর্ত্তৃক ফুটবল খেলার ও আই-এফ্-এর আইন কানুন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্ঘের কর্ম্মীবৃন্দের নাম ও বিভিন্ন প্রতিযোগাদির ফলাফল ভিন্ন খেলার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও কখনও প্রকাশিত হয় নাই এই পঞ্চাশ বৎসরে। ইহা লিখিবার যথার্থ অধিকারী যাঁহারা আই-এফ্-এর সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা বহুকাল গত হইয়াছেন। অবশিষ্টের মধ্যে থাকেন অন্যতম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্র প্রসাদ এবং কতকাংশে (তাঁহারই মনোনীত) সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য কালী মিত্র। এ বিষয়ে নগেন্দ্রপ্রসাদ একটী আঙ্গুলী সঞ্চালনও করেন নাই। তাঁহার নীরবতা উপেক্ষা করিয়া কালী মিত্রের কোনও রকম 'হালুচালু' করিবার সাহসে কুলায় নাই। ঘনিষ্ঠ পুরাতন আমরা একথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। 'জয়ন্তী-সংখ্যা' প্রকাশিত হইবে শুনিয়া সকলেই সুতরাং আশান্বিত হইয়াছিল 'হবার মত একটা কিছু' এইবার হইবে। সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। শিব গড়িতে গড়া হইয়াছে বাঁদর—ইতিহাসের সপিণ্ডকরণ করিয়া। সেই কথাই সংক্ষেপে বলিব। সুযোগ মত সবিস্তারে তাহা বর্ণিত হইবে। না হইলে ইতিহাসের দফা গয়া হইয়াই থাকিবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে একথা কিন্তু

স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই যে, জয়ন্তী সংখ্যা নবীনদের চিত্রাদি পরিশোভিত হইয়া পরিপাটি হইয়াছে। এই নবীনদের সাহচর্য্য লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছে নগেন্দ্রপ্রসাদ—one of the Pioneers রূপে। প্রশ্ন হইতে পারে তবে অপরাপর Pioneers-কে কে। তাঁহাদের নাম ও ছবি ছাপা না হইয়া একা নগেন্দ্রপ্রসাদের নাম ও ছবি দেওয়া হইল কেন? উত্তর দিতে হইবে আই-এফ্-এ-কে। তবে প্রশ্নের উত্তরে আই-এফ্-এর 'ফ্যাল্‌ফ্যাল' করিয়া চাহিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, আমরা জানি। আর এক কথা জয়ন্তী সংখ্যায় এক নগেন্দ্রপ্রসাদ ভিন্ন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে তাঁহার সহকর্ম্মীদের চিত্র প্রকাশিত হওয়া ত' দূরের কথা, কাহারও নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। এমন নহিলে জয়ন্তী সংখ্যা! অনুশীলন শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায় ইহার ছত্রে ছত্রে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলিকাতা বন্দরে মালামাঝি প্রভৃতির ফুট্‌বল্ খেলা এবং ১৮৫৪-তে কলিকাতায় এক 'ম্যাচ্' খেলার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জয়ন্তী সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে ঐতিহাসিক তথ্যের উৎকর্ষতা দেখাইতে। এ সব খেলা হইয়াছে 'রাগ্‌বী' না 'সকার' কানুনানুযায়ী স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই। এর আবিস্কারক নাকি এক 'মরা' কাগজ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 'মরা' যখন তখন বোধহয় ভূত হইয়াছে সুতরাং 'মরা-ভূত'-এর নাম উচ্চারণ করিতেও ভয় পাইয়াছে। উদ্দেশ্য ১৮৮৪-র বিশেষত্বের গুরুত্ব লঘু করিয়া দেওয়ার প্রয়াসকে ফলবতী করা। এদিকে ট্রেডস্ ক্লাবকে বলা হইয়াছে ইয়োরোপীনদের সর্ব্বপ্রথম দল। ট্রেডস্ ক্লাবের যে 'বাবা' ছিল জানা নাই। পুরাতন জীবন্ত কাগজে এ হদিশ আছে। অনুশীলন-প্রতিভার চরমোৎকর্ষতায় এই জয়ন্তী-সংখ্যাখানি পরিপূর্ণ! যথা:—ওয়েলিংটন্ স্থাপিত ১৮৮৪তে (স্থাপয়িতার নাম নাই), সভাবাজার ১৮৮৫তে, সভাবাজার রাজবাটী ক্লাব 'গোচারণের' মাঠে ১৮৮৭তে, প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্লাব ১৮৮৪তে এবং সভাবাজার ক্লাবের পূর্ব্বে নানা কলেজ ক্লাবের উৎপত্তি-কথায় ইহা মুখর। এ সকল তথ্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইল—উল্লেখ নাই। বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন সন্দেহ নাই! বহু বর্ষ পূর্ব্বে মৎপ্রদত্ত সাল তারিখ ছাপার হরফে প্রকাশিত হওয়া ভিন্ন বিভিন্ন আর কোনও মালমশলার অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না। সেই 'ছাপার হরফ' হইতেই ইহা গৃহীত, বিকৃত ভাবে। দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। প্রেসিডেন্সি ক্লাবের উল্লেখ (কলেজের নহে) আমার বর্ণনায় আছে। পঞ্চাশী (উনপঞ্চাশী হইলেই শোভন হইত) উৎসবের ডামাডোলে তাহা হইয়া গেল কলেজ ক্লাব। 'প্রেসিডেন্সি' যখন পাওয়া গিয়াছে আর তাহার সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে প্রফেসর ষ্ট্যাকের হেয়ার স্কুলের ছেলেদের বল কিনিয়া দেওয়ার কথা, অনুশীলন প্রতিভায় ষ্ট্যাক্‌কে টানিয়া হেঁচড়াইয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল কলেজ ক্লাবে। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! ইতিহাস বলে ইহাকে! প্রতিভাবানদের প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান করা হইতেছে তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে প্রমাণ দেখানর জন্য। সভাবাজার বিশেষ কিছু নহে। শীল্ডে ইয়োরোপীয়ন শক্তির হেয়ার স্পোর্টিং (চিন্‌সুরা টাউন্ রূপে) কর্ত্তৃক বাঁধন ছিঁড়িয়া দিবার অপূর্ব্ব কথার অনুল্লেখ জয়ন্তী-সংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য! ১২।১৩।১৪ বৎসরের বালকবৃন্দের (ডেভিড্ হেয়ার এথেলেটিক্ ক্লাব) শীল্ড প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ভারতীয় দলরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা চাপিয়া রাখা ও সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী প্রতিযোগিতা 'ভোলানাথ .পাল কাপ'-এর নাম করা—এই সকলই হইল জয়ন্তী সংখ্যার বিশেষত্ব। সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী মোহনবাগানকে 'ইষ্ট বেঙ্গল'-বিজয়ী ১৯১১র শীল্ড-জেতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা। এই সংখ্যা প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত।

'ইষ্ট বেঙ্গল'—নবীন দলগুলির মধ্যে এ দলের শক্তিমত্তার পুনঃ পুনঃ নিদর্শন ক্রীড়ামোদীরা পাইয়াছে বহুলভাবে। বর্ত্তমান বর্ষে শীল্ড ও লীগ্ দুইই জিতিয়া লইয়াছে ইষ্ট বেঙ্গল। দুই প্রতিযোগিতাতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে মোহনবাগান। বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই কয় বৎসরে এ প্রতিযোগিতায় মিলিটারি টিমের মত টিম্ যোগদান করিবার সুযোগ পায় নাই। সিভিলিয়ন্ (ইয়োরোপীয়ন) দলগুলির শক্তি সামর্থ্য পড়িয়া যাহা গিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা কাহাকেও করিতে দেখা যায় নাই। সুখের বিষয় বর্ত্তমান

বর্ষে ক্যালকাটাকে উভয় প্রতিযোগিতাতেই বেশ একটু হালুচালু করিতে দেখা গিয়াছে। ভবানীপুর লীগের প্রথমার্দ্ধে যে ভাবে অগ্রসর হয় তাহা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। 'ধোপে' কিন্তু টিকিল না। ভবানীপুরের চমকপ্রদভাবে অগ্রগামী হওয়া এবং পরিশেষে ধোপে না টিকার ব্যাপার হইতে ফুট্‌বল্ খেলা কি স্তরে পরিণত হইয়াছে নিশ্চয়রূপে বলা যায়। ১৮৯৩ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত এ দৃষ্টান্ত আদৌ পাওয়া যাইবে না যে, ১৬৷২০ দল বলিয়া যাহারা গণ্য তাহাদের মধ্যে ১৬ কখনও ২০কে মারিয়াছে। ১৯০৫এর পর হইতে কিন্তু এ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইদানীং এ দৃশ্যের বাড়াবাড়ি হইয়াছে এত যে uncertain ties of sports বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 'অনিশ্চয়তা'—ক্রিকেটে বলিলে সাজে বটে, কিন্তু ফুট্‌বলে ষোল কুড়িকে মারিল এবং 'অনিশ্চয়তা'র বুলি তাহাতে আওড়ান হইল, ইহা বড় সাজে না। এবম্প্রকার ঘটনা সদা সর্ব্বদা ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে, খেলার স্তর ও নীতি একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারই কারণে 'মুড়ি, মিছরি'র বিশেষ প্রভেদ নাই। এ অবস্থা কলিকাতার পক্ষে লজ্জাজনক। ইহার কথোঞ্চিৎ প্রতিকার হওয়া দরকার। করে কিন্তু কে? আই-এফ্-একে সখের ডিবেটিং ক্লাবে পরিণত করা যত সহজ, খেলার স্তর বজায় রাখা বা উন্নত করা সে প্রকারের নহে। পায়ে-বলে জীবনে যাহারা কখনও করে নাই মোড়ল যদি তাহারা হন, এ বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভের সম্ভাবনা একেবারেই নাই। যথার্থ ক্রীড়ামোদী এ কথা বিচার করিয়া যেন দেখেন।

শীল্ড ও লীগ্‌জয়ী—১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত (ইহার পূর্ব্বের তালিকা প্রবর্ত্তকে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত) শীল্ড ও লীগ্‌জয়ীর তালিকা যথাক্রমে এইরূপ:—

শীল্ড—এরিয়ন (১৯৪০), মহামেডন্ (১৯৪১), মহামেডন্ (১৯৪২), ইষ্ট বেঙ্গল (১৯৪৩) বি-এ রেলওয়ে (১৯৪৪), ইষ্ট বেঙ্গল (১৯৪৫)।

লীগ—মহামেডন্ (১৯৪০), মহামেডন্ (১৯৪১), ইষ্ট বেঙ্গল (১৯৪২), মোহনবাগান (১৯৪৩), মোহনবাগান (১৯৪৪), ইষ্ট বেঙ্গল (১৯৪৫)।

খেলায় গুণপণা—খেলা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এখন সকলেই বলে। এ বলা অবশ্য যাহারা বলে তাঁহাদের অনেকেই ১৯১১র খেলাও চাক্ষুস করে নাই। মহামেডানের অভ্যুদয়কাল হইতেই খেলার সম্বন্ধে ইহাদের যাহা কিছু ধ্যান-ধারণা জন্মিয়াছে। এই যুগের খেলার অবস্থা ১৯১১র খেলার স্তর হইতে কত নামিয়া পড়ে, তাহা সেই সময়ের প্রবর্ত্তক-এর আলোচনায় সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যাইবে। দর্শকবৃন্দ বর্ত্তমান কালে সেই ধরণের খেলা দেখিতে পাইলেও, যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিত। সে সৌভাগ্য হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইতেছে। ১৮৯৩এর শীল্ড বিজয়ী রয়াল আইরিশ্-এর খেলা এবং সেই জাতীয় খেলার সমকক্ষতা লাভের আপ্রাণ চেষ্টায় তৎকালীন ক্যাল্‌কাটা ও ডাল্‌হাউসীর 'তপশ্চর্য্যা' ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ এবং ভারতীয়দলের মধ্যে হেয়ার স্পোর্টিং ও ন্যাশানালের তাহার ফলে অগ্রগতি ও খেলায় আধিপত্য স্থাপন—ফুটবলের সুবর্ণযুগ নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য। ইদানীং-র 'যাদুকর' শিবদাসের দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতাও ছিল না ১৯০৬ সালেও। অথচ এই শিবদাসের ক্রীড়া-নিপুণতা ছিল (সেই যুগের শেষাশেষিতে) ১৯১১ অপেক্ষা অনেক বেশী। যাহা হউক ব্রেট্‌ফোর্ড (রয়াল আইরিশ), স্পিগুলে ও লোমাশ (রয়াল আর্টিলারি), ষ্টিভেন্‌সন্ (গ্লষ্টার) জ্যাক্‌সন্ হাণ্টার, হ্যারিশ্ (ক্যালকাটা), লিণ্ডসে, ব্রাউন (ডালহাউসী), নগেন্দ্রপ্রসাদ, কালী মুখার্জ্জী (সভাবাজার), সভ্যধেমু, গোবর (ন্যাশানাল), অন্নদা, নিতাই মুখুজ্যে, কর্ম্মকার (হেয়ার স্পোর্টিং), মোনা ভট্টাচার্য্য (বিশপস্), পলসাঁই (চন্দননগর) প্রভৃতি ত দূরের কথা, একটা শিবদাসও শিবদাসের পরে দেখিতে পাওয়া গেল না। আর এখন? খেলা বেলেখেলায় পরিণত হইয়াছে ও দুর্নীতি বাড়িয়াছে, মুখে শুধু বলিলেই চলিবে না। সুবর্ণযুগের খেলা ও সে সময়ের খেলোয়াড়োচিৎ মনোবৃত্তি আবার কিসে ফিরিয়া আসে, চেষ্টা করিতে হইবে। আই-এফ-এর 'ডিবেটিং ক্লাবত্ব' বন্ধ করিয়া এদিকে মন দেওয়াইতে পারা কি যায় না? না যায় যদি এ সজ্ঘ থাকায় লাভ কি?

বাংলা সাহিত্যের শারীরক ভাষ্য

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপর্য্যুপরি বহু জাতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে উপস্থিত হয়েছিল গৌড়ীয় শীলতা। কাজেই বাঙালী জাতির রক্ত, মনন ও হৃদয়-তত্ত্বের বিচার না করে' বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর চিন্তার ধমনী-প্রবাহের সূক্ষ্ম কথার সমস্ত উপাদানের বিচার কি সম্ভব? এ সমস্ত উপাদানের ইতিহাসে আছে এ জাতির নৃতাত্ত্বিক প্রেরণার পটভূমি এবং ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাত বা মিলন ও আশ্লেষে লব্ধ নব নব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও উচ্ছ্বাসের সঞ্চয়। এসব উপেক্ষা করে' কি চর্য্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রসগ্রহণ সম্ভব? বিংশ শতাব্দীর মিশ্র সংস্কার, দুষ্ট বুদ্ধি ও কষ্টকল্পনা লক্ষ্মীন্দরের লৌহ বাসরগৃহ অপেক্ষা কঠিন কঞ্চুকের ভিতরও নির্লজ্জভাবে ঢুকতে সঙ্কুচিত হয় না নিজের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে। ফলে দুর্ব্যাখ্যা বিষে কাব্যলক্ষ্মী সহজেই মূর্চ্ছিত হন! একাধিক সাহিত্য-আলোচক এর ভিতর ঢুকেছেন অনধিকারী হয়ে'। এ জন্যই বার বার বলা হয়েছে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে একঘেয়ে ভাবটা বেশী এবং বঙ্কিম বা রবীন্দ্রের দানেই বাংলাসাহিত্যের লজ্জা ঢাকা হয়েছে অতি কষ্টে। প্রাচীনতার যা' প্রাপ্য নয়, তা'তে তা আরোপ করা একান্ত ভুল; কিন্তু গুপ্ত আমলের মুদ্রা গুপ্ত যুগের বলেই যে কোম্পানীর টাকশালের রচনার কাছে বিনাসর্ত্তে তা' পরাজয় স্বীকার করবে, এমন বায়না সত্যের দিক হ'তে অসহনীয় এবং আধুনিকতার পক্ষেও সার্টিফিকেট হিসেবে চলতে পারে না।

বস্তুতঃ বাঙালীজাতির ইতিহাসটিই এক অজ্ঞাত অধ্যায় বাংলার সমাজে। যে ক'টি পণ্ডিত এর গঙ্গোত্রীর সন্ধানে গেছেন, তাঁরা মহাপ্রস্থানে উৎসাহিত পাণ্ডবদের মত উপলখণ্ড-কণ্টকিত ঊর্দ্ধ হিমাদ্রির নানা সন্ধিস্থলে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য গুলিয়ে গেছে নব নব ঘটনার জটিল পাকচক্রের আবর্ত্তে। এজন্য বাঙালীর ইতিবৃত্তের কোন কোন যুগের উপাদান থাকা সত্ত্বেও, প্রাচুর্য্যপুষ্ট ইতিহাস নেই। প্রাচীন কবিরাও পুনঃ পুনঃ এ দেশের একটা বিরাট ও বিকাশমান হৃদ্যতা লক্ষ্য করেছে যা' সমগ্র ভুবনে বিস্তৃত হ'তে চেয়েছে বার বার। এ রকমের ক্রমব্যাপ্তির বর্ণ ও রক্তগত ঐতিহাসিক ভিত্তিকে খুঁজে পাওয়া যে খুবই কঠিন, তা মনে হয় না। চর্য্যাপদের কবি সরোরুহ মানুষের ভৌমতত্ত্ব প্রসঙ্গে বাঙালীর এই অনুভূতি ও দৃষ্টি লিপিবদ্ধ করেছে:—

> "অদ্বঅচিত্ত তরুঅর ফরাউ তিহ অণে বিস্থ
> করুণা কুল্লিঅ…"

মানুষের চিত্ত ত্রিভুবনে বিস্তৃত হয়ে স্ফূর্ত্তি পায়—তা'তে তখন করুণার ফুল ফোটে! এ রকমের ভৌম দিক্‌দর্শন তখনই সার্থক হয়েছিল যখন প্রাক্‌ভারতে বাঙালী আচার্য্যের পদে চীন-জাপান প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় ভূখণ্ডের অধিবাসী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দীক্ষিত হ'তে গৌরব মনে করেছে প্রাক্‌ভারতীয় বিরাট বিদ্যাপীঠে! বিংশ শতাব্দীর দাস যুগে এরকমের কল্পনাও ভণ্ডামি হ'তে বাধ্য!

শুধু সাহিত্যের দিক্ হতেই বাংলাসাহিত্যের উপকরণ কুড়োতে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। আসমুদ্রহিমাচল বাংলার অক্ষরমালার বিস্তৃতিও ধরা পড়েছে। জাপানের রেউইজি মন্দিরের সৌন্দর্য্যের অলকায় এর সন্ধান মিলেছে। চর্য্যাপদের রচনা নেপালের গভীর উপত্যকায় পাওয়া গেছে যেমন মণির কৌটোয় সে-যুগে লুকোন থাকত ভ্রমর-সঞ্চয় পদ্ম সরোবরের মাঝে। অপর দিকে চালুক্য রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের আদেশে রচিত মানসোল্লাসেও বাংলাভাষার প্রাণকপোতের গুঞ্জন পাওয়া যাচ্ছে, এও ত একটা তাজ্জব ব্যাপার! ইতিহাস এর চেয়েও বিরাট ঘটনার প্রেক্ষাগৃহ উন্মুক্ত করেছে যা'র হিসাবকেতাব এখনও হয়নি!

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাদুকরের মত এ ক্ষেত্রে অনেক দৃশ্যই উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন এবং শেষটা আনমনা হয়ে বলেছেন: "বাঙ্গলা Nineva ও Babylon হতেও প্রাচীন অথবা নূতন! বাঙ্গলা চীন হতেও প্রাচীন অথবা নূতন! যখন আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হ'তে পঞ্জাবে আসেন তখন বাঙ্গলা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ এলাহাবাদ

এসে বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও ভাষাশূন্য পক্ষী বর্ণনা করেছেন"*।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ† ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। এদের বাসভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত থাকলে উত্তর বঙ্গ আর্য্যগণের পরিচিত ছিল, এ কথা স্বীকার অনিবার্য্য হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গশব্দের প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—অঙ্গে, বঙ্গে বা মগধে এ সময় আর্য্যজাতির বাস ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে অগ্নি সরস্বতী তীর হ'তে সরযূ, গণ্ডকী ও কুশী নদী পার হয়ে' মদানীরা তীরে আসেন; কাজেই দক্ষিণে, মগধে বা বঙ্গদেশে যাওয়ার কথা এ ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অথচ এসব দেশ তাদের জানা ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির উল্লেখ আছে, এরা আর্য্য নয়; চের জাতিরা দ্রাবিড়। দ্রাবিড়জাতি ভারতের বহু কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য ও বেলুচিস্তানের ব্রহুই জাতি দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে। দ্রাবিড়জাতিই যে বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী এরূপ অনুমানের হেতু আছে। অপর দিকে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সিংহের লঙ্কা আগমনের একটি প্রসঙ্গ আছে। ইনি আর্য্য। কাজেই বাঙ্গলাদেশে এ সময় আর্য্যদের আগমন কেউ কেউ কল্পনা করেছেন। ঐতিহাসিকদের এসব আলোচনা বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি বা গঠনের হয়ত কিছু সূত্র দান করে। কাজেই এই অন্ধকূপে এখনও আলোক নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কথা হচ্ছে দশম শতকের বাংলা-সাহিত্যসৃষ্টিতে এদের কি কোন পরোক্ষ প্রেরণা আছে? এ সময়কার বাঙ্গালীজাতির স্বরূপ কি ছিল? ইদানীং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা একেবারে ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে এ যুগের ইউরোপীয় চর্চ্চার স্বার্থদুষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতে। আদমসুমারীতে বাঙালীজাতির রক্ত ও দেহের কাঠামো পরীক্ষিত ও নির্ণীত হয়েছে, তাতে করে বাঙ্গালীকে একটা বিশিষ্ট জাতির কোঠায় ঢোকান হয়েছে। কিন্তু কোন বাঙ্গালীর সোয়াস্তী তা'তে হয়নি, বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। রিজলী (Riseley) সাহেব বাঙ্গালীর ভিতর মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণ কল্পনা করেছেন। অপর দিকে শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ এ অনুমান একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন*। রাখাল বাঁড়ুয্যে মহাশয় লগুড়াঘাত করে এক সময় বলেছেন—"বঙ্গবাসীগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যেতে পারে।"† বাঙ্গালী এ কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়নি। শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় বাঙালীর ভিতর মঙ্গোলীয় নক্সা পাননি।

এই হট্টগোলে আলোচনার পাঁক আরও ঘনীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু তা' হলেও বিচারের সকল পথ রুদ্ধ হয়নি। ও'দিকে রক্তগত বর্ণবিচারের সমগ্র ভিত্তিই আধুনিক ইউরোপের বিশেষজ্ঞগণের বাদানুবাদে শিথিল হয়ে গেছে। অক্ষশক্তির নেতৃস্থানীয় জর্ম্মন পণ্ডিতরা জাতিগত রক্তধারার প্রভাবে যে কৌলীন্যের দাবী করেছে অন্যান্য জাতিরা তা' স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। তাদের মতে কোন জাতিরই রক্তের কোন বিশিষ্ট প্রভাব নেই। স্লাভ জাতিরা যেমন কর্ম্মঠ, বিচক্ষণ ও মেধাবী, নর্ডিকরা তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। অপর দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ইদানীং আর্য্য ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, আর্য্য জাতি নামক বিশিষ্ট কোন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই প্রস্তুত নয়। আধুনিক Ethnic শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বতন ভাগ-বিভাগ একেবারে বর্জ্জন করেছে। এসব দিক হ'তে দেখতে গেলে জাতির রক্তপ্রেরণার মূলে কোন বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা কোন ঐশ্বর্য্য কল্পনা করা ভুল। অথচ বর্ত্তমান ইউরোপীয় তত্ত্বই anti-intellectual। আদিম আরণ্য প্রভাব, বংশগত ও গোষ্ঠীগত প্রেরণা শিরোধার্য্য করেই আধুনিক দর্শনের স্রোতোভঙ্গ বিস্তৃত।

(ক্রমশঃ)

* সাহিত্য সম্মিলন; সপ্তম অধিবেশন: অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। অনুবাদ পৃঃ ৫৯৭।

* Vide An outline of the racial Ethnology of India N B. Guha.

† রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস' পৃ ২৩।

ভ্রম সংশোধন—গত আষাঢ় সংখ্যা "প্রবর্ত্তক"র ১৩ পৃষ্ঠার (জীবন-সাধনা নিবন্ধে) দ্বিতীয় স্তম্ভের ১৮ লাইনে "পরলোকগত মিঃ জে, চৌধুরী"র স্থানে "শ্রদ্ধেয় মিঃ জে, চৌধুরী" হইবে। এই অসতর্ক ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মহাশয়ের আমরা দীর্ঘায়ু কামনা করি। —প্রঃ সঃ।

সাময়িকী

পণ্ডিতজীর 'পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস':

পণ্ডিত জওহরলালজী কারার অন্তরালে থাকিয়া পৃথিবীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমেরিকার 'পি, এম' পত্রিকায় মন্তব্য বাহির হইয়াছে: "এশিয়ায় দাঁড়াইয়া পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলে উহা কিরূপ দেখায়, পণ্ডিতজীর পুস্তকখানি পাঠে তাহা জানা যাইবে।" এই পুস্তকখানি জাপানকে জানিবার জন্ম যে তেরখানি পুস্তক সুপারিশ করা হইয়াছে তাহার অন্যতম।

অভেদানন্দ একাডেমি অব কালচার:

ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অভেদানন্দ একাডেমি অব কালচার নামক একটি সংস্কৃতি-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন স্বামী শঙ্করানন্দ। পৃথিবীর সংস্কৃতি-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা ও পঠন-পাঠন এবং বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র আবিষ্কার করা এই নবগঠিত সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য হইবে।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষালয়:

গত ৯ই আগষ্ট মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষালয়ের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত অনাথগোপাল সেন এই শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত মিহিরকুমার সেন সম্পাদক হইয়াছেন। এই শিক্ষালয়ে বর্ত্তমানে ৫০ জন ছাত্র লওয়া হইবে। কোন বেতন লাগিবে না, মাত্র দুই টাকা প্রবেশশুল্ক দিতে হইবে। জাতীয় সংস্কৃতি, গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে ধারাবাহিক শিক্ষাদানই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের সাধারণ সভা:

গত ১৫ই ও ২৮শে জুলাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলিকাতায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের ১৫শ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের মধ্যে মিঃ কে, এন, মজুমদার বার-এট্-ল, ও-বি, ই, মিঃ তুলসীচরণ রায় এম-এ, বি-এল, ডাঃ সৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পি, সি, চক্রবর্ত্তী, ডাঃ পি, সি, মজুমদার, মিঃ জে, এন, মজুমদার, মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী, মিঃ কে, সি, বড়াল, মিঃ এন, সি, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের স্থায়ী সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় মহোদয় উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারায়, মিঃ এস, কে, লাহিড়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় উক্ত অধিবেশনে পরিচালকমণ্ডলীর কার্য্যবিবরণী ও ১৯৪৪ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। উক্ত হিসাব পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি দেখান যে, ব্যাঙ্কের আমানত পূর্ব্ব বৎসরের দ্বিগুণে (১৮ লক্ষ টাকা) দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যকরী মূলধনও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া ২২ লক্ষ টাকার উপর হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের জের টানিয়া লাভের অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ২৫,২৯৯৲ টাকার মত। উহার ভিতর ৪৫০০৲ টাকার উপর মজুত তহবিলে রাখা হইয়াছে। ২০,০০০৲ টাকার উপর জের আনা হইয়াছে। উহা হইতে আয়কর বাবদ খরচ মিটাইয়া সাধারণ শেয়ার ও প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর আয়করমুক্ত শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

আরও দেখা যায়, ১৯৪৪ সনে ব্যাঙ্কের নূতন ৫টী শাখা অফিস যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিংহ ও কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শাখা খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত ৫টী শাখা অফিস ও কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস ব্যতীত আরও ৩টী শাখা অফিস চন্দননগর, চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে মোট ৯টী অফিসে ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিতেছে। ১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাসের শেষে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২,৪৭,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের যে অনুমতি প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক পাইয়াছিল তাহার সমুদয়টুকুই ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় পুনরায় ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষার জন্ম মেসার্স এন, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং ১৯৪৫ সনের জন্ম নিযুক্ত হইয়াছে।

লর্ড অরুণ সিংহ:

রায়পুরের ব্যারণ লর্ড এস্, পি, সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লর্ড অরুণ সিংহ এবার এই প্রথম বিলাতে লর্ড সভায় লিবারেল দলীয় সদস্যরূপে আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। লর্ড সভায় ইনিই একমাত্র ভারতীয় সদস্য।

নারী-সেবাসঙ্ঘ ট্রেনিং ক্যাম্প:

গত ১৬ই শ্রাবণ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নারী সেবা সঙ্ঘ ট্রেণিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। ১৬৪নং ল্যান্সডাউন রোডে এই ক্যাম্পের আবাস স্থাপিত হইয়াছে। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সীতা চৌধুরী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, প্রথম দলে যে ৩০টি মেয়ে শিক্ষা লাভ করে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ৫০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্ঘ-পরিচালনার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে রাজী হইয়াছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষা:

জাতীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনের যোগ্য স্মৃতি রক্ষার তেমন ব্যবস্থা আজও হয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। জানিয়া সুখী হইলাম যে, কবির নামে চট্টগ্রামে একটি স্মৃতি-ভবনের প্রতিষ্ঠা ও তথায় একটি পুস্তকাগার স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, বি, দত্ত ও সরকারী উকীল মিঃ কে, পি, নন্দী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আগামী বর্ষে কবির জন্মভূমি নোয়াপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করারও আয়োজন হইতেছে। জাতীয় কবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা কার্য্যে বাঙালী মুক্তহস্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বাংলা সাহিত্যিকার সম্মান :

বাংলাসাহিত্যে অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার বিগত কনভোকেশনে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী "ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণ পদক" লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। ইতিপূর্ব্বে ৺মানকুমারী বসু (১৯৩৫), শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী (১৯৩৮) ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী (১৯৪১) ঐ পদক লাভ করিয়াছেন।

রসায়নে প্রথম মহিলা ডি-এস্-সি :

রাসায়নিক গবেষণায় বিশেষ আবিষ্কারিকা হিসাবে এবার কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নে ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমানে ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা ও বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা কার্য্যে রত আছেন। ইনি বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম যিনি রসায়ন শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম ডি-এস্ সি উপাধি পাইলেন। কুমারী অসীমা হুগলীর ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

মিঃ বি, জি, হর্ণিম্যান :

গত ২৬শে জুলাই প্রসিদ্ধ 'বোম্বাই সেন্টিনেল' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বি, জি, হর্ণিম্যান তাঁহার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বোম্বাইবাসী কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এই উপলক্ষ্যে ৩১ হাজার টাকার একটি তোড়া তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাংবাদিক জীবনে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কল্যাণকল্পে যেরূপ ঐকান্তিক সেবা দিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে সমগ্র ভারতবাসীর নিকট শ্রদ্ধার্হ ও স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

প্রবর্ত্তক বালিকা বিদ্যালয় :

চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নারীমন্দির কর্ত্তৃক পরিচালিত 'প্রবর্ত্তক বালিকা বিদ্যালয়' (উচ্চ ইংরাজী) সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্তি (affiliated) লাভ করিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর উন্নতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। সম্প্রতি স্থানীয় ভোলানাথ স্মৃতিভাণ্ডার হইতে এককালীন এক হাজার টাকা এবং বার্ষিক একশত টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের জন্য আরও গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং একখানি মোটর বাসেরও আয়োজন হইতেছে।

কর্ম্মবীর প্রতাপচন্দ্র :

গত ১২ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্নে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর মুখ্যতম স্থাপয়িতা স্বর্গত প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের সপ্তম বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভার পৌরোহিত্য করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তৃতা করেন এবং বিগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় কোন কোন বিতর্কমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতার সময়োপযোগী উপসংহার করিয়া আবহাওয়াকে শ্রদ্ধাপূর্ণ করিয়া তোলেন। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্যের উদ্বোধন ও সমাপ্তি-সঙ্গীত উপস্থিত সকলেরই মনোরঞ্জন করে। কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ধন্যবাদপ্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আলোকে স্বর্গত শেঠ মহাশয়ের জীবনের যে মহনীয় দিগ্‌দর্শন করেন তাহাও বিশেষ মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছিল। সভার শেষে প্রচুর জলযোগ ও স্মারক-উপঢৌকন দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ আমন্ত্রিতগণকে আপ্যায়িত করেন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে গুরুপূর্ণিমা :

গুরু পূর্ণিমা হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ তিথি। অব্যক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমার মধ্য দিয়া সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। তাই হিন্দুর সমাজ-জীবনে আষাঢ়ের গুরুপূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকের পূর্ণিমা এই চারি মাস চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের মধ্য দিয়া ভাগবৎ চেতনা-রক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সর্ব্বত্র এই তিথিতে শ্রীগুরুর স্মরণোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। কেন্দ্র সঙ্ঘে সঙ্ঘগুরু এই উপলক্ষে সাধনার নিগূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ একটি বাণী প্রদান করেন। সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরে এই চারিমাস শ্রীযুত চিন্তামণি তর্কতীর্থ মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্র নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা করিতেছেন।

শুভ পরিণয় :

"কুণ্ডু পাবলিসিটি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার" স্বত্বাধিকারী উদীয়মান উদ্যমশীল ব্যবসায়ী শ্রীমান নির্ম্মলকুমার কুণ্ডুর সহিত নদীয়া-কুমারখালির সুপ্রাচীন বংশের শ্রীযুক্ত হরিপদ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী অনিমা-রাণীর শুভ পরিণয় গত ৩১শে আষাঢ় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নব দম্পতীর যাত্রাপথ শুভ হোক, নিরাময় ও নিষ্কণ্টক হোক, এই প্রার্থনা।

* * * *

গত ২৮শে শ্রাবণ খুলনার প্রসিদ্ধ মিত্র বংশের কল্যাণীয় শ্রীমান বিনয়-কৃষ্ণ মিত্রের সহিত খুলনা-কাড়াপাড়ানিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত অবনীমোহন দেব মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মীরারাণীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী মীরা প্রবর্ত্তকের চিরসুহৃদ শ্রীমান অনিল দেবের ভগ্নী। নবদম্পতীর এই শুভ মিলন কল্যাণময় হোক, এই প্রার্থনা।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

জন্ম : ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ | মৃত্যু : ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৫

৩০শ বর্ষ
১৩৫২ বাং
ইং ১৯৪৫

প্রবর্ত্তক
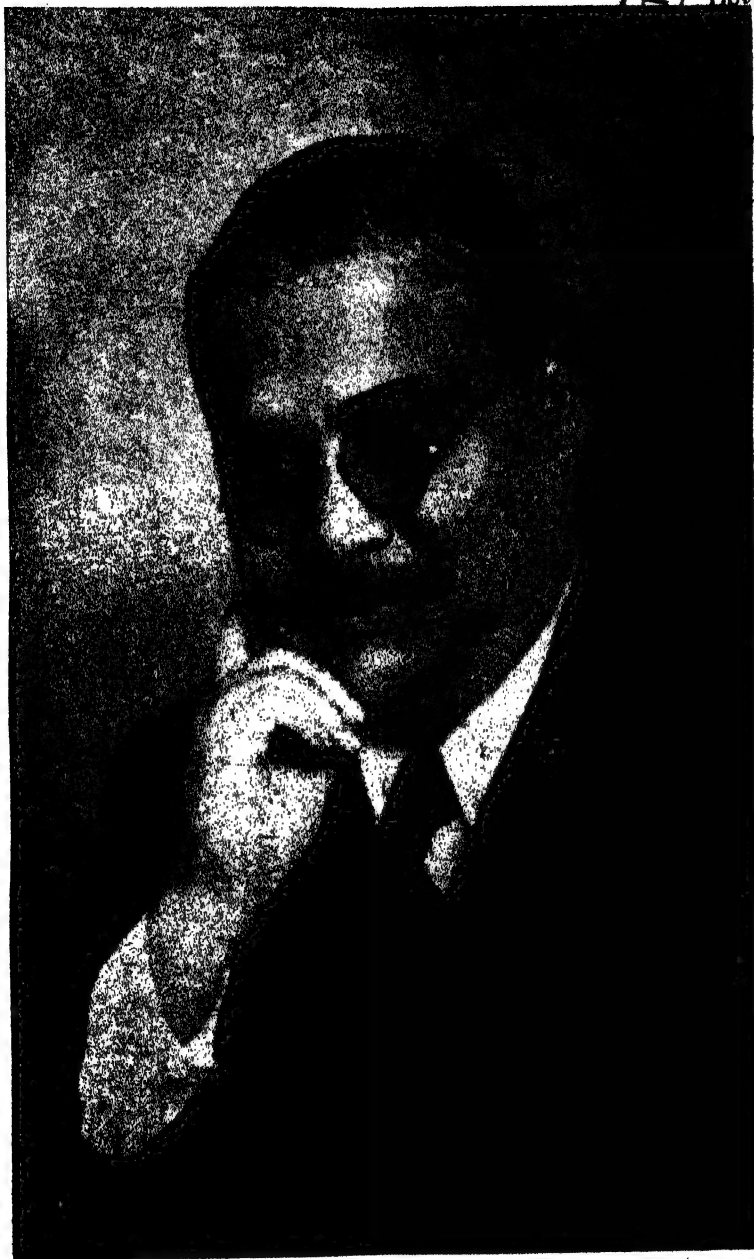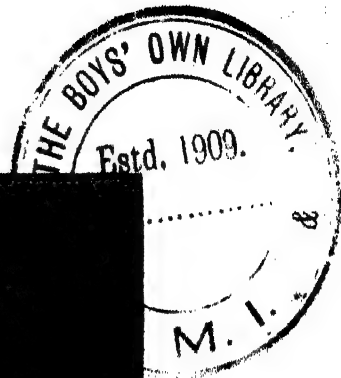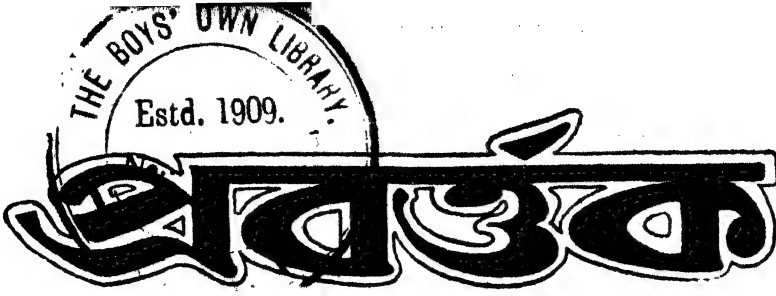
ভাদ্র ঃ
(আগষ্ট)
১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

এক মতের মানুষ কয়েক শত, কয়েক সহস্র হলেই কাজ হয় না। ভারতে অনেক আচার্য্য আছেন বা ছিলেন, যাঁদের সম্প্রদায়ে বহু লোক সমবেত হয়েছেন কিন্তু জগতের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নি।

সেই হিসাবে এক মতের মানুষের সংখ্যাই বড় কথা নয়, এমন একটা মতবাদবিশিষ্ট মানুষের সংখ্যা চাই—যাহার উপর নির্ভর করে সমগ্র জাতির মধ্যে ঐক্যশক্তি জাগ্রত করা যায়। ঈশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। ঈশ্বরেচ্ছা লাভের উপরেই মানুষ এই অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করতে পারে।

ঈশ্বরপ্রসাদ প্রাপ্তির জন্য উদাসীন অবস্থায় কালহরণ শ্রেয়ঃ নয়। মৃদু, মধ্য ও তীব্র এই তিন প্রকার গতি। তামসিক প্রকৃতির মানুষ শ্রেয়ঃ কর্ম্মও অতি ধীরে করে, মধ্যপন্থা—মিশ্রিত বুদ্ধি মানুষের, শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতির মানুষের মধ্যেই উত্তম গতির তীব্রতা দেখা যায়। ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ঈশ্বরেচ্ছা পূর্ণ করার জীবনগতি যদি ক্ষিপ্র না হয়, তবে কি জন্য এই জীবনবাদ।

প্রথম, যে কোন এক মতবাদ নিয়ে কাজ হবে না; শ্রুতিসিদ্ধ এবং অনুভূত পরম মত আশ্রয় করা চাই। সেই মতের মানুষ প্রথম দুই চারিজন সংগ্রহ করা, তারপর মতপ্রাবল্যে জাতির মধ্যে বহু লোককে সেই শ্রেষ্ঠ মতের আশ্রয়ে আনয়ন করা। সর্ব্ব সময়ে গতিক্ষিপ্রতায় বাধারও তীব্রতা বাড়ে, কিন্তু বাধার ভয় থাকলে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করার অধিকার কোথা? যে অভীঃ নয়, যে সাহসী নয়; যার ধৃতি অল্প, সে মানুষ বৃহতের অনুসরণ কোন দিন করে না।

মতবাদ নির্দ্ধারণ করতে হবে একটী সমষ্টির মধ্যে, যাদের চিত্ত, বুদ্ধি, তুল্যরূপেই মতটীকে স্বীকার করলে মত প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মত তোমার আমার নয়। পূর্ব্বেই বলেছি ভারতসংস্কৃতির অনুমোদিত হওয়া চাই। তারপর সেই মতের অনুভূতিসিদ্ধ একটী সমষ্টির প্রয়োজন। তারপর কর্ম্ম। সমষ্টি হলেই তাদের জীবন ও জীবনের গতি পরিচালনে কেবল বুদ্ধির প্রয়োজন নয়, প্রেমের সঙ্গে সঙ্গতির প্রয়োজন আছে। এই অবস্থায় সমষ্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করে কর্ম্মে অগ্রসর হতে হবে। সঙ্গতি সৃষ্টির জন্য প্রবল প্রাণশক্তি-সম্পন্ন লোকদের এই দুর্গম পথে দাঁড়াতে হবে। ইহাদের শক্তি যত ফলপ্রসূ হবে, অন্য অঙ্গের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ততই বর্দ্ধিত হবে। সঙ্গতির প্রবাহ যেন কোন দিন রুদ্ধ না হয়। যেখানে দু'জন মানুষ সেখানেও চাই একজনকে সঙ্গতির পথে, অন্যকে সংস্কৃতিপ্রচারে নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা। যেমন এক দম্পতির একজন সঙ্গতি সৃষ্টি করে, অন্যজন দম্পতির ধর্ম্মপালনে তৎপর থাকে। জাতি-জীবনেও এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত দলের প্রত্যেকটীর স্ব স্ব ধর্ম্ম নিয়ে অগ্রগতির প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিভেদ বা একের কর্ম্মে অন্যের হানা সত্যধর্ম্ম প্রচারে বিঘ্নসৃষ্টির কারণ হয়।

ভারত চারিযুগে বিভক্ত। সত্য, ত্রেতাদি যুগে, মানুষের ধর্ম্মানুভূতির প্রয়োজনই ছিল না—তারপর ধর্ম্মের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পরে পতন। এইবার পুনরুত্থানের যুগ। বিপুল মতবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে উত্থান সম্ভব হবে।

শুদ্ধ বীর্য্যই কার্য্যকরী। বীর্য্যের বস্তুতন্ত্ররূপ শুক্র। যে শুক্র—ভাগবত, তাহাই ঈশ্বরকার্য্য সম্পন্ন করার সিদ্ধ বস্তু। তাহা বৈরাগ্যে ও তপস্যায় লাভ হয়। এই শুক্র যখন সংহতি সৃজন করে—তখন সংহতির শক্তিকে দ্বিধা বিভক্তরূপে কর্ম্মরত হতে হয়। একাংশে প্রচার, অন্যাংশে সংহতি। প্রচার সংস্কৃতির। সংহতি—অর্থের।

বণিকের মানদণ্ড যে রাজদণ্ড হ'ল তাহা উপহাসের বস্তু নয়, পতিত জাতি এইরূপ বলেই আসল সত্য উড়িয়ে দেয়। অর্থসংস্থান যে সংহতি করে না—সে সংহতি রচনার বিজ্ঞান জানে না। অর্থই সংহতি সৃজনের মূল ভিত্তি। সর্ব্ব যুগের এই নীতি। ইহা উপেক্ষিত হয় পতন যুগে।

কর্ম্মবিমুখতা—মৃত্যু। কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুই নিয়ে মর্ত্ত্য জীবন। কর্ম্মবিভাগ না হলে অবসাদ আসে। যার যে কর্ম্ম সে তার অধিক বা অল্প বা অন্যের কর্ম্ম করিলেও অবসাদ আসবে। প্রকৃতি অনুসারে প্রচার বা সংহতি, এই উভয় পথে একবৃন্তে যুগল ফুলের মত, মানুষকে বেছে নিতে হবে তার কর্ম্ম।

কর্ম্ম কিছু করা নয়। যাবৎ জীবন তাবৎ কর্ম্ম। কেননা, জীবনের ধর্ম্ম সাংখ্য ও যোগ। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম।

প্রচার ও সংহতি এই দুইয়ের যুক্তি চাই সুদৃঢ়। প্রচারক সংস্কৃতিমন্ত্র, সংহতির মধ্যে সঞ্চারণ করবে। সংস্কৃতি মনে মনে নয়—অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাকে ভ্রমণ করতে হবে সংস্কৃতির মন্ত্র নিয়ে—নতুবা বণিকের বৃত্তি ভাগবত হবে না। আমরা পরশুরামে জ্ঞান ও শক্তির সমাবেশ দেখেছি। আজ জাতির মধ্যে যোগ ও সম্পদের সমন্বয় দেখতে চাই। এইখানে জাতি সজাগ নয়? প্রচারকের প্রাণ আর সংহতি-সৃজনের প্রাণ একই। এইজন্য এক সঙ্গেই দুইটী প্রবাহ ছুটবে জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তি লক্ষ্যে।

ইহাই উভয় প্রবাহকে অবসাদ থেকে রক্ষা করবে। ঔদাসীন্যে আমরা অর্দ্ধপথে বসে পড়বো না। যে জাতিপ্রাণ আজ উৎসবের আনন্দ থেকে বিমুখ হয়ে ছোটে অর্থসাধনার ক্ষেত্রে, সেখানে গড়ে উঠে সংহতি। প্রচারক যদি সংস্কৃতির ঝুলি নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে না ছুটে যায়, তবে ঐ অর্থকরী কর্ম্মক্ষেত্র অসুরের অধিকৃত হবে। তার জন্য দায়ী সংহতি সৃজনকারী নয়—প্রচারক। যে সংস্কৃতির মন্ত্র জপে জাতিকেন্দ্রে।

এই দিক দিয়ে জাতিশক্তিকে জাগ্‌তে হবে। দিনগত পাপক্ষয়ের মত গতানুগতিক জীবন-নীতির চাই প্রতিদিন পরিবর্ত্তন, নতুবা উহা নিশ্চল, স্থির হবে। স্মরণে রেখো সংস্কৃতি ও সংহতি এই দুই পন্থায় জাতির লক্ষ্য সফল হবে। যোগ ও সম্পদ, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, এই দুই নিয়েই জীবন। শ্রীম—

দিবা স্বপ্ন

শ্রীযুক্তা হেমমালা বসু

২৪-এ কার্ত্তিক, বুধবার, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে আমি একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এমন যে স্বপ্ন……তাও রাত্রে নয়, দিনেই দেখিয়া ফেলিলাম!

সেদিন দুপুর বেলা আহারাদির পরে 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' খানা লইয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নে দেখিলাম, এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের বৈধব্য দশার পূর্ব্বে আমার তিনি যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তেমন আছেন……তবে একটু যেন আঁধার-ঘেরা, খুব স্পষ্ট রূপে তাঁকে দেখিতে পাইলাম না।

তিনি যেন সুন্দর পর্য্যঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আমি একখানা মাসিক পত্র হাতে লইয়া তাঁর পাশে বসিয়া আছি। প্রবন্ধটি মনে মনে পড়িয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, 'দেখ, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য এই মুসলমান লেখক একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন! কত যুক্তি দেখিয়েছেন, কত যে উপদেশ দিয়েছেন, তার অন্ত নেই!'

ধীরে ধীরে হাতখানি আমার কোলের উপর রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'একটু পড় তো, শুনি!'

আমি পড়িতে লাগিলাম:

দেখুন এই বিশাল ভারতবর্ষ আমাদের উভয়েরই দেশ; ইহাকে আপনারা হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান যাহাই কেন বলুন না, ইহা হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতিরই জন্মভূমি। আপনারা সংখ্যায় অনেক ও আমরা অল্প; সেজন্য মনে হইতে পারে, আপনারা প্রবল আর আমরা দুর্ব্বল…কিন্তু আমরা যে এক দেশের অধিবাসী ও প্রতিবেশী, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমাদের আচার-ব্যবহার আপনাদের পছন্দসই নয়, সে কারণে আপনারা আমাদের ঘৃণা করিতে পারেন না…আমরাও

আপনাদেরই মত মানুষ। আমাদের এই দুই জাতির ধর্ম্ম মতের যতই পার্থক্য থাক, মানুষ হিসাবে তো কোনই পার্থক্য নাই? আপনাদের একজন কবিও তো এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন...

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া;
কতরূপ স্নেহ করি', দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এসব কথায় কোনই ফল হয় নাই। আমাদের বিরুদ্ধে আপনারা এতই ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, যাহা একেবারে মজ্জাগত...যুক্তি বা উপদেশ দ্বারা তাহার খণ্ডন হইতে পারে না!

জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করিতে সুরু করেন, সেই ঘৃণা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে অপরিমিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা জন্মগত বা মজ্জাগত হইয়া দাঁড়ায়; ইহা যে কতদুর অন্যায় বা অস্বাভাবিক, সে ধারণাও কেহ করিতে পারেন না॥

হিন্দুসমাজ আপনাকে শিক্ষিত ও সুসভ্য মনে করেন; বাস্তবিকই বহু সুশিক্ষিত নরনারী এই সমাজ সমলঙ্কৃত করিয়াছেন; কিন্তু অপর সমাজভুক্ত লোকদের ঘৃণা করাই কি হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন? অপরাপর সভ্য জাতির ন্যায় পরকে আপন করিবার কোন চেষ্টাই তো আপনাদের নাই, বরং ঘৃণা করিয়া দূরে রাখাই এই সমাজের বিশেষত্ব! এই সব দেখিয়া মুসলমান সমাজও হিন্দুদের ঘৃণা করিতেছে। ইহার পরিণাম ভাবিয়া দেখুন...এ যে দুই জাতি দুই দল, বিষম ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনেকে বলেন, হিন্দুগণ বাল্যকালে গো-দুগ্ধে প্রতিপালিত হ'ন বলিয়া গাভীদিগকে মাতার মত মনে করেন ও দেবতাদের প্রতিমা পূজা করেন...সুতরাং গোখাদক, প্রতিমাবিদ্বেষী মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন না। এই অভিযোগ সমগ্র মুসলমানসমাজের উপর অর্পিত হইতে পারে না; বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের বহুলক্ষ মুসলমান কৃষক হিন্দুর আচার-বিচার সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলে, গোজাতিকে তাহারা হিন্দুর মতই বিশিষ্টরূপে দেখে; পুত্র-কন্যার বাল্যকালে বিবাহ দেয়, হিন্দুর দেবতা শ্যামা ও শীতলার পূজা করে। রামায়ণের রাম-সীতা তাহাদের অন্তরও অধিকার করিয়াছেন, তাহারা সুন্দর রামায়ণ গান করে। যদি আপনারা ভ্রাতার মত স্নেহে, প্রতিবেশীর মত যত্নে এই জাতিকে গ্রহণ করিতেন, তবে এই সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইতে পারিত, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া যাইত! হয় তো এ আশা আমার দুরাশা, বিকৃত মনের বিকার বা কল্পনা বলিয়া উপহসিত হইবে...তবুও মনে হয়, যদি ইহা সফল হইত, তবে কি না হইতে পারিত!

গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্র গুজরাটের অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনমন্ত্র বাঙ্গালার কেহ যে গ্রহণ করিবেন, ইহা তো মনে হয় না! এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ দুর হইয়া দুই জাতির মিলন যেন বর্ত্তমানে অসম্ভব বোধ হইতেছে!

আপনারা ধনী, আমরা দরিদ্র; আপনাদেরই এক অংশ মাড়োয়ারী বা জৈন সম্প্রদায় শুধু ভারতের নহে, জগতের মধ্যে বিশিষ্ট ধনসম্পৎশালী...তাহা ছাড়া এদেশের অধিকাংশ রাজা ও জমিদারগণ হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত; তাঁহারা উদার, দয়াবান্ কিন্তু স্বজাতিবৎসল। ভিন্ন জাতির প্রতিও যে কর্ত্তব্য আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন নহেন।

আপনারা আলোকপ্রাপ্ত; বহু সংখ্যক লেখক-লেখিকা, বিদ্বান ও বিদুষী এই সম্প্রদায় উজ্জ্বল করিয়া আছেন। শতকরা কুড়িজন হিন্দুও নিরক্ষর নহেন। আমরা অন্ধকারের জীব; সামান্য একটু আলোকরশ্মি দেখা যাইতেছে...তাহাতে এ অন্ধকার দুরীভূত হইবার নহে, জানি না, এই ক্ষীণ রশ্মিটুকু উজ্জ্বল হইয়া কবে যে জাতির অন্তরদেশ আলোকিত করিতে পারিবে! যদি আমরা আপনাদের সাহায্য ও সাহচর্য্য সম্পূর্ণরূপে পাইতাম, তবে হয়তো এ স্বপ্ন সফল হইতে পারিত। যখন দেখিবেন, দেশমাতা পঙ্গু হইয়া রহিয়াছেন...কিছুতেই উঠিতে পারিতেছেন না, তখন বুঝিবেন, এই বিদ্বেষের ফল কি বিষময় হইয়াছে! আমাদের সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় এই অন্ধকারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বদেশের দৃষ্টিগোচর হইতে পারিতেছেন না।

তার পরেই অন্ধকারে সমস্ত লেখা অস্পষ্ট হইয়া গেল ......লেখকের হৃদয়-বেদনার শেষ দিকটা আর দেখিতে দিল না ......ইহার বোধ হয় শেষও নাই! সেই আঁধারে আমার তিনিও মিলাইয়া গেলেন......মিলাইয়া গেল সেই সুসজ্জিত গৃহ, সুন্দর পর্য্যঙ্ক, সুখের দিনের স্মৃতি-রেখাটুকু একেবারেই বিলীন হইয়া গেল! রহিল শুধু বৈধব্যের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, আর এক অসহায় অবস্থাজনিত সুদীর্ঘ হতাশ্বাস!
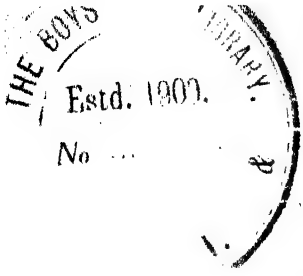
প্রাচীন সপ্তগ্রাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাচীন সপ্তগ্রাম কোথায় গেল! এখন সাতগাঁ সাধারণ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়াই সপ্তগ্রাম দেখিবার জন্য কৌতূহলি হইয়াছিলাম, আমি যখন প্রথম সপ্তগ্রাম দেখি তখনও লর্ড কার্জ্জনের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণের বিধান হয় নাই। আমার বয়সও ছিল অতি অল্প, কাজেই আমার কল্পনাপ্রবণ মন সপ্তগ্রাম দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তাই সপ্তগ্রাম দেখিতে গিয়াছিলাম। সে হইবে ১৮৯৮ সাল। তখন সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ দেখিয়াছিলাম ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ, যাহা কিছু দেখিবার ছিল, তাহার প্রায় সব কয়টিরই ছিল ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থা। কতকগুলি উচ্চ স্তূপ, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ও নানা তরু গুল্মে সমাচ্ছন্ন। সাতগাঁ পূর্ব্বে সরস্বতী নদীর দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত ছিল, তখন সেই নদীর পরিণতি দেখিয়াছিলাম একটি শীর্ণকায় খালে, খালের পশ্চিম পাড়ে নিম্ন ভূভাগে ছিল বিক্ষিপ্ত ইষ্টকসমূহ এবং কোথাও কোথাও ভগ্ন জীর্ণ প্রাকারের চিহ্ন। স্থানীয় লোকেরা তাহাকেই কিল্লা বা প্রাচীন কালের দুর্গ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। কে জানে উহা কি ছিল, হয়ত ঐ গুলি এক সময়ে জেটির মত ছিল, বাণিজ্য পণ্যাদি জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য ঐগুলি প্রস্তুত হইতে পারে। রাস্তার অনেকটা পূর্ব্বদিকে অনেক প্রাচীন দীঘি ও পুষ্করিণী ছিল এবং এখনও আছে। তাহার একটির নাম জাহাঙ্গীরের দীঘি। এই দীঘিটি আকারে বেশ বড়।

সপ্তগ্রাম নাম কেন হইল? সে কথা এখনও বলি নাই। সাতটি গ্রামের সমষ্টি বলিয়াই ইহা সাধারণতঃ সপ্তগ্রাম বা সপ্তগাঁ নামে পরিচিত। কথিত আছে এককালে সে কোন্ সময় বলিতে পারিব না, সে সময়ে অগ্নিধ্র, রোমক, ভোপিশস্ত সৌরবনন, বহ্ন্য, সরণ এবং রতিমন্ত নামক কান্যকুব্জের রাজা প্রিয়বন্তের সাতটি পুত্র ছিলেন। ইহারা সকলেই সপ্তগ্রামে বাস করিতেন এবং ইহাদেরই নামানুসারে সাতটি গ্রামের সমষ্টির নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছে। এই সপ্ত জন ছিলেন ঋষি। ইহাদের অভিশাপের দরুন সপ্তগ্রামে কুশতৃণ জন্মে না। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে ধনপতি সদাগরের সিংহল-যাত্রায় যে পথের বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন:

> কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
> মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
> বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিপ্পল শহর।
> উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥
> মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
> পুরীক্ষেত্র প্রয়াগ গোদাবরী গয়া॥
> শ্রীহট্ট কাণ্ডর কোঁচ হঙ্গর ত্রিহট্ট।
> মণিকা কণিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট।
> বাগল মলয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
> বটেশ্বরী আদি স্থল আর সপ্তগ্রাম।
> শিবতট মহানট্ট হস্তিনা নগরী।
> আর যত সহর কহিতে কত পারি?
> এ সব সহরে যত সদাগর বৈসে॥
> অঙ্গ ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আসে॥

কবির বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সপ্তগ্রাম কত বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সবদেশ বিদেশের বণিকেরাই সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, কিন্তু

> সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথাও না যায়।
> ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
> তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
> সপ্ত ঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম।
> কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
> ত্রিবেনীতে স্নান করে সাধু ধনপতি।
> রাঢ়মধ্যে সপ্ত গ্রাম অতি অনুপম।
> দু' দিন দুই সাধু তথা করিল বিশ্রাম।

তারপর সাধু কি করিলেন:

> কিঙ্কা বেচ্যা নানা দ্রব্য লয়ে দিল ভরা
> বাহ বাহ বলি সদাগর করে ত্বরা।
> নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানি
> বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন করয়ানি।

নৌকা তীরবেগে নদীর বুক দিয়া চলিল। সাধু ধনপতি

গরিকা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী।

ইহার পর সাধুর তরী ভাগীরথী তীরবর্ত্তী বেতড়ে আসিল। সে সময়ে বেতড় একটি বিখ্যাত বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। সপ্তগ্রামে যাইবার পূর্ব্বে দেশ বিদেশের বাণিজ্য তরণী দ্রব্যসম্ভার লইয়া বেতড় হইয়া যাইত। সেখানে প্রতি বৎসর একটি নির্দ্দিষ্ট কালে মেলা বসিত। বিদেশী বণিকেরা এখান হইতে জিনিষপত্র কিনিতেন। "ধনপতির সিংহল যাত্রায়' এই বেতড়ের উল্লেখ রহিয়াছে :

সঘনে চলয়ে তরী তীরের প্রমাণ।
বেতড় ছাড়িয়া শুধু পাইল বাগন।
লঘুগতি সদাগর পাইল কালীঘাট।
দুই কূল তপ জপ যাত্রিকের ঠাট।

কবিকঙ্কণের প্রাচীন পুঁথিতে এইরূপ পাঠ আছে, আবার চণ্ডীর কোন কোন সংস্করণে এইরূপ পাঠ দেখা যায়—

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা যে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইলা বেনিয়ার বালা।
বেতড়ে উতরল অবসান বেলা॥

চণ্ডীর প্রাচীন পুঁথির কোনখানিত চিত্রপুর, সালিখার নাম কিংবা কলিকাতার নাম আছে কিনা জানিনা, তবে আমাদের মনে হয় কালীঘাট পাঠই সঠিক। আমরা বিপ্রদাসের' মনসামঙ্গল কাব্য (আনুমানিক ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল) সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা নামের উল্লেখে পাই—আর পাই আইন—ই-আকবরিতে—মহাল কলিকাতার নাম। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে পাইতেছি কালীঘাট, চিত্রপুর, কলিকাতার উল্লেখ।

সপ্তগ্রাম গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরস্বতী নদীর উপরকার পুলটির কাছে একটি মস্‌জিদ আছে। অধ্যাপক ব্লকমান্ সাহেব Journal of the Asiatic society of Bengal VOL. X X X I X Pt. 1 for 1870, P.P. 280, 28 (Hunters Statistical Account of Bengal, VOL 111 P. 308) গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথম মসজিদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি অকর্ষণ করিয়াছিলেন। সে প্রায় আশীবৎসর আগে ব্লকম্যান সাহেব এই মসজিদটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : এই মস্‌জিদটি এবং তাহার কাছাকাছি কয়েকটি সমাধি মাত্র নিম্নবঙ্গের প্রাচীন রাজধানী সপ্তগ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তিস্বরূপ ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মসজিদের গায়ের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ জামালুদ্দিন এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ফকরুদ্দীন। ইনি কাস্পিয়ান সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী আমূল নামক নগর হইতে সপ্তগ্রাম আসেন। মসজিদের প্রাচীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ দেয়ালের ভিতর ও বাহিরের কারুকার্য্য অতি চমৎকার আরবী স্থাপত্য কলাদর্শে নির্ম্মিত। মসজিদের ভিতরে প্রাচীরের গায়ে একটি মিহরাব বা কুলজী আছে। কুলজীটী দেখিতে বেশ সুন্দর। কিন্তু এই মসজিদের পশ্চিম দিগের প্রাচীরের উপরের দিক্‌টা ভাঙ্গিয়া পড়ায়—মসজিদের ভিতরের দিক্‌টা নানা জঞ্জালে এবং ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এজন্য মীরহাবের সবটা দেখা যায় নাই। এই মসজিদের খিলানগুলি এবং কলস গম্বুজ পাঠানদের পরবর্ত্তী যুগের স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী গঠিত। মসজিদটির প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের দ্বারের উপর একটী করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদটির বাহিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান দেখা যায়, উহার ভিতরে তিনটি সমাধি আছে। একটি সৈয়দ ফকরউদ্দীনের, দ্বিতীয়টি তাহার পত্নীর আর তৃতীয়টি হইতেছে খোজার। কবর তিনটি বেড়িয়া যে প্রাচীর তাহা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুইটি দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড দেওয়ালের সঙ্গে হেলানভাবে দেখিতে পাইলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ উহার মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে প্রাচীরের গায়ে এমন একটা ছিদ্র হইয়াছে যে তাহার মধ্যে প্রত্যহ প্রদীপ জালানো হয়। যে প্রস্তরখণ্ড দুইখানির উল্লেখ করিলাম, উহাতে পারস্ত ভাষায় খোদিত লিপি আছে, কিন্তু এই লিপির সহিত সমাধি তিনটির কোনও সংস্রব নাই। এই তিনটি খোদিত লিপিসংযুক্ত প্রস্তরখণ্ড কোনও যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা উচিত। যে সময় সপ্তগ্রামে এবং

ত্রিবেণীর পতন কাল, এবং সেখানকার রাজকীয় প্রসাদ সমূহের ভগ্নাবস্থা সে সময় হয়ত কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই খোদিত লিপিসংযুক্ত প্রস্তর খণ্ড তিনটির উদ্ধার করিয়া এই পবিত্র স্থানে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ফলে, অনেকগুলি খোদিত শিলাখণ্ড জাফরখাঁর মসজিদ ও সমাধি বেষ্টনীর মধ্যে রক্ষিত আছে। সুতরাং এই মসজিদ ও সমাধি স্থানগুলি এক প্রকার যাদুঘরের আকারে পরিণত হইয়াছে। ফকরউদ্দীনের সমাধিগাত্রেও একটি শিলালেখ আছে, কিন্তু তাহার লেখা এত অস্পষ্ট যে, পাঠ করা সুকঠিন। পড়িতে পারিলে হয়ত অনেক কিছু জানা যাইত। লেখাগুলি যদি সযত্নে অঙ্কিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় উহা পাঠকরা সম্ভবপর হইত।

এই মসজিদ, এই সমাধিগুলি যে প্রাচীন রাজধানী সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং ঐগুলি যে তিন চারিশত বৎসরের বেশী পুরাতন নহে, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারি। সম্ভবতঃ সেই তিন চারি-শত বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মসজিদ ও সমাধিগুলি নির্ম্মিত হয় তখনই হইয়াছিল সপ্তগ্রামের পতনকালের সূচনা।

ব্লকম্যান সাহেবের ঐরূপ বর্ণনায় প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরকারি পুর্ত্তবিভাগ এই মসজিদটির যথাসাধ্য সংস্কার করিয়াছেন। এখন মসজিদটি বেশ ভাল ভাবেই রহিয়াছে। ফকরুদ্দীনের সমাধির গায়ে যে লিপিটি আছে সে লিপিটি আরবী ভাষায় লিখিত, অনেকে মনে করেন যে, বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই লিপিটি পড়া যাইতে পারে। মসজিদ ও সমাধিকয়টির অনেকটা দূরে একটি বৃহদাকার প্রস্তরস্তম্ভের পাদপীঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তগ্রামে যে সুন্দর আরবী অক্ষরে খোদিত শিলাখণ্ড-খানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে "নসির-উদ্দুনিয়া ওয়াদিন্ আবুল মজাফ্ফর (মহাম্মুদ) শাহ, রাজা, ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজ্যশাসন চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁহার অবস্থার উন্নতি করুন! মহৎ উচ্চ এবং উদার প্রকৃতির তর্‌বিয়ৎ খাঁ উপাধিধারী ব্যক্তি দ্বারায় এই সমজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার কৃপা এবং তাঁহার অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা নিবন্ধন তাঁহাকে অন্তিমকালের বিপদ হইতে রক্ষা করুন! ৮৬১ হিজরা—খৃষ্টাব্দ ১৪৫৭।

সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী। সপ্তগ্রামের কাছে মহামুদ-সা' নামে একটি স্থান ছিল, উহা ছিল সাতগাঁয়ের উপনগর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। 'মামুদসার' লোকদের সঙ্গে সপ্তগ্রামবাসীদের নানারূপ কৌতুক পরিহাস হইত, সেই সমুদয় বাক্‌যুদ্ধে সপ্তগ্রামবাসীরা মহামুদসা-বাসীদের পরাজিত করিতেন বলিয়া—সাতগাঁবাসীদের মুখে শুনা যাইত "সাতগাঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী।" সাতগেঁয়ে ভাষারও এক সময়ে বেশ সমাদর ছিল। এখনও অনেকের মুখে 'সাতগেঁয়ে ভাষার' কথা শুনা যায়। সাতগাঁর এক সময়ে বস্ত্রশিল্পের প্রসিদ্ধি ছিল।

সপ্তগ্রাম যখন রাজধানী ছিল, সে সময়ে সেখানে যে সকল প্রসিদ্ধ বংশের বাস ছিল তাহাদের মধ্যে কলিকাতা নিবাসী শেঠ বসাকদের নাম করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধনী ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্রের ব্যবসায় করিতেন, আর যাঁহারা দরিদ্র ছিলেন তাঁহারা বস্ত্রবয়ন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। পরে এই সব বংশীয়েরা কলিকাতা আসিয়া বাস করিতেছেন। কলিকাতার মল্লিক উপাধিধারী সুবর্ণ বণিকেরাও ছিলেন প্রাচীন সপ্তগ্রামের অধিবাসী।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে সরস্বতী নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়ার দরুন সপ্তগ্রামের দুর্দ্দশার আরম্ভ। সে সময়ে নিরুপায় হইয়া অধিবাসীরা নানা স্থানে প্রস্থান করেন। কথিত আছে যশোহরের বিখ্যাত বীর প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব পুরুষ বঙ্গীয় কায়স্থ রামচন্দ্র গুহরায় সপ্তগ্রামের নবাব সরকারে কাজ করিতেন। তাঁহার ভবানন্দ, গুণানন্দ, শিবানন্দ নামে তিন পুত্র ছিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় শিবানন্দের বংশসম্ভূত। যশোহরের প্রতাপাদিত্য এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র। একদিনকার ঐশ্বর্য্যশালী সপ্তগ্রামের কি পরিণাম হইয়াছে তাহা অনুধাবনযোগ্য।

সপ্তগ্রাম বাঙ্গলাদেশের একটি প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ এইখানে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। ইনি দ্বাদশ গোস্বামীর অন্যতম ছিলেন। এইখানেই একদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ দীর্ঘকাল বাস করেন, এইখানেই গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য মজুমদার নামে দুই ভাই হুসেন শাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামের অধিকারী বা নৃপতিতুল্য ছিলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় ছিল

বারলক্ষ টাকার উপর। হিরণ্য মজুমদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি রাজার মত অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য সাধন করিয়া পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে সপ্তগ্রামে একটি মেলা হয়।

সপ্তগ্রামের অতি অল্প দূরে—প্রাচীন ত্রিবেণী নগরী। ত্রিবেণী পুণ্যতীর্থ। এইখানে ভাগীরথী, সরস্বতী, যমুনা এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত বলিয়াই ইহা ত্রিবেণী নামে অভিহিত। ভাগীরথীর উত্তরতীরে ত্রিবেণী। ত্রিবেণী—অর্থে তিনটি নদী। এখানে 'ভাগীরথী ও সরস্বতী'র ধারা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যমুনা বলিয়া যাহাকে বলা হয়, তাহাকে ইউরোপীয়েরা বলেন কাঁচড়াপাড়ার খাল। ত্রিবেণীর সম্মুখে ভাগীরথীর বক্ষে যে দ্বীপের মত চড়া আছে, যমুনা সেই চড়ার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পূর্ব্বদিকে আসিয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়াছে।

ত্রিবেণীতে নানা সময়ে নানারূপ মেলা হয়। তাহাদের মধ্যে মকরসংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ উল্লেখযোগ্য। এই মেলা পৌষ মাসের শেষ দুই দিন এবং মাঘ মাসের ১লা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। মেলাটি সাধারণতঃ ইংরাজী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পড়ে। এই মেলায় স্ত্রীলোকদের সংখ্যাই হয় বেশী। যাত্রীদল এই উপলক্ষ্যে ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করিয়া ত্রিবেণীর মন্দিরগুলি, জাফর খাঁর সমাধি এবং বাঁশবাড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির দেখিয়া আসে। ত্রিবেণীর ঘাটটি সরস্বতীর মুখের উত্তরে অবস্থিত। ঘাটের সিঁড়িগুলি বেশ প্রশস্ত। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতার মধ্যে হিরণ্য ছিলেন জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। অনেকের মতে ইঁহারা গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার ইজারাদার কিংবা প্রতিনিধিরূপে চব্বিশ লক্ষ টাকা রাজকর তহশীল করিতেন এবং তাহা হইতে বাদশাহকে বার লক্ষ টাকা দিয়া নিজেরা পারিশ্রমিক লইতেন বার লক্ষ টাকা। সেকালের বার লক্ষ টাকা এখনকার অর্দ্ধ কোটি টাকা হইতেও বেশী। কিন্তু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন ছিলেন সজ্জন, দীন দুঃখীর আশ্রয়দাতা। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের জন্য ছিলেন মুক্তহস্ত। চরিতামৃতে আছে :

হিরণ্যক গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ।
সদাচার, সৎ কুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য।
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥

হরিদাস ঠাকুরও এক সময়ে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রাম—চাঁদপুরে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের ঘরে আসিয়াছিলেন।

হরিদাস ঠাকুর যদি আইলা চাঁদপুরে,
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার,
তার পুরোহিত বলরাম নাম তার॥

কিন্তু

একদিন বলরাম মিনতি করিয়া,
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া।

একদিন সমস্ত বাঙ্গলার লোক সাধু হরিদাসকে মুসলমান হরিদাসকে ঠাকুর বলিয়া সমাদর করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া দুই ভাই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। চরিতামৃতে আছে :

অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন,
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য-গোবর্দ্ধন।
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চ মুখে!
শুনিয়া সে দুই ভাই ডুবিল বড় সুখে।

হরিদাস যখন বলরামের বাড়ী অতিথি, সে সময়ে বালক রঘুনাথ দাশ গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ একদিন সব ত্যাগ করিলেন নিত্যধন লাভের প্রত্যাশায়। 'হরিদাসের ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণা রঘুনাথকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিল। বালক রঘুনাথ হইলেন বৃদ্ধ হরিদাসের ও স্নেহের উৎস। চরিতামৃতে আছে :

"রঘুনাথদাস বালক করেন অধ্যয়ন,
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন।

হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে,
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্ত পাইবারে।
তাহা যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন,
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ।

এই বালকই পরে বৃন্দাবনে ও উৎকলে রঘুনাথ দাস গোস্বামি নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত স্তবাবলী নামক গ্রন্থ ভক্তি রসের জন্ম বিখ্যাত। রঘুনাথ দাসের জীবনের ত্যাগ স্বীকার, দীন হীন দাসাভাব, শুধু সপ্তগ্রামকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালা দেশ পবিত্র হইয়াছে।

সপ্তগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস শুধু ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণমহা-নগরী বলিয়াই নহে, রাজধানী বলিয়াই নহে, বাণিজ্য ক্ষেত্র বলিয়াই নহে, বৈষ্ণব পাঠকগণের পুণ্যপ্লাবন ধারা ইহার বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াও ইহাকে পবিত্র করিয়াছে—পুণ্যতীর্থে উন্নীত করিয়াছে।

বাংলার নদীসমস্যা ও তাহার প্রতিকার

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এস্, সি

বাংলা দেশ নদী মাতৃক। বহু নদনদীর জলধারায় বাংলার মাটি সরস। নদী বাহিত পলিস্তর বাংলার দেহ গঠন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরতায় জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে। বাংলার মাটিতে পূর্ব্বে সোণা ফলিত—বাংলার লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারিত—দুই হাতে বিলাইত। কবি গাহিয়াছিলেন "ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী—অন্ন খেতেছে লুটিয়া।" বর্ত্তমানে বাংলায় অন্নাভাব, বহু জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়াছে—অনাবাদী অবস্থায় বহু জমি পড়িয়া আছে। বাংলার এই দুর্দ্দশার মূলে অনেক সমস্যাই জড়িত, তন্মধ্যে নদীসমস্যা উপেক্ষনীয় নয়। আমাদের দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষার উন্নতি নাই, কৃষির অবস্থা শোচনীয়। দেশবাসী দেশের বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইতেছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বাংলা ও বাঙ্গালী" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"বাংলার দেহে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষয়রোগ বৃদ্ধি পাইলে নানাদিক হইতে রোগীর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ ও দূষিত করিয়া দেয়। বাঙ্গালীর সমাজ দেহেও তাহাই হইয়াছে। প্রাকৃতিক আব্‌হাওয়া, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই অবনতি বাঙ্গালীর অতীতকে বিদ্রূপ করিয়া বর্ত্তমানকে ধিক্কার দিয়া, তাহার সংস্কৃতিকে কোন্‌ ব্যর্থতার অতলে আজ টানিয়া লইতেছে"।

এই নিদারুণ রোগের আশু প্রতিকার চাই বিজ্ঞানের দ্বারা—জাগ্রত সামাজিক বিচার বুদ্ধি দ্বারা। নদনদীর বিপর্য্যয় হেতু বাংলার দেহে তুমুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—তাহার প্রাকৃতিক কারণ আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বাংলার নদীগুলি বৃষ্টি ও হিমাচল-নিঃসৃত বরফগলা জলে পুষ্ট হয়। জলস্রোত মৃত্তিকা ধৌত করিয়া বৎসরের পর বৎসর জমা করিয়া রাখে—ফলে নদীর আকৃতি শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে থাকে। বহু বৎসরের সঞ্চিত মৃত্তিকা-স্তূপ নদীর গভীরতাও হ্রাস করিয়া দেয়। নদীর বাঁকের মুখে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া প্রধান জলস্রোতকে বাধা প্রদান করে। ইহার ফলে নদীর জলধারণ করিবার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়েও নদীপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। ফলে কোন কোন নদী শুকাইয়া যায়। বাংলা দেশের নদীগুলির অধিকাংশের মধ্যেই পরস্পর যোগাযোগ আছে। মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির উপর উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নদী-প্রকৃতি নির্ভর করে। মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির শীর্ণাবস্থা হইলে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে প্লাবন ও ভাঙ্গনের সূত্রপাত করিবে। জলস্রোতের বাধা নদীপ্রকৃতির

সমতাকে নষ্ট করিয়া দেয়, ফলে দেশের নানা স্থানে বন্যার সৃষ্টি করে। আজকাল বাংলাদেশে বন্যা একটি বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্যাপীড়িতেরা ইহার জন্য তাহাদের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নদীপ্রকৃতির সমতাকে নষ্ট করে সত্য; কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাচারিতাও এই নদী-বিপ্লবের জন্য কম দায়ী নহে।

মনে রাখিতে হইবে যে, নদীকে সৃষ্টি করে পর্ব্বত ও উপত্যকা, পালন করে বনভূমি, ঝিল ও জলাভূমি এবং ধ্বংস করে মানুষের তৈয়ারী রেলপথ, সেতু ও বাঁধ। মানুষ আপন স্বার্থের লোভে দেশ-দেহের অঙ্গে কষাঘাত করিয়াছে—তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। অরণ্য-ভূমি নদীকে পোষণ করে বৃষ্টি দিয়া—উহা বন্যা নিবারণ করে এবং নদীর সমতা রক্ষা করে। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের সানুদেশে ও ছোটনাগপুরের অরণ্য-বিনাশের কার্য্য বিনা বাধায় চলিয়া আসিয়াছে। ফলে উড়িষ্যা ও বাংলার বহু স্থানে প্লাবন হইতেছে—বৃষ্টির পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, যেখানে যেখানে অরণ্যবিনাশ যথেচ্ছ হইয়াছে সেখানের ভূমি বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও নগরপ্রতিষ্ঠার জন্য কলকারখানা বসাইবার জন্য অরণ্য পরিষ্কৃত হইতে চলিয়াছে—জলাভূমি, বিল প্রভৃতি বুজাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে, অরণ্যারোপন (re-forestation) ও বিল জলাভূমি রক্ষা না করিতে পারিলে, নদীর বন্যা ও প্রবাহ নিবারণ করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত কিছুকাল আগে "হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড" পত্রিকার পর পর কতকগুলি রবিবাসরীয় আলোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনাগুলিতে কিছু মতভেদ থাকিলেও, এই কথাই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় যে, বনভূমি প্লাবননিয়ন্ত্রণে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। বাংলার নদী-গুলির উৎপত্তি-স্থল পার্ব্বত্যদেশে—তথাকার বনভূমি নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে নদীর প্রশাখাগুলির পার্ব্বত্য জন্মস্থল-ক্ষেত্রে বহুকালব্যাপী অরণ্যচ্ছেদন ও সমতল ভূমিতে পথঘাট ও সেতুনির্ম্মাণ যে নদীর অবরোধ ও গতি পরিবর্ত্তন ও জল-সরবরাহে বিপর্য্যয়ের অন্যতম কারণ, তাহা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষের স্বেচ্ছাচার ও অজ্ঞতা যে কার্য্য করিয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপ প্রকৃতি অস্বাস্থ্য ও অনুর্ব্বরতা আনিয়া দিয়া মানুষকেই দণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, নিশ্চেষ্টভাবে তাহার ফলভোগ করিলে চলিবে না—বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির অবলম্বনে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হইবে।

নদী-বিপর্য্যয়ের ফলে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের এত নিকটের সপ্তগ্রাম এক সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল—যেখানে ইউরোপীয় ও আবরদেশীয় বণিকগণ সমবেত হইত—যে স্থান ধনীর প্রাসাদসৌধে আপনার ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিত—সেই স্থান আজ দুর্ভেদ্য অরণ্যবেষ্টিত হইয়াছে। জন-কোলাহলের পরিবর্ত্তে আজ শৃগালের উচ্চরবে উহা মুখরিত। সরস্বতী নদীর আজ যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বেকার সরস্বতীর সহিত এখনকার তুলনাও করা চলে না। আজ স্বচ্ছন্দে সরস্বতীকে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—গ্রীষ্মকালে ক্ষীণ জলধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইলে নদীর দৈন্যদশাই কঠিনভাবে প্রকট হইয়া উঠে।

ভাগীরথীর অবস্থাও আজ শোচনীয়। পদ্মা পূর্ব্ব-গামিনী হওয়ায়, ভাগীরথীর জল কমিয়াছে—তাহার উপর বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত মৃত্তিকা নদীর মধ্যে একের পর একটি চড়ার সৃষ্টি করিতেছে। নদী আজ শীর্ণকায়া—ইহার উপর লৌহসেতুর নাগপাশে আজ তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত স্থলের শোচনীয় অধঃপতনের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশীমবাজার ইংরেজের সুপরিচিত বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রেশম ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। তখন কে অনুমান করিতে পারিত যে, পশ্চিমবঙ্গের এই বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার শেষ দীপ্তি! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজেরা বর্দ্ধমানকে বাংলার উদ্যান

বলিয়া বর্ণনা করিত। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যকর মনোরম দীর্ঘিকা ও আম্রকাননসুশোভিত এবং বহু মন্দির ও চতুষ্পাঠীমণ্ডিত ও শাস্ত্রাধ্যয়নমুখরিত জনপদ যে এত শীঘ্র অধঃপাতের পথে যাইবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল? একদা মুর্শিদাবাদ নগরীর শোভা দেখিয়া লর্ড ক্লাইভ মুগ্ধ হইয়াছিলেন—কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাংলার এই একদা সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্রটি আজ ম্যালেরিয়ার আবাস-স্থল! শৃগাল-কুকুর আজ স্বচ্ছন্দে গঙ্গা পার হইয়া যায়—রাজধানীর অপর পারে জগৎশেঠের গুপ্ত রাজকোষের রক্ষী-যক্ষের আত্মা স্বর্ণ গণিতে গণিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—আর কবরে সিরাজদ্দৌলার খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ এই গৌরব-হানিতে শিহরিয়া উঠিয়া উত্তপ্ত শোণিতে রক্তিম হয়।"—উপরোক্ত বর্ণনায় বাংলার শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠকের মন বেদনায় ভরিয়া উঠে।

বাংলার নদীর জল-সরবরাহের মধ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি হওয়ায়, কৃষির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন স্থান জলের অভাবে শুষ্ক পড়িয়া আছে—আবাদ হয় না। আবার কোন কোন আবাদী জমির ফসল জলপ্লাবনের ফলে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আবাদ নাই—তাহার উপর এই প্লাবনের অত্যাচার—ফলে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতে চলিয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, বাংলার ৮৬ হাজার গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ গ্রামের অবস্থাই আজ শোচনীয়। কর্ষিত ভূমির পরিমাণও অনেক কমিয়া গিয়াছে—বর্দ্ধমান জেলায় শতকরা ৪০ ভাগ, নদীয়ায় ৭ ভাগ, মুর্শিদাবাদে ১৪ ভাগ, যশোহরে ৩১ ভাগ ও হুগলীতে ৪৫ ভাগ। মধ্য বঙ্গের বহু স্থান জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ১৯২১-১৯৩১ সালের মধ্যে জলের অভাবে বাংলার মোট শস্যভূমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এক লক্ষ একর—কিন্তু লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩০ লক্ষ। বাংলা দেশকে এক্ষণে সোয়া লক্ষ টন চাউলের জন্য অন্য প্রদেশের উপর বিশেষভাবে ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিতে হয়। শত্রুকরতলগত ব্রহ্মের চাউল না আসায়, ১৩৫০ সালে বাংলার কি নিদারুণ অবস্থা হইয়াছিল তাহা সকলেরই মনে এক গভীর রেখাপাত করিয়াছে—সে অবস্থা এখনও আমরা সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

অপরের অনিষ্ট ঘটিয়াছে। মানুষ চেষ্টা করিলে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে নানা উপায় প্রয়োগ করিয়া এই নদীগুলিকে রক্ষা করিতে পারিত। তাহা তো তাহারা করেই নাই—উপরন্তু রেলওয়ে, বাঁধ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নদী, নালা ও স্বাভাবিক জলনিকাশের পথগুলির আরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ডাঃ বেণ্টলী, প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার উইলিয়ম উইলকক্স ও মেঘনাদ সাহা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। উইলিয়ম উইলকক্স বলেন যে, বাংলা দেশে জলসেচের যে প্রাচীন সেচপ্রণালী ছিল তাহা গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া সেচপ্রণালীর প্রবর্ত্তন না করিলে, বাংলার নদনদীকে বাঁচান যাইবে না।

আমেরিকা, মিশর, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও নদী-বিপর্য্যয় আছে। কিন্তু সেখানকার বৈজ্ঞানিক সমাজ এ সমস্যায় উদাসীন নহেন। বিজ্ঞান-বলে তাঁহারা নদীর অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়াছেন। অনুর্ব্বর সাইবেরিয়ায়, মিশরে খালের সাহায্যে প্লাবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া বর্ত্তমানে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে নূতন ফসল হইতেছে। সেখানকার লোক ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। আমাদের বাংলার কৃষককুল আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৃষ্টির আশায় দিন গণিতে থাকে। বৃষ্টি যদি হয়, তবেই ফসল হইবে, নহিলে নয়। এইভাবে অনেকে চাষ করিতে না পারিয়া জমিজমা পরিত্যাগ করিয়া, সাতপুরুষের ভিটামাটি উঠাইয়া দিয়া সহরের কলে কাজ করিতে যাইতেছে। বাংলার কৃষি যে আজ মরণোন্মুখ, তাহা আজ দেখিয়াও শাসকসমাজ উদাসীন। বাংলার কৃষির এই মৃত্যুদশার জন্য নদীসমস্যাকে অনেকাংশে দায়ী করা যাইতে পারে।

নরদেহের ধমনী দিয়া যেমন রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তেমনি বাংলার নদীকুলও জলধারাকে দেশদেহের মধ্যে সঞ্চারিত করে। কিন্তু দেশের প্রাণধারারূপ জলধারা যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে দেশের মধ্যে অনেক অনাসৃষ্টি করিয়া তোলে। বাংলার নদীগুলিকে বাঁচাইতে হইবে। দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজকে একটি সক্রিয় কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতে হইবে। দেশকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

সাংখ্যযোগ

শ্রীকৌশিকীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ,

সাংখ্য এবং যোগ উভয়ই সমান তন্ত্র—

"সাংখ্য-যোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ

অর্থাৎ সাংখ্য তথা যোগের মধ্যে অবিবেকীই ভেদ দর্শন করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ নহেন। এইরূপ গৌতম-প্রবর্ত্তিত ন্যায় এবং কণাদপ্রবর্ত্তিত বৈশেষিক সমান তন্ত্র। কেননা, ন্যায় বৈশেষিকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। অতএব বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্যকাররূপে প্রশস্তপাদাপরনামা গৌতম মুনি মান্য হইয়াছেন। এই প্রকারে জৈমিনী-প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্যাসপ্রবর্ত্তিত উত্তরমীমাংসাও (বেদান্তদর্শন) উভয়ই সমান তন্ত্র।

"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশে ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসায় পরস্পর কোন বিরোধ নাই। কেননা, উভয় গ্রন্থকার আচার্য্য গুরু-শিষ্য হওয়ার দরুণ (তাঁহারা) বেদের পারদৃশ্ত বিদ্বান্ ছিলেন। সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক মহামুনি কপিলদেব রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানোপদেশেই সর্ব্বত্র জ্ঞান প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত সাংখ্যদর্শন জগৎপ্রসিদ্ধ। পরন্তু কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি সাংখ্যদর্শনকে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শন কপিলকৃত হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্ব-মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামী এবং বেদান্তভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী আপন আপন ভাষ্যে সাংখ্যসূত্রের অবশ্য উল্লেখ করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া উক্ত ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের ভাষ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকারই যত্র তত্র

উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষড়দর্শন-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মহোদয়ও সাংখ্যকারিকার 'টীকাকৌমুদী' রচনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শন কপিলপ্রণীত নহে। পরন্তু দৃঢ় প্রমাণাভাববশতঃ এইরূপ যুক্তি কপোলকল্পিত মাত্র। কেননা, বিজ্ঞানভিক্ষু তদীয় 'প্রবচন-ভাষ্যে' উপর্য্যুক্ত সাংখ্যসূত্রের পাঠান্তরও দিয়াছেন। ইহাতে সিদ্ধ হয় যে, বর্ত্তমান বেদান্তদর্শন নিশ্চিতই মহামুনি কপিলপ্রণীত। সাংখ্যশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে; এই সমুদয়ের যথার্থ জ্ঞানে মোক্ষলাভ হয়। গৌড়পাদভাষ্যে লিখিত আছে—

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।

জটী, মুণ্ডী, শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থ সুস্পষ্ট। যোগদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি; ইনি পুষ্যমিত্রকালীন ব্যাকরণভাষ্যকার গোনর্দ্দদেশীয় পতঞ্জলী হইতে ভিন্ন তথা বহু প্রাচীন কালের মনীষী। এই কথা যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। যদ্যপি ভগবান ব্যাসদেবের উত্তরকালে তিনি (পতঞ্জলি ঋষি) অদৃশ্য ছিলেন; ভগবান বেদব্যাস মহর্ষি পতঞ্জলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়" অর্থাৎ ভগবান পতঞ্জলি লোককল্যাণার্থ স্বকীয় বাস্তবিক [শেষ] রূপ পরিত্যাগ করিয়া অনেক রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং
মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥"

এই পদ্যাংশ দ্বারা কেহ কেহ 'যোগদর্শন,' 'ব্যাকরণমহাভাষ্য' ও 'চরকসংহিতা'—এই ত্রিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা হিসাবে এক পতঞ্জলিকেই মান্য করিয়া থাকন। পরন্তু আমার মনে হয় যে, এই পদ্য-লেখকের এবম্বিধ ভ্রম নামৈক্য হইতেই সম্ভাবিত হইয়াছে। ব্যাসপ্রণীত যোগভাষ্যের অনন্তর যোগদর্শনের উপর অদ্যাবধি বহুবিধ টীকাটীপ্পনি রচিত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে বিক্রমীয় একাদশ শতক মধ্যবর্ত্তী ধারা-নরেশ ভোজরাজকৃত 'রাজমার্ত্তণ্ড' এবং বিক্রমীয় ষোড়শশতকালীন বিজ্ঞান-ভিক্ষুকৃত 'যোগবার্ত্তিক' তথা বিজ্ঞানভিক্ষুশিষ্য ভাবাগনেশ-কৃত "যোগসূত্রবৃত্তি" অত্যন্ত সুন্দর গ্রন্থরূপে সুধীসমাজে আদৃত হইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি এই অষ্টবিধ সাধনাঙ্গ দ্বারা অতিবিকৃত, মলিন তথা চঞ্চল চিত্তকে বিষয়বাসনা হইতে দূরে সরাইয়া ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন করাই যোগের লক্ষণ।

"যথাত্মা মলিনেঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎস্বভাবতঃ।

নহি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি॥"

এস্থলে 'আত্মা' অর্থ 'মন'। অন্য অর্থ সুস্পষ্ট। যোগাভ্যাসকরণার্থ অরণ্য-গুহাদিতে যাইবার অত্যাবশ্যকতা আছে; ন্যায়দর্শনের "অরণ্যগুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসঃ" বাক্য একথার প্রমাণস্থল। (৪।২।৪০)

"গৃহং পরিত্যজ্য যোগাভ্যাসসম্পাদনার্থমরণ্যাদিষু

গন্তব্যম্, গৃহে বিষয়াসক্ত্যা চিত্তস্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ।"

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবগীতা (শ্রীগীতা)

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।"

অর্থ সুস্পষ্ট। মুক্তাবলীকারগণ যোগী দুইপ্রকারের বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন—যুক্ত এবং যুঞ্জান। যুক্ত-যোগি-জনের মধ্যে ধ্যান ব্যতিরেকেও সদা স্থূল-সূক্ষ্ম, অব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট পদার্থজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে; যুঞ্জানযোগীকে ঐ জ্ঞানার্থ ধ্যান করিতে হয়।

ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়াদি হইতে রহিত পুরুষকেই যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অবিদ্যাদি শুভ এবং অশুভ কর্ম্ম; এতদুভয়ের ভোগেই বিকারের বা বিপাকের উৎপত্তি; তদনুকূল আশয়কেই বাসনা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্তই মনে থাকা সত্ত্বেও পুরুষকে মান্য করা হয়; কেননা, পুরুষ ঐ সমুদয়ের ফলভোক্তৃ-স্বরূপ। যিনি ভোগ হইতে মুক্ত, তিনিই ঈশ্বর এবং এই ঈশ্বরই সর্ব্বোচ্চ। তাঁহার ধ্যান-ধারণা করিলে, জপ করিলে এবং যোগাভ্যাস করিলে নির্ব্বিঘ্নে যোগপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ

ত্রিধা প্রকল্পয়ন প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥"

তদনন্তর এবম্বিধ যোগী 'দাসোহহং সোহম্'-এর ন্যায় স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা হইয়া যান; কারণ যোগদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করাই পরম ধর্ম্ম। যথা—

"অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়॥"

বাংলা সাহিত্যের শারীরক ভাষ্য

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিচার করলে দেখা যায়, ডিমক্রেটিক জাতিগুলির বিরুদ্ধ ওকালতি বংশ বা রক্তগত প্রেরণার বিচারকে একবারে আঁস্তাকুড়েতেও ফেলে দিতে পারেনি। জর্ম্মণীকে হতপ্রভ করতে বাজে ওকালতি করা যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিচার নয়। J. B. S. Haldane বলেছেন, "Clever Negroes are cleverer than stupid Englishmen, and musical Englishmen are more musical than unmusical Negroes." তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "And a team to represent the human race whether of Olympic winners or Noble-prize-men, would include Jesse Owen or Sir Venkata Raman to mention no other members of inferior races." *

এ আলোচনা সমগ্র ব্যাপারেরই পাশ কেটে গেল। কথা হচ্ছে—ইউরোপের Nordics, East Baltics, Alpines ও Mediterraniansদের ভিতর যে দেহবৈষম্য ও গঠনবৈচিত্র্য দেখা যায়, তাতে কি চরিত্রগত কোন বিশিষ্ট প্রেরণা বা সম্ভারের সূচনা করে না? এরা সবই কি একঘেয়ে এক বর্ণের ও এক প্রকৃতির? এর সদুত্তর পাওয়া কঠিন হয়েছে।

জাতি ও বর্ণবিচারে heredity বা রক্তের পরম্পরাকে তুচ্ছ করা কঠিন। বাংলার রক্তে কিছুটা আর্য্যশোণিত ও অনেকটা দ্রাবিড় শোণিত আছে, এ তো স্বীকৃতই হচ্ছে। উত্তর ভারতে আর্য্যচিন্তায় ও কৃষ্টিতে আমরা যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করি, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়-রচনায় সে রকম কিছু পাই না, পাই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অন্য সম্পদ্। বাংলার রক্তে বাকি রইল মঙ্গোলীয় শোণিতের দানের কথা বা কল্পনা। যারা এটি অস্বীকার করে, তারাও উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতে অর্দ্ধচন্দ্রের মত ঘিরে যে মঙ্গোলীয় বলয় আছে, তা' অস্বীকার করতে পারে না। কুচবিহার, নেপাল, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, চীন ও ব্রহ্মদেশের সহিত বাংলা দেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বহু শতাব্দী হতে চলে আস্‌ছে এবং এদের পারস্পরিক প্রভাব উভয় দিকেই বিস্তৃত হয়েছে। নেপালে আর্য্য-রক্তের সহিত মঙ্গোলীয় রক্তের সুস্পষ্ট সংযোগ হয়েছে। এক সময়ে নেপাল প্রাক্‌ভারতের অন্তর্গত ছিল এবং বিপৎকালে বাঙালীর আশ্রয়ভূমিরূপে এ দেশ তীর্থরূপে পরিণত হয়ে এসেছে।* একথা এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বার বার বলেছেন। রক্তসংমিশ্রণ হোক না হোক, মঙ্গোলীয় প্রভাব অস্বীকার করা বাংলা দেশের পক্ষে কপটতা, সেটা সম্ভব হয়েছে নেপালী জাতিটির প্রতি সমগ্র ভারতের অন্ধ কুসংস্কার আছে ব'লে। মঙ্গোলীয় শীলতা কোন কোন বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত, কতকটা সে ঐশ্বর্য্য কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালী অর্জ্জন করেছে দেখে, এ প্রশ্ন বার বার উঠে। ভেঙ্কটরমণও এই জন্যই বোধহয় বাঙ্গালীদের ব্রহ্ম ও চীনের অন্তর্ভূ্ক্ত করতে প্রস্তাব করেছিলেন। এদের এতই অধঃপতিত ও নিম্নশ্রেণীর মনে করা অনেকের স্বভাবসুলভ হয়েছে। নিজেদের অলীকভাবে আর্য্য ভেবে এরা বেলুনের মত নিজদের স্ফীত করে' বসে আছে।

সে যাক, অতি পরিস্ফুট ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণ তুচ্ছ মনে করা বা অগ্নিকটাহে নিক্ষেপ করা সব সময়ে সম্ভব নয়। ইতিহাসকে বলিষ্ঠভাবে দেখা এবং প্রত্ন-তাত্ত্বিক সত্যের মর্য্যাদার না করা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলা দেশে অনেক কিছু সৃষ্ট হয়েছে, যা' ভারতের অন্য কোথাও হয়নি। বাঙালী এ রকমের প্রেরণা পেলে কোথা হতে? যারা প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক কোন আবেষ্টনের প্রভাবই মান্‌তে চায় না, তাদের সঙ্গে সাহিত্য ও কলার বিশিষ্ট সৃষ্টি নিয়েই আতঙ্ক

---

* J. B. S. Haldane. "Science and Every day Life" P. 179.

* Vide Sarat Das. "Indian pundits in the land of snow."

সকল বিচার করতে হবে শুধু ভাসমান প্রত্যক্ষ যুক্তির সাহায্যে। তা'ও যথাস্থানে করা হবে। কিন্তু কোন সুসভ্য জাতিই নিজেদের ভূঁইফোঁড় বা সকল রকমের উপাধিবর্জ্জিত মনে করে না। তারা ইতিহাসের ধারার ভিতর সুপ্ত প্রাণসরস্বতীর সন্ধান ক'রে নিজকে শক্তিমান্ মনে করে।

বাংলার ইতিহাসে দেখতে পাই এক আশ্চর্য্য ঘটনা। দেখ্‌তে পাই এক সময়ে কাম্বোজেরা রাজা নারায়ণ পালকে জয় ক'রে উত্তরবঙ্গের প্রভুত্ব লাভ করে। গৌড়ের এই কাম্বোজ নৃপতির বংশ ছিল তিব্বতব্রহ্মীয়। এরা বাংলা দেশে এসে হিন্দু হয়ে শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করে। দিনাজপুরের Bangarb-এ এরা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। দশম শতাব্দীতে রাজা মহীপাল উত্তরবঙ্গ হতে এদের তাড়িয়ে দেয়। কাজেই মঙ্গোলীয় সম্পর্ক বাংলা দেশের পক্ষে অস্বীকার সমীচিন বা গৌরবের নয়। রাখাল বাঁড়ুর্য্যে এজন্য তা' শিরোধার্য্য করেছে। হয়ত এ সম্পর্কের প্রভাবে এবং মঙ্গোল বলয়ের সহযোগিতায় বাংলা দেশে এমন ব্যাপারের সৃষ্টি হয়েছে, যা' ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কল্পনাও কেউ করতে পারে না। বিচিত্র কলাকৃত্যে যেমন এর প্রচুর প্রমাণ আছে, সাহিত্যেও কি এর প্রভাব কোথাও পাওয়া যায় না? মহারাষ্ট্র, তামিল, হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে সে বিশিষ্ট রণন্ ও পেলব মাধুর্য্য অনেক সময় পাওয়া যায় না, যা' বাংলাতে অরূপকে বন্দী করেছে রূপের পিঞ্জরে। ভারতের ন্যগ্রোধ-বৃক্ষতলে সত্যের সন্ধানের ফলে বিমল আনন্দ পাওয়া গেছল, এরূপ কথা প্রচলিত আছে। সে সত্যের চর্চ্চা হয়েছে অন্যত্র চীন দেশে গৃধ্রকুট পর্ব্বতের [Vulture peak] মেঘালিঙ্গিত সমুচ্চ শৃঙ্গে। এর প্রচারও অন্যত্র হয়েছে বায়বীয় ঈথর-সূক্ষ্ম ভাবমরীচিকার ভিতর, আর্য্যকল্পনার দ্বন্দ্ব ও পিচ্ছিল অনিশ্চয়তা বা দ্রাবিড়ীয় ধারণার বর্ব্বর ও দুর্ভেদ্য কঠিন কঞ্চুকের ভিতর নয়। একথা যেন এশিয়ার সভ্যতা ও শীলতার কোন অধ্যায়-আলোচনায় কেউ না ভোলে। চর্য্যাপদের কবির উক্তি এ প্রসঙ্গে বার বার কাণে পৌঁছচ্ছে। তাতে এমনি স্থূলভাকে বার বার পরিহাস করা হয়েছে অঘটনঘটনপটু কবির কাব্যজালে। কুক্কুরীপাদ বলছেন—

> রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ
> দিবসই বহুড় কাড়ই ডরে রাঅ
> রাতি ভইলে কামরু জাঅ
> আইসন চর্য্যা কুক্কুরী পাএ
> কোড়ি মঁঝে একুছি আছি সমাইজ।'

কবি বলছেন—কবির এই সূক্ষ্ম রূপকের উক্তি কোটির মাঝে শুধু একজনের অন্তরে পৌঁছয়, কারণ গাছের তেঁতুল কুম্ভীর খায় না বা গৃহের বধূ রজনীতে কামরূপে যায় না—তবুও তা' সম্ভব রসক্ষেত্রে শুধু নয়, তত্ত্বক্ষেত্রেও! না হয় পরবর্ত্তী কবির ভাষায় এক মুহূর্ত্তও "লাখ লাখ যুগ" হয় কেমন ক'রে?

বোধি-কাকোতে আছে—মঙ্গোলীয় সাধু লাওৎসু ভারতেই তীর্থ করতে আসেন। ত্যায়োধর্ম্মের সমর্পণ-বিধিতে ভারতীয় তন্ত্রের সুস্পষ্ট ছায়া আছে*। জাপানের হীয়েনযুগ ও চীনের ত্যাঙযুগের মঙ্গোলীয় প্রভাব সমগ্র এশিয়ায় যে অঘটনঘটন ভাবমূর্চ্ছনা উপস্থিত করেছিল, একথা কে না জানে†? রাজধানী চ্যাঙ্‌এনের প্রভাব সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডকে অভিভূত করেছে, একথা অস্বীকার করবার বা এর পাশ কাটাবার কোন উপায় নেই। কাজেই মঙ্গোলীয় বা ত্যুরেণীয় (Turanian) সংস্পর্শ বিধাতার একটা আন্তর্জ্জাতিক দান ছাড়া আর কিছু নয়। চীনের ত্যাঙযুগ ও গৌড়ীয় পালযুগ প্রায় সমসাময়িক—এ সময়ে ভাবের আদান প্রদান হয়েছে প্রচুর অন্ততঃ বাংলা দেশের সঙ্গে চীনের। বাংলার কবিদের দৃষ্টি এজন্য দূরগামী হয়েছে। সরোরুহ মুগ্ধকর ভাষায় বলেছে :—

> "পর অপ্পাম ম ভন্তি করু"

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না, এ দুইই এক।

* Sister Nivedita, in Okakura's "Ideals of the East" P. XII, Also P. 133

† Ency. Brit "In Tang Period China became the strongest and largest empire on earth...... extended up to Caspian" Vol. V. P. 547. Also Well's History of the world P. 378.

এজন্য 'নেতি' ব'লে ভারত চৈনিক পরিব্রাজকদের প্রাকৃভারত হতে দূর করে দেয় নি। অপরদিকে এ যুগের চৈনিক কবিও ভাবের এই বিরাট্ সমুদ্রসঙ্গমে অবগাহন ক'রে তৃপ্ত হয়েছে এবং দৃষ্টিকে বিস্তৃত করেছে অসীম-ভাবে। ত্যাঙ্ যুগের কবি লি-পোর কবিতা মনে হচ্ছে। এ কবি এক নিঃশ্বাসে স্থিতি ও গতি, দূর ও নিকট এবং অন্তর ও বাইরকে এক করেছে কতকটা সন্ধ্যাভাষায় সমাহৃত কল্পনার সাহায্যে :—

"ইবনীতে তৈরী রে মোর তরী,
(আবার) বাঁশীর ওগো সকল রন্ধ্রে
সোণার কারিগরী।
সবুজ শষ্প দাগ মুছে দেয় রেশ্‌মী অঞ্চলে,
লাল মদিরা উড়িয়ে দেয় গো, দুখের জঞ্জালে।" *

* লেখক কর্ত্তৃক Titz Pevaldএর অনুবাদের অনুবাদ।

সব আয়োজনে মানুষ ওতঃপ্রোতঃ। যা একদিকে নেই—তা' অন্যদিকে আছে—যা' একদিকে রুদ্ধ, তা' অন্য দিকে খোলা। সামঞ্জস্যের রামধনুতে সৃষ্টির বিরাট্ আকাশের উভয় প্রান্ত যুক্ত। ত্যাঙ্ যুগের কবি তাই বাংলার কবির মতই দূরদর্শী।

বাঙালীর রক্তের নৃতাত্ত্বিক দিক্ হ'তে বিচার অবশ্যম্ভাবী। তা' না হলে বাংলার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপ ও কীর্ত্তির অনেকটা অংশ চোখে পড়বে না। নৃতাত্ত্বিকেরা যে কয়টি মুখ্য জাতির কঙ্কাল ও শির পরীক্ষা করেছেন, তাদের অর্থাৎ 'অষ্ট্রিক', 'নৈগ্রি'ক্, 'আল্পোদিনারী'য়, 'আর্য্যনর্ডিক্', 'ভূমধ্যসাগরিক' প্রভৃতি জাতির রচিত রক্তের ধাঁধাঁয় কিছুটা প্রবেশ করা বাংলাজাতির মনের তাঁত-বিশ্লেষণে উপেক্ষা করা চলে না। মনের তাঁতেই তো বাংলা কাব্যের মসলীন তৈরী হয়েছে। (ক্রমশঃ)

অন্তরায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গীতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দেবকুমার একটুও দুঃখিত হইল না। তাহার মনে হইল, সে খুব ভাল করিয়াছে, গীতাকে আঘাত করিয়া। গালিমন্দ গীতার একান্ত ভাবে পাওনা ছিল। শুষ্ক পত্রের মত সমাজ-দেহ হইতে যাহা খসিয়া পড়িয়াছে, আঁস্তাকুড় হইতে পূতিগন্ধযুক্ত সেই আবর্জ্জনাগুলি তুলিয়া সমাজের স্বাস্থ্য যে নষ্ট করিতে চায়, তাহাকে সে আঘাত করিতে বাধ্য। কর্ম্মশক্তিতে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা আজ পৃথিবী শাসন করিতেছে। আর কবর হইতে তাবিজ-কবজ খুঁড়িয়া তুলিয়া কর্ম্মশক্তির গলায় আমরা পাথর বাঁধিয়া দিতেছি। যা' আত্মশক্তিকে পঙ্গু করে, তার চেয়ে বড় পাপ আর নাই। গীতা এই পাপকেই প্রশ্রয় দিতেছে।

কিন্তু গীতা চলিয়া যাইবার পর যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনের বল যেন কমিয়া আসিতে লাগিল এবং একটা অজ্ঞাত ভয় ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত বুক দখল করিয়া বসিল। সে যে সত্য কথা বলিয়াছে, সে সম্বন্ধে তখনও তাহার কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু ইহা ভাবিয়াই এখন নিজের উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। সে গীতাকে আঘাত করিতে গেল কেন? সে তো বুঝাইয়া তাহার কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিত! কেন সে হঠাৎ রাগিয়া গেল? সে যা' বিশ্বাস করে এবং যা' বিশ্বাস করে না, তা সে খুলিয়া বলিতে পারে। খুব জোর দিয়া বলিলেও দোষ হয় না। কিন্তু সে উত্তাপের সৃষ্টি করিল কেন? উত্তাপেরও একটা মাত্রা আছে। সে রাগের মাথায় এমন কথা কি-করিয়া বলিয়া ফেলিল, যাহা পৃথিবীতে কাহাকেও বলা যায় না?

সে-দিন দেবকুমার আর বাড়ী হইতে বাহির হইল না। ঘুমের কাঙাল রোগীর মত বিছানার উপর পড়িয়া থাকিয়া কেবলি সে ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর মা তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর কোন রকম করিয়া সে রাত্রির আহার শেষ করিয়া আসিল। কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল

না। তাহার নিজে গহিত অপরাধের স্মৃতি গুরুভোজনের উদ্গারের মত বার বার তাহার মনে উঠিয়া, তাহাকে চাবুক মারিয়া যেন জাগাইয়া রাখিতে লাগিল।

গীতার মা প্রতিদিন ভোরে শিবপূজা করেন। পরের দিন তিনি পূজা করিতে বসিয়াছেন। মুখ তুলিয়া দেখিলেন, দেবকুমার আসিয়াছে। তাহার হাতে এক সাজি ফুল। ফুল দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া তিনি কহিলেন, এত ফুল কোথায় পেলি রে?

তোমার জন্য নিয়ে এলাম বসুদের বাগান থেকে।

গীতা ঘরের ভিতর হইতে দেখিল, দেবকুমার আসিয়াছে। কিন্তু সে ঘর হইতে বাহির হইল না। ঘরের ভিতর বসিয়া বিনা প্রয়োজনে এ-কাজ সে-কাজ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পূজার কাছে বসিয়া দেবকুমার কহিল, কাকীমা, তোমাদের না একখানা মহাভারত ছিল?

হাঁ, ঐ-যে রয়েছে তাকের উপর। কি করবি মহাভারত দিয়ে?

আমার একটা জিনিস দেখবার আছে, বলিয়া সে তাকের কাছে গেল।

একখানা তাকের উপর অনেকগুলি বই সাজান। সমস্তই ধর্ম্মপুস্তক। পুরোহিতদর্পণ, ক্রিয়াকর্ম্মবারিধি, পূজারহস্য, শক্তিতত্ত্ব, স্তবকবচমালা, মনসামঙ্গল আবার রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বিভিন্ন পুস্তকও রহিয়াছে। ইহার ভিতর গীতা, চণ্ডী ও মহাভারতের বিরাট্ পর্ব্ব প্রভৃতি কতগুলি পুস্তক তালপাতার উপর ছাপার মত হরফে লেখা। গীতার পরলোকগত পিতা বহুকষ্টে এই বইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং গীতা বড় হইয়া শালগ্রামশিলারই মত যত্ন করিয়া বইগুলি রক্ষা করিয়াছে। দেবকুমার বইগুলি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া কালীসিংহের মহাভারত দুইখণ্ড বাহির করিয়া বারান্দায় ভাল হইয়া বসিল।

কতক্ষণ পর নির্ম্মলা দেবী কহিলেন, তোর মহাভারতের দরকার, তুই নিয়ে যা না বাড়ী।

না, এক্ষুণি দেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু তখনি দেখা হইল না। তাহার পরও প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। প্রাঙ্গনে গৃহের ছায়া অনেক দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ধীরে ধীরে ছোট হইয়া আসিতে লাগিল।

গীতা দেখিল, দেবকুমারের যাইবার মতলব নাই। সে তখন বাহির হইয়া কহিল, মা, আমি একটু অরুণাদের বাড়ী চল্লাম। ফিরতে দেরী হবে।

মা কহিলেন, সকাল বেলা তোর ও-বাড়ী কি? অরুণা তো নেই এখানে!

গীতা তাহার কোন উত্তর করিল না, চলিয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পর গীতা ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, দেবকুমার তখনও মহাভারত পড়িতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাহার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়াই দ্রুতপদে ঘরে যাইয়া উঠিল।

গীতার মা কাল সন্ধ্যায় গীতার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখনও তার হাবভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, গীতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি দেবকুমার?

দেবকুমার এইবার মুখ তুলিয়া কহিল, আমি কিছু ঝগড়া করিনি, কাকীমা, কাল খেটে-খুটে যেই এসেছি, অমনি আমাকে খামকা-খামকা কতগুলি গালমন্দ দিল, তারপর রাগ ক'রে চলে এল।

তোকে গালমন্দ দিল কেন?

রসিককে আমি জুচ্চোর বলেছি, এই আমার অপরাধ। ও সকলকে ঠকিয়ে বেড়ায়, ওকে জুচ্চোর বলা কি অন্যায়?

ও জুচ্চোরই তো! ও আমাদেরও ঠকায়।

তবে বুঝলে তো, আমার অপরাধটা কি!

কিন্তু গীতা কথায় যোগ দিল না। কতক্ষণ পর দেবকুমার মহাভারত বন্ধ করিয়া কহিল, কাল আবার তোমার জন্য ফুল নিয়ে আস্‌ব কাকীমা?

আনিস্ বাবা, তবে নাকি ওর ভক্তি নেই! আমার দেবুর মত লক্ষ্মী ছেলে কে আছে!

দেবকুমার চলিয়া গেলে নির্ম্মলা দেবী কহিলেন, আচ্ছা গীতা ও এতক্ষণ ব'সে গেল, তুই একটা কথাও বল্লিনে ওকে!

গীতা কুপিতকণ্ঠে কহিল, মা, সব কথার ভিতর তুমি না এসে পার না!

আমি কোন কথায় যেতে চাহি-নে বাছা। আগে বিয়ে-থা হোক, তারপর যত ইচ্ছে ঝগড়া ক'রো। আমি কথা বলতে যাব না।

পরের দিন ভোরে দেবকুমার আবার ফুল নিয়া আসিয়াছে। সে ফুলগুলি পূজার থালার সম্মুখে রাখিয়া আবার মহাভারত লইয়া বসিল। মহাভারতের ভিতর কি একটা কথা আছে, তাহা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আজও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। তথাপি গীতা ঘর হইতে বাহির হইল না। পূজা করিতে বসিয়া নির্ম্মলা দেবী রাগে জ্বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আজ তাঁহার পূজা কিছুই হইল না।

আর কতক্ষণ মহাভারত নাড়িয়া-চাড়িয়া দেবকুমার কহিল, গীতা বাড়ী নেই কাকীমা?

বাড়ী আছে, ও গীতা!

গীতা উত্তর করিল, কি? কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইল না।

দেবকুমার এইবার উঠিয়া ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, গীতা আজ নাকি তোমার অনেক পূজারীর দরকার, আমাকে এক জায়গায় পূজো করতে পাঠাও না।

গীতা রুষিয়া কহিল, তুমি বি.এ পাশ করে' পূজো করবে—লোকে দেখলে ছি ছি করবে না!

আচ্ছা, আমাকে কেবল তুমি গালাগালিই করেছ, কখনও বলেছ, পূজো করে এসো।

আমি বল্লেই কি তুমি যাবে?

হুকুম করে' কখনও দেখেছ কি!

দেবকুমারকে কাজের ভিতর আনিবার এই সুযোগ গীতা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। কহিল, তবে যাও, সত্যি আজ পূজারীর দরকার আছে। কামারদের বাড়ী যেয়ে আজ পূজো করে' এস। ওঁরা একজন ভাল পুরুত চান।

কখন যেতে হবে?

চান করে' উঠে এক্ষুনি চলে যাও। আমি অতুলকে বলেছিলাম। তা' নাই যাবে অতুল।

দেবকুমার চলিয়া যাইতেছিল। নির্ম্মলা দেবী কহিলেন, ফিরে এসে আজ এখান থেকে খেয়ে যাস্ দেবকুমার।

দেবকুমার কহিল, গীতা বল্লে খাব।

গীতা এবার হাসিল। সে দেখিল, তাহার মনটা অনেক হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। কহিল, তাই খেয়ো, আমি রান্না করে' রাখব কিন্তু।

অনেক দিন পর গীতা আবার ভাল করিয়া রান্না করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে ঝিকে তাড়াতাড়ি বাজারে পাঠাইয়া মাছ ও তরকারি আনাইল। অনেক কিছু পদ আজ হইবে না। কিন্তু যে-কয়টি জিনিস আজ হইবে, তাহাই ভাল করিয়া রান্না করা চাই।

গীতা স্কুলে রান্নার পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পাইত। বইতে লেখা সমস্ত পদ সংগ্রহ করিতে না পারিলেও, যতটা সম্ভব ভাল করিয়াই সে কালিয়া রাঁধিল।

ঝি চাউল ধুইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। গীতা কহিল, দেখতো ঝি, কালিয়াটা কেমন হয়েছে?

ঝি প্রসারিত হাতের উপর কালিয়ার একটু ঝোল লইয়া চাখিয়া দেখিয়া কহিল, চমৎকার হয়েছে দিদিমণি!

গীতা খুব খুশী হইল। মুড়িঘণ্ট এখনও বাকি। চাটনিও একটা রাঁধিতে হইবে। দুই-তিনখানা মাছ ভাজাও দরকার। দেবকুমার তো আসিয়া আর অপেক্ষা করিবে না। বেলাও হইয়া গিয়াছে অনেক।

মুড়িঘণ্টটা কড়াইয়ের উপর ফুটিতেছে। সুন্দর একটা গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে চারিদিকে, সদ্যফোটা ফুলের গন্ধের মত। রান্নার কাছে বসিয়া গীতার মন যেন কেমন একটা আনন্দে দোল খাইতে লাগিল। এতদিন পর দেবকুমারের মন একটু ফিরিয়াছে। এখনি যদি অল্প-স্বল্প কাজ চালাইয়া লয়, তাহা হইলেই সে খুশী। সে ব্যবসায় করিতেছে, করুক। পৌরোহিত্যের স্বল্প আয়ে হয়তো তাহার মন কখন সন্তুষ্ট হইবে না। কিন্তু ব্যবসায়

করিলেই যে পৌরোহিত্য করিতে পারিবে না, তাহার কি অর্থ আছে? সে যদি কাজের ভিতর থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহার পর এককালে এমনও হইতে পারে, সে-ই সমস্ত কাজের দায়িত্ব নেবে। দেবকুমার এমনি কাজে বাহির হইয়া যাইবে, আর সে ঘরে বসিয়া তাহার জন্য—রান্না করিয়া রাখিবে। ইহাই সে চায়, আর কিছুই সে চায় না।

বেলা অনেকটা হইয়া গিয়াছে। আকাশ হইতে আগুন যেন গলিয়া পড়িতেছে পৃথিবীতে। গীতা দরজায় দাঁড়াইয়া একবার রাস্তার দিকে চাহিল—না দেবকুমারকে এখনও দেখা যায় না।

গীতা আবার আসিয়া বসিল। একবার তাহার মনে হইল, আচ্ছা দেবকুমার যে পূজা করিতে গিয়াছে, তাহা কি কর্ত্তব্যর প্রেরণায়? হঠাৎ তাহার মনে এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির জাগরণ হইল কেন? তাহার এই শুভবুদ্ধি এতদিন লুকাইয়া ছিল কোথায়? কিন্তু ইহা নিয়া যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই দেখিল, রোষের পরিবর্ত্তে একটা অনির্ব্বচনীয় সুধায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতেছে।

দেবকুমারের ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। গীতা আসন পাতিয়া থালা-বাটিগুলি সব সাজাইয়া নিরামিষ-ঘরে মায়ের কাছে গিয়া বসিয়াছিল। দেবকুমার আসিতেই তাহাকে আসনে নিয়া বসাইল।

দেবকুমার খাইতে বসিয়াই ট্যাঁক হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া গীতার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও দক্ষিণা নিয়ে এলাম দু' টাকা।

গীতা আনন্দিত হইয়া কহিল, দু' টাকা! খুব পেয়েছ তো!

আজ যা' পুজো হয়েছে, টাকায় তার দক্ষিণা হয় না।

হয়তো তাই, তুমি যা' করবে, অতুলের সাধ্য আছে তা' করতে পারে!

দেবকুমার একটু হাসিল, উত্তর করিল না।

কতক্ষণ পর গীতা কহিল, আজ তোমার অনেক বেলা হয়ে গেল। কারখানায় যেতে পারলে না তো!

পারলাম না, কি করব!

এতে তো ক্ষতি হ'ল তোমার

ক্ষতি হলেই করছি কি? নীতিবাক্যে আছে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'লে, পণ্ডিতেরা অর্দ্ধেক ত্যাগ করেন।

গীতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছিল তোমার?

তা' তুমি বুঝবে না।

গীতা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শেষে কহিল, আচ্ছা তুমি মনে কর, আমি খুব কঠিন-কঠোর,—আমার স্নেহ, ভালবাসা বলে' কিছু নেই, না?

তোমার যে ভালবাসা আছে, এই কথাটা বুঝতে অনেকটা পথ ঘুরতে হয়। যেটুকু ভাষায় প্রকাশ পায়, তা' থেকে ধরাও কঠিন।

গীতা বুকের কলরোল কতক্ষণ নীরবে অনুভব করিয়া শেষে কহিল, যা' বলা হয়, তার চেয়ে যা' বলা হয় না, তার মূল্য ঢের বেশী হ'তে পারে জান!

দেবকুমার অনুরাগভরে গীতার মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর খাইতে লাগিল।

দেবকুমার অনেক বেলা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে অর্দ্ধেক পদ দিয়াই প্রায় সম্পূর্ণ ভাত তুলিয়া ফেলিল। গীতা পাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, তুমি যে এক কালিয়া দিয়েই সব ভাত খেলে আর সব পদ কি হবে?

আর খেতে পারব না গীতা, পেট ভরে' গেল।

এ'রি ভিতর পেট ভরলে চলবে না।

কথা বলতে বলতে খেয়ালই ছিল না যে, এত পদ আছে। আমাকে আগে মনে করিয়ে দাও নি কেন?

থালার চারিদিকে বাটি রয়েছে, মনে করিয়ে দিব কি আবার!

তা' আমি এখন কি করব, সত্য কথা বল্লাম।

না, তা' হবে না। সেইদিন খাওনি মনে আছে? আজ যদি এ-সব না খাও তবে—

তবে কি?

না, খেতে হবে সব। তারপর মা ঐ ঘরে মিষ্টান্ন রাঁধছেন। তা' বুঝি তোমাকে না খাইয়েই ছাড়বেন ভেবেছ!

তবে আর আমার রক্ষে নেই! তুমি আমাকে রক্ষে কর গীতা। আমি এখন উঠি।

উঠবে! ক্ষেপেছ! বলিয়া কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দীর্ঘকণ্ঠে গীতা ডাকিল, মা!

মা কি বলিলেন, শোনা গেল না। কিন্তু হঠাৎ বাড়ীর বাড়ীর দরজা হইতে নারীকণ্ঠের একটা করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। গীতা তাড়াতাড়ি কহিল, তুমি উঠ না, আমি দেখে আসি, বলিয়া দ্রুতপদে দরজায় আসিয়া দেখিল, কর্ম্মকার-গৃহিণী বক্ষে আঘাত করিয়া কাঁদিতেছেন।

দেবকুমার ইঁহাদের বাড়ীতেই পূজা দিতে গিয়াছিল। গীতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এই তো এলেন ঠাকুরমশায় তোমাদের বাড়ী থেকে। এর ভিতর আবার তোমাদের হ'ল কি?

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, ঠাকুরমশায় আমাদের সর্ব্বনাশ করে' এসেছেন।

কি সর্ব্বনাশ করে এসেছেন?

কর্ম্মকার-গৃহিণী ঘটনার বিবরণ কহিলেন। প্রতি বার পূজারী যান, তাঁহারা নিজেরাই পূজা করিয়া আসেন। দেবকুমার গিয়া বলিলেন যে, পূজারীতে পূজা করিলে কোন ফল হয় না। নিজেদের পূজা নিজেদেরি করিতে হইবে। তাহার বড় বৌমা তো কিছুই বোঝে না। দেবকুমার তাহার বড় ছেলের মত করাইয়া, বড় বৌকে দিয়া শালগ্রামশিলা পূজা করাইয়াছেন। মেয়েছেলে বলিয়া তাহার তো শালগ্রামশিলা পূজা করার অধিকার নাই-ই—তাতে আবার শূদ্রাণী। এ পাপ দেবতা কখনও সহ্য করিবেন না। সকলে বলিতেছে, এই মহাপাপে তাহাদের বংশ নির্ব্বংশ হইবে—বলিয়া কর্ম্মকার-গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া সুর তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে দেবকুমার কোনরূপে আহার শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়াছে। কর্ম্মকার-গৃহিণীর সহিত তাঁহার একটি ছেলে আসিয়াছিল। গতবার সে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে। দেবকুমার তাহাকে কহিল, এই জন্য তোমরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে' দিয়েছ!

সে কহিল, মা কি বলেন, শুনুন।

দেবকুমার কর্ম্মকার-গৃহিণীকে কহিল, তখন তো তোমরা সবাই মত দিলে, এখন তবে কান্নাকাটি কেন! আমি তো স্পষ্ট করেই বলেছিলাম, আমায় পুজো করতে বললে, আমি করব। কিন্তু তোমাদেরই করা উচিত। তখন না বল্লে, কোন পুরুত কি আমাদের ঠাকুর ছুঁতে দেয়! এখন কাঁদছ কেন বাছা!

তখন বুঝতে পারিনি বাবা!

গীতা কহিল, এতো ঠিক, তুমি ওর বৌকে দিয়ে শালগ্রামশিলা পূজ' করিয়েছ?

আমি ওদের বলেছি, পূজারীতে পুজো করলে তোমাদের কি লাভ হবে? তোমরা নিজেরা পুজো কর।

পূজরীতে পুজো করলে কিছুই লাভ হবে না, একথা বলার তোমার কি অধিকার ছিল?

আমি ওদের বলেছি, আত্মিক উন্নতির ব্যাপারে কোন 'প্রক্সি' চলে না। নিজের আত্মিক উন্নতি নিজেরই করতে হয় অপরে কখনও করে' দিতে পারে না। পরে পথ দেখাতে পারে—উৎসাহ দিতে পারে, কিন্তু নিজের সাধনা নিজেদেরই করতে হবে। কি ভাবে পুজো করতে হবে, আমি তা' বলে দিয়েছি—ওরা নিজেরাই পুজো করেছে।

আত্মিক উন্নতির দিক্ ছাড়া একটা কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন এর ভিতর কি নেই? নিজে পূজা না ক'রেও বাড়ীতে ঠাকুর-পূজা হ'লে তাতে কি কল্যাণ হয় না?

নিজেরা ভগবানের নাম নিলে কল্যাণ হয় না, এ-কথা বিশ্বাস করার পূর্ব্বে আমি আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত আছি। আমি সত্যি সত্যি এদের বলেছি, পূজা করার জন্য পুরুত ডাকার দরকার নেই। রাজা আর প্রজার ভিতর জমিদার, আর ভগবান আর ভক্তের ভিতর পুরুত সমানই অনাবশ্যক।

গীতা ক্রোধে কতক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর কহিল, অনাবশ্যক তো বটেই! আচ্ছা, সাত পুরুষের ভিতর কখনও কেউ দেখেছে, শূদ্র হয়ে আর নারী হয়ে কেউ শালগ্রাম পুজো করেছে?

দেবকুমারের হঠাৎ স্মরণ হইল, সে আর রাগ করিবে না। সে সুর অনেক নরম করিয়া হাসিয়া কহিল, গীতা শাস্ত্র তোমাদের সে-অধিকার দিয়েছে। গীতার

আছে, নারী হোক, শূদ্র হোক, পতিত হোক, সাধনা করে' সকলেই পরমগতি লাভ করতে পারে। দেখ না গীতাটা আর একবার।

যে-ছেলেটি কর্ম্মকার-গৃহিণীর সহিত আসিয়াছিল, পূজার সময়ে সে বাড়ী ছিল না। কিন্তু এতক্ষণ দেবকুমারের কথা শুনিয়া একটা উত্তেজনা বোধ করিতেছিল। এইবার সে কহিল, আমার বড়দার তো এখনও মত, কোন অন্যায় হয়নি। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা মাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। মা কোন যুক্তি বোঝেন না।

দেবকুমার কহিল, এই সহজ কথাটা কেন তুমি বুঝবে না? তুমি রোজ খাও, আমি যদি তোমার হয়ে খাই, তোমার পেট ভরবে কি? তুমি রোজ মালা জপ কর, একজন যদি তোমার হয়ে নাম জপ করে' দেন, তোমার ফল হবে কখনও? পূজারী যদি পূজো করে, তবে পূজারীর ফল হতে পারে, অপরের কেন হবে? বাড়ী চলে' যাও, কিচ্ছু অন্যায় হয় নি। বুঝতে পাল্লে!

কর্ম্মকার-গৃহিণী কহিলেন, কিসে কি হয়, তা' আমি জানিনে। আপনারা একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিন।

গীতা কহিল, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি! আসলে উদ্দেশ্য নিয়ে কথা। তা'ছাড়া একটা সামাজিক শৃঙ্খলাও তো আছে! এখানে যা' খুশী তাই কি করা চলে? এ-কথা যখন লোকে শুনবে, তখন আগুন লেগে যাবে না চারিদিকে?

কর্ম্মকার-গৃহিণী সুরে সুর মিলাইয়া কহিলেন, আগুন লেগে গেছে দিদিমণি। সব লোক এসে ধিক্কার দিচ্ছে না! পঞ্চতীর্থ-গৃহিণী তো বলছেন, এবার সংসারে একটা অমঙ্গল না হয়ে যাবে না, বলিয়া আবার তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

গীতা কহিল, আচ্ছা, তোমরা বাড়ী যাও। রসিক ঠাকুরকে পাঠাচ্ছি এক্ষুনি।

কর্ম্মকার-গৃহিণী চলিয়া গেলে গীতা কহিল, তুমি আজ যে কি-ব্যাপার করেছ, সে-সম্বন্ধে তোমারই ধারণা নেই। এর ফলে আমাদের বহু যজমান ছুটে যাবে। আর আজই যে এটা বন্ধ হবে, তা' নয়। তুমি চিরকাল এ-সব করবে। তার ফলে একদিন আমাদের ব্যবসায় সম্পূর্ণ নষ্ট হবে। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আশা তুমি কর না, তা' আমি জানি। কিন্তু আমার মায়ের কথা সে-দিন তোমাকে বলেছিলাম। মায়ের এই বিপদ্ চক্ষের উপর দেখে, কখনও আমি চুপ করে' থাকতে পারি-নে। তোমার কাছে অনুরোধ এই, তুমি আজ বাড়ী যেয়ে, জেঠাইমাকে বলে' আমার মায়ের যজমান মাকে ভাগ করে' দেবে— বলিয়া গীতা ত্রস্তপদে উঠিয়া গেল।

পরের দিনই রসিক কর্ম্মকার-বাড়ী প্রায়শ্চিত্ত করাইতে গেল। সে গিয়া বলিল, শালগ্রামের পুনঃ সংস্কার করাইতে হইবে। দেব-বিগ্রহ কোন প্রকারে ভগ্ন হইলে, ফাটিয়া গেলে, পূজারাহিত্য দোষ ঘটিলে বা অস্পৃশ্যস্পর্শ হইলে, সেই বিগ্রহে দেবতা থাকেন না। এইরূপ স্থলে পুনঃ সংস্কার না করিয়া উপায় নাই। রসিক খুব ঘটা করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিল। পঞ্চগব্যে শোধন, মিলিত পঞ্চগব্যে বিগ্রহকে স্নান, কুশোদকে বিগ্রহের শোধন, দেবতার মস্তকে মন্ত্র-জপ এবং পুনরায় পদ্ধতি-অনুযায়ী পূজা প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি সে রাখিল না এবং বহু সময় বসিয়া মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করিয়া দেবকুমারের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইল।

কিন্তু এই ব্যাপারে দেবকুমারের যে কিছুমাত্র অপরাধ আছে, তাহা সে স্বীকার করিল না। বরং সকল দোষই সে কর্ম্মকার-গৃহিণীর উপর চাপাইল। শূদ্রের কি স্পর্দ্ধা! সে নিজেই পূজা করিতে চাহে! দেবকুমার কেবল কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে, সে কি তা' বুঝে! নিজেদের ইচ্ছা না থাকিলে, দেবকুমারের সাধ্য কি তাহাদের দিয়া পূজা করাইতে পারে? গালাগালি খাইয়া কর্ম্মকার-গৃহিণী যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল এই ভাবিয়া যে, আবার যেন হিন্দুত্বের আব্‌হাওয়ায় সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন—গত শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' প্রেসের অনবধানতাবশতঃ ১৫৮ পৃষ্ঠার পরে ভুলক্রমে ১৫৯ পৃষ্ঠার স্থলে ১৬৩ পৃষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পঠিতব্য বিষয়বস্তু বাদ পড়ে নাই। এই ভ্রমের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।
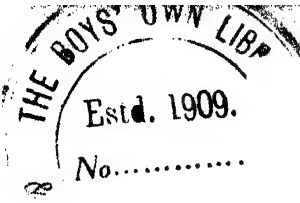
"মন্বন্তর"

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,

বাঘা চৌধুরীর নামে থরথরি কাঁপে ভয়ে ভরগ্রাম।
এমনি প্রতাপ, যেন কাল-সাপ, দেখিলে আসে যে ঘাম!
দালান-কোঠার, বাড়ীর বাহার, তুলনা কোথায় পাই,
সোণা টাকা কড়ি, এত জমিদারী, আশে পাশে কারো নাই।
ভক্তিতে কেহ মানে কিনা মানে, ভয়ে মানে সবে তাঁরে;
তাঁর রোষানলে বারেক পড়িলে যেতে হবে ছারেখারে।
এ নহে প্রবাদ, খাঁটি সংবাদ, দেখেছে হারাণ রায়,
তাঁহার ভয়েতে বাঘেতে-গরুতে একই ঘাটে জল খায়।
আরো দেখিয়াছে অশ্বিনী খুড়ো,আশীর উপরে হয়েছে বুড়ো:
সত্য ঘটনা, নহে তা' রটনা অথবা খবর উড়ো।
একদিন নাকি চৌধুরী সাথে বেড়াতে বেড়াতে পথে,
ভেল্কির মত বাঁচিয়া গেলেন পড়িয়া বাঘের হাতে।
সন্ধ্যা তখনও হয়নি ঘোরালো, নেবেনি দিনের আলো—
এমন সময়ে দেখা গেল কাছে গায় ডোরা বাঘ কালো।
যেমন ভীষণ, তত গরজন, সাক্ষাৎ যেন কাল,
খুড়ো মহাশয় ভয়ে অতিশয় হারায়ে ফেলিল তাল।
তেড়ে এলো বাঘ, যেন কত রাগ, এখনই করিবে শেষ—
সহসা থামিল, কি যেন দেখিল, ভয়েতে হইল মেষ।
চৌধুরী তারে কহিলেন পরে বিবরণ—যত তার—
কেমনে রক্তচক্ষু ঘুরাতে বাঘের হইল হার।
আরও কত কথা, দশখানা খাতা যদি লিখি যাবে ভরে',
এইখানে থাক্ সে সব কথার বিবরণ, শোন পরে।
হেন চৌধুরী, নহে জারীজুরি, রীতিমত বাহাদুরি—
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান স্বাস্থ্যে পেটজোড়া এই ভুঁড়ি।
খাঁটি জমিদার গাফিলতী তার এতটুকু কোথা নাই—
ছাইকে সোণা করিবারে পারে, সোণাকে আবার ছাই।
আপনার হাতে জমিদারী-ভার ফাঁকির উপায় নাই;
খাজনার টাকা না দিতে পারিলে ঘটিবাটী সব চাই।
মোসাহেব যারা ঘাড় নেড়ে তারা বিজ্ঞের মত কয়—
আপনার মত এমন মহৎ হাজারে ক'জন হয়।
দিনে চলে শুধু সুদ-কষাকষি হিসেব নিকেশ যত,
রাতের আঁধারে নাচের আসরে সুন্দরী নাচে শত।
এক-আধ গেলাস, তা'ও নাকি চলে, অনেক তাহার দাম,
বড় ওরা তাই, এটুকে-ওটুকে হানি নাহি হয় নাম।
তার পরে যদি গরীব, বিশেষ অনাথা বিধবা হয়,
রক্ষার ভার নিজ হাতে তার, খাঁটি কথা মিছে নয়।
কুলোকে লুকায়ে কত কিছু বলে, মিথ্যা সকলি জেনো;
সারা পৃথিবীতে চৌধুরীর সম মানুষ মেলে না হেন।
বয়স সবে তো ষাটের কোঠায়, তেমন বিশেষ নয়,
আস্ত একটা এত বড় পাঁঠা আজিও হজম হয়।
জীবনের সাথী গিরীশের নাতি পেটুক গোবর্দ্ধন,
চাকর বেহারী, লখনা তেওয়ারি, এরাই আপন জন।
ছেলে-পুলে নাই, স্ত্রীর বালাই তাহাও হয়েছে শেষ
গোবর্দ্ধন আর লখ্‌নার সাথে জীবন চলেছে বেশ।

*　　*　　*

কত কাল এল, কত কাল গেল, আসে নাই হেন সাল,
তেরশ'র বুকে পঞ্চাশ যেন ভৈরব মহাকাল।
কত প্রাণ গেল অনাহারে ভুগে, কত গেল রোগে জ্বলে-
কত গেল ঝড়-ঝঞ্ঝা-প্লাবনে—কত গেল ছলে, বলে!

*　　*　　*

বাগ্দীপাড়ার কেহ নাহি আর গিয়েছে কালের গ্রাসে,
শুধু আছে বেঁচে নফ্‌রার বৌ গিরীশের বাড়ীপাশে।
শেষ সম্বল ছেলে ভোম্বল, রোগে দেহ জরজর,
কখন যে যাবে, সে কথা কে ক'বে, এমনি কঠিন জ্বর।
মাসাবধি কাল ঘরে নাহি চাল, শুধু কচুপোড়া খেয়ে,
ছেলেরে আঁকড়ি নফরার স্ত্রী আছে ওরই মুখ চেয়ে।
কত বার গেছে আগুনে পুড়িতে, কত বার গেছে জলে,
ছেলের মায়াতে পারেনি মরিতে, যদিও মরিছে জ্বলে।
বাগ্দীর মেয়ে, তবু থাকে চেয়ে পাড়ার যতেক ছেলে—
এত সুন্দর হাজারেতে নাকি একটিও নাহি মেলে।
এত যে দুঃখ, তবুও লক্ষ প্রলোভন দলি' পায়—
পুত্রের পাশে আঁখিজলে ভাসে জীবনের বেদনায়।

*　　*　　*

সন্ধ্যার আকাশে উঠিয়াছে চাঁদ, বহিছে বাতাস ধীরে,
হেন কালে ছেলে শুধাল মায়েরে "এনু কি ঘাটের তীরে ?"
ঘাট, ঘাট' বলে' মাথায় বুলান জননী শীর্ণ হাত—
বাতাস সহসা দম্‌কা বহিল, কাঁদিল জোছনা-রাত।
অতি ক্ষীণ স্বরে কহিল মায়েরে ডালিম নাহি কি ঘরে ?
ডালিম যে বড় ভালবাসি আমি, সে কথা কহিগো কারে !"
কাঁদিয়া উঠিল মায়ের পরাণ, মুছিয়া চোখের জল,
ঘরের শিকল টানিয়া চলিল আনিতে ডালিম ফল।
ধীরে ধীরে এসে বাগানের পাশে ডাকিল "লখ্‌না ভাই",
লখ্‌না ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "বল কি চাই ?"
কাঁদিয়া কহিল বিধবা অনাথা "ডালিম চেয়েছে ছেলে,
পায় ধরি, দাও গুটি দুই ফল, শোধ দেব মাটী ফেলে।"
আস্তে আস্তে লখ্‌না কহিল নিকটে আসিয়া তার,
'তুই যদি মোর কথা মেনে নিস্, ভাবনা থাকে কি আর ?
কত সুখে র'বি, খাইবি-পরিবি, রাণীর বাড়া সে সুখ—
বল্ যদি তুই রাজি হস্, তবে ঘুচিবে এখনি দুঃখ।
বাগানের ফল নিয়ে যা'ব পেড়ে, খাওয়াবি পরাণ ভরে,
এঘর-দুয়ার সব হ'বে তোর, ছেলে হবে রাজা পরে।"
ঘৃণায় আনত মলিন আনন মুছিয়া আঁচলে তার ;
কহিল বিধবা 'তাই হবে বেশ অরাজী নহিগো আর'।
খুশী হয়ে তারে তাড়াতাড়ি পেড়ে ডালিম অনেক দিল ;
ছেলের মায়ায় শত বেদনায় আঁচল পাতিয়া নিল।

* * *

রাতের জোছ্‌না আকাশে হঠাৎ নামিল জলের ধারা,
লখ্‌নার সাথে চৌধুরী আসে আনন্দে আত্মহারা।
এতদিনকার অভিলাষ তার আজিকে পূরণ হ'বে,
ঘাটের এ ঠাট জীবনখাতার কায়েমী হিসেব র'বে।
লখ্‌না ডাকিল দুয়ারের কাছে 'ভোম্বলার মা আয়,'
বাঘা চৌধুরী কাঁপিয়া উঠিল অজানা আশঙ্কায়।
জীবনের কত অনাচার গেছে এমন হয়নি মন,
কে জানে জীবন-সন্ধিক্ষণে কেন এত আলোড়ন !
চৌধুরী দেখে এদিক্-ওদিকে, কেউ যদি দেখে তারে,
ফ্যাসাদ না হোক্, সুনামের তাঁর কুনাম রটিতে পারে।

লখ্‌নার ডাকে বাহিরিয়া এসে নফরার বৌ ভানী—
কহিলা "আসুন, হে বাবা ঠাকুর !" মাথায় আঁচল টানি'।
নারীর সরম মায়ের মরমে গরবে উঠিল হাসি',
বাগ্দীপাড়ার শত হাহাকার আঁখিজলে গেল ভাসি'।
চৌধুরী চাহে লখ্‌নার পানে, বুঝিবা করিবে খুন,
লখ্‌নার প্রাণ ভয়ে আনচান, মুখ হল কালি-চুণ।
জড়তা কাটায়ে কহে নির্ভয়ে নফরার বৌ ভানী,
"হে বাবা ঠাকুর, লাজ করে' দূর, বসুন আসন টানি'।
কে আছে আমার জন আপনার, যে আজি পিতার মত,
হেন দুর্দ্দিনে আশা দিবে প্রাণে, ঘুচা'বে মনের ক্ষত !"
গলায় টানিয়া দু'হাতে আঁচল প্রণাম করিল ভানী,
অজানা পুলকে চৌধুরী কহে, "কে রে তুই মায়াবিনী ?"
মনে পড়ে তার সকল কথার এমনি ছিল যে হায়,
একই প্রাণধন কন্যা-রতন অকালে হারাল তায়।
নিমিষের মাঝে শত ব্যথা বাজে, চৌধুরী ডাকে—"মা !
অভাগা পিতায় নিজ করুণায় কর, কর আজি ক্ষমা।
জীবন ভরিয়া বিপথে চলিয়া নিজেরে হারায়ে আমি,
মানুষের বহু নীচের জগতে এসেছি আজিকে নামি'।
ক্ষমা কর মাতঃ, ক্ষমা কর মোরে, অন্তর জলে' যায়,
এত পাপ জমা, না করিলে ক্ষমা, কোথায় দাঁড়াব হায়" !
ভাসি আঁখিজলে ভানী তারে বলে "আপনার আমি মেয়ে,
ক্ষমার বিচার বিশ্বপিতার, তাঁর কাছে নিন চেয়ে।"
চৌধুরী কহে "অন্তর দহে, ক্ষমা কর প্রভু ভগবান !
জীবনের শেষে জীবন হারাতে পেলাম যদি গো প্রাণ।"
কহিল ভানীরে "চল মাগো ফিরে ছেলেরে লইয়া তোর,
মরণের বুকে জীবনের আলো ঘুচাক তামসীঘোর।"
মায়ের মুরতি হাসিয়া উঠিল নারীর বুকের মাঝে,
শ্রদ্ধা-আনত চৌধুরী হাসে ভুলিয়া সকল লাজে।
পঞ্চাশ যত করিয়াছে গ্রাস বড় তার এল ফিরে,
মানুষের মাঝে মানুষ হাসিল প্রেতের আত্মা চিরে'।
পুরুষ-মনের মম্বন্তরে নারীর হইল জয়,
মায়ের স্নিগ্ধ পরশ মুছিল হাজার অপরিচয়।

ব্রহ্মসূত্র
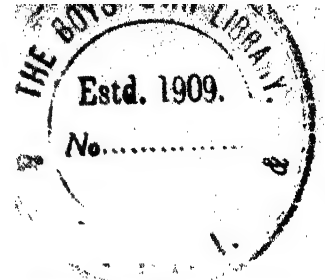
তৃতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

শ্রীমতিলাল রায়

পরামর্শং জৈমিনিঃ অচোদনাচ, অপবদতি হি ॥১৮॥

পরামর্শং (অনুবাদ) জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য্য) অচোদনা চ, (বিধি অভাব হেতু) অপবদতি (নিন্দা করে) হি (যে)।

অর্থাৎ আচার্য্য জৈমিনি বলেন—উর্দ্ধরেতাদের জ্ঞানে অধিকার, এই যে শ্রুতিবাক্য—ইহা পরামর্শবিধি নহে। বিধির অভাব থাকায়, ইহা নিন্দনীয়।

আচার্য্য জৈমিনি কর্ম্মবাদী। কর্ম বস্তুতন্ত্র, তিনি মানবধর্ম্ম, ঋষিধর্ম্ম, দেবধর্ম্ম পর্য্যন্ত বস্তুতঃ স্বীকার করেন। ইহ-জগতে কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ ঋষিলোক ও দেবলোক প্রাপ্ত হয়। মানুষের পক্ষে উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী হওয়া তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ মনে করেন না। তবে যে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাতপইত্যুপাসতে," "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি," "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ "ধর্ম্মের তিন স্কন্দ। যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক 'তপঃ' এইরূপ উপাসনা করে" অথবা "পরিব্রাজ্য ইচ্ছা করিয়া যাহারা প্রব্রজ্যা করে," কিম্বা "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন হইলেই প্রব্রজ্যা লইবে" এই যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ উর্দ্ধরেতো-মূলক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, ইহা বিধিপ্রত্যয়জনক বিভক্তিযুক্ত না হওয়ায়, উহা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। উহা কদাচ অনুষ্ঠেয় নহে। ধর্ম্মস্কন্দ—তিন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ,—এই স্কন্দ গার্হস্থ্যের পক্ষে। দ্বিতীয় স্কন্দ তপশ্চরণ—ইহা বানপ্রস্থের পক্ষে। তৃতীয় স্কন্দ ব্রহ্মচর্য্য—ইহা আচার্য্যকুলে বাস করিয়া দেহকে বিশুদ্ধ করা। যাহারা এই সকল যথারীতি করিতে পারে, শাস্ত্র বলিতেছে "সর্ব্বত্র তে পুণ্যলোকা ভবন্তিঃ" অর্থাৎ তাহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়।

এই শ্রুতিতে আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ আছে এবং এই সকল আশ্রমের নিত্যতার অভাব অর্থাৎ এই সকল ফল চির-স্থায়ী নহে। পরিশেষে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি" অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়—এই কথায় গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের ন্যায় এইখানে আশ্রমবিষয়ক কোনরূপ প্রসঙ্গ নাই। অতএব এই চতুর্থ আশ্রম অসিদ্ধ।

যদি বলা যায়—'প্রব্রজ্যা' কর, তবে এতদ্দ্বারা প্রব্রজ্যাশ্রমেরই বিধান গ্রহণ করিতে হইবে। যখন প্রব্রজ্যার পরামর্শ রহিয়াছে, তখন উহা সংসিদ্ধ করার নিশ্চয়ই আচার ও আশ্রম থাকিবে। তদুত্তরে জৈমিনি-মতাবলম্বীরা বলিবেন, সন্ন্যাসীর যখন কর্ম্ম নাই, তখন আশ্রম ও আচারের কথা আসিতে পারে না। কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, কিছুতেই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান নাই। এই হেতু চতুর্থ আশ্রম কল্পনিক ও অনাদরনীয়। জৈমিনির মতে নৈষ্কর্ম্যমূলক এই কাল্পনিক সন্ন্যাস আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রমের অনধিকারীর জন্য প্রযুজ্য। অন্ধ ও পঙ্গুর জন্য যেমন সেবাশ্রম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ না হইলেও, লোক-প্রসিদ্ধ। চতুর্থ আশ্রমের কথাও ততোধিক অন্য কিছু নহে। কেহ যদি বলেন যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ইহাও গার্হস্থ্যধর্ম্মের উল্লেখ থাকায় অনুবাদ বা পরামর্শ নামে প্রসিদ্ধ। যখন এই ক্ষেত্রেও এই সকল বাক্য অনুবাদ মাত্র, তখন উর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের ন্যায় গার্হস্থ্যধর্ম্মও অপ্রামাণিক হইবে না কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। "কর্ম্ম-স্কন্দত্রয়"মূলক শ্রুতি গার্হস্থ্যের পরামর্শ, তাহার জন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিধানও শ্রুতিতে আছে। সাক্ষাৎশ্রুতি আশ্রমত্রয়ের বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য শুধু পরামর্শ হইলেও, শ্রুতি-বিহিত হইত না। শ্রুতিতে উর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের স্তুতি আছে; কিন্তু তাহার বিধান নাই। বরং তাহার নিন্দাই করিয়াছে। "না পুত্রস্য লোকহস্তি" অর্থাৎ অপুত্রক ব্যক্তির উর্দ্ধলোক নাই। তৎসর্ব্বে পশবঃ বিদুঃ" অর্থাৎ তাহাদিগের সকলকেই পশুতুল্য জানিবে।

অতএব চতুর্থ আশ্রমের যুক্তি বিধেয় বা অনুষ্ঠেয় নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। শ্রুতিতে যে আছে "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ"—এই 'প্রব্রজেৎ' সন্ন্যাসবিধায়ক প্রত্যক্ষ শ্রুতি।

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—এই শ্রুতি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যাইবে, উহাও স্তুতিবাচক শব্দ। বিচারের দ্বারা দেখা যায়, সন্ন্যাস জীবনের ধর্ম্ম নহে। যাহা জীবন নহে, তাহা লইয়া অনুষ্ঠানের কথা আসিতেই পারে না। জৈমিনির এই যুক্তিযুক্ত কর্ম্মবাদের উল্লেখ করিয়া বাদরায়ণ বলিতেছেন

"অনুষ্ঠেয়ম্ বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥

সাম্যঃ শ্রুতেঃ (সমান পরামর্শ শ্রুতিতে থাকা হেতু) বাদরায়ণঃ (আচার্য্য ব্যাসদেব মনে করেন) অনুষ্ঠেয়ম্ (গার্হস্থ্যাশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাসআশ্রমও অনুষ্ঠেয়ম্ বা বিধেয়)।

বাদরায়ণ বলিতেছেন—কি গার্হস্থ্যাশ্রম, কি সন্ন্যাসাশ্রম, দুই দিকেই সমান পরামর্শ শ্রুতিতে আছে। "ধর্ম্ম-স্কন্ধঃ" এই শ্রুতিবাক্যে গার্হস্থ্যধর্ম্মের যতদূর স্তুতি করা হইয়াছে, তাহা অন্য আশ্রমের পক্ষেও উদাহৃত হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, প্রব্রাজকগণ এই আত্মলোকলাভের জন্য প্রব্রজ্যা করেন। অন্যত্র ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যোগ, যজ্ঞ, দান ইত্যাদির দ্বারা ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা করেন—এইরূপ শ্রুতিবাক্যও এক সঙ্গেই পঠিত হয়। আবার যাহারা অরণ্যে "শ্রদ্ধা তপঃ ইত্যুপাসতে"—শ্রদ্ধাই তপঃ-স্থানীয়, এইরূপ উপাসনা করেন, এইরূপ শ্রুতিবাক্যও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিধায়ক শ্রুতির সঙ্গে একত্র পঠিত হয়। শ্রুতিতে আছে "তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ" এই বাক্যে আশ্রমান্তরের বিধান দেওয়া হইতেছে। আরও বলা হইয়াছে—তিন ধর্ম্ম-স্কন্দঃ। শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বহু ধর্ম্ম অভিহিত হয়। আশ্রমবিভাগ ব্যতীত ঐ সকল ধর্ম্ম কার্য্যকরী হয় না এবং আশ্রম বিভাগ হইলে ঐ তিন ধর্ম্মে স্কন্দের অন্তর্ভূত হইবে। এক স্কন্দ গৃহস্থশ্রেণীর জন্য নীত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দ্বিতীয় স্কন্দ এবং তৃতীয় স্কন্দ যে তপঃ, তাহা বানপ্রস্থাশ্রমে নিশ্চয়ই প্রযুজ্য হইবে। তপঃ-শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে বৈখানসঃ। ইহা বানপ্রস্থ-সম্বন্ধীয় শব্দ। তপঃ-শব্দটী কায়ক্লেশপ্রধান কর্ম্মের বোধক।

বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য সকল পক্ষেই তপস্যার স্থান আছে, কিন্তু শ্রুতিতে বলিয়াছে—যিনি ব্রহ্ম-সংস্থ, তিনি অমৃত লাভ করেন। এই ব্রহ্মসংস্থা শব্দটী যৌগিক। সমস্ত আশ্রমীর পক্ষে যখন ব্রহ্মসংস্থা সম্ভব, 'তপঃ' সর্ব্বাশ্রমীরই সম্পদ্।

এক্ষণে কথা হইতেছে ব্রহ্মসংস্থত্ব যখন সকল আশ্রমেই সম্ভব, তখন সকল আশ্রমেই তো অমৃত্বের অধিকার আছে। হাঁ, ইহাতে মানবমাত্রেরই অধিকার। এই বাক্য কিন্তু আশ্রমবিষয়ক অনুবাদ-বাক্য। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃত্বলাভ করে—এই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে গেলে অনুষ্ঠানের পর্য্যায়-ক্রমে ইহার অপেক্ষা-কাল নির্ণীত হয়। পরাশর মুনি এইজন্য বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন "প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মাণানাম্" আর "ব্রাহ্ম সন্ন্যাসিনাম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রাজাপত্য লাভ করেন, সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম-প্রাপ্ত হন। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন "একান্তনিষ্ঠাসম্পন্ন সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যায়নে রতঃ যাহারা, তাহারাই পরম পদ লাভ করে।" এই সকল কথার মধ্যে সকল আশ্রম হইতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলিয়া "যে চ ইমে অরণ্যে" এই অরণ্য শব্দটী ঐ একান্তনিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রহ্মধ্যানে রত অবস্থার সূচনা করিতেছে। এই অবস্থা বানপ্রস্থের এবং শ্রুতিতে যখন ঊর্দ্ধরেতাঃ সন্ন্যাসীর কথা রহিয়াছে, তাহা অনুবাদ-বাক্য হইলেও, চতুর্থ আশ্রমের বৈখানস অবধারণ করাইতেছে।

জৈমিনি মুনি জীব-ধর্ম্মে আস্থাবান্। জীবের অপ্রাকৃত দেহযাত্রার কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াই তিনি স্বভাবধর্ম্মকে পর পর অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদ ঈশ্বরবিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠা করে। জৈমিনি মুনি লৌকিক জীবনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্যাসদেব বলিতে চাহেন, শ্রুতিতে জন্মান্তরবাদ প্রসিদ্ধ থাকায়, জীবের স্বভাবধর্ম্ম উপাসিত হইয়া একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ যদি আসে, তখন ব্রহ্মচর্য্য-সমাপ্তকারী ব্রহ্মামৃত পানে অভিলাষী হইলে সে শাস্ত্রনির্ণীত আশ্রমত্রয়ের ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা যখন শ্রুতিতে রহিয়াছে, তখন তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। ঋষি বাদরায়ণ জীবনের পর পর পর্য্যায় অক্ষুন্ন রাখিয়াই জাবাল শ্রুতির 'ব্রহ্মচর্য্যাৎ প্রব্রজেৎ', এই উক্তির সমর্থনকল্পে বলিলেন, অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় চতুর্থ আশ্রম, সন্ন্যাস "অনুষ্ঠেয়ম্" অর্থাৎ বিধেয়। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গানটা হইয়া গেল; তখন আমাদের মধ্যে পাকা ওস্তাদ প্রফুল্লচন্দ্র গানের সুর দিলেন। সুরটী নূতন কি পুরাতন, তাহা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু পুরাতন হইলেও, ঐ সুর বড়ই বাজিয়া উঠিল। পরে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ঐ সুরেই মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহর্সেল দেওয়া শেষ হইল, তখন স্থির হইল গানটী একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কি, তোদের আবার তর্ক বেধেছে নাকি! তোদের জ্বালায় দেখছি একটু স্থির হইয়া কাজ করিবারও যো নাই। কি ব্যাপার বল্‌ত?" তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আমাদের মুখমাত্র-স্বরূপ (কারণ তিনি তখন বি, এল পড়েন, নায়েক হইয়াছেন) বলিলেন "আমরা একটা বাউলের দল করব। তারজন্য একটী গান লিখছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল শত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখেছিস্? সুর বসানো হয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হয়েছে; এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ; সকলে মিলে গা দেখি।" আমরা সকলে গান ধরলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন; তার-পর যখন অন্তরা ধরা হইল, তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই আছি। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান! সে এক অপার্থিব দৃশ্য!

শেষে গান থামিলে কাঙ্গাল বলিলেন—"দেখ, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা' একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না! আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ কলম ধর্ ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ-কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ-গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন; তারপর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি গাইলেন:

"আমি করব এ রাখালী কত কাল!
পালের ছটা গরু ছুটে' করছে আমায় হাল-বেহাল
আমি গাদা করে নাদা পুরে রে, কত যত্ন করে খোল বিচালী
ক্ষেতে দিয়ে ঘরে;
তারা ছটা যে গু-খেকো গরু রে; তারা নরক খায় রে হামেহাল।
কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর
পারিনে গরু চরাতে;
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, তাই কর দীন-দয়াল।"

এইটী দ্বিতীয় গান। এই দুইটী গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামে বাহির হইলেন সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখাল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রামবার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল।

—"ভাব মন দিবানিশি"—

দুইটী গান লইয়া বাউলের দল প্রথমে বাহির হইল; কিন্তু দুইটী গানে লোকের পিপাসা মিটিল না; দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই কুমারখালী গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামের আবালবৃদ্ধ গান দুইটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। আমরা যখন যেখানে যাইতাম, শুধু শুনিতাম, কেহ গাহিতেছে—

"ভাব মন দিবানিশি"

অথবা আর কেহ গাহিতেছে—

"আমি করব এ রাখালী কত কাল!"

তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্ত বলা হইল; অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর বাঁধিব না; দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন কাঙ্গাল ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দার প্রসিদ্ধ গায়ক (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন; তিনি বলিলেন "আমি গান বাঁধিব।" যে বলা, সেই কাজ। প্রফুল্ল গান গাহিতে পারিত। প্রেসের প্রিণ্টারের প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। প্রফুল্ল পনর মিনিটের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম; বুঝিলাম, তাঁহার কৃপা হইলে, অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রফুল্লের গানটী আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গানটী এই—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ রে আমার মন পামরা।
১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা,
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে, না করিবে নাড়াচাড়া।
২। যখন তোর সকল অঙ্গ অবশ হ'য়ে, প'ড়ে রবে ধরে ধরা,
যখন তোর আপ্তলোকে, ডেকে ডুকে না পাইবে কথার সাড়া।
৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস্ ওরে ঘাটে পড়া;
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াৎ ঘড়া।
৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্ সত্য পথে নিত্য নগরেতে মোরা;
শুনেছি সেই ধামেতে এই রূপেতে মরে নারে মানুষ যারা।"

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটী রচনা করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আমার এই প্রথম গানে ভণিতা দিব না। এ-গান আমার রচনা নহে; আমার সাধ্য কি যে, আমি এই গান রচনা করি। যিনি আমার মুখ দিয়ে, আমার মত মহা-পাপী ও দুশ্চরিত্রের মুখ দিয়ে এ গান বাহির করে দিয়েছেন, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তবে তিনি ভণিতা দিবেন।" তাই এই গানটীর কোন ভণিতা নাই; কিন্তু তৃতীয় দিনে যখন এই গানটী লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল। যে একবার শুনিল, সে দ্বিতীয়বার শুনিবার জন্য দলের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কাঙ্গালের কুটীর হইতে গ্রামের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌছিল, তখন লোকারণ্য, দূর গ্রাম হইতে লোকেরা এই দলের গান শুনিবার জন্ত বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। বাজারের উপর যখন এই গানটী আগা-গোড়া গীত হইল, তখন কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না; সকলেরই প্রাণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি অনেক দিন এমন জন-সমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি এমন প্রাণস্পর্শী গানও আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়ন সম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে গঠিত হয়। আজ ৩৩ বৎসর পরেও আমি সেই দিনের দৃশ্য অবিকল দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি—একদল ফকির; সকলেরই গৈরিক আলখোল্লা পরা; কাহারও মুখে কৃত্রিম দাড়ী, কাহারও মাথায় কৃত্রিম বাব্‌রী, চুল, সকলেই নগ্নপদ। সম্মুখভাগে প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁহার তাহার বাম পার্শ্বে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বানবারীলাল, দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্র কৃত্রিম দাড়ী বা চুল পরিধান করিত না। সে গৌরকায় পুরুষ ছিল; তাহার মুখে দাড়ী ছিল। আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি, তিন ভাইয়ের হস্তে তিন-খানি খঞ্জনী। সেই তিনখানি খঞ্জনীতে এক সঙ্গে ঘা পড়িতেছে, আর তিন ভাই প্রেমে মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া নাচিতেছে, আর গাহিতেছে—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর—"

বলিতে কি, সে সময়ে আমাদের অঞ্চলের লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত যে, আমাদের অবসর সময়ের খেয়াল হইতে যে সামান্ত গানটী বাহির হইয়াছিল, তাহার তেজ এত অধিক! কে জানিত যে, এই কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের সঙ্গীতে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্য বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ ভাসিয়া যাইবে! কে জানিত যে, সামান্ত বীজ হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিবে! প্রিয়তম অক্ষয়কুমার সত্য সত্যই বলিয়াছেন

যে "এমন যে হইবে, তাহা ভাবি নাই! এমন করিয়া যে দেশের জনসাধারণের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করা যায়, তাহা আমি জানিতাম না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের গান বেশ হইয়াছে শুনিয়া সকলেরই মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তখন প্রফুল্লচন্দ্র পরম উৎসাহে আর একটী গান রচনা করিল এবং 'ফিকির-চাঁদ' ভণিতা ব্যবহার করিল। সে গানটীও আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটী এই—

"দেখ্ দেখি ভেবে ভেবে, কেবা রবে, যে দিন সে তলব দিবে।
১। কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকাকড়ি, জুড়ী গাড়ী কে হাঁকাবে;
বল্ দেখি চেন ঝুলান ঘড়ী তোমার, সেই দিনেতে কে পারিবে!
২। কোথা তোর রবে মালা, কৌপীন-ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে;
তার কাছে ছাপাবার যো নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে কে ছাপাবে!
৩। ফিকিরচাঁদ ফকিরে কয়, তা হ'বার নয়, ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হবে,
বিপদে তরবি যদি, নিরবধি, সেখিগে চল্ সত্য দেবে (ও ভোলা মন)।"

এখানে একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। উপরিলিখিত গানটিতে তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর একটু ইঙ্গিত আছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন; তিনি, যিনি এই গানের রচয়িতা, তিনি সত্য সত্যই কাহারও উপরে কটাক্ষ করেন নাই। আমাদের গ্রামটী বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সংখ্যা বেশী নহে; তিলি এবং তন্তুবায়গণের সংখ্যাই অধিক। কাঙ্গাল হরিনাথ তিলিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামে তিলি জাতিই বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাঁতি, কুমার, কামার ও অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব। সুতরাং আমাদের গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এখনও আছে। এ অবস্থায় ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে স্বতঃই কদাচারী বৈষ্ণবগণের কথাই মনে উঠিয়া থাকে, সুতরাং ইহা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের উপর আক্রমণ বলিয়া আমরা স্বীকার করি নাই এবং এখনও করি না; প্রফুল্লচন্দ্রও তখন এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এইরূপ একটু প্রতিবাদ হইয়াছে শুনিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ দুইটী গান দিলেন। এই দুইটী গান বড়ই সুন্দর। আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রথম গানটী এই—

"বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার, মনের মাঝে রোগের হাঁড়ী।
চিনিবে কার সাধ্য, ডাক্তার-বৈদ্য হদ্দ হ'ল টিপে নাড়ী।
১। তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও, উপদেশ দাও নেড়ে দাড়ি;
তোমার যে, আপন বেলায় মহা প্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের হাঁড়ি।
২। তুমি এ রোগের জ্বালায় জ্বলছ সদাই, দেখে লোকের টাকাকড়ি,
তোর এ জ্বরবিকারে বৈদ্য ঘোরে, ভেবে মরে কি দেবে বড়ি।
৩। কাঙ্গাল কয় হও রে দৃঢ়, ছাড়, ছাড় কুপথ্য, মিথ্যা-ছল-চাতুরী,
এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে, খাও রে হরিনামের বড়ি।"

দ্বিতীয় গানটী এই—

"মজে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে, কেন না মন সং সাজিলি!
১। মন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে, আগে কেশে কালী দিলি;
ওরে মন বয়স-দোষে, রসে রসে, অবশেষে চুণ মাখিলি!
২। হরিনামে সাজ্‌লে রে সং, ফিরত না ঢং, থাকৃত এক রং চিরকালই;
এখন তোর, কতক রাঙ্গা, কতক পাঙ্গা, ঠিক যে মাছরাঙ্গা হ'লি।
৩। বাবি তুই লেংঠা হ'য়ে লজ্জা খেয়ে, লেংঠা হয়ে যেমন এলি;
ওরে তোর কৌপীন-কোচা, জামা মোজা, ঘোলে গোঁজা হয় সকলই।
৪। কাঙ্গাল কয়, প্রেমভরে, সং সাজরে, গান কর রে বাহু তুলি,
যাদের নাই হরি-ভজন, সত্য-কথন, তারাই রে সং হয় কেবলই।"

(ক্রমশঃ)

ভয়

শ্রীললিতমোহন মিত্র

ক্ষুদ্রের ব্যাপারী আমি, তাই এত ভয়,
অকূলে তরঙ্গে বুঝি পণ্য হয় লয়।
তোমারে সর্ব্বস্ব যদি গণিতাম মনে,
রহিতাম নিরভয়ে জীবনে মরণে।

দীপ-শিখা

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

কহিনু তোমারে আঁধার রাত্তির ওগো মোর দীপ-শিখা,
নিবিড় নিশীথে, ললাটে আঁকিলে বিজয়-ভস্ম টীকা;
সারা জীবনের গলিত-আঁধার ও রূপ জ্যোতিতে হারাল কালি,
আমার যতেক বিফল সাধন, সাজাল তোমার বরণ-ডালি।

(তৃতীয় খণ্ড : ২৮শ পরিচ্ছেদ)

বিপদ্ ঘনাইয়া আসিল। স্থির হইয়া কোন এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। কে যেন তাড়া দিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া চলে। লক্ষ্যে আমায় পৌঁছিতেই হইবে। এ পথের চিরসঙ্গী যাহারা, তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে, ইহা জানিয়াই যেন আমার যাত্রা। ইহার জন্য প্রস্তুতির কোন কথা নাই। আমি আছি, তুমি আছ—এই জানাজানিটুকুই এই পথের যথেষ্ট সম্বল। আত্মীয়স্বজন বহু দূরে পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে আছে এক দল নব তান্ত্রিক। জীবনসঙ্গিনীর সে কি উৎকণ্ঠা! দুর্গম পথে সঙ্গছাড়া না হন, এই কঠোর সঙ্কল্প তাঁহার ছিল—আমার উপর কোন প্রত্যাশা তিনি রাখিতেন না। পৃথিবীর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য হইতে চিরবঞ্চিত আমি, আমার উপর কি আশা রাখিবেন ভর্ত্তা বলিয়া—তাঁহার কোন ভারই লইতে পারিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবুও তিনি চিরসঙ্গিনী। সুখের দিন কোন দিন দেখি নাই, দুঃখের পারাপারে জীবনতরী ভাসিয়াছে। অপলকে আমার দিকে চাহিয়াই তিনি সেই যে বিবাহের দিন হইতে আমার সঙ্গে যাত্রা সুরু করিয়াছেন—কত সুখস্বপ্ন তাঁহার ছিল, সব ভাঙ্গিয়াছে—তবুও চলিয়াছে—নসম্পূর্ণ নিরাসক্ত অপ্রাকৃত সন্ধানের আকর্ষণে! এই অসহায় সাথীকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া চির বিদায় লইলেন। নিঃস্বার্থ প্রেমের মদিরায় আজিও চলিয়াছি মাতালের মত, কিন্তু স্থির লক্ষ্যে। সেদিন তিনি ভাঙ্গা বুকে বল দিয়া বলিলেন "ভয় নাই তোমার। আমি এক সুখস্বপ্ন দেখিয়াছি।" আমি তাঁর আশ্বাস-বাক্যে মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, "কি তোমার স্বপ্ন ?"

তিনি বলিলেন, "যখনই তোমার বিপদের দিন ঘনাইয়া আসে, আমি দেখি মহাকালী খড়্গ হাতে শত্রু-বিনাশে ছুটাছুটি করিতেছেন। আমি তাঁর রাঙ্গা পায়ে ফুল-বিল্বপত্র ছড়াইয়া দিই। তিনি হাসি-মুখে আমায় অভয় প্রদান করেন। এই বিপদের দিনে মা এই রূপেই আমায় দেখা দিয়াছেন। তোমার পথের বাধা নিশ্চয় দূর হইবে।"

আমি আর আমার ভগবান, এই দুই ভিন্ন তৃতীয় কিছু নাই। শ্রীমন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনে সপ্তস্বতী হোম করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছি, পত্নীর মুখে এই কথা শুনিয়া মনে হইল, মনে মনে সাধনার দিন আর নাই, সাধনা প্রকরণ আশ্রয় করিয়া সুরু করিব। সম্মুখে খট্টাঙ্গধারিণী মহাচণ্ডিকার বিভীষণা মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। আমি বলিলাম "দেখ হয়তো আবার আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, নরমুণ্ডমালিনী দ্বীপিচর্ম্ম-পরিহিতা মহা-ভৈরবী মূর্ত্তি। ২২ শে পৌষের প্রাতে তাঁহার সহিত এইরূপ কথা কহিয়া আশ্রমে গিয়া দেখিলাম, প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ পূর্ব্ব দিনের ঘটনা লইয়া আলোচনারত। আমার পশ্চাতে গৃহদেবী ছিলেন। উন্মাদের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়াই ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আজ আমি তোমাদের নেতা নই, পরন্তু গুরুর আসন অধিকার করিতে আসিয়াছি। আমাদের মধ্যে গুরু ও শিষ্যের নিত্যসম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার দিন আসিয়াছে। শিক্ষার পরিণতি দীক্ষায়।" বিগত তিন বৎসর ধরিয়া যাহারা ব্রহ্মবিদ্যার্থী শিক্ষাব্রতী হিসাবে উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত প্রাক্তন সঙ্ঘধর্ম্মী তরুণেরা আমার কথা শুনিয়া উদ্বুদ্ধ হইল। তাহারা আমার সে দিনের মূর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিল, নীরবেই আমার পদধূলি লইল। পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আমার পত্নীর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহারা একে একে তাঁহাকেও প্রণাম করিল। আমি বলিলাম "আজ আমাদের উপবাস। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার লীলাভূমি ফরাসী চন্দননগরে আমারা আর নিরাপদ্ নহি। এখানকার শিক্ষা, দীক্ষা,

সাধনায় মানুষগড়ার যোগ্য ক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া দিতে ফরাসী রাষ্ট্রশক্তি উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু এই অমৃত পথের যাত্রা আমি রোধ করিব না। যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে সপ্তশতী হোমের আগুন অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আজ সেই হোমশিখায় পূর্ণাহুতি দিয়া তোমাদের নবজীবনের দীক্ষা দিব—তোমরা প্রস্তুত হও।"

আশ্রমে নব প্রেরণার সঞ্চার হইল। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের যাত্রাপথে চলার নারীপুরুষ নব প্রাণের আস্বাদ পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরিল—

"আমার প্রাণের-ঠাকুর জেগেছে—
হোক না পথে কাঁটাখোঁচা
হোক না পথ পাহাড়-ঘেরা—
হোক না বাধা আকাশ-জোড়া
আমার প্রাণ যে নেচে চলেছে।"

ফরাসী রাজ্যে ইংরাজী ভাষায় রাজকীয় কর্ম্ম হয় না। আমাদের চিরসাথী মণীন্দ্রনাথ ফরাসীভাষাভিজ্ঞ, কাজেই তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া পণ্ডিচারীর গভর্ণর বাহাদুরকে জানাইয়া এক পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা করিলাম এবং ঐ পত্র পরদিন যথারীতি রেজেষ্টারী করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল।

২২শে পৌষ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তক আশ্রমে প্রাচীন বিল্ববৃক্ষমূলে এক বৃহৎ হোমকুণ্ড স্থাপন করা হইল। সম্মুখে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী। পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কয়েকটি শিবমন্দির। অশ্বত্থ-বট-পরিবেষ্টিত এই তপোবনে আমার সন্তানপ্রতিম পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিল। ২০ জন ব্রহ্মচারী ছাত্র ও দুইজন ব্রহ্মচারিণী নব দীক্ষা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া হোমকুণ্ড ঘিরিয়া উপবেশন করিল।

এই ক্ষেত্রে একটী মর্ম্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নারীচরিত্র-গঠনের অনুচ্চারিত আহ্বান শুনিয়া পুরোভাগে আসিয়াছিল দুইটী কিশোরী, অমিয়বালা ও নির্ম্মলা। ইহার পর আবার আমার কর্ম্মজীবনে উৎসর্গের আকৃতি লইয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অমিয়প্রসূন আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র ইহাকেই আপনার চিরসঙ্গিনী বলিয়া আমার নিকট ব্যক্ত করায়, অরুণচন্দ্রকে ইহা হইতে বিরত করার কঠোর সাধনায় তাহাকে রত রাখি। অমিয়প্রসূনকে আমার সান্নিধ্য হইতে একতিল অপসৃত করি নাই। ইহাতে গৃহদেবীর ঘোরতর বাধা সত্বেও, অলক্ষিতে এই কিশোরীকে আমার একান্ত আশ্রয়ে অভিভূত রাখিয়াছি। এই তিনজনকেই নব জীবনের দীক্ষা দিতে আমি অগ্রসর হইয়াছিলাম। ছাত্রদের ন্যায় ইহারাও তিনজনে পূর্ব্ব দিনে উপবাসী থাকিয়া, ২২শে পৌষ প্রাতঃকালে যজ্ঞকুণ্ড ঘিরিয়া বড় আশায় উৎফুল্ল চিত্তে সারি দিয়া দাঁড়াইল। আমি গৃহদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। তিনি এই তিনজন কিশোরীর দিকে চাহিয়া আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। তিনি কথা বলিতেন কম। কিন্তু তাঁর চক্ষের দৃষ্টিতে পরিষ্কার ভাষা ছিল, আমি তাহা বুঝিতাম। বুঝিলাম—তাঁর জন্মগত যে দৃঢ় সংস্কার, তাহা আজিও ত্যাগ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। যে সংস্কার তাঁহাকে একটি বিষয়ে বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিত, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও তাহা হইতে নিরস্ত করিতে পারি নাই। তিনি প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন। পার্শ্বে শ্মশানঘাট। কত নারী পতিহারা হইয়া আর্ত্তনাদের কণ্ঠ তুলিত, সধবার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বৈধব্যের আচার গ্রহণ করিত—এদৃশ্য তিনি দেখিতে চাহিতেন না। যাহারা তাঁহার সহিত স্নানে যাইত, তাহাদের পূর্ব্ব হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "কোন শবের সহিত পতিহারা নারী আসে নাই তো?" যদি ইহার বিপরীত শুনিতেন, তিনি প্রশান্ত চিত্তে স্নান করিতেন। ইহার অন্যথা শুনিলে, তিনি শিহরিয়া উঠিতেন, নয়ন মুদিত করিয়াই তাড়াতাড়ি স্নান-সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতেন—বলিতেন "এ দৃশ্য প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না।"

তিনি আপনার জননীরও বৈধব্যমূর্ত্তি প্রথম দেখিতে পারেন নাই। এক বেলা ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি অবস্থান করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর পর তিনটী ভগিনী পতিহারা হয়। তিনি নারীর বৈধব্যমূর্ত্তিকে বড় ভয়ের চক্ষেই দেখিতেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে সতত্তই আতঙ্কিত হইতে দেখিতাম। তাঁহার জন্মকোষ্ঠীর সঙ্কেত এই বিষয়ে অনুকূল ছিল না। তিনি পরে ইহাও জানিয়া

ছিলেন। অন্তরে আশঙ্কা থাকিলেও, তিনি জোর করিয়া বলিতেন, "আমার বৈধব্যমূর্ত্তি কোন দিনই সহিব না। তোমার আগে আমি মরিবই।" তিনি ভালবাসিতেন সহোদরাদের কেবল নয়, তাঁর ধর্ম্মকন্যাস্বরূপা বিধবা নির্ম্মলাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কিন্তু আজিকার এই সপ্তশতী হোমকুণ্ডে তাঁহার পাশে বসিয়া, নির্ম্মলাকে আহুতি দেওয়ার প্রতিকূলে তাঁহার দৃষ্টি আমার দিকে নিপতিত হইল। আমি নির্ম্মলাকে নিরস্ত করিলাম। যজ্ঞকুণ্ড ঘিরিয়া সারি সারি সকলে বসিল। গৃহলক্ষ্মীর বাম পার্শ্বে বসিল অমিয়প্রসূন। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিল অমিয়বালা। যজ্ঞকুণ্ড ঘিরিয়া দীক্ষার্থীরা উন্নত শিরে উপবেশন করিয়াছে; আর নির্ম্মলা বেতসপত্রের ন্যায় স্নান-সমাপনান্তে দীক্ষাকুণ্ডের দূরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় ও অভিমানে কাঁপিতেছে। চক্ষের জল যেন আর নিষেধ মানে না! তার সে যে কি বিক্ষোভ, তাহা আমি ভিন্ন বুঝি আর কেহ বুঝে নাই। সে যে মানুষ না স্থাণু, সে বোধ সে হারাইয়াছিল। আশাভঙ্গে তাহার হৃদয়ভঙ্গ হয় নাই। তাহার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের প্রতিকার সঙ্ঘজননী করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব। আর আমি মেয়েটীর সেই অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিদান আজও দিয়া চলিয়াছি। নারীহৃদয়ের বিমল শ্রদ্ধা ও স্নেহে আমায় পুষ্টি ও সঞ্জীবিত করিয়া সে বুঝি আজ পরামৃত পান করিয়াছে।

এইবার আমার কথা। এখনই আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ মন্ত্রপূত কাষ্ঠস্তূপে অগ্নিসংযোগ করিবে। এখনই পূত সাধক-সাধিকাগণ সপ্তশতী চণ্ডীমন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঘৃত বিল্বপত্র হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। আমি বলিলাম "সকলে সতর্ক হও, আজিকার প্রতিশ্রুতি অনন্ত জীবনের। এই দীক্ষা অধ্যাত্ম-নবজন্ম। ব্রহ্মসংস্থ হও। ব্রহ্মানন্দে নিজেদের নিমজ্জিত কর। দীক্ষা দেন ধর্ম্মগুরু। আজ আমার সমস্ত দায়িত্ব ভগবানে বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহারই গুরু-স্বরূপে আশ্রয় লইয়া, এই দীক্ষার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছি। আজ আমাদের সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধে পরিণত হউক। আমাদের প্রাকৃত ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হউক। ভাগবত কৃপায় তোমরা সফল হও। তোমাদের এই জীবনের সহিত নিত্যযুক্ত থাকার সঙ্কল্প আমারও রহিল। গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও; কিন্তু তিনটী মহাব্রতের কথা কাহারও ভুলিলে চলিবে না। তাহা—সত্য সঙ্ঘ ও ব্রহ্মচর্য্য। চিরদিন ইহা অক্ষুন্ন ভাবে পালন করিও।"

তারপর জ্বলিয়া উঠিল দাউ-দাউ করিয়া যজ্ঞাগ্নি। ধূপধুনার পূত সৌরভে দিগন্ত আপূরিত হইল। অনুভব করিলাম, যেন অলক্ষ্যে ভারতের ঋষিমণ্ডলীর সভা বসিল। শিক্ষার পর দীক্ষার এই হোমানল যাহাদের বুকে জ্বলিয়াছিল, তাহাদের দিকে আঁখি আমার চিরস্থির থাকিবে। এই মর্ত্ত্যে অমৃত-সঞ্চয়ের জন্য সেই অমৃতের পথে আজি হইতেই সঙ্ঘের যাত্রা সুরু হইল।

মহাদেবী বসিয়াছেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছি। আমার নয়ন নিমীলিত; দেবীও নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। সকলের কণ্ঠে যখন গর্জ্জন উঠিল—

বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥

আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। দেবী বাহ্য-চৈতন্য হারাইয়াছেন, মহাচণ্ডীর প্রতিমার ন্যায় তিনি স্থির। বদন প্রসন্ন, দেবীভাবে আপ্লুত। একবার দীপ্ত অগ্নিশিখার দিকে দৃষ্টি পড়িল—জাগ্রত হুতাশন; কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! অস্পষ্ট দেখিলাম—যজ্ঞকুণ্ড বেষ্টন করিয়া ফরাসী পুলিসেরা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, আর শ্বেতাঙ্গ পুলিস কমিশনার বিস্মিত বিহ্বল নেত্রে আমাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। বাংলার এই নব-তীর্থে সেদিন যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সে আগুন নির্ব্বাপিত হইবার নহে, সেই দীক্ষাই সঙ্ঘকে নব জন্মের অধিকার দিয়াছে।

প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এই হোমকার্য্য চলিল। হোমান্তে ছাত্রছাত্রীগণ আচার্য্যকে প্রণাম করিল, মাতৃ-পদধূলি লইয়া আমার আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইল। সপ্তশতী হোমকার্য্যে একজন মুসলমান ছাত্রও যোগদান করিয়াছিল, ইহার দিকে আমার লক্ষ্য পড়িল। হোমশেষে তাহার বদনমণ্ডল অতিশয় প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। ইহার কথা এইখানে কিছু বলিব। হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে এত বড় বিপ্লব-সৃষ্টির আমিই সম্ভবতঃ অগ্রণী এবং ব্রাহ্মণসন্তান

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ ইষ্টের আদেশ দ্বিধাহীন হইয়া পালন করিয়াছে। খোদাবক্স খাঁ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই, ইসলামধর্ম্মী হইয়াও সে এই মহাদীক্ষাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু বিবৃত করিতেছি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধুর ডাকে স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন হাওড়া জিলার ডোমজুড় গ্রামের এই মুসলমান তরুণ আমার নবপ্রবর্ত্তিত বিদ্যাপীঠে আসিয়া যোগ দিয়াছিল। সে অন্যান্য হিন্দু ছাত্রগণের সহিত তুল্য ব্যবহার পাইত। গীতা, উপনিষৎ, যোগদর্শনের শিক্ষা সমানভাবেই সে গ্রহণ করিত; ছাত্রগণ স্বাবলম্বনের সাধনায় যখন কেহ তাঁত-শালায়, কেহ প্রেসের কাজে, কেহ বা কাঠের কারখানায় যোগ দিল, তখন এই মুসলমান যুবক আমাদের অখণ্ড অন্নক্ষেত্রের ভার লইল। গৃহলক্ষ্মীর অনুগত হইয়া সে এই কার্য্যে বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। খোদা সজ্যজননীর স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।

২১শে পৌষ হিন্দু বিদ্যার্থীদের সপ্তশতী হোমের অধিকার দিয়া তাহাদের উপবাসী থাকার আদেশকালে খোদাও দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিল। খোদাকে শিক্ষা দিতে আমার কার্পণ্য ছিল না; কিন্তু মুসলমান হইয়া সে সপ্তশতী হোম করিবে, হিন্দু-মন্ত্রে দীক্ষা লইবে—এইরূপ ধারণা আমি করিতে পারি নাই। এই জন্য এই কর্ম্মে তাহাকে বিরত রাখার ইচ্ছাই আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে শুনিলাম—খোদা এইরূপ কার্য্যে মুসলমান বলিয়া বঞ্চিত থাকার আদেশ প্রাণ দিয়া পালন করিবে, কিন্তু সে প্রায়োপবেশনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আমি ইহা শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—খোদা গঙ্গাস্নানান্তে ললাটে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিয়াছে। সে শিরোদেশে একটী তুলসীবৃক্ষ স্থাপন করিয়া, চক্ষু বুজিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। আমি ডাকিলাম "খোদা!" সে চাহিল। চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ। আমি বলিলাম, "আমি ধর্ম্মান্তরের পক্ষপাতী নহি। খোদা, তুমি মুসলমান। হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম জানার জন্য শিক্ষায় অধিকার তোমার আছে, কিন্তু হিন্দু-মন্ত্রে তোমায় দীক্ষা দিব কেমন করিয়া?"

খোদা বাষ্পপূর্ণ লোচনে বলিল "আমি হিন্দু নহি, মুসলমান। কিন্তু আপনি আমার গুরু, আমার আশ্রয়। মুসলমান বলিয়া আপনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন; আমি গুরুত্যাগ করিতে পারিব না, তাই মৃত্যু শ্রেয়ঃ করিয়াছি।"

আমি এই ক্ষেত্রে আর কি করিতে পারি! আমার মন্দির জগন্নাথের মন্দির; জাতিবিচার তো সেখানে রাখি নাই! কত মুসলমান আমার মন্দিরে নমাজ পড়িয়া গিয়াছে, আমি আপত্তি করি নাই। আমার বিগ্রহ পশ্চিমমুখী তাই এক পদস্থ ইসলাম বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন, "আমরা পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িব; ইহাতে আপনার মন্দিরদেবতা আমাদের পশ্চাতে পড়িবেন।" আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম "আমার দেবতা শুধু ঐ বিগ্রহেই বাস করেন না, তিনি অনন্ত। ঐখানেও যেমন তিনি আছেন, সর্ব্বত্র হইতেও তেমন তিনি বাদ পড়েন না। আপনারা যে মুহূর্ত্তে আমার মন্দিরদেবতার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইবেন, সেই মুহূর্ত্তে দেখিবেন—আমার দেবতা আপনাদের সম্মুখেও অবস্থান করিতেছেন।"

আমার মুসলমান বন্ধুরা সেদিন বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদী হিন্দুধর্ম্মী তার এই সার্ব্বজনীন হিন্দুত্ব দিয়াই বিশ্বের বিচিত্র ধর্ম্মকে বুক পাতিয়া ধরার অধিকারী। হিন্দুর দেবতা অতীন্দ্রিয়, অনন্ত। ইহার অর্থ এমন নহে যে, ইন্দ্রিয় হইতে, সান্ত হইতে তিনি পরিচ্ছিন্ন। এমন হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বত্রগ বলা যায় কি প্রকারে? আমি খোদাকে বুকে লইয়া বলিলাম "খোদা, আমি শক্তিমন্ত্রে তোমায় দীক্ষা দিব। হিন্দু বলিয়া মসজিদ আমার ঈশ্বরতীর্থ নহে, যেমন বলিতে পারি না, তেমনই তোমায় মুসলমান বলিয়া হিন্দুর দীক্ষাতীর্থ হইতেও দূর করিব না। কাল তুমি হোমকুণ্ডে হিন্দুর সহিত যোগাসনে উপবেশন করিও।"

খোদার নয়নে সেদিন যে পবিত্র দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছি তাহা আমার স্মরণে থাকিবে। খোদা মুসলমান হইয়াও, সে আমার দীক্ষিত সন্তান। ঈশ্বরচেতনার তীর্থে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নাই। এইখানেই খোদা দিব্য ঐক্যের

সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছে। খোদা আর নাই, কিন্তু তার স্মৃতি মুছিবার নহে।

এই দীক্ষাতীর্থে অস্পৃশ্য-ব্রাহ্মণ, নারী পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান মানবতার মহান্ ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। সাক্ষী স্বয়ং ভগবান আর সেই অশরীরিণী মহাদেবীর অঙ্গুলীতে যাহাদের ললাটে জয়টীকা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহারা। ভাগীরথীকূলের এই অপূর্ব্ব দীক্ষাতীর্থের মহিমা তাহারা কিরূপে রক্ষা করিবে, তাহা তাহাদেরই চিন্তনীয়।

যাহারা এই দীক্ষাতীর্থে সেদিন অগ্নিসাক্ষী করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নাম এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ক্ষীরোদচন্দ্র, সুখেন্দুবিকাশ, খোদাবক্স ও মনোরঞ্জন (পরে ব্রহ্মানন্দ) আজ পরলোকে। প্রফুল্ল, দেবেন্দ্রবিজয়, নরেশচন্দ্র, নীরেন্দ্র ও বসন্ত সঙ্ঘের বাহিরে। অদ্বৈত, রজনীকান্ত (পরে শ্রদ্ধানন্দ), রোহিণীনন্দন (পরে অমৃতানন্দ) যোগেন্দ্রনাথ, গোপালচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণপ্রসাদ, ফণিভূষণ, ইন্দুভূষণ, নন্দলাল, হরিরঞ্জন ইহারা আজিও সঙ্ঘের সহিদরূপে পরিচয় দিতেছে। অমিয়বালা ও অমিয়প্রসুন নারী-মন্দিরের ভিত্তি রক্ষায় আজিও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ সঙ্ঘাচার্য্যরূপে গৃহস্থজীবন যাপন করিতেছে; আর এই দীক্ষাতীর্থের কেন্দ্রদেবীর পুণ্যাত্মা অলক্ষ্যে দীক্ষিত সন্তানদের পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছেন। আমি একদিকে দ্রষ্টা, অন্য দিকে সেবার অধিকার লইয়া সেই পুণ্যস্মৃতির পুনরুল্লেখ করিতেছি।

হোম সমাপ্ত হইল। উপবাস-ভঙ্গের পর প্রসাদ-গ্রহণের পালা। অন্নপূর্ণার মন্দিরে আজ মহোৎসব। কেহই মনে রাখিল না যে সঙ্ঘের শিরে কি কঠোর বজ্র নিপতিত হইয়াছে!

পরদিন বুধবার ৭ই জানুয়ারী পুলিস কমিশনার বাহাদুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। উল্লেখযোগ্য কিছুই মিলিল না। আশ্রমবাসীদের নাম লিখিয়া লইলেন, তারপর আমায় বলিলেন, "আপনার ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের নাম লিখিয়া লইতে হইবে।" আমি শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—মন্দির শূন্য, আচার্য্যের সহিত ছাত্রগণ প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছে। পুলিস কমিশনর আমার করমর্দ্দন করিয়া যথারীতি সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, "বড় সাহেবর হুকুম, আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। বাহিরের লোক যদি কেহ থাকেন, পুলিসে তাহাদের নাম লিখাইয়া দিবেন।"

অপরাহ্নে সমন জারি হইল। অভিযোগ করা হইয়াছে, "আমি বিদেশীর নাম রেজিষ্টারী না করিয়া স্থান দিয়া থাকি, আর ৪০ জনের অধিক লোক লইয়া সভাদি করি।" এই অভিযোগের উত্তর আমি এড্‌মিনিষ্ট্রের বাহাদুরকে জানাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম, আমার প্রতি তাঁহার অভদ্র আচরণের কথা আমি পণ্ডিচারীর গভর্ণর বাহাদুরকে জানাইয়া দিয়াছি। এই সঙ্গে এই সকল ঘটনার বিবরণ "নবসঙ্ঘে" প্রকাশ করিয়া দিলাম। বাংলাদেশে এক ব্যাপক আন্দোলন সুরু হইল। তাৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে আমার উপর বড়সাহেব বাহাদুরের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ বাহির হইল। ১৯শে পৌষ 'বৈকালী পত্রিকায়' 'মাসতুতো ভাইয়ের কীর্ত্তি' বলিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ায়, বড় সাহেব বাহাদুর আমায় জনাইলেন, ফরাসী ভারতের ব্যাপার লইয়া বৃটিশাধিকৃত ভারতে আন্দোলন সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আমি সে কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলাম না।

আমার নামে বড় সাহেব বাহাদুর মোকদ্দমা রুজু করিলেন। তাহার শুনানী আরম্ভ হইল—২৬শে পৌষ শনিবার। আমাদের শ্রদ্ধেয় উকীল বন্ধু ৺বনমালী পাল আসামী পক্ষ অবলম্বন করেন। আসামী আমি ব্যতীত আর ৬জন অভিযুক্ত হইয়াছিল—পর পর তাহাদের নাম এই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীপঙ্কজ-কুমার চৌধুরী, শ্রীবিজয়কুমার চ্যাটার্জ্জি, শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য আর এক গুজরাতী ছাত্র শ্রীত্রিভুবন ভাই প্যাটেল। তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির পক্ষে বনমালী বাবু তাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, এই কথা বলায়, জজ সাহেব মঁসিয়ে বোজারিও ইহাদের ছাড়িয়া দেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা মুলতবী রাখা হয়, আর পঞ্চম আসামীর তিন ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হয়। আমারও অপরাধ সাব্যস্ত

করিয়া ৪ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে Court de আপীল করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রায়ের নকল চাহিলে, জজ সাহেব তাহা দিতে অস্বীকার করেন। ইহা এক প্রকার আমার উপর জুলুম বলিতে হইবে।

পর পর কঠোর ব্যবস্থা হইয়াছিল। মঁ স্যামপাইন আমাকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আমি গভর্ণর বাহাদুরকে সঙ্গে সঙ্গে সব কথা জানাইয়া দিলাম। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কর্ম্মবিধি সর্ব্বত্র যেমন হয়, এখানেও তাহার অন্যথা হয় নাই। মঁসিয়ে স্যাম্পাইনের অভিযোগও সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণর বাহাদুরের নিকট পৌছিয়াছিল। তিনি আমার আবেদনপত্রের কোনই উত্তর দেন নাই, পরন্তু তাঁর ১৪ই জানুয়ারী তারিখের কঠোর আদেশ ১৮ই জানুয়ারী আমার জন্য জারী করা হইল। তিনি জানাইয়াছেন—"Vu le decret du 19 murs 1922 rendant" প্রভৃতি, অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে অর্ডিনান্স ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ তারিখের দেক্রের ফরাসীভারতের বিশেষ সর্ত্তে প্রযুজ্য প্রেস আইনানুসারে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকা গভর্ণমেণ্টের সতর্কবাণী সত্ত্বেও যে সব প্রবন্ধ ও ছবি আইনের মাত্রা ছাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে, বিশেষতঃ ডিসেম্বর মাসের দশম সংখ্যায় যুবকদিগের হত্যাকার্য্যে প্রণোদিত করা ঘৃণিত কার্য্য বলা হইলেও, গভর্ণমেণ্টের মতে পূর্ব্বোক্ত ভাবেই ইহাতে প্রচার করা হইয়াছে। তাই 'প্রবর্ত্তক' তিন মাসের জন্য বন্ধ করা হইল।

বড়সাহেব বাহাদুর গভর্ণরের এই আদেশপত্রের সহিত আমায় লিখিলেন—

'L' autorisation accorde'e ace Journal "Prabartak" de Chandernagore, de Paraftra au franquis et en Bengali egt suspendue Pour trais mois—অর্থাৎ "প্রবর্ত্তক" প্রকাশের অনুমতি তিন মাসের জন্য বন্ধ করা হইল।

পৌষ মাসের 'প্রবর্ত্তক' বাহির হওয়ার উপক্রমকালেই এই আদেশ আমাদের প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত দিল। এইখানেই শাসনশক্তির জিদ ও ক্রোধের শেষ নহে, ইহা আমার অন্তরাত্মা বুঝিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই আঘাত অতিশয় গুরুতর মনে হইল। সঙ্ঘের সকলেই স্তম্ভিত, আমিও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়। জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের উদ্যত অভিযান ফরাসী রাজশক্তি অকস্মাৎ রুদ্ধ করিলেন, সেদিন সাহসের বাণী উচ্চারণ করিয়া হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিলেন গৃহদেবী। তাঁর চক্ষের [illegible] হইতে এই মন্ত্রই যেন উচ্চারিত হই[illegible]
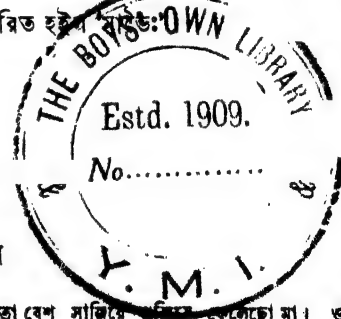
(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা-পূরণ

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

মৃণ্ময়ীর মনে এমনিই তো শান্তি নাই। এত বয়স হইতে চলিল, তাহার না হইল একটা ছেলে, না হইল একটা মেয়ে, তার উপর পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্য যদি দু' দণ্ড স্থির থাকা যায়।

কয়েক দিন হইল তাহারা নূতন বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া মৃণ্ময়ী একটু গড়াইয়া লইতেছিল, এমন সময় বাড়ীওয়ালা-গিন্নী সদলবলে আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়াই গিন্নী ভূমিকা ফাঁদিলেন: "ভাবলাম, যাই একবার, খোঁজখবরটা নিয়ে আসি। রোজই যাব-যাব করি, কিন্তু কি জান মা, কোমরের ব্যথায় আর ওঠা-নামা করতে পারি না।"

তারপর ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: "বাঃ, একদিনেই তো বেশ সাজিয়ে [illegible] ফেলেছো মা। ওই টেবিলটার ওপর ওটা কি গো?"

মৃণ্ময়ী জবাব দেয়—রেডিয়ো।

—'সেই যে চাবি ঘোরালেই কথা কয়? কী তাজ্জব কাণ্ডই যে হচ্ছে দিন দিন! তা দাও না মা চাবিটা ঘুরিয়ে, দু' একটা গান-টান শুনি। তবে শুনবোই বা কি ছাই! গলা কি আর আছে কারুর। কারও হয়ত কাঁসর পেটানো স্বর, কারও বা মিনমিনে।'

একটা দম লইয়া আবার সুরু করিলেন—'ঐ যে মা বসে আছে আমার মেয়েটি। নাম পুঁটু, ভাল নাম অবিশ্যি একটা আছে—স্বর্ণলতা। আহা কি গলা। নিজের মেয়ে বলে বলছি না মা, সেই গানটা, কি

নাম যে গো—ঐ ভাখ ভুলে বসে আছি—যখন গায় চোখের জল না ফেলে থির থাকা যায় না। শুনিয়ে দিস্ তো পুঁটু তোর মাসিমাকে।'

পুঁটু সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'এখনই শোনাব মা'?

মা নিরুৎসাহকণ্ঠে বলিলেন—'এখন কি আর গান শোনবার সময়। তার চেয়ে দুটো গাল-গল্প করি, আর এক সময় এসে শুনিয়ে যাস্।'

মৃণ্ময়ী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাক্ ফাঁড়াটা হয়ত কাটিয়া গেছে।

কিন্তু ফাঁড়া নাকি এত সহজে কাটিতে চায় না। নানা সাংসারিক কথাবার্ত্তার পর এক সময় গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—'কৈ খোকা খুকুদের তো দেখছি না। ইস্কুলে গেছে বুঝি? আজকাল তো আর বাড়ীতে'—।

মৃণ্ময়ী জবাব দিল, 'না, স্কুলে যায়নি। আমার ছেলেপেলে নেই।'

—আহা, মারা গেছে বুঝি। তা' ক'টি হয়েছিল মা?

ঘাড় নীচু করিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত মৃণ্ময়ী বলিল—'হয়নি'।

বাড়ীওয়ালা-গিন্নী হাঁ করিয়া কতক্ষণ মৃণ্ময়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর তর্জ্জনী দ্বারা স্বীয় চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'সে কি গো! এত বয়স হোল এখন পর্য্যন্ত কিচ্ছু হোল না!'

তারপর কি মনে হইতে বলিলেন—'তা' তুমি একবার বাবা বৈদ্যনাথের কাছে ধর্ণা দিলেই পার। আমার এক ভাসুর-ঝি, বুঝলে মা, ছেলেপিলে তার হয় না, কত রকম তুক্‌তাক্, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। শেষে শাউড়ী মাগী বল্লে, ছেলের আমি আবার বে দেবো। শুনে আমার ভাসুর তো মেয়েকে নিয়ে বাবার কাছে ধর্ণা দেওয়ালেন। শুন্‌লে বিশ্বেস যাবে না মা, বছর না ঘুরতেই মেয়ের কোলজোড়া ফুটফুটে এক ছেলে।'

গিন্নী কথাটা এক নিংশ্বাসে শেষ করিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। তারপর ঘড়ির দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন—'ওমা, চারটে যে বেজে গেছে। এখন উঠি।'

তিনি বিরাট্ বপুকে একটা ঝাঁকুনি দিয়া সোজা করিয়া লইলেন। তারপর যাইবার আগে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলেন—'তুমি বাবুকে নিয়ে একবার বাবা বৈদ্যনাথের কাছে যাও মা, সব আশা পূর্ণ হবে।' কথাটা হয়ত নেহাৎ সমবেদনা, কিন্তু এই সমবেদনার জ্বালায় অস্থির হইয়াই মৃণ্ময়ী আজ দুই বৎসর ধরিয়া কেবলই বাড়ী বদ্‌লাইতেছে। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশিনীদের সমবেদনার হাত হইতে সে নিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। মৃণ্ময়ীর একটা দুর্ব্বলতা আছে। সে যাচিয়া উপদেশ শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু সেইগুলি না মানিয়াও মনে শান্তি পায় না।

স্বামী নিখিলেশ গভর্ণমেণ্ট আপিসে বেশ ভাল মাহিনার চাকুরী করে। দুই জনের ছোট সংসার তাহাতে চলেই, উপরন্তু প্রতি মাসেই কিছু কিছু জমেও।

নিখিলেশ অনেক সময় বলে—'টাকা জমিয়ে আর কি হবে! দু'জনের সংসার, কেই বা অমান টাকা ভোগ করবে?'

মৃণ্ময়ী কৃত্রিম কোপকটাক্ষ হানিয়া বলে—'তা হোক। টাকা তো খোলাম কুচি নয় যে দু' হাতে ছড়াতে হবে। আজ দুজন, কাল তিন জন হবে কিনা, কে জানে?' মৃণ্ময়ী এখনও আশা করিয়া বসিয়া আছে।

নিখিলেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলে, 'এই তো বেশ আছি। ছেলে-মেয়ে নিয়ে আর ঝামেলা পোয়াতে ভাল লাগে না বাপু।'

মৃণ্ময়ী এ কথার জবাব দেয় না। স্বামীর মনের নিভৃত আকাঙ্ক্ষা যে তাহার এই কথার ঠিক উল্টা, মৃণ্ময়ী তাহা জানে। কিন্তু উপায় তো নাই, সবই ভগবানের হাত। চেষ্টার তো আর সে ত্রুটি করে নাই। সিদ্ধ বাবার মাদুলী, বুড়ো শিবতলার কবচ, কত রকম শিকড়, গাছ-গাছড়া, ওষুধ-পত্তর—সবই তো বিফল হইয়া গেল। তাহার আর কিই- বা করিবার আছে!

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিখিলেশ সিগারেট মুখে সকালের খবরের কাগজটা আর একবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিল, মৃণ্ময়ী কাছে আসিয়া চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল। মুখ নীচু করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—দ্যাখ, কথাটা বলিতে যেন কী রকম সঙ্কোচ হয়।

নিখিলেশ মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, কি?

—ভাখ, এ বাড়ীটা যেন তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না। কথাটা কোন রকমে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলে মৃণ্ময়ী। তাহার এই চাতুরী নিখিলেশের কাছে আর অবিদিত নাই। লোকের সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে সরাইয়া ফেলিবার জন্ম সকালের 'বেশ বাড়ী' বিকালে 'তেমন সুবিধার নয়' বলিতে নিখিলেশ মৃণ্ময়ীকে আরও কয়েকবার শুনিয়াছে।

ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিখিলেশ বলিল—'কত আর বাড়ী বদলাবে বল তো! এ নিয়ে তো সাত বার হোল।'

সঙ্কোচে আর মৃণ্ময়ী কথা বলিতে পারে না। শুধু হরিণীর মত কালো আয়ত চোখ দুইটি মেলিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকে, দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া আসে চোখের জলে। নিখিলেশ আদর করিয়া বধূকে কাছে টানিয়া গভীর স্নেহে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—'ছি, কাঁদতে নেই। বেশ তো, কালই না হয় বাড়ী দেখে আসব'।

মৃণ্ময়ী স্বামীর কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল—'ওগো, শুনছি বাবা বৈদ্যনাথের কাছে ধর্ণা দিলে নাকি আশা পূর্ণ হয়। নিয়ে চলো না একবার, লক্ষ্মীটি।'

—বেশ তো পুজোর ছুটিতে নিয়ে যাব সেখানে। তারপর বাবাজী যখন গণ্ডায় গণ্ডায়—

সসব্যস্তে তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া মৃণ্ময়ী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'ছি, ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে তামাসা করে না।'

নিখিলেশ তাহার দিকে তাকাইয়া কি রকম দুষ্টুমিভরা হাসি হাসিতে থাকে যেন। মৃণ্ময়ী আর হাসি চাপিতে পারে না, ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, 'যাও, তুমি ভারী বয়ে গ্যাছো আজকাল।'

এইভাবে এই দুইটি প্রাণীর সংসার চলিতে থাকে।

...দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি শেষ হইয়া আসিল। নিখিলেশ মৃণ্ময়ীকে লইয়া দেওঘর ঘুরিয়া আসিয়াছে। মৃণ্ময়ীর স্ফূর্তি আর ধরে না, বলে—'দেখ, এবার ঠিক হবে।'

নিখিলেশ ইচ্ছা করিয়াই উৎসাহ দেখায় না, বলে, 'হলেই ভাল।'

দেওঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা নূতন একটা বাসায় উঠিয়াছে। এই বাড়ীটা কেন জানি না, মৃণ্ময়ীর বেশ ভাল লাগিয়াছে। পাড়া-প্রতিবেশিনীদের অত্যাচার নাই বলিয়াই হয়ত।

পার্কের পাশে ছোট একতলা বাড়ী। বিকালে মৃণ্ময়ী জানালার গরাদ ধরিয়া পার্কের দিকে তাকাইয়া থাকে।...আহা, ঐ অতটুকু ছেলেটাকে ছাড়িয়া চাকরটা মহাসুখে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করিতেছে। দরজা গলিয়া যদি ছেলে রাস্তায় নামে! রাস্তায় কি আর গাড়ী ঘোড়ার অভাব আছে। অতটুকু ছেলেটাকে কেই বা দেখিবে!

হঠাৎ একটি ছোট ছেলের কান্নার শব্দে মৃণ্ময়ীর দৃষ্টি আর এক দিকে আকৃষ্ট হয়। দেখে, ছেলে একটি ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কাগজের ভেঁপু কিনিবার জন্য বায়না ধরিয়াছে। বুড়ী আয়া এক ধমকে ছেলের আব্দার বন্ধ করিয়া দেয়, ছেলেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে। মৃণ্ময়ীর বুকটা হু হু করিয়া উঠে। ছেলে হইলে সে কিছুতেই চাকর আয়াদের কাছে ছাড়িয়া দিবে না। কিছুতেই না!

কিন্তু ছেলে কি তাহার হইবে! ভগবান কি মুখ তুলিয়া তাকাইবেন তাহার দিকে! বাঁজা নাম কি আর ঘুচিবে তাহার কোন দিন? দেখিতে দেখিতে দুই চোখ বাহিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, চোখের জল মুছিতে মনে থাকে না।

দরজায় খুট্ করিয়া শব্দ হয়। সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখটা বেশ ভাল করিয়া রগড়াইয়া লইয়া পিছনে ফিরিয়া তাকায়, কিন্তু নিখিলেশের চোখকে ফাঁকি দিতে মৃণ্ময়ী পারে না। নিখিলেশ কিছুই বলে না, চুপ করিয়া জামা ছাড়িতে থাকে।

মৃণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি জামাটা হাতে নিয়া ব্রাকেটে ঝুলাইয়া দিয়া, জুতার ফিতা খুলিতে বসিয়া যায়। তারপর খাটের উপর নিখিলেশের পাশে বসিয়া পাখা হাতে বাতাস করিতে থাকে। স্বামী আসিলে তাহার সময়টা কাটে চমৎকার। কত রকম মজার কথাই না বলিতে পারে নিখিলেশ, তাহার স্বামীর মত স্বামী ক'জনেরই বা হয়! ঐ তো আগের ভাড়াটে বাড়ীর পাশের বাড়ীতে একটি বউয়ের ছেলে-পেলে হয় না, স্বামী করিয়া বসিল আর একটা বিবাহ। কথাটা মনে হইতেই মৃণ্ময়ী শিহরিয়া উঠে। এক হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া সে ধীরে ধীরে বলে—'হ্যাঁগা, আমার যদি ছেলে না হয়, তুমি কি আবার বিয়ে করবে?'

কথা শুনিয়া নিখিলেশ গম্ভীর হইয়া যায়, তারপর অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে,—'আমাকে তুমি এত ছোট মনে কর, মীনু, তুমি ভাবতে পারলে, তোমায় ছেড়ে আমি আবার বে করব?'

মৃণ্ময়ী লজ্জায় মরিয়া যায়, ছি ছি, কি দরকার ছিল এই সব কথা বলিয়া নিখিলেশের মনে দুঃখ দিবার। সে কি আর তাহার স্বামীকে চেনে না! তবে কেন আবার পরীক্ষা করিতে বসিল তাহাকে! গভীর অনুশোচনায় সে নিখিলেশের ডান হাতটা চাপিয়া ধরে, ওগো, আমায় ক্ষমা কর। নিখিলেশ টানিয়া বধূকে বুকে জড়াইয়া ধরে, ধীরে ধীরে বলে,—'ও কথা আর ব'লো না। আমি যে ওতে বড় কষ্ট পাই।

মৃণ্ময়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক্ ঝড়টা কাটিয়া গেছে। আর সে কখনও বলিবে না ওরকম কথা! কখখনও না। কী যে হয় তাহার মাঝে মাঝে! কথায় যেন লাগাম থাকে না।

* * * *

কথাটা বলি-বলি করিয়াও কেন যে মৃণ্ময়ী নিখিলেশকে এতদিন কথাটা বলিতে পারে নাই, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এক এক সময় ভাবে নাই বা বলিল সে। নিখিলেশ কি দুই চোখ দিয়া কিছুই দেখিতে পায় না! পরক্ষণেই আবার ভাবে, পুরুষ মানুষের কি খেয়াল থাকে নাকি সব দিকে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর বাড়ী আসিয়া অত দিকে নজর দিবার সময় পায় নাকি তাহারা!

সেই দিন নিখিলেশ বাড়ী আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া খাবার খাইতে বসিল। মৃণ্ময়ী তাহার পিঠে একটা হাত রাখিয়া বলিল,—শোন।

—শুনছি।

—একটা কথা বলব।

—একটা কেন, যতটা ইচ্ছে বলতে পার।

কিন্তু বলাটা অত সহজ হয় না, কি রকম লজ্জা করে যেন। মৃণ্ময়ী ভাবিল, থাক রাত্রে বলিবে। দিনের আলোয় এমন অনেক কথা বলা যায় না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে যেন বলা অনেক সহজ হয়। রহস্যময় রাত্রির যেন একটা নিজের ভাষা আছে—আছে আবেগ। নিখিলেশ কিন্তু ছাড়িল না। মুখ ফিরাইয়া বলিল, আবার বাড়ী বদলি তো!

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া মৃণ্ময়ী বলিল—'না গো মশাই না।'

নিখিলেশ নির্লিপ্তভাবে বলিল—'কোন ওষুধ-বিষুধ চাই বুঝি?'

—'ওষুধ দিয়ে কি করব আমি!' কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল মৃণ্ময়ী।

—তবে, গভীর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল নিখিলেশের কণ্ঠস্বরে।

সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃণ্ময়ী বলিল, একটা রাঁধুনী বামুন রাখতে হবে যে গো।

—বেশ তো, তুমিই তো রাঁধুনীর কাজ ছাড়তে চাওনি এতদিন। কতদিন তো বলেছি তোমায়।

পুরুষ মানুষ যেন কী! সাধারণ কথাটার মানেও বোঝে না। সে কি খাটুনীর ভয়ে রাঁধুনী রাখিতে বলিতেছে নাকি! নাঃ, লজ্জা করিলে আর চলিবে না। যে হাবা মানুষ, সাত জন্মেও তাহার কথার মানে বুঝিতে পারিবে না।

রহস্যভরা কণ্ঠে মৃণ্ময়ী বলিল—'বেশী দিনের জন্যে নয় গো।'

তারপর আঙুল গণিয়া নিজের মনে যেন কী হিসাব করিয়া বলিল—'মোটে চার পাঁচ মাসের জন্যে।'

নিখিলেশের যেন কি সন্দেহ হইল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া মৃন্ময়ীর দিকে তাকাইয়া বলিল—'সত্যি?'

—মিছে কথা বলছি নাকি।

নিখিলেশের রক্তে যেন নেশা লাগিয়া গেল, চেয়ার ছাড়িয়া মৃন্ময়ীকে ধরিতে যায়, মুখে বলে, 'এতদিন বলনি কেন?'

মৃন্ময়ী এত সহজে ধরা দিল না। 'বলব কেন? চোখ নেই।' বলিয়া সেও টেবিলের এ-পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম বিবাহের দিনগুলি যেন আবার তাহাদের ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিখিলেশের কোন কাজেই আজকাল আর মন লাগে না। আপিস হইতে বাড়ী আসিবার জন্য মন উস্‌খুস্ করিতে থাকে। বাড়ী আসিয়া সে মৃন্ময়ীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ সন্তানের জল্পনাকল্পনায় মাতিয়া উঠে। বন্ধু মহল বলে, কুণো। নিখিলেশ সে কথা কাণেই তোলে না। ঐ রকম কত লোকে কত কথা বলে। সব কথায় কান দিলে আর সংসার চলে না।

মৃন্ময়ীর তো কথাই নাই। সে সমস্ত দুপুর বসিয়া ভাবী অতিথিটির জন্য কাথা, সার্ট, প্যাণ্ট সেলাই করে। মৃন্ময়ী যেন ঠিক জানে, তাহার ছেলেই হইবে। অনেক সময় সে নিজের মনেই হাসিতে থাকে, অতটুকু পুঁচ্‌কে ছেলে সার্ট প্যাণ্ট পরিবে কি করিয়া? থাক্, তবু তৈরী করিয়া রাখা ভাল, পরে কাজে লাগিবে তো।

নিখিলেশ কৌতুক করিয়া এক সময় বলে—'এত পরিশ্রম ক'রে সার্ট প্যাণ্ট তৈরী করছ, কোন কাজেই লাগবে না। হবে তো মেয়ে।'

এই কথায় মৃন্ময়ী রাগিয়া উঠে, তর্জ্জনী তুলিয়া শাসন করে—ধ্যেৎ!

নিখিলেশ এত সহজে কথা শোনে না, বলে—সত্যি বলব না তো কি?

মৃন্ময়ী কাছে সরিয়া আসিয়া নিখিলেশের গলা জড়াইয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া বলে—'বল না গো, ছেলে হবে, বল না।'

নিখিলেশ অনিচ্ছার ভাণ করিয়া বলে—'আচ্ছা ছেলেই হবে।'

প্রাপ্তবয়স্ক দুইটি বালক বালিকার এই কলহাস্যমুখরিত দিনগুলির দিকে তাকাইয়া অন্তরীক্ষে বিধাতাপুরুষ কি ভাবিতেছিলেন কে জানে।

* * * *

মাঝে একটি দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পর আবার আজ এই কাহিনীর যবনিকা তুলিয়া ধরিলাম, কিন্তু না তুলিলেই বুঝি ভাল হইত।

মৃন্ময়ীর আজ সকাল হইতে 'ব্যথা' উঠিয়াছে। প্রথম পোয়াতী, তায় বেশী বয়স। নিখিলেশ ভয় পাইয়া সহরের সেরা সাহেব ডাক্তার আনিয়া হাজির করিয়াছে। মৃন্ময়ী আপত্তি তুলিয়াছিল, 'এত টাকা খরচ করে আর সাহেব ডাক্তার আনতে হবে না। একজন সাধারণ লেডী ডাক্তার আনলেই চলবে।'

নিখিলেশ কথাটা কাণেই তুলে নাই, বলিয়াছিল—'হয়েছে থাম। তোমার আর টাকার মায়া না দেখালেও চলবে।'

রুদ্ধ দুয়ারের বাইরে গভীর উৎকণ্ঠায় কাণ পাতিয়া নিখিলেশ দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে মৃন্ময়ীর কাতোরোক্তি ভাসিয়া আসিতেছে। ভিতরে ডাক্তার এবং নার্সের ফিস্ ফিস্ কথা শুনিয়া নিখিলেশ বুঝিল সময় আসন্ন।

হঠাৎ নিখিলেশ একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। হাত জোড় করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া বলিল, মৃন্ময়ীকে বাঁচিয়ে তোল আর তার কোলজোড়া একটি ছেলে দাও, ঠাকুর।

ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সন্দিহান, নাস্তিক বলিয়া বন্ধু মহলে যাহার নাম-ডাক আছে, সেই নিখিলেশ চৌধুরী আজ নিতান্ত দায় ঠেকিয়াই ভগবানের উদ্দেশ্যে ছেলেমানুষের মত তাহার আকুল প্রার্থনা জানাইয়া বসিল।

এক মিনিট, দুই মিনিট করিয়া পনেরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। হঠাৎ কচি শিশুর গলার আওয়াজে নিখিলেশ চমকিয়া উঠিল। মৃন্ময়ীর সন্তান হইয়াছে। সে আজ শুধু মীনু নয়, সে আজ মা। মা। মা!

নিখিলেশের ইচ্ছা হইল দরজা ভাঙ্গিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃন্ময়ীকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ জানাইয়া আসে তাহার এই অমূল্য উপহারটির জন্য। কিন্তু তাহার এই ইচ্ছা দমন করিতে হইল। কে জানে মৃন্ময়ী এখন কেমন আছে! আহা, কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছে মৃন্ময়ীকে! বেচারী মৃন্ময়ী, আহা বেচারী!

খট্ করিয়া দরজা খুলিয়া যাওয়ার শব্দে নিখিলেশ চোখ তুলিয়া দেখিল, দুয়ারের বাইরে দাঁড়াইয়া ডাক্তার। নিখিলেশ ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, ডাক্তার বাধা দিলেন—'একটু পরে যাবেন, আসুন আমার সঙ্গে। কথা বলিতে বলিতে' তিনি আগাইয়া চলিলেন। নিখিলেশকেও পিছু পিছু যাইতে হইল দায়ে ঠেকিয়াই।

নিখিলেশ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার স্ত্রী কেমন আছে, ডক্টর?'

—তিনি ভালই আছেন। আপনার একটি ছেলে হয়েছে।

নিখিলেশ আনন্দে ছোট ছেলের মত লাফাইয়া উঠিল।

—ছেলে হয়েছে। পরে যেন নিজের মনেই বলিল—মৃন্ময়ী ছেলেই চেয়েছিল। তার কতদিনের সাধ, কতদিনের আকাঙ্ক্ষা!

ডাক্তার বলিলেন—ছেলে হয়েছে, কিন্তু—

—'কিন্তু কি ডক্টর?' গভীর উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠে নিখিলেশের কণ্ঠস্বরে।

গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তার উচ্চারণ করিলেন, 'কথাটা এখন এই অবস্থায় প্রসূতিকে না জানানোই ভাল, ছেলেটি আপনার জন্মান্ধ।'

নিখিলেশ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কথাটা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিনা, ঠিক বোঝা গেল না।

সম্পাদকীয়
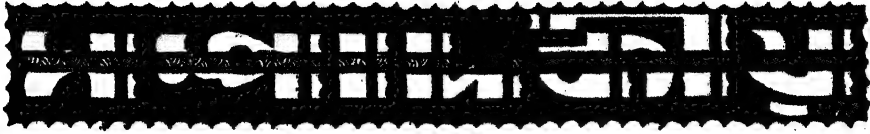
যুদ্ধোত্তর ভারতের নীতি

জাপানের আত্মসমর্পণ-স্বাক্ষরের সঙ্গে মহাযুদ্ধের কালানল আপাততঃ নির্ব্বাপিত হইল। অতঃপর, সমস্যা আর যুদ্ধের নহে, শান্তির। এ সমস্যারও গুরুত্ব বড় কম নহে, বরং সমধিক জটিল ও গুরুতর। ম্যাঞ্চুরিয়ায় তথাকথিত চীন-জাপ-"ঘটনা"য় (incident) যে মহাযুদ্ধের আরম্ভ, টোকিও'র স্বাক্ষরপত্রে তাহার দৃশ্যত. পরিসমাপ্তি হইলেও, গত বিশ্বযুদ্ধের ভার্সেইস সন্ধিপত্রে ও লীগ-অফ-নেশন্সের দুর্ব্বলতার মধ্যেই ইহার আসল বীজ উপ্ত হইয়াছিল; আর বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের শান্তিপত্রে ও সান্‌ফ্রান্সিস্কোর বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সংগঠনে তাহার যথার্থ মূলোচ্ছেদ হইল কিনা, তৎসম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করিবার মত দূরদর্শী সত্যদৃষ্টি কাহারও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবুও সকলেই বুক ভরিয়া আশা করিতেছে—এইবার যথার্থ শান্তি ও নব শৃঙ্খলা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক। অন্ততঃ যুদ্ধে বিজয়ী জাতিগুলি সেই কথাই জোর গলায় ঘোষণা করিতেছেন এবং পরবর্ত্তী সংগঠনের আভাসও তাহাদের প্রতিভূগণের কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই যুদ্ধোত্তর জীবন-নীতি সম্বন্ধে নানা চিন্তা ও পরিকল্পনাই স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইতেছে।

বিধ্বস্ত ইউরোপ ও প্রাচ্যভূখণ্ডসমূহ—উভয়ত্রই বিরাট্ সমস্যা—খাদ্য, বস্ত্র, কয়লা, জীবিকা, শিল্প, শিক্ষা—সব কিছু লইয়াই। অর্দ্ধেক পৃথিবীকে যেন ভাঙিয়া গড়িতে হইবে। বিজিত দেশ ও জাতিগুলির রাষ্ট্রনীতিক পরিবর্ত্তনের সমস্যা ইহার উপর আছে—তাহা যে কি গুরুতর, তাহা রাষ্ট্রসাধকগণই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যুদ্ধ-বিদ্রাবিত দেশগুলির পুনর্গঠনের জন্য সম্মিলিত বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি যে পুনর্গঠন-সমিতি রচনা করিয়াছেন, তাহার অপরিমেয় অর্থভাণ্ডারে ভারতকেও একটা প্রকাণ্ড অংশ বহন করিতে হইবে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভারতকে যেমন মহাযুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল, তেমনি যথাসময়ে তাহাকে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের পুনর্গঠনেও সহায়তা ও সহযোগিতা করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে ভারতের চিন্তানায়ক ও কর্ম্মনায়কগণ অবহিত নহেন, তাহা আমরা বলি না; কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করার সুযোগ কতটুকু, তাহাই আজ ভাবিবার বিষয়। সে সুযোগ না পাইলে, ভারতের পক্ষে যুদ্ধোত্তর চিন্তা ও পরিকল্পনা সবই ব্যর্থ হইবে।

মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের মনোভাব যেটুকু ধরা যায়, তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, কেহ কাহারও সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমেরিকা তাহার ধনবল ও বিজ্ঞান-বল মহাচীন ও প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপময় এশিয়ার বিপুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইতেছে; সুতরাং ভারতের জন্য তাহার মাথাব্যথা ক্রমেই কমিয়া আসিবে। মহারুষ তাহার নিজস্ব সমস্যাতেই ব্যস্ত—যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাল রাখিয়া অগ্রগতির জন্য তাহাকে অভিনব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে। চীন ও ফ্রান্স—নিজেরাই এখনও নিজ পায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহাদের দাঁড়াইতে হইবে। অতএব ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য নির্ভরতা অন্য কাহারও উপর করিবার নাই। এখানে বৃটনেরই সঙ্গে আমাদের বুঝাপড়া অথবা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই চলিতে হইবে।

ভারতের যুদ্ধোত্তর নীতি ও পরিকল্পনা পুনর্গঠনেরই। বৃটনেরও তাই। উভয়ের স্বার্থ আজ একান্ত বিরোধী নহে। বরং সমাজতন্ত্রশাসিত বৃটনের প্রকৃত স্বার্থ নির্ভর করিতেছে—ভারতের অনুকূল একটা বুঝাপড়া করায়, এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দও চিন্তা সুরু করিয়াছেন, দেখা যায়। ইংলণ্ডের পার্ল্যামেণ্ট হইতে লর্ড ওয়াভেলকে আহ্বান করার মূলে যদি এইরূপ স্বার্থপ্রেরণাই থাকে, তাহাতে ভারতের আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। অবশ্য যুদ্ধোত্তর ভারত ও যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের পুনর্গঠনের প্রয়োজনগুলি বিভিন্নমুখী, ইহা সত্য। ইংলণ্ডকে আজ যুদ্ধজনিত বিপুল ঋণভার শোধ

করিতে হইবে—আমেরিকার সাহায্য লইয়া; কিন্তু ভারতকেই তাহার পণ্যের প্রধান বাজার না করিলে চলিবে না। পক্ষান্তরে, ভারতের শিল্পবাণিজ্য-সৃষ্টি ও তাহার দ্রুত প্রসারের ইহাই শুভ অবসর। এই অবসরের পরিপূর্ণ সুযোগ আমরা লইতে চাই। এইখানে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-নেতৃগণ ও অর্থনীতিকগণ যদি ভারতের উদীয়মান শিল্প ও বাণিজ্যশক্তির সহিত একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রফায় উপনীত হইতে পারেন, তাহা হইলেই উভয়ের মঙ্গল। আমরা সেই শুভ স্বার্থবুদ্ধিপ্রকাশেরই আশা-প্রতীক্ষা করিব। ভারতের অর্থবিৎ ও রাষ্ট্রবিৎ ধুরন্ধরগণ এই সংগঠনী দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইলেই যুদ্ধোত্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে এইদিকেই উদ্যোগী দেখিলে আমরা সুখী হইব।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ

আমাদের পরম সুহৃদ্ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ১২ই আগষ্ট রবিবার তাঁর এলগিন রোডস্থ ভবনে পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

স্যার নৃপেন্দ্রের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সঙ্ঘের ২২শে অগ্রহায়ণের মাতৃ-উৎসবের হিন্দুসভার সভাপতিরূপে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি "প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচারের" পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শের সহিত নিবিড় পরিচয় করিয়া, তিনি ইংরাজীতে ইহার ভাল-মন্দ দুই দিক্ দেখাইয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ সঙ্ঘ-গুরুর নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘগুরুর প্রব্রজ্যাকালে দার্জ্জিলিঙে তিনি তাঁহাকে মহাসমাদরে স্বভবনে লইয়া যান এবং শ্রীমতী সরকারের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। তাঁহারা উভয়েই কয়েকদিন চন্দননগরে আসিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ খাঁটী বাঙ্গালী ও খাঁটী হিন্দু ছিলেন। তিনি ভারত-বরেণ্য স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর বিচিত্র বহুমুখী কর্ম্মজীবনে যে অভিজাত স্বাজাত্যবোধ, নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি, তাহা যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবনীয়। আজিকার নেতৃহীন বাংলায় স্যার নৃপেন্দ্রনাথের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব বাঙ্গালী বিশেষভাবেই অনুভব করিবে। 'অলকায়' ও 'হিন্দুস্থানে' তিনি সম্প্রতি আত্মজীবনী সবিনয় সঙ্কোচের সহিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইলে দেশসাধনার অনেক অনুদ্ঘাটিত পরিচ্ছদের উপর প্রভূত আলোকপাত হইতে পারিত। স্যার সরকার নেপথ্যে থাকিয়া জাতিগঠনে যে প্রভূত অবদান ঢালিয়া গিয়াছেন তাহারও পরিচয় খানিকটা দেশবাসী পাইত। আমরা তাঁর আত্মার সাধনোচিত উর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনে প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ভারতের জাতীয় সেনা

জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইলে, যে সব ভারতীয় সেনা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের চরম দণ্ডে দণ্ডিত করার প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রকাশ করেন যে, "এই সকল ব্যক্তির অবলম্বিত নীতি ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের দেশপ্রেমের আন্তরিক অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার দাবী করা যাইতে পারে। এই দিক্ দিয়াই ব্যাপারটা দেখিলে, তাহা ভারতীয় ভাবে দেখা হইবে—ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের এইরূপ সহৃদয় ব্যবহারে বিশেষ পরিতোষ লাভও নিশ্চয় করিবে।"

কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদও এই দাবীর সমর্থন করিয়াছেন। ভারতের এই বিপথচারী দেশ-প্রেমিকগণকে তাহাদের ভ্রান্ত দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ও নূতন-ভাবে জীবনগ্রহণের সুযোগ দিলে, তাহা শুধু রাজশক্তির মহানুভবতা নহে, পরন্তু দেশের হৃদয়ে একটা সুমধুর সান্ত্বনার প্রলেপও পড়িবে। ইহাদের মুক্তি-সাধনার সঙ্কল্প ও তপস্যাকে যদি দেশের সংগঠনকল্পে প্রযুক্ত করা যায়, তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণবিধানই হইবে।

নমস্তে নৃপেন্দ্রনাথ

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার-এ্যাট্-ল

নৃপানাং ইন্দ্র তাহার 'নাথ'! পিতামাতার সোহাগে 'কানাপুত'ও পদ্মলোচন নাম ধারণ করে। তাহাদের মধ্যে কচিৎ কেহ আকারে পদ্মলোচন না হইয়া, প্রকারে মিণ্টনের ন্যায় 'ত্রিকালদর্শী' হইয়াছেন, পিতামাতা কর্ত্তৃক নামকরণেরও সার্থকতা হইয়াছে। নৃপেন্দ্রনাথের পিতামাতা কিন্তু খনা ও বরাহ মিহিরের ভাবপ্রেরণাতেই যেন পুত্রের নামকরণ করেন। ভারতবর্ষে বিশেষ বাংলা-দেশে ব্যারিষ্টার-সম্প্রদায়ে নৃপস্থানীয় ভাগ্যবানের অভাব তখন ছিল না। তাহাদের ইন্দ্রত্ব শুধু নহে, তাহারও নাথ হইয়া বসেন যে নৃপেন্দ্রনাথ, 'নৃপসমাজ' তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত। ইহা লইয়া বাক্-বিতণ্ডার কোনও প্রয়োজনই নাই—অঙ্কের খাতা যখন মজুত রহিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট নৃপেন্দ্রনাথকে সত্যই 'নৃপেন্দ্রনাথ' জানিয়া কঠোর দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য্য ব্যপদেশে তাঁহার সহায়তা লাভে আগ্রহান্বিত হন এবং তাহা পাইয়া কৃতার্থও হয়। নৃপেন্দ্রনাথ সেই কার্য্যে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের মর্য্যাদা শুধু অক্ষুন্ন রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, সে মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেন তিনি শতগুণে। তাহা যদি তিনি না করিতেন, তবে তিনি কিসের নৃপেন্দ্রনাথ!

নৃপেন্দ্রনাথ যখন মাত্র ৬।৭ বৎসর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, তখন তাঁহার সংস্পর্শে আমি আসি। 'ক্যাল্‌কাটা বার্' ইয়োরোপীয় প্রভাব হইতে তখন মুক্ত এবং ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ব্যোমকেশ, আশুতোষ চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের জজ ও স্যার), এচ্-ডি-বসু, এস্-আর দাস, সি-আর দাস, এস্ পি-সিন্‌হা (পরে স্যার্, ব্যারণ ও বিহারের গভর্ণর), বি-সি-মিত্র (পরে স্যার) এ রসু'ল প্রভৃতি দিক্‌পালগণ তখন বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য জ্যাক্‌সন ও আরড্‌লি নর্টন্ ক্যাল্‌কাটা বার্‌কে সমভাবে গৌরবান্বিত করিতে-ছিলেন। ৬।৭ বৎসরের ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্রনাথকে দেখিলাম, দিক্‌পালশোভিত রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যেই মাথা তুলিয়া স্বীয় ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতেছেন। এটর্নি ও ব্যারিষ্টার মহলে নৃপেন্দ্রনাথের যোগ্যতার কথাও শুনিলাম। যে রঙ্গমঞ্চে সি-আর-দাসের ন্যায় শিল্পীকেও মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে ১৫।১৬ বৎসরকাল একাদিক্রমে, সেই নাট্যভূমিতেই এই তরুণ শিল্পীর ত্বরিৎ অগ্রগতি কিসের পরিচায়ক বলিয়া দিতে হইবে না। স্বয়ং নৃপেন্দ্রনাথকে পরে বলিতে শুনিয়াছি—'ভাগ্যং ভাগ্যং মূলম্'। অবশ্য পুরুষকারাবলম্বী নৃপেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবানেরই ইহা বলা সাজে।

চোরবাগানের সুবিখ্যাত সরকার বংশজ নৃপেন্দ্রনাথের বংশমর্য্যাদার বড়াই করিবার আছে অনেক কিছু। পিতামহ প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ, পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ নগেন্দ্রনাথ, খুল্লতাত ঋষিকল্প শিক্ষাবিদ্ শৈলেন্দ্রনাথ। এই তিনের নাম করিলেই সরকারবংশের পরিচয় বাহুল্য করিয়া দিবার প্রয়োজন আর থাকে না। বাংলা ও বাঙালীর ঋণ এই বংশের কছে অপরিশোধ্য। দেশহিতে নীরব ব্রতী এই কর্ম্মবীরদের অনুষ্ঠিত প্রথাই অবলম্বন করেন নৃপেন্দ্রনাথ তাঁহার দেশ সেবা কার্য্যে। হাইকোর্টের মহিমামণ্ডিত মর্য্যাদারক্ষায় একনিষ্ঠ পূজারীরূপে তাঁহার সশ্রদ্ধ অঞ্জলী দান এবং তাহারই ফলস্বরূপ দৈব শক্তির ন্যায় অপরিসীম যে শক্তি নৃপেন্দ্রনাথ অর্জ্জন করেন, তাহারই অলক্ষ্য প্রয়োগে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে শাসকের নিত্য নূতন দণ্ডবিধি প্রণয়নে যে কি ঘোর বাধার সৃষ্টি করে এবং দেশবাসীকে বহুতর যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করে, ইতিহাসকার অবশ্যই তাহা লিপিবদ্ধ করিবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথাসময়ে। দেশের ও দেশের মঙ্গলার্থে দেশহিতকামীর এই নীরব কিন্তু নৈষ্ঠিক অভিযান নৃপেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষাবলম্বিত নীতিরই ধারানুসরণ ভিন্ন আর কিছু নহে। নৃপেন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (লর্ড) কংগ্রেসের প্রধান পুরোহিতরূপে দেশবাসীকে সমরবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া সৈন্যশ্রেণী সৃষ্টি করিবার অধিকারের কথা বজ্রনির্ঘোষে জগজ্জনকে জানাইতে সেদিন দ্বিধা বোধ করেন নাই। কংগ্রেসের কৃতিত্ব-কথার উল্লেখ ও পুনরুল্লেখের বিরাম নাই, কিন্তু স্বদেশীয় সৈন্য শ্রেণীসৃজনে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের দাবির কথা তাহাতে

দেখিতে পাওয়া যায় না; না যাউক, কথাচ্ছলে একদিন তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রশ্ন উঠে, "কংগ্রেস দেশের মনোভাব সৃষ্টি করে, না মুষ্টিমেয় কয়েকজন কংগ্রেস-নীতির স্রষ্টক, যাহা 'রেজলিউসন্'রূপ ধারণ করিয়া দেশের মনোভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয়?" নৃপেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন উত্থাপনে তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলেন, "আরে রও, রও সরকার, যা হয় কিছু বল।" হাত জোড় করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ বলেন, আজ্ঞে, "আদার ব্যাপারী।" একটা হাসির রোল উঠে। কংগ্রেসে ক্যাল্‌কাটা বার'এর দান সামান্য নহে। প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস আঁতুড়েই মরিয়া যাইত ক্যালকাটা বার যদি তাহার লালনপালনে অমনোযোগী হইত।

'আদার ব্যাপারী' পরিচিত, নৃপেন্দ্রনাথের ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থার কথা সদ্যমুক্ত রাজবন্দী শরচ্চন্দ্র আইনব্যবসায়ে নৃপেন্দ্রনাথের জুনিয়র রূপেই কার্য্যারম্ভ করেন। গুরুশিষ্যে বিশেষ সম্প্রীতির কথা কাহারও অবিদিত নাই। শরচ্চন্দ্র যখন কংগ্রেসে যোগদান করেন তাহাতে নৃপেন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল কিনা, শরৎবাবুই যথাসময়ে বলিবেন। নিষেধ যে ছিল না সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। যতদূর মনে পড়ে, শরচ্চন্দ্র সম্প্রদায় বিশেষের চক্ষে Notorious congressite বলিয়া দাঁড়াইবার পরেও, তিনি দিল্লীতে নৃপেন্দ্রনাথের মাননীয় অতিথির সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। নৃপেন্দ্রনাথ কিন্তু কস্মিনকালেও কংগ্রেসভুক্ত হন নাই।

অথচ এমনদিনও গিয়াছে যখন কোন কোন 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদ-পত্র নৃপেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসদ্বেষী সুতরাং দেশদ্রোহী আখ্যা দিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম হরতাল অনুষ্ঠিত হইবার পরদিনের 'ইংলিশম্যান'-এ এন-এন-সরকার স্বাক্ষরিত একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। শিরোনামায় লিখিত হয় 'গুণ্ডারাজ'। হরতাল উপলক্ষে বলপ্রয়োগে দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া, ট্রাম ও অন্যান্য যানবাহনের গতিরোধ করা, এমন কি ঠিকা ঝিকেও গৃহস্থের কাজ করিতে যাইবার পথে বাধা দেওয়া প্রভৃতি হাস্যকর ঘটনার অন্ত থাকে নাই। শ্বেতাঙ্গ মহিলা মোটরে যাইতেছেন। কোথা হইতে দলবদ্ধ বালক মোটরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়া বিকৃতভাবে 'বন্দেমাতরম করণ' এবং প্রকারান্তরে মহিলার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, এই হরতালের অন্যতম ঘটনা। এই সকল ঘটনার বিকৃতির উল্লেখেই সরকার মহাশয়ের পত্রখানি পূর্ণ থাকে এবং নগরবাসীর দৈনন্দিন কর্ম্মে গুণ্ডামি করিয়া যাহার ইচ্ছা সে বাধা দেওয়াতে শান্তিরক্ষকের কর্ত্তব্যপালনে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই অপরাধে নৃপেন্দ্রনাথ একদা দেশদ্রোহী আখ্যা পান। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অসম্মানার্থ সম্প্রতি হরতালের নব সংস্করণ প্রদর্শিত যাহা হইয়াছে তাহাতে আজও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে তাহারাই, যাহারা নৃপেন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিল। অযথা আক্রমিত হইয়াও নৃপেন্দ্রনাথ থাকেন কিন্তু স্থির, ধীর। ভাব— They do not know what they do, Pardon them oh lord! তাঁহার চরিত্র ছিল এই ধাতুতেই গড়া। ইহারও একটী দৃষ্টান্ত দিই।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্-এর কলিকাতায় আগমনোপলক্ষে 'বয়কট'-এর যে ঝড় বহিয়া যায় তাহা নিবারণোদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। রাজবর্ত্মে মিলিটারী পিকেটের ব্যবস্থা হয়। সেই পিকেটের এক গোরার হস্তে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ বৃদ্ধ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় লাঞ্ছিত হ'ন নির্ম্মমভাবে। তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংলিশম্যান পত্রিকায় আমি একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখি। পত্রখানির মর্ম্ম:

> "শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাও অবশ্য কর্ত্তব্য যে, তাহা রক্ষা করিতে গিয়া হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্ব্বরের হস্তে নিগৃহীত না হ'ন। আমার মনে হয় জনগণের স্বার্থরক্ষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রণী এন্-এন্ সরকারের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্রিক্-এর পাহাড় কিছুদিনের জন্য ঠেলিয়া রাখিয়া 'টমিদ্বয়' পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে কি বৃত্তান্ত তাহাকে সমঝাইয়া দিলে মৈত্র মহাশয়ের সম্পর্কে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার পুনরুক্তি হয় না।"

ইংলিশম্যান সেই পত্রখানিকে ভিত্তি করিয়া সুদীর্ঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমার 'সারবান' প্রস্তাব সমর্থন করে। কৌতুকবশেই প্রস্তাবটী আমি করি। ইংলিশ-ম্যানের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া কৌতুক উপভোগ আমার

হইয়া যায় কাণায় কাণায়। ইহার জন্য সদ্য সদ্য প্রায়শ্চিত্ত যে করিতে হইবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। ওই পত্রখানি লিখার জন্য বার লাইব্রেরীতে বাহবা আমাকে দিল অনেকে। অবসর করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ আমাকে অন্তরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন—'I appreciate the spirit of your letter but you have done me injustice,' রাগ, দ্বেষ কিছু নাই, কথা কয়টী বলিবার ভঙ্গীতে ছিল কেবল ঐকান্তিকতা। তাহাই আমাকে তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিল কৌতুক করিতে গিয়া আমি কি করিয়াছি! মার্জ্জনা ভিক্ষার অবসর তিনি দেন নাই। আমার হাত দু'টী ধরিয়া তিনি বলেন, "Hope now we know each other well enough." দেখিলাম গঙ্গাবারির ন্যায় স্বচ্ছ, পূত, পবিত্র তাঁহার হৃদয়চিত্র! মিথ্যার স্থান তথায় নাই। কার্য্যোদ্ধারের জন্য কুটিলতায় কলুষিত তাহা নহে। তেজোময় কিন্তু ক্ষমাশীল।

অঙ্ক ও রসায়নশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী এম-এ কেন যে আইনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 'মাষ্টারী' করিয়া প্যারীচরণ নাম কিনেন বটে, কিন্তু তাহার তুলনায় অর্থলাভ হয় তাঁহার স্বল্পই। নগেন্দ্রনাথ সুতরাং পুত্রকে সেই পথ হইতে সরাইয়া অন্য পথে চালিত করেন। অথচ আইন ব্যবসায়ে নৃপেন্দ্রনাথের রুচি ছিল না একেবারেই। কি করিবেন, পিতৃ-অভিলাষ তাঁহাকে পূরণ করিতেই হয়। ইহার অনেক পূর্ব্বে নয় বৎসরের বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেও তাঁহাকে হয় পিতৃমাতৃ আজ্ঞায়। নৃপেন্দ্রনাথ নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন অন্ধ যুগের, বর্ত্তমান যুবকের ন্যায় পিতৃমাতৃবিরোধী হইবার সৎসাহস তাঁহার ছিল না, সুতরাং যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিবার মত অবস্থাই তাঁহার হয়। এই সগর্ব্ব বাণী শ্রবণে আত্মাবহ এক আদর্শ পুত্রের চিত্র মনপ্রাণ জুড়িয়া বসে।

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইয়া ভাগলপুর কোর্টে নৃপেন্দ্রনাথ যখন বসিলেন, ব্যবসায় জমাইবার চলিত 'মার প্যাঁচ' তাঁহার ভাল লাগিল না। রাঁজবনেলীর ম্যানেজার তখন তাঁহার পিতা। পিতার পদমর্য্যাদার কারণে তাঁহার অনুগতদের যোগাড়ে, ব্যবসায়ে নৃপেন্দ্রনাথের 'খোরাক' অল্পবিস্তর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার গলাধঃকরণ আর হয় না! তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন এবং এক ছুটে হইয়া বসিলেন মুন্সেফ। উত্তরকালের জাঁদরেল ল' মেম্বরের কি কৌতুককর অভিযান! মুন্সেফী করিতে করিতে নৃপেন্দ্রনাথ পিতৃ আজ্ঞা পাইলেন, "বিলাত যাও, ব্যারিষ্টার হও।" নৃপেন্দ্রনাথ পিতাকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন, অর্থ অসচ্ছলতার কথা জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঋণ করিয়া পুত্র প্রেরিত হইল সাগরপারে ব্যারিষ্টার হইতে। ব্যারিষ্টার সহপাঠী ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের (এখন স্যার) ইহাতে যোগ ছিল তলে তলে। বিলাত যাত্রার অনতিপূর্ব্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার বিনোদলাল মিত্রের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করেন নৃপেন্দ্রনাথ। পিতৃমাতৃ পদরেণু শিরে ধরিয়া পুত্র পাড়ি মারেন চক্ষু মুদিয়া। বিজয়লক্ষ্মীর পূর্ণ দৃষ্টি পড়ে তাঁহার উপর। অক্লান্ত পরিশ্রমে অতি অল্পকালের মধ্যে বার-এর শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন নৃপেন্দ্রনাথ। পিতৃভক্তির পুরস্কারের সেই সূচনা মাত্র। হাইকোর্টে নৃপেন্দ্রনাথের প্রথমাবস্থার কথা আভাষে বলা হইয়াছে। সেই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সূত্রে বাংলায় গঠিত হয় বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর ও বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট বাঙালীরই আয়োজনে। নৃপেন্দ্রনাথ দুইটীরই কার্য্যকরী সদস্য হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হ'ন। তাহা হইতে কিন্তু তিনি স্বীকার পান নাই। না পাইলেও, তাঁহার সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে দুইটীর একটীও বঞ্চিত হয় নাই। ভারতীয়ের খেলাধূলার উন্নতিকল্পে পরে তিনি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দ্বন্দ্বকলহে কলিকাতায় ফুটবলের অবস্থা যখন সঙ্গেমিরে, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রযোগে লেখক নৃপেন্দ্রনাথকে কলহ নিবারণে মধ্যস্থ হইবার অনুরোধ জানায়। নৃপেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন দার্জ্জিলিংএ। সে অনুরোধ উপেক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মধ্যস্থতায় কলহ মিটিয়া যায়। বালক ও যুবজনের স্বাস্থ্যোন্নতির পরিকল্পনাতেই নৃপেন্দ্রনাথের ক্রীড়ানুষ্ঠানাদির সহিত সহযোগিতা। কলিকাতার এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় "সরস্বতী

ইন্‌ষ্টিটিউট'-এ তিনি এককালীন দশ সহস্র টাকা দান করেন ছাত্রদের খেলার মাঠ ও সাজসরঞ্জামের জন্য। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেশসংগঠনের অন্যতম কার্য্য। এ বিষয়ে নৃপেন্দ্রনাথের উদারতা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবার। ক্রীড়কোপযোগী মনোবৃত্তি নৃপেন্দ্রনাথের ছিল পূর্ণমাত্রায়। আইন ব্যবসায়েও এ মনোবৃত্তি তাঁহার প্রকাশ পাইয়াছে পদে পদে। দশ বৎসর প্র্যাক্‌টিস করিতে না করিতে হাইকোর্টের জজিয়তী করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হ'ন। অনুরোধ রক্ষা করা কিন্তু সম্ভবপর হয় নাই, কারণ পিতা স্বর্গত হইলেও, তাঁহার আশা-স্বপ্ন সত্যে পরিণত করিতে তখনও তিনি পারেন নাই। মুন্সেফীর পরিবর্ত্তে জজিয়তীতে পিতৃ-আত্মা সন্তোষলাভ করিবে না। হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল হইবার পরে ল' মেম্বর হইবার জন্য যখন তাঁহার ডাক পড়ে, তখন পূর্ব্ব প্রতিবন্ধক আর ছিল না। অর্থোপার্জ্জনের দিক হইতে তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান ব্যারিষ্টার হয় নাই বলিয়াই সকলের প্রতীতি। পিতৃ-স্বপ্ন সত্যে পরিণত যখন হইল তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, তখন দেশমাতৃকার আহ্বান জ্ঞানেই ল' মেম্বরের পদ তিনি গ্রহণ করিলেন। কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতি করিয়া যে তিনি ল' মেম্বর হ'ন তাহা সহজ অঙ্কপাতেই অনুমিত হয়। আপন স্বার্থ তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন জনগণের স্বার্থরক্ষার সুবর্ণসুযোগ পাইয়া। ইহার পূর্ব্বে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে নৃপেন্দ্রনাথের তেজোময় অভিভাষণ এবং 'কমিউন্যাল এওয়ার্ড' ভারতের স্কন্ধে চাপাইবার মূল উদ্দেশ্য-বিশ্লেষণ এবং সেই সম্পর্কে ষ্টেট সেক্রেটারী স্যামুয়েল হোর-এর তাঁহার হস্তে ভীষণ নিগ্রহভোগ ব্রিটিশ এবং ভারত দুই গভর্ণমেণ্টকেই বিশেষ ভাবিত করিয়া তুলে। নৃপেন্দ্রনাথের নিজ ব্যয়ে বিলাতে এওয়ার্ডের বিপক্ষে প্রচার কার্য্য, সাক্ষ্য সংগ্রহ, ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জিকে টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতা হইতে লণ্ডনে লইয়া যাওয়া, বি, সি, চ্যাটার্জ্জি স্থাপিত হিন্দুসভার সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করা প্রভৃতির কথা কর্তৃপক্ষের জানিতে বাকি থাকে নাই। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী, নির্ভীক, দেশ-স্বার্থ রক্ষায় একাগ্র বঙ্গজননীর এই বীরপুত্রের হুঙ্কারে কম্পান্বিত স্বরে স্যার স্যামুয়েল বলিয়া ফেলেন, 'আমরা কি করিব, বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারতীয়ের সুপারিসে আমরা এ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি'। নামের তালিকা শ্রবণে নৃপেন্দ্রনাথ মরমে মরিয়া যান। তিনি দেখিতে পান হিন্দুই হিন্দুর বিপক্ষাচারী। 'দেশদ্রোহী' নৃপেন্দ্রনাথ ইহাতে না হাসিয়া পারেন নাই। পরে গভর্ণমেণ্টের ডাক আসিলে কর্ত্তব্য তাঁহার স্থির হইয়া যায়। ল' মেম্বর তিনি হওয়াতে কাণাঘুষা হয় যে, 'বড় পদ দিয়া নৃপেন্দ্রনাথের দফা রফা করিল।' নৃপেন্দ্রনাথ ইহাতে ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন—দেশের তাৎকালিন অবস্থা হেতু দেশসেবা করিতে ওই উচ্চ পদ গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর তাঁহার না থাকায়। অর্থ ও লোকবল তাঁহার অল্প ছিল না। ইচ্ছা করিলে বড় একটা দল গড়িয়া জোর দলাদলি তিনিও করিতে পারিতেন—দেশ-সেবার নামে বিরাট্ স্বার্থ-সেবা চলিতে পারিত অপ্রতিহতভাবে। যে ধাতুতে নৃপেন্দ্রনাথ গড়া তাহাতে তাঁহার সে কার্য্য করা কল্পনার অতীত। অবস্থাচক্রে যতটুকু সম্ভব জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে উচ্চ রাজপদ গ্রহণই শ্রেয়ঃ তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পান। সুখের বিষয়, নৃপেন্দ্রনাথ তাঁহার কার্য্যকাল গৌরবমণ্ডিত করিতে সমর্থ হন। একদিকে গভর্ণমেণ্ট, অন্য দিকে বে-সরকারী সঙ্ঘ তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তটস্থ থাকিয়াছে। নৃপেন্দ্রনাথের এই নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠায় দেশবাসী চমৎকৃত হইয়াছে—নমস্তে নৃপেন্দ্রনাথ!

পাণ্ডিত্যে গগনস্পর্শী, বুদ্ধিতে ক্ষুরধার, রঙ্গ-কৌতুকে সদা হাস্যময়, সততায় দেবতুল্য এবং স্পষ্টবাদিতায় কুলিশসদৃশ নৃপেন্দ্রনাথের তুলনা এযুগে পাওয়া খুবই বিরল। তাঁহার অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতার জন্য হাইকোর্টের জজ, কাউন্সিলের সদস্য এবং স্বয়ং বড়লাট কি সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁরাই অনুভব করিয়াছেন। উচ্চ শির তাঁহার চির উচ্চই থাকিয়াছে সর্ব্বথা ও সর্ব্বতোভাবে। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পরেও ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে তাঁহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা কম হয় নাই, কিন্তু তাহাতে যোগদান করিতে তিনি সম্মত হন নাই। অন্য দিকে দেশের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের

তাঁহাকে দলভুক্ত করিবার বহু আয়াসও সিদ্ধ হয় নাই। আসলে দলাদলি করিতে নৃপেন্দ্রনাথ শিখেন নাই কখনও।

অবসরকাল নৃপেন্দ্রনাথের ব্যয়িত হয় অধিকাংশভাবে পাঠাধ্যয়নে ও ধর্ম্মানুশীলনে। দূরদূরান্তরে সস্ত্রীক তীর্থ-যাত্রার আনন্দ উপভোগ তিনি করিয়াছেন পূর্ণমাত্রায়। স্বগৃহেও ভাগবদাদি পাঠ শ্রবণের বিরাম থাকে নাই। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর পূজারীরূপে তাঁর পরিণত স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছে। 'হিন্দুস্থান' নূতনরূপে দেখা দিলে অঞ্জলী প্রদত্ত হইল প্রাণ ভরিয়া হৃদয়েরই। কিন্তু আরও চাই, আরও চাই! আলো—আরও আলো! কর্ম্ম ও ধর্ম্মবীরের আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না। যোগী কূটস্থ হইলেন। কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না। দিব্যলোকে আকাঙ্ক্ষিতের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন। জীবনের জয়যাত্রার এমন মহিমাময় সমাপ্তি সত্যই গৌরবের। তাঁর বিদেহী আত্মাকে পরম শ্রদ্ধায় আজ নমস্কার করি। নমস্তে নৃপেন্দ্রনাথ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্মারক

জন্ম—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ (কলিকাতায়)

পিতা—নগেন্দ্রনাথ সরকার (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট)।

পিতামহ—প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার।

শিক্ষালাভ—মেট্রপলিটন ইন্‌স্‌টিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, রিপন কলেজ, লিন্‌কন্‌স্ ইন্ (লণ্ডন)।

শিক্ষায় কৃতিত্ব—সসম্মানে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৯) চৌদ্দ বৎসর বয়সে। বি·এ'তে ডবল অনার্স—গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে (১৮৯৪)। এম-এ'তে রসায়ন শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থানাধিকার। সসম্মানে বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৯৭)। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার (১৯০৭)।

ওকালতী—ভাগলপুরে ১৮৯৭ হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত।

মুন্সেফী—১৯০২-এর কতকাংশ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত।

লণ্ডন-যাত্রা—১৯০৫ (ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিতে)।

ব্যারিষ্টারি—১৯০৭ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত।

এ্যাডভোকেট জেনারেল—১৯২৯।

'নাইট্' উপাধি লাভ—১৯৩১।

দ্বিতীয় বার বিলাত-যাত্রা—১৯৩২। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (লণ্ডনে) এবং ভারতীয় শাসন সংস্কার সংক্রান্ত যুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটিতে ভারতের বিশিষ্ট সদস্যরূপে 'কমিউনাল এওয়ার্ডের' প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতাকরণ এবং ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্ স্যামুয়েল হোরকে জেরায় জেরায় জেরবারকরণ এবং ভারতে সাম্প্রদায়িকতা প্রচলনের অভিপ্রায় ও নীতির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ ও অসারতা প্রমাণ।

ল' মেম্বর—১৯৩৪

কে-সি-এস্-আই উপাধি প্রাপ্তি—১৯৩৬

ল' মেম্বরী হইতে অবসর গ্রহণ—১৯৩৯।

হিন্দুকোডের বিরোধিতা—১৯৪৩ হইতে।

পত্রিকা প্রকাশ—উচ্চাঙ্গের ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' (১৯৪৪)।

খেলাধূলার সম্পর্কে—বিভিন্ন সময়ে বেঙ্গল জিম্‌খানা ও ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের সভাপতি-নির্ব্বাচিত।

ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ—১৯৪০ সালে প্যারী প্রেসে মুদ্রিত।

পুত্র—রমেন্দ্র (ব্যারিষ্টার), বীরেন্দ্র (চিত্রা প্রভৃতি সিনেমা হাউসের এবং নিউ থিয়েটার্সের মালিক), নীরেন্দ্র (অভ্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত), ধীরেন্দ্র ('অলকা'র সম্পাদক), রবীন্দ্র, শচীন্দ্র, হীরেন্দ্র, অমরেন্দ্র (বিভিন্ন আপিসের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত)।

মৃত্যু—৬৯ বয়সে, কলিকাতায়। ১২ই আগষ্ট রবিবার, বেলা ১১৷০ টায়, ১৯৪৫।

নৃপেন্দ্রনাথ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মৃত্যুর পশ্চাতে যেথা অমৃতের গান
অনন্তকালের পথে নিতি শুনা যায়,
যেথায় প্রদীপ্ত রহে আত্ম-অবদান
সেথা তব কীর্ত্তি রবে উজ্জ্বল প্রভায়

সাময়িকী

সুভাষচন্দ্র :

২৩শে আগষ্ট জাপানের নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, "অস্থায়ী 'আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্টের' প্রধান কর্ত্তা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে বিমানযোগে টোকিও যাইবার কালে পথিমধ্যে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে ১৮ই আগষ্ট মধ্য রাত্রে হাসপাতালে প্রাণ-ত্যাগ করেন।" এ মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ সুভাষচন্দ্রের স্বদেশবাসী যেন বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিজয়ী বিদেশী শাসকের চোখে যিনি যুদ্ধাপরাধী, তাঁর কর্ম্মপন্থার ভিন্নতা সত্ত্বেও, তিনি জাতীয় স্বাধীনতাসাধনার ও ত্যাগ-তপস্যার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে এ দেশের হৃদয়মন্দিরে চিরসম্পূজ্য। পণ্ডিত জহরলালজী পরাধীন দেশবাসীর এই রুদ্ধ মর্ম্মবাণী নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যে ব্যক্ত করায় দেশবাসী তবুও খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছে।

পরলোকে সরলা দেবী চৌধুরাণী :

গত ১৮ই আগষ্ট শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নি স্বর্ণকুমারী দেবীর তিনি কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতা জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সুপরিচিত। পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজনেতা রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সহিত ১৯০৫ সালে তাঁর বিবাহ হয়। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত দীপক চৌধুরী তাঁহার একমাত্র পুত্র। কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি সমাজসংস্কারে শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবীর বিচিত্র ও বহুমুখী দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জাগরণের অগ্রগামিনী হিসাবে যে মুষ্টিমেয় মহিলার নাম উল্লেখযোগ্য সরলা দেবী তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার ব্যাপক ও সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের পরিচয় বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পণ্ডিত সীতানাথ তর্কভূষণ :

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় গত ১৯শে আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৯০ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত নীতিবান, সংযতেন্দ্রিয় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে ও প্রচারে তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ব্রাহ্ম আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তির তিনি শেষ স্তম্ভ ছিলেন বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি ও বাংলাভাষায় তাঁহার রচিত বহু দার্শনিক গ্রন্থ শুধু এ দেশের নয়, সমগ্র জগতের চিন্তাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

প্রবর্ত্তক কমার্শিয়াল কর্‌পোরেশন লিঃ

এই কোম্পানীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত মতিলাল রায়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে কোম্পানীর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গত ২৫শে আগষ্ট ৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ রেজিষ্টার্ড অফিসে হইয়া গিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টস্ প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের পক্ষে ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কোম্পানীর যে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন, তাহাতে দেখা যায় যে. যুদ্ধ-সঙ্কটের মধ্যেও কোম্পানীর কার্য্য ক্রমোন্নতির পথেই চলিয়াছে এবং শতকরা ৮৲ টাকা আয়করমুক্ত লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীযুত মতিলাল রায় (সভাপতি), শ্রীযুত সুকুমার মিত্র, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত ইন্দুভূষণ রায় ও শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ডিরেক্টর পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হন এবং মেসার্স এ, চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত হন।

পরমহংস নিগমানন্দজীর জন্মোৎসব :

গত ৬ই ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে রাজহাট (হুগলী) নিগমানন্দ সারস্বত সঙ্ঘে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব নৈষ্ঠিক, পূতআবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা-হোম, গীতা-ভাগবত স্বাধ্যায় হয় এবং পরদিন পরিতোষ-সহকারে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়।

কবি-সাহিত্যিকের সম্মান :

উত্তর বঙ্গের প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুত কুলদাচরণ সরকার মহাশয় সম্প্রতি রঙ্গপুর 'সাহিত্য পরিষদ' কর্ত্তৃক 'সাহিত্যভারতী' ও 'কবিভূষণ' উপাধিভূষিত হইয়াছেন। এই অবহেলিত যোগ্য কবির যোগ্য সম্মানের জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং পরিষদের গুণগ্রাহী কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতেছি। কবি কুলদাচরণ প্রবর্ত্তকের পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। তাঁর 'অশ্রু' কাব্য গ্রন্থও পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত। দারিদ্র্যপীড়িত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও, কবি কুলদাচরণ কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় যে নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার সহিত তপস্যা করিয়া চলিয়াছেন তাহা এ যুগে বিরল।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শারদ-লক্ষ্মী

শিল্পী—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
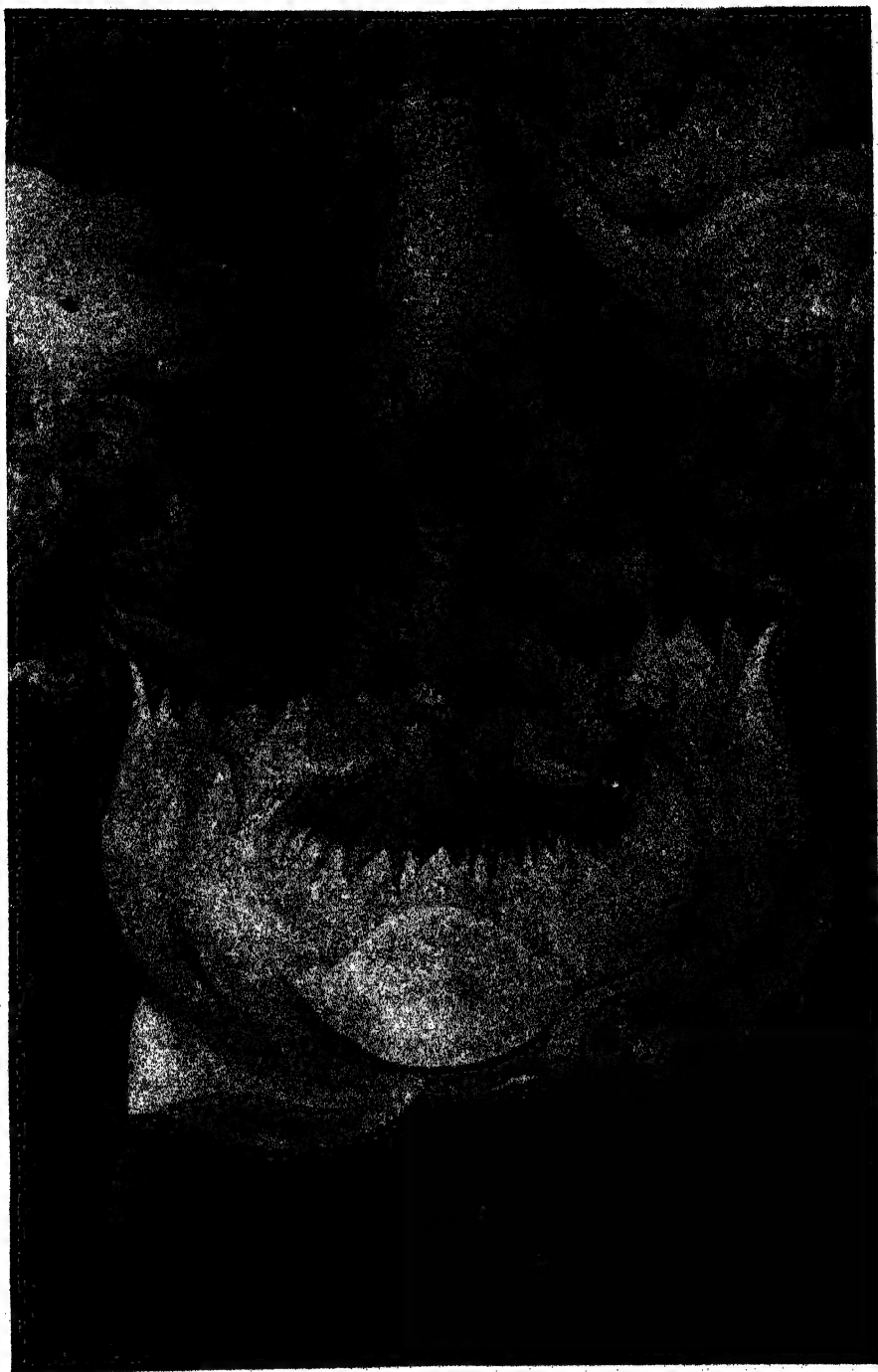
৩০শ বর্ষ
১৩৫২ বাং
ইং ১৯৪৫

আশ্বিন ঃ
(সেপ্টেম্বর)
১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আকাশ ধরে নাই। বর্ষায় রৌদ্রে কাঠ ফাটিয়াছে। শরতের বনে এবার তেমন করিয়া ফুল ফুটিল না। বর্ষার কুহেলিঘেরা বিটপিবল্লরী ভিজা গায়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্যাঁৎস্যাঁতে আর্দ্র বাতাসে মধুসৌরভ আঘ্রাণে তৃপ্তি নাই। নৈরাশ্যের ঘনিমায় নীলাকাশ সমাচ্ছন্ন। বিষণ্ণমর্ত্ত্যে আনন্দময়ী মায়ের আগমন মন যেন স্বীকার করিয়া লইতে চাহে না। বিপনিশ্রেণী শ্রীহীন। পূজার চাহিদা মিটাইতে কোন সাজসজ্জা নাই। নিরাভরণা প্রকৃতি—সুষমার নামগন্ধ নাই। কেমন করিয়া প্রত্যয় করি—শ্রী, সম্পদময়ী মহামাতার আবির্ভাবকাল আসন্ন।

শত-ছিন্ন মলিন বসন পরিহিতা রমণীর দল নদীপথে ভাঙ্গা কলসী কাঁখে চলিয়াছে বিষণ্ণমুখে; যৌবন আছে, সৌন্দর্য্য নাই। যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় চলিয়াছে সারি দিয়া জীবনের তাগিদে—স্বাস্থ্য নাই, পাণ্ডুর মুখশ্রী এমন উজ্জ্বল সন্ধ্যাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ব্যথায় দশদিক ভরিয়া যায়, মা আসিবেন সে ভরসা কেমন করিয়া করি!

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, সম্পদ নাই। প্রেতভূমি শ্মশান বাংলায় শারদ-জননীর নূপুর-নিক্কণ ভাল শুনাইবে কি? বাংলার এই দুর্দ্দশার দিনে, দীনের প্রাঙ্গণে ভগবতীর আমন্ত্রণ কেমন করিয়া করিব? তাই মনে হয়, বাংলার চিরপ্রসিদ্ধ শারদোৎসবের শুভ শঙ্খ এবার নীরব হইয়াই থাকুক। রমণীর কণ্ঠে হুলুধ্বনি উঠিবে না। গায়কের কণ্ঠ মুখরিত হইবে না। কবির লেখনী স্থির ও অচল হউক। শিল্পির তুলি বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবে না। স্তব্ধ অচল বাংলার প্রাণ, তবুও কি মায়ের আগমন প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইবে?

মাতৃপূজা বুঝি সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; তাই বার বার ঘট পাতিয়া মায়ের আবাহন-মন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যায়। পূজার বাদ্য তাই বেসুরা বাজে। নহবতের প্রভাতরাগিণী কর্কশ শুনায়। হিয়া নাই, বাঙ্গালীর অনুভবের শক্তি নাই। সে মেধা হারাইয়া বাংলার বর্ত্তমান কাঙ্গাল বেশ বড় মর্ম্মন্তুদ। মা আসিবেন এই দুর্দ্দশার দিনে বাংলার এই অসহায় মূর্ত্তি দেখিতে? মন্দির দ্বার রুদ্ধ হউক। পূজার বেদী শূন্য পড়িয়া রহিবে, মহাদেবীকে এবার বাঙ্গালী ডাকিয়া আনিবে না। বাঙ্গালীর অক্ষমতা ইহার জন্য দায়ী। অবস্থার ইহা নিষ্ঠুর পরিচয়।

নদীতড়াগের জলকল্লোল, স্থলপদ্ম কেন ফুটিয়াছে বনে, উদ্যানে? কেন মাঠের ধারে কাশকুসুমের ঢেউ উঠিয়াছে? কেন জ্যোৎস্নায় সুধাধারা ঝরে? পাপিয়ার কণ্ঠে চিত্ত চমকিয়া উঠে? নরকঙ্কালের মেলা বসিয়াছে বাংলায়। প্রকৃতির উপদ্রব বিদ্রূপের মত অঙ্গে বিষ বর্ষণ করে, জ্বলিয়া মরি যাতনায়—মা, তাই তোমায় এবার ডাকিয়া আনিতে চাহি না। তুমি থাক সর্ব্বেশ্বরীরূপে সাধকের হৃদয়-মন্দিরে অর্গলবদ্ধ হইয়া। দোর খুলিয়া সন্তানের দুঃখ

দেখিতে এ বছর আর দৃষ্টি দিও না মা! দৈন্যে, ব্যাধির পীড়নে মুমূর্ষু বাংলার নরনারী হতশ্রী হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাউক, তোমার কৃপাদৃষ্টিপাতে তাহাদের বিদগ্ধ জীবন আর অধিক দিন জিয়াইয়া রাখিও না।

কিন্তু কে শুনিবে এ কথা। পিতৃপক্ষের তর্পণ-মন্ত্র সমাপ্ত হইয়া মহালয়ার মহাতিথিতে ব্রাহ্মণের চক্ষে আগুণ জ্বলিল। মণ্ডপে মণ্ডপে চণ্ডীর আবাহন-গীত উঠিল মহা ঝঙ্কারে। জবার বনে আগুন ধরিল। ষষ্ঠীর বোধন রাতে শুভ্র জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত নরনারী ক্ষুধা ভুলিল, ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিল। লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই কটিতটে। আনন্দের শিহরণে দৈন্য ভুলিয়া ঘরে ঘরে আগমনীর শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল মহারোলে। সপ্তমী-প্রভাতে সিংহবাহিনীর ওষ্ঠপুটে মৃদু হাসি, নয়নে স্নেহের আগুন জ্বলে, মা মা বলিয়া বাঙ্গালী লুটিয়া পড়িল মায়ের চরণতলে।

পূজা বন্ধ হইল না। এ পূজা বন্ধ হইবার নহে। বুকভরা ব্যথা দূর হয় মায়ের কটাক্ষে। তাই কাতারে কাতারে বাঙালী মিলিত হইয়াছে মায়ের দেউলে—অঞ্জলি ভরিয়া সে লইয়াছে পূজার অর্ঘ্য। কি সান্ত্বনা চরণে তাঁহার তর্পণে? কি বুঝিবে পূজার মন্দিরে যে উপনীত হইতে পারিল না?

জাগো বাঙালী! মাথা তোল বাঙালী! দশপ্রহরণধারিণী, মহা জগদ্ধাত্রী তোমার জননী। জ্ঞানে, বিবেক-বৈরাগ্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ মহাদুর্গার মননে ও ধ্যানে। পারিবে কি বাঙালী ষষ্ঠীর বোধন বসাইয়া দেবীর চরণে তিনদিন সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দশমীর প্রভাতে দেবীর বরাভয় করস্পর্শে অভিনব জন্ম নিতে? সন্তানব্রতী হইয়া বাঙালীর জিলায় জিলায় মায়ের মন্ত্র-বিতরণ করিয়া নিরন্ন দুর্ব্বল বাঙালীকে নবদীক্ষা দিতে? মা তুমি এস। বড় অসহায় পঙ্গু তোমার সপ্তকোটী সন্তান, হে সন্তান-পালিনী মহামাতঃ! আমাদের নবজন্ম দাও। রূপ দাও। যশ দাও। শত্রুবিজয়ী কর। আজ মন্দিরে মন্দিরে তোমার প্রতিমার দিকে চাহিয়া শত সহস্র কণ্ঠে প্রণতি মন্ত্র উচ্চারণ হোক—

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

দেবীপক্ষ

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

বাদল-আকাশ ধুয়ে মুছে দিয়ে শরৎ এসেছে ভুবন ঘিরে,
বনে বনে আজ বিহগ-কাকলি, ঝরিছে শেফালি সোহাগে ধীরে…।
আগমনী-গানে মগ্না নহে যে বিধুরা-ধরণী বেপথু মানা,
অন্নহারার বিপুল বেদনে কাঁদিছে সকল আর্ত্তজনা।
ফেরে ক্ষুধাতুর দুয়ারে দুয়ারে, অন্নের লাগি ভিক্ষা মাগে
দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়ায় মৃত্যু নাচিছে তাদের আগে।
আশ্রয়হারা পথের ভিখারী সম্বল শুধু বৃক্ষতল,
জীবনের পুঁজি কিছু নাই আজ শুধু দুই কোঁটা নয়ন-জল!
এসেছে শরৎ সোনালী আলোয় কাহারো মুখেতে নাহিক হাসি,
দূর মাঠে আজি বেদনা বহিয়া বাজে রাখালের করুণ-বাঁশী।

ধ্বংসের তালে নাচিছে মৃত্যু সর্বহারার জীর্ণ দ্বারে,
আকাশ বাতাস হ'লো ভারাতুর আজিকে সবার ব্যথার ভারে।
এত যে দুঃখ, এত যে বেদনা, তবুও তাহারা সকল ভুলে,
দেবী দুর্গার চরণ-পদ্মে, অর্ঘ্য সাজায় গন্ধে, ফুলে।
মৃন্ময়ী যদি চিন্ময়ী হয় তাদের সবার করুণ ডাকে,
বিশ্ব-পূজিতা জননী জাগিলে, দুঃখ-বেদনা কভু কি থাকে?
ঐশ্বর্য্যের পূজা নহে আজি, বৃথা সমারোহে নাহিক' কাজ,
দানব-দলনী জননীরে পূজি', বৈভব কেন রহিবে আজ?
আকুতি-অর্ঘ্যে ভকতি প্রদানি' পূজিগো জননী হৃদয় খুলি',
সাজায়ে এনেছি দীন-আয়োজন, হাসিমুখে তাই লও মা তুলি।

কল্যাণময়ী, শারদলক্ষ্মী বাংলার বুকে এস গো দেবি!
ব্যথাতুর হিয়া বেদনা ভুলিয়া ধন্য হউক তোমারে সেবি।

ব্রহ্মময়ী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ভগবানের আদি কল্পনা ব্রহ্মরূপে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। সেই ব্রহ্মের আধারস্বরূপ সূর্য্য। সূর্য্যের আলোক দ্বারা যেন ব্রহ্মজ্ঞান বিচ্ছুরিত হয়। 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' (-কঠ, ২।৫।১৫)। সূর্য্যের প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে দুর্গার কল্পনা (-ব্রঃ সং)।

ব্রহ্মকে আমরা দেখিতে পাই না। আমরা বলি— জ্যোতিরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূ-ভূব-স্বরোঁ। জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া তাঁকে কল্পনা করি। সূর্য্যস্থ ঐশতেজোরূপে তাঁকে কল্পনা করি। 'আদিত্যান্তর্গতং বর্গো ভার্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।'

ব্রহ্মাই 'আদিত্য-হৃদয়।'

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি (গীতা)।

তিনিই-সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

কেহ বলিলেন—রামচন্দ্র রাত্রিকালে 'আদিত্য-হৃদয়' মন্ত্র উদ্‌যাপন করিলেন। তাহাতে সূর্য্য দর্শন করিলেন এবং অরাতি নিধনের শক্তি লাভ করিলেন—(বাল্মীকি রামায়ণ)। তমসাচ্ছন্ন রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্র বিভ্রান্ত। 'ততো যুদ্ধপরিশ্রান্তং সমা চিন্তয়া স্থিতম্।' ঋষির উপদেশে তিনি আদিত্য-হৃদয় মন্ত্র অপধ্যান করিলেন।

অন্য কেহ বলিলেন—রামচন্দ্র 'অকাল বোধন' করিলেন। দেবগণের নিদ্রাকাল (দক্ষিণায়ন) আশ্বিন মাসে তিনি দেবীর 'বোধন' করিলেন। বোধন অর্থে জাগ্রত করা। নিদ্রিতা (আত্ম) শক্তিকে জাগ্রত করিলেন—কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিলেন। ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইল। মোহ নাশ হইল—অরাতি নাশ হইল (পুরাণ)। সুতরাং—

'অকালে ব্রহ্মণা বোধঃ' দ্বারা যে দেবতার পূজা বুঝায়, 'আদিত্য-হৃদয়' মন্ত্রোদ্‌যাপনের দ্বারা সেই দেবতারই পূজা বুঝাইতেছে।

সূর্য্যের শক্তিকে আমরা মূর্ত্তি দিলাম। মানবীমূর্ত্তি দিলাম। মূর্ত্তি না দিলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। দুর্গাদেবীর কাল্পনিক রূপ আমাদের ধারণা মত গড়িয়াছি। বাণী, লক্ষ্মী, আদি সেনাপতি, আদি শাস্ত্রীকে তাঁর সন্তান-রূপে একত্রে পূজার বেদীতে বসাইয়াছি। সেখানে পশুরাজকেও পূজা করিতেছি। অসুররাজকেও পূজা করিতেছি। বাঃ…বাঃ। আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। প্রশ্ন জাগে—কেন…কেন এরূপ করিলাম? কেন —বিদ্যা-অবিদ্যা-পশু-পাখি-সাপ-মূষিক-শত্রু-শত্রুনাশিনী— 'সব এক সঙ্গে?' মন উত্তরে বলে—ইহাই মায়িক জগতের সম্পূর্ণ ছবি। ইহাই কল্পিতে অকল্পিতের আরোপ —ভারতীয় সাধনায় গুরু-মন্ত্র-প্রতিমায় যাহার অনুবাদ।

ইনিই মহামমায়া…ব্রহ্মময়ী।

এই মায়িক জগতের সব কিছু ব্রহ্মস্বরূপ— সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। —রামচন্দ্রকর্ত্তৃক সূর্য্যপূজা বা দেবীপূজা একই বস্তু। বিভিন্নরূপে কল্পনা মাত্র।

—সবই কল্পনা। ভগবানকে ব্রহ্ম বলাও কল্পনা, মহামায়া দুর্গা বলাও কল্পনা। ভগবানকে কেহ দেখে নাই। কেহ জানে না। তিনি চির বিস্ময়ের বস্তু। অথচ আমরা তাঁর রূপ দিই—

> রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল-গুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ। তদবিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।
>
> (মহর্ষি বেদব্যাস)

হে রূপবিবর্জ্জিত, অখিল গুরু, সর্ব্বব্যাপী। আমরা বহুরূপে তোমার কল্পনা করি। আমাদের এই দোষ তুমি ক্ষমা কর।

ভারতীয় সংস্কৃতি

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার

আণবিক বোমার আবিষ্কারে পাশ্চাত্য সভ্যতা আর এক উচ্চতর ধাপে আত্মপ্রকাশ করল। বিজ্ঞানের শক্তিকে অপব্যবহার করে' সভ্যতার গতি এমনি দ্রুতবেগে চলেছে যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি কোথায় নিয়ে যাবে, তা ভাবতেও ক্লেশ হয়। মানুষকে এই যান্ত্রিক-সভ্যতা পিষ্ট করছে, পুষ্ট করছে না—আপাততঃ যাকে পুষ্টি বলে মনে হয়, তাও সত্যিকার পুষ্টি নয়। মানুষের নিম্ন সত্তার শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তাকে ক্রমশঃ তার তেজোময় স্বচ্ছ দৃষ্টি হতে অবতরণ করিয়ে তমিস্রার গভীর গহনে প্রবেশ করাচ্ছে। সেটা এত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে যে, সন্দেহের এতটুকু আর অবকাশ নেই। মানুষ যেন ক্রমশঃ তার চেতনায় দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ প্রকাশ হতে স্তিমিত অবচেতনে নেমে প্রাণশক্তির উদ্দাম ও কুটিল শক্তিতে ধাবিত হচ্ছে। আণবিক বোমা প্রস্তুতপ্রণালীর মধ্যে অণুর তনুত্যাগের ভেতর যত কিছু গোপন তথ্যই থাকুক না কেন, এর ভেতর যে প্রেরণা আছে তার উৎপত্তি তমসাচ্ছন্ন অন্তরে; গতি এর ধ্বংসের পথে। বিজ্ঞানের এই কুজ্ঝটিকাময় গতিতে সমস্ত সভ্যতা এক ভয়াবহ পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হচ্ছে—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যতই কেন শক্তিব্যূহের নিয়ন্ত্রণ, নিরোধ করবার কল্পনা করুন না কেন। পাশ্চাত্য শক্তি বুদ্ধির কৌশলদীপ্ত হলেও, বুদ্ধির দিব্য দীপ্তি তাতে নেই। পাশ্চাত্য তার শক্তিতে স্ফীত ও গৌরবান্বিত; কিন্তু মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে, বিশেষতঃ ইউরোপে, যে জ্ঞান-দীপ্তি স্ফুরিত হয়েছিল, তা' আজ বিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকাময় আলোকে আবৃত। বিজ্ঞানের শক্তির অপব্যবহারে পাশ্চাত্য শুধু আত্ম-বিনাশেই উদ্যত নয়, সমস্ত সভ্যতাকে বিপথগামী করছে। মানুষের অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল মানুষের উচ্চতর বৃত্তি ও নীতিকে উদ্বোধিত না করে' কি ভাবে মানুষকে বিরাট অসংযমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা সত্যিকার বিস্ময়ের বিষয়। শক্তির অপব্যবহারে কেহ সুখী হয়নি, হতে পারে না। যার প্রভূত শক্তি, তার সম্পদও যেমন, বিপদও তেমনি। বানচাল হলে শক্তিই শক্তিমানকে নষ্ট করে দেয়, ক্ষমতা ধ্বংস করে।

আজ সকল জাতির সঙ্গে সকলের সংস্পর্শ। তাই সব দেশের ভাবধারার সর্ব্বত্র গতি। শক্তিমান জাতির দিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়ে এবং যাদের বুঝবার বা বিশ্লেষণ করবার শক্তির অভাব আছে, তারা চমৎকারিত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য সমৃদ্ধমান ও শক্তিমান বলেই আজ পাশ্চাত্যের সভ্যতাও এসিয়া তথা ভারতবর্ষের অন্তর-প্রাণকে' মুগ্ধ করছে। ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে দেখলাম—সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়যাত্রা। স্থূল ভোগের আনন্দে প্রায় সকলেই লিপ্ত। বিস্ময়ের বিষয়, এই স্থূল ভোগ ও তার বৈচিত্র্য-বৃদ্ধির এরূপ উৎকট প্রচেষ্টা দেখে মনে হয়, যেন এ ভিন্ন আর কোন কিছু সূক্ষ্ম আনন্দ ও ভোগ আছে কিনা তাও কেউ আজ ভাবতে পারছে না—দু'চারজন এর ব্যতিক্রম থাকলেও সমষ্টি যেভাবে আপাতঃ রমণীয়ের দিকে আকৃষ্ট ও লিপ্ত, তাতে মনে হয়, ভারতের সংস্কৃতি ও তার সুর আমাদের অন্তরে বিশুদ্ধ ভাব উদ্দীপ্ত করছে না। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির কোন মূল্য আছে কিনা তাও যেন ভাবনার বিষয় হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষ যেন তার স্বধর্ম্ম বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না ভারতীয় জীবন দু' টানে চলছে—এক বাহিরের টান, সেখানে সে পায় বর্ত্তমান সভ্যতার ভোগের প্রাচুর্য্য (যা' তার দারিদ্র্যই বাড়িয়ে দেয়) ও অন্তরের টান যা' ফল্গুধারার ন্যায় স্তিমিত) তাকে কখনও তার নিজ সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সূক্ষ্ম রূপ আছে, যা বিক্ষিপ্ত চিত্তে প্রতিভাত হয় না, এবং যাকে ফিল্মের ছবির মত লোকচক্ষুর গোচর করা যায় না। আজ এই সূক্ষ্ম রূপটা স্তিমিত, তার কারণ অনেকের ভেতরই ভারতীয় সাধনার অভাব এবং বাইরের সভ্যতার উদ্দাম গতি অন্তরের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত যা' কিছু শুভ্র সংস্কার তার উপর প্রলেপ টানছে। তাই ভারতের অন্তরজীবনও যেন শুষ্ক হয়ে পড়ছে। কোন সভ্যতা পরানুকরণে বেঁচে থাকতে পারে না। ভারতের একটা নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি আছে। তার

পরাভব হয়নি, হতে পারে না। কারণ এমনতর বস্তু তাতে আছে যা অব্যয় এবং যার অনুভব হতে পারে না গভীর অন্তরানুপ্রবেশ ভিন্ন। দুঃখের বিষয়, চাকচিক্যের আকর্ষণে সকলেই আমরা বাইরের দিকে তাকাচ্ছি। অন্তরানুপ্রবেশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। স্থূল আনন্দ চরিতার্থ করতে গিয়ে বুদ্ধি স্থূল প্রাণের উপরে উঠ্‌তে পারছে না। যা' কিছু আনন্দে আমরা বেঁচে আছি, তা শরীর ও প্রাণের অধস্তন স্তরের।

আজ সত্যিকারের সংঘর্ষ কৃষ্টিগত। এই সংঘর্ষে বেঁচে থাকতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও মুখ্য সংবেগ বুঝে নিতে হবে, নতুবা বাইরের প্রাচুর্য্যের আকর্ষণে ও ভোগের লিপ্সায় সত্য দৃষ্টি হতে আমরা চ্যুত হব। আজ পাশ্চাত্যে ধর্ম্ম ও নীতি পরাভূত, সভ্যতা অর্থ ও সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতই আমরা বিশ্বমানবের, সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার কথা শুনি না, কিন্তু একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সত্যই প্রতীত হবে আসলে স্বাধীনতা (জাতির বা ব্যক্তির) বৃদ্ধি হয়নি। প্রজাতন্ত্রের ব্যাখ্যা উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞাপিত হলেও, সত্য হচ্ছে এই যে, কতগুলি ধনিক-সমষ্টিশক্তিশালী পুরুষ সভ্যতাকে নিয়ে ক্রীড়া করছে (জৈবপ্রবৃত্তি সন্তুষ্ট করাই যেন সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়েছে)। অনেক সুখ-সুবিধার বৃদ্ধি সত্ত্বেও, আমাদের আত্মবিকাশের পথে কত না বাধা পড়েছে। ভোগের এত বিচিত্র উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যে, মানুষ আর কিছু ভাবতে পারছে না। অধিকতম ব্যক্তির অধিকতর সুখ, এই হচ্ছে এ সভ্যতার প্রধান কথা। এর জন্যই সাম্রাজ্যবাদ। এই নিয়েই জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ কখনও নির্ব্বাপিত হবে না, মানুষের মন যদি উর্দ্ধস্তরে আরোহণ না করতে পারে, যদি শক্তির সূক্ষ্ম ও শোভনতর বিকাশের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু ভারত তার ধর্ম্মগত ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য এ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছে। কারণ, লক্ষ্য তার চিরন্তন সত্যের দিকে। ভারতবর্ষ যে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি, তার কারণ ভারতবর্ষের প্রধানতম শিক্ষা—জীব-ব্রহ্ম-অভেদ—জীবনে সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হয়নি। জীবনের বিকাশে তার স্বীকৃতির অবহেলা করেই দুর্ব্বলতাকে আহ্বান করা হয়েছে। পরিপূর্ণ ধর্ম্মকে স্বীকার করলে জাতির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী এবং সে ধর্ম্ম প্রত্যেকের অভ্যুদয়ের পথ উন্মুক্ত রেখে বিশ্ব-কল্যাণের দিকে নিজকে নিয়োজিত করে। বিশ্ব-কল্যাণের দৃষ্টি ভারতবর্ষ হারায়নি, কিন্তু রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। ভেবে দেখতে হবে, যাকে আজ রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য বলা হয়, ভারতবর্ষ ঠিক সেরূপ রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যবাদ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ। ভারতবর্ষ স্বাতন্ত্র্য চায় ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের জন্য, ভোগের প্রাচুর্য্যের জন্য নয়। তার জীবন ও সত্তা ধর্ম্মকে রক্ষা করতে চায়, কারণ তার ভেতর দিয়ে সে পায় সেই মৈত্রী যা' বিশ্বকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করতে পারে, মানুষকে কল্যাণদৃষ্টিসম্পন্ন করতে পারে। আজিকার বহু বিঘোষিত প্রজাতন্ত্রের ভেতর এই বিশ্বমৈত্রী সৃষ্টির চেতনা সম্যক্ বিকশিত নয়। কারণ বিশ্বপ্রাণের ছন্দবোধ সেখানে পরিস্ফুট নয়। এই বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বমানবতার কাছে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ম্লান—কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের ভেতর আছে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি—নেই বিশ্ব-মানবের হিত ও কল্যাণের কথা। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞানস্পৃহা যেখানে ম্লান সেখানে জনহিতের কথা স্ফুট হতে পারে না।

ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই ভোগ পরাস্বাপহরণ করে না, বরং বৃহত্তর জীবনের সেবা করে। কিন্তু সেই সেবা হবে খাঁটি—এতটুকু বেশী নেবার যুক্তি তাতে থাকবে না বরং নিজের শক্তির দ্বারা সমাজকে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যজ্ঞাবশেষই হোতা গ্রহণ করে থাকেন—নতুবা অপরাধ হয়।

এখানেই বিজ্ঞানের শক্তির সাথে ধর্ম্মের শক্তির ভেদ। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-শক্তির দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের বিপুল ভোগের পথ আবিষ্কার করছে, এবং মানুষের অনেক সুখ সুবিধার পথ উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ তার স্বমহিমাকে এখনও বুঝতে পারেনি—প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ প্রকৃতির অধীনতা হতে মুক্ত হতে পারেনি, বরং নিজ প্রকৃতির স্থূল রূপের

ও শক্তির মধ্যেই তার শাশ্বত স্বরূপ-সৃষ্টির বাধা পড়েছে। বিজ্ঞান মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ ও অহংবোধকে করেছে স্ফীত, আর তার ভেতর এমন গভীর দৃষ্টি এখনও সুস্পষ্ট নয়, যাতে মানুষ তার অহংকারকে অতিক্রম করে' চিরন্তন সত্যের দৃষ্টি যা' বাহিরে ও অন্তরে স্ফুট—তাকে লাভ করে' কৃতার্থ হতে পারে। বিজ্ঞান মানুষের ভোগকে বাড়িয়ে মানুষকে সেখানেই বদ্ধ করেছে, সত্যিকার মুক্তির কোন সংবাদ দেয়নি। মানুষের মুক্তির জন্য আবশ্যক আছে যে স্বর্গীয় উন্মাদনা (divine inspiration), যে কল্পনার দিব্য শক্তি ও দিব্য স্পন্দন, তাও বিজ্ঞানে ধরা পড়েনি। বিজ্ঞান তার নিজস্ব জগতে এক অপূর্ব্বতার সন্ধান দিলেও, মানুষের ব্যবহারে মানুষকে সে শক্তির ক্রীড়নক করেছে, তার ভেতর কোন দিব্য রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং মানুষকে অধিক শক্তিশালী করে' মানুষের বিনাশের পথই উন্মুক্ত করেছে। বিজ্ঞানের সাধনা শক্তিরই সাধনা, অধিভূত ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন; তার উর্দ্ধে তার স্থান নেই। ধর্ম্মের সাধনাও শক্তি-সাধনা, কিরূপে শক্তির গতিকে সংহত ও সংযত করে' আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পরিণতি সম্ভব হয়—সেই পথের সন্ধান দিয়েছে ধর্ম্ম। শক্তি এখানে প্রকৃতিকে পরাভূত করে' তাকে দিব্য ও রমণীয় বিকাশে পূর্ণ করে' তোলে। মানুষের অন্তর দিব্য স্পন্দনে আলোড়িত হয়ে সূক্ষ্ম শক্তিতে পূর্ণ হয়। অন্তরের রূঢ়তা দূরীভূত করে' প্রেম, জ্ঞান, যোগৈশ্বর্য্যের পথ মুক্ত করে। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় মানুষ প্রকৃতিকে পরাভব করতে পারে, এবং প্রকৃতির অন্তরের দিব্য শক্তির প্রকাশ করতে পারে। ভারতবর্ষে শক্তিবাদ জড়ের তমিস্রা উদ্ভিন্ন করে' শক্তির শাশ্বত দীপ্তি, প্রসারতা ও শিবময় স্থিতির পরিচয় দিয়েছে। শক্তির প্রকৃত সত্যিকার রূপ দেখেছে ভারতবর্ষ, যে রূপ ভোগের বৃত্তিকে প্রশমিত করে' পেতে হয়, যা' দিব্যজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় করিয়ে দেয়। শক্তি-সাধনায় ভারতবর্ষ কখনই পরাঙ্মুখ নয়; কিন্তু প্রকৃতিরূপঞ্চ ইত্যাদি বিভূতিতেও ভারতের সাধনা তৃপ্তি লাভ করেনি। তার দৃষ্টি প্রকৃতির পরা বা দিব্য ঐশ্বর্য্যকেও অতিক্রম করে' প্রকৃতিস্পর্শরহিত আনন্দহীন সত্যের নিত্যানন্দের [illegible] নিবদ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের অখণ্ড জীবনের সাধনা আজ ম্লান, তাই দেখি জ্ঞানী লোকেরাও ভারতীয় সাধনার সহিত পরিচিত হ'লেও, তার গভীর গহনে প্রবিষ্ট হয়ে তার প্রকৃত রূপ উদ্ধার করতে পারেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার এমনি মোহ যে, কৃতী ও অভিজ্ঞ পুরুষেরাও ভারতীয় সাধনায় পুষ্ট ও বলিষ্ঠ লোকদের ভাষা ও ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ নন। কিন্তু ভারতের এই অভয় জীবনের সাধনা এমনি বিকশে প্রতিষ্ঠা করে যে, সাধকমাত্রই তার প্রাপ্তিতে বিস্মিত হয়; অভাবনীয়, অসম্পর্কীয় গভীরতায় উজ্জ্বল সত্যের মহিমায় সে স্তব্ধ হয়। এ স্তব্ধতা মূঢ়তা নয়—এ জ্ঞানের মৌন প্রতিষ্ঠা।

বস্তুতঃ মানুষের মন এমনি হয়েছে যে, কোন উচ্চ ও গভীর আস্পৃহায় মানুষ আকৃষ্ট নয় অর্থাৎ এই জ্ঞান-প্রতিষ্ঠার পথে যে কত কল্যাণ-ছন্দের পরিচয় মেলে তা আমরা যেন ভাবতেও পারি না। এমন একটা আচ্ছন্ন ভাব আমাদের মন বুদ্ধিকে আবৃত করে' রেখেছে যে, আমরা সত্যের বরণীয় মহিমাও বুঝতে অক্ষম। হতে পারে পরম সত্যারোহণের পথ সুকঠিন; কিন্তু কঠিন বলেই ত মানুষের তা পরম বা কষ্টসাধ্য। অভিব্যক্তি মার্গে মানুষ তার মানবত্বকে অতিক্রম করতে বাধ্য; কারণ মানুষের অন্তঃসত্তার ভেতর আছে এক মহনীয় সত্তা, যেখানে মানুষ পায় তার দিব্য প্রতিভা ও দিব্য শক্তি—তাই প্রকৃতির রমণীয় পুষ্টি ও শক্তিতে মানুষ তৃপ্ত না হয়ে আরও বরণীয় সত্যের দিকে ধাবিত হয়; সেখানে সে পায় পরামুক্তি। মুক্তির সংবাদ ভারতের পরম সংবাদ, এ কথা আজ বিশেষ করে' ভাববার বস্তু হয়েছে—সমাজে এর দীপ্তি আজ আচ্ছন্ন। এ কিন্তু বিনাশ নয়, পরন্তু পরম ব্যাপ্ত ও পরম স্থিতি। এ ভূমিকায় প্রাণ বিশ্বপ্রাণে, মন বিশ্বমনে, বিজ্ঞান বিশ্ব-বিজ্ঞানে লয় হয়। এরূপ ভূমিকার পরেও ভূমিকা আছে। কিন্তু আরোহক্রমে এখানে উঠতে মানুষ ব্রহ্মলোকের ঋতময় স্পন্দনে ধৃত হয়; এবং অন্তের ভেতর এই ধৃতি ও স্পন্দন উদ্বোধিত করে।

কথা উঠতে পারে জাতীয় জীবনে এত সূক্ষ্ম তত্ত্বের স্থান কোথায়? বরং এর চেয়ে ব্যবহারিক জীবনের সুখের নানা পথ উন্মুক্ত করাই ত ভাল। খুব সত্যি কথা,

কিন্তু বিবেচ্য বিষয় এই, শক্তি সৃজনের যত পথ উন্মুক্ত করুক না কেন, তার গভীর ছন্দে অনুপ্রবেশ করতে না পারলে কি ব্যক্তি, কি জাতি কেহই পরমা ধৃতি লাভ করতে পারবে না। শক্তিমাত্রই কাম্য নয়, শক্তিকে সংস্কৃত করে তার রমণীয় উদ্বোধনই কাম্য। মানুষের মধ্যে এমনি একটি পার্থিব আকর্ষণ আছে যে, মানুষ কেন্দ্র হতে চ্যুত হতে চায় না, অথচ এই আকর্ষণই অন্যদিকে মানুষকে উচ্চতর বিকাশ হতে পরাঙ্মুখ করে' পার্থিব সুখ ও ভোগেতে মুগ্ধ করে' রেখেছে। মানুষ চায় বাঁচতে, কিন্তু কিসের জন্য? শুধু পার্থিব ভোগের জন্য নিশ্চয় নয়, পরন্তু তার সুপ্ত শক্তি ও সত্তাকে জাগ্রত করবার জন্য। জৈবধর্ম্মে তার চরম তৃপ্তি নেই। তার অনাবিল ভাস্বর সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তার একমাত্র প্রয়োজন। অন্য প্রয়োজন গৌণ।

এই গৌণ প্রয়োজনের মূল্য বড় বেশী হয়েছে আজিকার দিনে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সাময়িক চমকপ্রদ শক্তি ও সমৃদ্ধি। এখানেই প্রাচী ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় দ্বন্দ্ব। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞান শক্তিকে অবলম্বন করে' স্ফীত; এই শক্তিটীর নিয়ন্ত্রণ আরও উচ্চতর শক্তির দ্বারা না হলে কিরূপ ফল হয়, তা আজ সুবিদিত। শৃঙ্খলা ও শান্তি অধ্যাত্মে যতটা স্ফুট, আধিভৌতিকে ততটা স্ফুট নয়। বিজ্ঞান শক্তি দিতে পারে, শৃঙ্খলা ও শান্তি দেওয়া তার কাজ নয়। শান্তির পথে শক্তির অরূপ রূপের পরিচয়, কিন্তু শক্তির ঊর্দ্ধগ আকর্ষণ এমনি যে কোন প্রাপ্তিই তাকে বদ্ধ করতে পারে না, অথচ তার অবস্থাকে উন্নীত করতে পারে। পরম শক্তিমান কী লৌকিক, কী অলৌকিক জগতে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করতে পারে।

আর এক কথা; অধ্যাত্ম শক্তি স্ফুরণ ব্যতীত জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তার স্বাভাবিক দৈন্য তাকে কখনও পরিত্যাগ করে না যদি অধ্যাত্ম ছন্দে শক্তি জাগ্রত না হয়। সভ্যতার রক্ষায় যদি ছন্দের যতিপাত হয়, তবে তাকে ঠিক সভ্যতা বলা যায় না। এজন্য হিন্দু মনীষা বরাবর সমাজ ও সভ্যতার ছন্দ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে—কতদূর পেরেছে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু দৃষ্টি যে মহনীয় তাতে সন্দেহ নেই; প্রতিষ্ঠা পূর্ণ যে হয়নি, তার কারণ বিশ্বছন্দের স্থূলে ও সূক্ষ্মে আমরা উদ্বোধিত হতে পারি নি। এই বিরাট ছন্দে জাগ্রত হওয়াই হিন্দুর সাধনা। আমাদের সংস্কৃতি এই ছন্দের বাণী বহন করেই এনেছে। অধ্যাত্ম-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই ছন্দকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রতি স্তরে—ছন্দের কত শক্তি তা ছন্দ-অপ্রতিষ্ঠ জীবনে কখনও মূর্ত্ত বা অনুভূত হয় না। জীবনের দিব্য ছন্দ কল্যাণ-শক্তিকে আকর্ষণ করে' জাতির শিবময় স্বরূপকে জাগিয়ে তুলতে পারে। আজ বিশ্বে এই নিরাময় ছন্দই অত্যাবশ্যক হয়েছে। ভারতীয়ের পক্ষেই একে জীবনে মূর্ত্ত করে বিশ্বের সম্মুখে ধরার সম্ভাবনা আছে।

নির্ম্মল মন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চাই নিষ্পাপ পবিত্র মন আমি,
রাজ্যের চেয়ে বহুগুণ তাহা দামী।
গোলকুণ্ডার শ্রেষ্ঠ হীরার খনি
তাহার নিকট মোহাং তুচ্ছ গণি।

কোন জন্মেই তুল্য তাহার মন—
বদরী কেদার কাশী কি বৃন্দাবন।
কিছু নাই যাহা তার চেয়ে ভালবাসি,
শ্রীভগবানের সে যেন মুখের হাসি।

সে যেন তাঁহার শ্রীকরের পরশন,
যুগের যুগের অক্ষয় মহাধন।
দেব দেবী সব ঘুরে ফেরে তার পাশে,
মুক্তি মোক্ষ যাচিয়া সেখানে আসে।
অষ্টসিদ্ধি দাঁড়াইয়া থাকে দোরে
ভগবান যেন দেখা দিয়াছেন মোরে।

"পুরুষের বোঝা"

প্রবোধকুমার সান্যাল

মেয়েরা নাকি পুরুষের জীবনে দুঃখের বোঝা; তারা অভিশাপ এনেছে, বিপদ এনেছে। আমি নারী-বিদ্বেষী নই যে, এই কথায় সায় দেবো; পুরুষবিদ্বেষী নই যে, ছেলেদের বিরুদ্ধে মেয়েদের উত্তেজিত ক'রে তুলবো। তবু এক কথায় এর মীমাংসা সহজ নয়।

আমার দিদিমা বলতেন, পথে নারী বিবর্জিতা। অর্থাৎ পুরুষের পথ বিচিত্র, মেয়েদের সেখানে ঠাঁই নেই। পুরুষ যুদ্ধ করে, হিমালয় অভিযান করে, বনে গিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় জাহাজডুবি হয়ে, আবার পৃথিবী জয় করতে বেরিয়ে পড়ে,—সুতরাং সেই সব পথে নারী বিবর্জিতা। মেয়েদের শক্তির ওপর শ্রদ্ধা অনেক মেয়ের কম,—দিদিমারা নাৎনীদের আদর করতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন না। আমরা বলি, পুরুষ যত বড় বীরই হোক, নারীর গর্ভেই ত' তা'র জন্ম। অর্থাৎ কোথাও একটা গুপ্ত শক্তি আছে মেয়েদের—যেথান থেকে উঠে আসে আগুন আর ঝড়, উঠে আসে প্রাণের অফুরন্ত বন্যা। এককালে পুরুষরা ভবঘুরে ছিল, মেয়েরা দু'হাতে কাঁকন প'রে হাতছানি দিয়ে তাদের ঘরে ডেকে নিল। পুরুষকে দিয়ে তা'রা ঘর বাঁধার কাজ করিয়ে নিল, সন্তানের মা হয়ে উঠলো, আবার কাব্যে শিল্পে পুরুষকে দিয়ে নিজেদের স্তুতিবাদ লিখিয়ে নিল। পুরুষ নিজেদের মনে করে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, মেয়েরা পুরুষকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে করে না।

দিদিমা বলতেন, মেয়ে মাত্রই ডাকিনী আর ডাইনী! মাথায় একরাশি রেশমের মতন নরম নধর চুল, চোখের কোণে সর্বনাশিনী মায়া, গায়ের মাংস মখমলের মতন পেলব—আর পা দু'খানিতে পুরুষের জীবন-মরণ সমর্পণের বাসনা! সুতরাং দিদিমা বলতেন, ডাকিনী! ডাইনী! ডাইনীরা যখন হাসে, পুরুষ মনে করে, কী মধুর স্বপ্ন! দিদিমা বলতেন, তোদের বোকামি দেখেই ওরা অমনি ক'রে হাসে। ওদের হাসি মানেই তোদের সর্বনাশ। আমি যে এসব কথা দিদিমার বকলমে নিজেই বলছি তা নয়,—এই দিদিমাই আবার উপকথা আর রূপকথায় আসর মাতিয়ে তুলতেন। রাজপুত্র বনজঙ্গল, বাঘভালুক, পাহাড়পর্ব্বত আর সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে চলেছে রাজকন্যাকে জয় করতে। অর্থাৎ মেয়ের মতন মেয়ে যদি হয় তবে রাজপুত্র তা'র জন্য প্রাণ দিতেই রাজি।

মেয়ের মতন মেয়ে মানে কী? দিদিমা বলতেন, পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্। তিনি বলতেন, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, সাবিত্রী ইত্যাদির কথা। অর্থাৎ যারা কেবলমাত্র সতীত্বনীতির ক্রীতদাসী নয়, যারা পুরুষের পক্ষে বোঝাস্বরূপ নয়, যারা ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমহিমায় মহীয়সী—তারা। মেয়ের মতন মেয়ে, যারা পুরুষের পাশে চলে—পিছনে চলে না। যারা সব কাজে পুরুষের মন্ত্রী, যারা পুরুষের প্রতিভাকে বাতাস দিয়ে জ্বালিয়ে তোলে, যারা পুরুষকে দুর্গমের দিকে উৎসাহিত করে—তাদের নাম শক্তি।

এধারে একটা ছবি তুলে ধরা যাক্। বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি ট্রেনে। সঙ্গে মেয়েছেলে। সব গাড়ীতেই ভীড়, অনেকবার ওঠানামা, সঙ্গে অনেক মালপত্র। নিজেকে সামলাবো, না মালপত্র, না মেয়েছেলে? ভীড়ের মধ্যে পুঁটলী হারাচ্ছে, ঘোমটা দেওয়া মেয়েছেলে ছিটকে যাচ্ছে, কুলীদের নিয়ে কচকচি—এখন উপায়? ওদিকে গাড়ী বুঝি ছেড়েই দেয়। এদিকে পশ্চিমারা মারামারি বাধিয়েছে। তখন মেয়েছেলেদের নিয়ে কী বিপদ! অমনি দিদিমার কথাটাই মনে পড়ে—পথে নারী বিবর্জিতা! ধরা যাক্—যুদ্ধে যাবো, না গেলেই নয়—দেশরক্ষার কাজে আমাকে নামতে হবে। এমন সময় মাতাঠাকুরাণী কান্না জুড়িলেন, বউ এসে কাছা টেনে ধরলো, ঠাকুরমা দিদিমা, মামীমা, পিসিমা—কপাল চাপড়াতে লাগলেন। যুদ্ধে যাওয়া কেমন করে হবে? দেখা যায়, মেয়েরা সব কাজই করিয়ে নিচ্ছে পুরুষকে দিয়ে। তারা ফরমাস করছে, নতুন ডিজাইনের শাড়ী তৈরী ক'রে দাও, ঠোঁটের রং কিনে দাও,

পায়ের নূপুর গড়িয়ে দাও, যত পারো তত দাও। পুরুষ কেবলই ছুটছে মেয়েদের ফরমাস নিয়ে। সমস্ত দেবার পরেও পুরুষের রেহাই নেই। মেয়েরা বলে, এবার আমাদের পাদ্য-অর্ঘ্য দাও, মধুর সম্ভাষণে কবিতা লেখো আমাদের নিয়ে। পুরুষ বলে, তথাস্তু দেবী! এই কারণেই, পুরুষ যত বড় বর্ব্বরই হোক না কেন, মেয়েদের কাছে তারা বিনয়নম্র।

পুরুষ ঘর বানিয়ে দেয়, কিন্তু ঘর পছন্দ না হ'লে মেয়েরাই সেই ঘর ভাঙে। দিদিমা বলতেন, ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটায় মেয়েরাই। বিয়ের আগে সবাই থাকে এক, বিয়ের পরে ভাই ভাই তফাৎ। দুই বন্ধুতে খুব ভাব, মাঝখানে মেয়ে এসে দাঁড়ালো—অমনি বন্ধু বিচ্ছেদ। অনেক রাজবংশ নির্ম্মূল হয়ে গেছে, অনেক রাজ্য ছারখার হয়েছে—তা'র গোড়ায় নাকি মেয়ে। দিদিমা বলতেন, "মরবে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই!" সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়—এই তিন শক্তি মেয়েদের মধ্যে আছে, তাই ওদের নাম দেওয়া হয়েছে দেবী। ওদেশে মেয়েদের কেউ দেবী বলে না, বলে, এন্‌জেল্—অর্থাৎ অপ্সরী! আমরা শ্রদ্ধায় বলি দেবী, ওরা বাসনার রঙে রাঙিয়ে বলে, অপ্সরী!

আর একটি ছবি মনে করো। একটি তরুণ যুবক সবেমাত্র মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তার চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তার মনে কত উচ্চাভিলাষ, প্রাণে কত দুরাশা। সে বড় হবে, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করবে, মানুষের মতন মানুষ হবে। ঠিক এমনি সময় হয়ত তা'র ঠাকুমা আদরের নাতিটির বিয়ে দিলেন। বছর না ঘুরতেই একটি ছেলে হোলো, এবং নিশ্বাস না ফেলতেই আর একটি কন্যালাভ করলো। গরীবের ছেলে, সুতরাং উপার্জ্জনের কথাটা আগে। সেখানে ঠাকুমা দিদিমা কেউ নেই। ছেলেটি তখন সদাগরী আফিসে চাকরি নেয় পঞ্চাশ টাকায়। দুটি সন্তান, স্ত্রী, নিজে এবং যদি থাকে মা কিম্বা ঠাকুমা,—কলকাতার বাসাভাড়া; তাছাড়া ডাক্তারবদ্যি, হাতখরচ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোথায় সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ, কোথা বা সেই উচ্চাভিলাষ? যুবকটি ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস হারায়, ভালবাসায় ফাঁকি বুঝে নেয়, মেয়েদেরকে মনে করে দুর্দ্দশার বোঝা। তার দোষ দিতে পারিনে। এর ওপর যদি আবার স্ত্রী ঝগড়াটে হয়, অবাধ্য হয়, কিম্বা কথায় কথায় তর্ক বাধায় তবে তো সোনায় সোহাগা! অনেক ছেলে মনে করে, তারা মস্ত বড় কিছু একটা হতে পারতো, কিন্তু মেয়েরা হোলো তাদের পথের বাধা। অনেক পুরুষ বৃদ্ধ বয়সে খিটখিটে হয়, মেয়েদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়—তারা মনে করে মেয়েছেলের সঙ্গে গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুকেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। তাদের প্রাণ থেকে সব রস নিংড়ে নিয়ে মেয়েরা তাদের আখের ছিবড়ের মতন জঞ্জালে ফেলে দিয়েছে।

আসল কথা, পুরুষের হাত থেকে মেয়েরা যদি কিছু কাজ কেড়ে নেয় তবে মন্দ কি? এই যুগে সেই মেয়ের আদর, যার মস্তিষ্কটা পুরুষের। পুরুষরা অনেক কাল ধ'রে মেহনত করেছে, এখন তারা একটু ক্লান্ত। মেয়েরা তাদের কাজ কতকটা লাঘব করুক না কেন? যেটা জড় আর অচল, সেইটিই বোঝা—মেয়েরা যদি একটু সজীব হয়ে নড়াচড়া করে, যদি কতকটা নিজের পায়ে দাঁড়ায়, যদি স্বতন্ত্র একটা মতামত গ'ড়ে তোলে, পুরুষ কতকটা স্বস্তি পেতে পারে।

তিরিশ বছর আগে প্রশ্ন করেছিলুম, আচ্ছা দিদিমা, বিয়ে করে মেয়ে, না ছেলে? দিদিমা বললেন, মেয়ে। প্রশ্ন করলুম, কিন্তু বর এলো যে বিয়ে করতে? দিদিমা বললেন, এইবার মেয়েটা ওর হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

কিন্তু মেয়ে ছাড়া পুরুষকে আমরা বলি লক্ষ্মীছাড়া,—আর যে মেয়ের জীবনে পুরুষের ছোঁয়াচ নেই, তাকে আমরা বলি প্রেতিনী। দুটি আলাদা থাকলে সৃষ্টি রসাতল, দুটো এক হ'লে তবেই সব রক্ষে।*

---

* 'রেডিয়ো'র সৌজন্যে।

উৎস

সরলা দেবী চৌধুরাণী

একটা লেখা চাই? চাওয়া সহজ, দেওয়া কঠিন কোন কোন সময়ে। যে মানুষটা লিখবে, বিশ্বের মাঝে যার মনটা সেজে এসে দাঁড়াবে—সে অনেক সময় উধাও হয়ে যায়, বিশ্বে তাকে খুঁজেই পাইনে। আজ তার খোঁজ করতে গিয়ে ধরে ফেল্লুম, সে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মত সৃষ্টিশতদলের নালে নালে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করে বেড়াচ্ছে তার মূল কোথায়। কোন উৎস থেকে সে উৎসারিত হয়েছে ঠাউরে-ঠাউরে খুঁজে খুঁজে তারই ধারে গিয়ে দাঁড়াবার পাগলামিতে সে ভরপুর হয়েছে। পঞ্চপ্রাণ-বায়ু তার ভিতর উনপঞ্চাশে খান খান হয়ে তাকে ঝড়ের আগে ধূলিকণার মত একটা বিশেষ দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এই ঘূর্ণীর আবেগের ভিতর সাধ্য কি তার বিশ্বের দিকে চোখ মেলে। অন্ধ হয়ে যাবে যে। তার নয়নতারায় এখন বিশ্বের আলো ধরা দিচ্ছে না। তার রূপের আকাঙ্ক্ষা 'জ্যোতিষাং জ্যোতি'র প্রতি ছুটেছে—

যস্তভাষা ভাসয়তে ইদং সর্ব্বং।

যে অনন্ত আকাশে অনন্ত বিশ্বের প্রসবিতা—কোটি কোটি গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য-মণ্ডল যার থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, যে সকলকে বিধৃত করে রেখেছে, যার থেকে দিকে-দিকে নভে-নভে কালে-কালে যুগে-যুগে প্রাণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, জীবন প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে, সেই বিশ্বজননী, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা, আমার মা, তোমার মা—সকলের মার বিশ্বদ্ধ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলানর জন্য প্রাণ আমার আকুলিত আজ। যে আমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমার হৃদয়ও আজ তাতেই সন্নিবিষ্ট। তারই ধ্যানে মন আজ বিভোর। সুতরাং ক্ষমা চাই তোমাদের কাছে। আজ বিশ্ববৃক্ষ থেকে তোমাদের হাতে কোন সুন্দর ফল পেড়ে দেবার শক্তি নেই, আজ সেই সুন্দর হতেও সুন্দরতম বিশ্ববীজ আমার চিত্ত অধিকার করে বসে আছেন। নমো নমঃ।*

*স্বর্গত সরলা দেবী চৌধুরাণীর এই অপ্রকাশিত রচনাটি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রঃ সঃ

মরূদ্যান

শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

সুদীর্ঘ দিন লেক্চার শুনিয়া মরা চিরিয়া ডাক্তারী পাশ করিয়া যে চাকরিটি সর্ব্বপ্রথম পাইলাম বোকার মত তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিলাম। ডাক্তারী পড়িবার পূর্ব্বে এবং সময়ে মনের মধ্যে কতই না আশা করিয়াছিলাম যে, আমি কী-ই না একটা হইব। কিন্তু তাহা আর হইল না। সামান্য বেতনে অতি সামান্য একটি ইউনিয়ন্ বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের পদের লোভ সামলাইতে পারিলাম না। সামলাইতে পারিলে, নিশ্চয়ই আমি অনেক উন্নতি করিতে পারিতাম।

এতদিন ছাত্র ছিলাম, পেশাদার ডাক্তার কেমন হয় জানি না। তাই যখন আমার প্রথম চাকরীর আসনে বসিবার আদেশ আসিল, তখন সত্যই এই 'ডাক্তার' কথাটি নিয়মিত আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। কেমন ভাবে মানুষের সহিত ব্যবহার করিব, রোগীদিগকে কেমন ভাবে দেখিব, কেমন কাজ করিলে সুনাম কিনিব, এই সব চিন্তা আমাকে সত্যই ব্যস্ত করিল। কাহারও নিকট পরামর্শ লইবার মত ইহা নয়, পরামর্শ চাহিলে লোকে হাসিবে।

তবুও চাকরী লইলাম। নূতন চাকরীতে যাইলে সকলেই আমার মত থাকে। একদিন আমি নিশ্চয়ই 'ডাক্তার' হইয়া উঠিব। মনকে এই বাক্যে প্রবোধ দিলাম।

কিন্তু আবার আসিল অন্তরায়। চাকরী সহরে নয়, বহুদূরে এক অজ্ঞাত পল্লীতে। ইতিপূর্ব্বে সেখানে কোন ডাক্তার বা দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল না—আমিই প্রথম। নিরক্ষর পল্লীবাসী, অচেনা স্থান, অপরিচিত মানুষ—সব কয়টা মিলিয়া আমাকে আবার ভাবাইল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেরা বলিলেন, নূতন নূতন ওই রকম ভাবনা

হয় বটে, কিন্তু দু'চারদিন কাটিলে সব ঠিক হইয়া যায়। পল্লীর নিরক্ষর মানুষ নাকি সহরের শিক্ষিত মানুষ অপেক্ষা ভদ্র এবং মিশুক।

শেষ পর্য্যন্ত আত্মীয়স্বজনের কথা বিশ্বাস করিলাম এবং বাহির হইলাম।

কিন্তু একী? মানুষ থাকিবে এখানে? গভীর অরণ্যের মত জঙ্গল, বিউগলের শব্দের মত মশার ডাক, মৌমাছির চাকের মত মশার ঝাঁক, স্যাঁৎসেঁতে ঘর, ভিজে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, এর মাঝে থাকিব আমি? দু'দিনে আমাকে দেখিবার জন্যই যে ডাক্তার আনিতে হইবে!

পরদিনই বোর্ডের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম।

লিখিয়া ফেলিয়াছি, এমন সময় বৃদ্ধ চৌকিদার মহেশ তরফদার (ইনিই আমার সব—কম্পাউণ্ডার হইতে সুরু করিয়া দ্বারোয়ান, রাঁধুনী, খানসামা, ধোপা পর্য্যন্ত) আসিয়া শুধাইল কী লিখছো বাবু?

—চিঠি!

—কোথায়? দেশে বুঝি?

—না, বোর্ডে। আমি এখান থেকে বদলি হতে চাই।

বিস্মিত মহেশ একটু হাসিল এবং হাসিয়া হাসিয়াই বলিল, আস্‌তে-না-আস্‌তে বদ্‌লি? শুনবে কেন?

—না শোনে চাকরী ছেড়ে দেবো। তা বলে এরকম জায়গায় আমি থাকতে পারবো না।

—আমরা আছি কী করে'? বাইশ বছরে চৌকিদার হয়েছি, আজ আমার বয়স ছাপ্পান্ন। কত দারোগা এলেন, গেলেন, কিন্তু মহেশ তরফদার ঠিক রয়ে গেল। ওসব ছেড়ে দেন বাবু, অনেক লেখালিখি করে' একটা ডাক্তারখানা যদিও বা হ'লো, তা আপনারা যদি এভাবে খায়ে ঠেলেন তাহ'লে তো আমরা শুধু মরবোই।

—তা আমি কী করবো? আমার জীবনটা তো আগে দেখতে হবে!

—ও কথা বল্‌বেন না বাবু। যে বিদ্যে শিখেছেন তাতে ও কথা আপনার মুখে মানায় না। দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলুন, আমাদের মুখের পানে তাকান।

মহেশের কথাগুলি আবার আমাকে ভাবাইল। যে বিদ্যা শিখিয়াছি তাহাতে নিজের জীবনের মূল্য অপেক্ষা পরের জীবনের মূল্য বেশী?

দরখাস্ত ছিঁড়িয়াই ফেলিলাম।

যে খামে দরখাস্ত ভরিবার ইচ্ছা ছিল, সেই খামে আত্মীয়ের কাছে পত্র দিলাম: আমি চাকরী লইয়াছি।

রহিয়া গেলাম।

থাকিবার ঘরের পাশেই দরমা-ঘেরা ডিসপেন্‌সারি। একটা ভাঙা টেবিলের সাম্‌নে একটি টুল পাতিয়া আমি বসিয়া থাকি, দলে দলে পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ আসে; হাত বাড়াইয়া দেয়, জিভ দেখায়, চোখ বাহির করে। নারীগুলি লজ্জায় মরিয়া যায়। রোগ তাহাদের সাথী হইয়া থাকুক, রোগে তাহারা মরুক, কিন্তু ডাক্তার কেন? অপরিচিত ওই লোকটি কেন তাহাদের হাত ধরিবে? কেন বলিবে, ঘোম্‌টা তোলো?

মহেশ ঢাক পিটিয়া পল্লীর পর পল্লীতে জানাইয়া আসে: আর ভয় নাই, ডাক্তার আসিয়াছে, রোগে আর কাহাকেও ভুগিতে হইবে না। বিনা পয়সায় মৃত্যুর হাত হইতে সকলেই রেহাই পাইবে।

প্রথমটা অনেকেই বিশ্বাস করে নাই। জ্বর হইলে যে ডাক্তারের প্রয়োজন, একথা এখানে কেহই স্বীকার করে না। হাত-পা ভাঙিলে, মাথা ফাটিলে তবেই না ডাক্তার ডাকিতে হয়! সামান্য জ্বরে ডাক্তার কী করিবে? মৃত্যু? ইহা তো ভগবানের দায়।

মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবে ডাক্তার? সকাল-সন্ধ্যায়, বাজারে-হাটে, ঘাটে-মাঠে সকলে বলাবলি করে আর অবিশ্বাসের হাসি হাসে। ডাক্তার কী ভগবান? ভগবান যাহাকে মারিবে, ডাক্তার তাহাকে বাঁচাইবে? ভগবান যাহা কপালে লিখিয়াছে তাহা রোধ করিবে ডাক্তার?

অবিশ্বাসের হাসির টুকরা ছিটকাইয়া আসে আমার কানে। মন ভাঙিয়া যায়। মহেশকে বলি, এবার যাই মহেশ!

—না। মহেশ বলে, একটু সহ্য করুন বাবু! অবোধ এরা, অবুঝ এরা—এদের বুঝতে সময় দেন বাবু!

সময় দিলাম। এবং অবশেষে একে একে আসিতে থাকিল। ঔষধ পাইয়া সারিতে থাকিল। বিশ্বাস আসিতে থাকিল।

তারপর রোগীর কামাই নাই।

যাহার কিছুও হয় নাই, সেও আসে। চোখ উঠা হইতে সুরু করিয়া টাইফয়েড পর্য্যন্ত সবাই আসে। মাথা টিপ্-টিপ্ করিলে, পেট ভুট্‌ভাট্ করিলে অভয় ডাক্তারের খানিকটা সিরাপ খাইলে তাহা সারিবেই সারিবে।

পল্লীর দক্ষিণ সীমানায় যে জাগ্রত শ্মশানকালী আছেন, সেখানে এতদিন বেশ জাঁকজমক করিয়া পূজা হইত, পূজারী বিশ্বম্ভর ঠাকুরের বেশ চলিয়া যাইত। মাদুলী আর চরণামৃত দিয়া তখন অনেক রোগীও নাকি সারিত।

বিশ্বম্ভর ঠাকুর একদিন মহেশকে ধরিল: মহেশ! আমি কী এবার ডাক্তারী শিখবো?

—কেন ঠাকুর? মহেশ বলিল, মা কালী তোমার কী হ'লো?

—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস্‌নে মহেশ, তোর অভয় ডাক্তারকে দু' একটা রোগী আমার হাতে দিতে বলিস্।

মহেশ বলিল, তোমার হাতে দেওয়া মানে তো···কথাটা সম্পূর্ণ না বলিয়া বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা বলবো'খন।

সবই শুনিলাম।

মানুষের জীবনের প্রতি এখন আমার দরদ হইয়াছে, নিজের জীবন হইতে তাহাদের জীবনের মূল্য যে অধিক তাহা বুঝিয়াছি, তাই তাহাদেরকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিব—এমন প্রবৃত্তি হইল না। বলিলাম, মহেশ, আমার কাছে যে আসবে, তাকে আমি প্রাণ দিয়ে সারিয়ে তুলবো। না পারি ছেড়ে দেবো, কিন্তু বিশ্বম্ভরের কাছে পাঠাতে পারবো না।

দিন কাটিতে থাকে।

বিশ্বের সব কিছু ভুলিয়া এই সব দরিদ্রের সেবায় লাগিয়া গিয়াছি। দরিদ্রকে কে কবে যেন 'নারায়ণ' বলিয়াছিলেন, কথাটি যে সত্য তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি।

রোজ সকাল ছয়টা হইতে সুরু করিয়া বেলা দেড়টা-দুইটা পর্য্যন্ত রোগী দেখিয়া শেষ করিতে পারি না।

আবার ইহারই মাঝে কাহারও কাহারও বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাইতে হয়। যদিও আমার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হিসাবে ইহা কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তবুও না গিয়াও পারি না। ইহাদের অকৃত্রিম ক্রন্দন, ইহাদের আন্তরিক আমন্ত্রণ, ইহাদের হৃদয়বিদারক হাহাকার উপেক্ষা করি—সত্যই এমন শক্তি আমার নাই।

দিন নাই, রাত্রি নাই চলিয়াছি।

কাহারও নিকট ভিজিট লই না। কিন্তু ভিজিটের পরিবর্ত্তে ইহারা যাহা দেয় তাহা মহেশ বহিয়া আনিতে পারে না। শাক সব্জী, কলা-মূলা, নারিকেল ইত্যাদি সে যে কত! আমি কিছুই লই না, মহেশ তাহা বহিয়া আনিয়া নিজে পেট পুরিয়া খায়।

নিজের টাকা দিয়া একটা সাইকেল কিনিয়াছি। সাইকেলের পিছনে ডাক্তারী ব্যাগটি বাঁধিয়া রোগী দেখিতে যাই।

আমার সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ সকলের নিকটেই পরিচিত। আওয়াজ পাইলেই সকলে ছুটিয়া আসে।

বাড়ীতে রোগী দেখিতে যাইলেই সাধারণতঃ স্ত্রী-লোককেই রোগী হিসাবে পাই। লজ্জায় ইহারা ঘরের বাহিরে আসে না, স্বামী-পুত্রের মুখ ছাড়া কোন পুরুষের মুখ দেখে না, জোরে কথা বলিলে ইহারা হাঁপায়। সম্প্রতি এই রকমের কয়েকটিকে লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

কেশব মণ্ডলের স্ত্রী ক্ষান্তমণি, কালু সেখের স্ত্রী নূর-জাহান, রাজেন নস্করের বিধবা ভগ্নী হৈমবতী, লালমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী বিনোদিনী এবং ভগবান দাসের একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা কুমারী পারুল।

কেশব মণ্ডলের স্ত্রীর জ্বর ম্যালেরিয়া—অনেক দিন ধরিয়া মুখ বুঁজিয়া ভুগিতেছে আর সংসারের কাজ করিতেছে। যখন আর পারিল না, তখন স্বামীকে বলিল, আর তারপর কেশব ছুটিল আমার নিকট। আসিয়া দেখিলাম, ক্ষান্তমণি ক্ষান্ত দিবার জন্য ব্যস্ত। কাপড়ের আড়াল হইতে যতটুকু অঙ্গ তাহার দেখিলাম তাহাতে তাহার শরীরে যে একবিন্দুও রক্ত আছে বিশ্বাস হইল না। তবে সারিয়া যাইবে।

কালু সেখের স্ত্রী নূরজাহান তো একেবারে শেষের দিকে। দেখিলাম, বোরখা চাপা দিয়া সে বিছানায় পড়িয়া আছে। বাঁচিবার তাহার কোন আশাই নাই।

রাজেন নস্করের বিধবা ভগ্নীকে দেখিলাম, নিউমোনিয়া হইয়াছে। বুকে পিঠে সর্দি বসিয়াছে, কিন্তু তবুও সে ব্যস্ত। দিব্য উদয়-অস্ত হাসিমুখে কাজ করিয়া যাইতেছে। বলিলাম, কাজ তোমার চল্‌বে না, বিছানায় শুতে হবে।

হৈমবতী হাসিয়া বলিল, এতখানি বয়স হ'লো ডাক্তার-বাবু, বিছানায় কখনো অসুখের জন্যে শুইনি। এখন আপনার কথায় শোবো? হুঃ!

কয়েকটি স্ত্রীলোক দরজার পাশ হইতে বলিয়া উঠিল, হৈমিটা কি বেহায়া লো! ডাক্তার না পরপুরুষ!

আমিও আমার কথার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিলাম। বলিলাম, অসুখটা খারাপ, যে ভাবে জল তুমি ঘাঁটছো তাতে আরো খারাপ হবে।

খারাপ হবে? বেহায়ার মতই হাসিল হৈমবতী: খারাপ হবে? হোক! ভালোয় আমার কাজ নেই ডাক্তার-বাবু! মিত্যুই আমি চাই!

রাজেন পাশে বসিয়াছিল।

হঠাৎ দরজার ওপাশ হইতে শুনিতে পাইলাম: ডাক্তারকে যেতে বল্ রাজু! হৈমি আমাদের মরুক-বাঁচুক, সে আমরা বুঝবো'খন। মরণ আর কি!

নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়াই আসিলাম: হৈমবতী মরিবেই।

লালমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি সাক্ষাৎ দেবী। অল্প বয়স, বোধহয় এখনও আঠারো হয় নাই, কিন্তু এমনই তাহার সৌন্দর্য্য, এমনই তাহার রূপ যে তাহাকে মা বলিতে ইচ্ছা করে। দেহের তাহার এমনই গড়ন যে 'মা' ছাড়া তাহাকে আর কিছুই ভাবা যায় না।

কিন্তু এখানেও সেই সন্দেহ। লালমোহন আর পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সেই কড়া পাহারা। বিনোদিনীর টাইফয়েড্ হইয়াছে! সামান্য একটুখানি অবগুণ্ঠন টানিয়া বিনোদিনী পাংশুদেহে বিছানার উপর পড়িয়াছিল, আমাকে দেখিয়া এতটুকু লজ্জা করিল না, অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া মুখখানি ঢাকিবারও কোন চেষ্টা করিল না।

বুদ্ধিমান লালমোহন অনেক কায়দা কানুন করিয়া বিনোদিনীর মাথার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে অবগুণ্ঠনটিকে এমনভাবে টানিয়া দিল যাহাতে বিনোদিনী কোনমতেই আমার মুখখানা না দেখিতে পায়।

লালমোহনকে বলিলাম, স্ত্রীর তোমার টাইফয়েড্, উপযুক্ত চিকিৎসা না হ'লে হারাতে হবে।

—মরে' যাবে? লালমোহন চমকাইয়া উঠিল।

—মরে' যাবো? বিনোদিনী অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল।

ভুল করিয়াছি, রোগিণীর সাম্‌নে আমার অমন মারাত্মক কথাটি উচ্চারণ করা কোনক্রমেই উচিত হয় নাই। ঢাকিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, না, না মরবে কেন? সেরে যাবে!

ঔষধ লইবার কথা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, অকস্মাৎ বিনোদিনী আমার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল: বাবা! আমাকে বাঁচিয়ে তোলো! আমি মরবো না—

সর্ব্বনাশ! রোগিণী এত কাঁদিলে এখনই হার্টফেল্ করিবে যে!

কিন্তু বিনোদিনী আমাকে কি বলিয়া ডাকিল? বাবা? আহা, কী মধুর! আবার বসিলাম, বিনোদিনীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলাম, আমি থাকতে তোমাকে কে ছিনিয়ে নেবে, মা?

কথা কয়টি বলিয়া নিজেই লজ্জিত হইলাম। কারণ কোন যুবতী নারীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেও, কেহ তাহাকে সৎভাবে গ্রহণ করিতে পারে না (বিশেষ করিয়া এখানে)—তারপর এমনই আমার বয়স!

প্রমাণ পাইতে দেরী হইল না। দরজার পাশ হইতে শুনিলাম: গলায় দড়ি দে! গলায় দড়ি দে! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! অত বড় মনিষ্যিটাকে বলা হ'লো কী না বা-বা! মরেছে!

গা জ্বলিয়া উঠিল। লালমোহনকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, স্ত্রীকে বাঁচাতে চান, না ছোট মন নিয়ে তাকে মারতে চান?

লালমোহন মাথা নীচু করিয়া রহিল, কথা বলিল না।

রাগ করিয়া একটি কথা পর্য্যন্ত না বলিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

ভগবান দাসের অবিবাহিতা কন্যা পারুলের কথা আর না বলিলেও চলে। পল্লীগ্রামে এত বড় মেয়ে কখনও

অবিবাহিতা থাকে না। পারুলের বয়স চৌদ্দ। গত বৎসরে তাহার টাইফয়েড্ হইয়াছিল। সহরে মাসির বাড়ীতে গিয়া সারিয়াছে; কিন্তু সেই কাল-অসুখে তাহার চুলগুলি গিয়াছিল। ভ্রমর কালো লম্ব-লম্বা চুলগুলি নাকি সেবার ডাক্তার নাপিত দিয়া কাটিয়া দিয়াছিল।

ভগবান অপরাধীর মত আমাকে বলিল, সেই জন্তেই বিয়েটা ওর হচ্ছে না।

আমার সে কথায় প্রয়োজন নাই। রোগিণীকে পরীক্ষা করিতে সুরু করিলাম। শুনিলাম, টাইফয়েডের পর হইতেই পারুল যাহা খায় হজম করিতে পারে না। এবং এক বৎসর যাবৎ পারুল এই রোগে মুখ বুজিয়া ভুগিতেছে।

বলিলাম, রোগ সারবে তবে টাকা খরচ হবে, পারবে?

ভগবান বলিয়া উঠিল, পারবো। জায়গা-জমি বিক্রী ক'রেও ওকে আমি বাঁচাবো।

খুসী হইলাম। মৃত্যুপথযাত্রিণী পারুল বোধহয় বাঁচিয়া যাইতে পারে।

এই কয়টি রোগিণীর জন্য সত্যই আমি চিন্তিত। মানুষকে অবহেলায় এমনি করিয়া মৃত্যুর দিকে আগাইয়া দেওয়ার এই যে রীতি—এ যে আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

রোগ যাহাদের হইয়াছে সকলেই বাঁচিতে চায়, পৃথিবীকে ছাড়িবার ইচ্ছা কাহারও নাই, তবুও ওই শাসকদের কী অধিকার আছে এইভাবে তাহাদের হত্যা করিবার?

মনটা খারাপ হইয়া গেল!

এতগুলি মানুষ এমনিভাবে মরিবে?

আমি থাকিতেও ইহারা অমন অসহায়ভাবে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? মানুষগুলি কী নীচ!

এমন সময় মহেশ আর একটা খবর আনিল, বিশ্বম্ভর ঠাকুর নাকি সারা পল্লীতে অভয় ডাক্তারের কুৎসা গাহিয়া বেড়াইতেছে! বিশ্বম্ভর বলিতেছে, ডাক্তারী নাকি আমার একটা অছিলা, আসলে আমি চরিত্রহীন। আমি লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নাকি মিছিমিছি ডাক্তারীর অভিনয় করি। ঘৃণায় আর লজ্জায় সারা শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ইহারা সব পারে। মানুষকে এমনি করিয়া মারিতে যাহারা পারে, তাহারা সব পারে। বসিয়া বসিয়া ভাবি: ইহাদের বাঁচাইবার কী কোন উপায় নাই?

আজ দুই দিন হইয়া গেল উহাদের কাহাকেও দেখিতে যাই নাই। কেহ আর ডাকিতেও আসে নাই। কয়েক-দিন বাদে একদিন ষ্টেশনের পাশ দিয়া সাইকেল চড়িয়া রোগী দেখিয়া ফিরিতেছি এমন সময় দেখি, লালমোহন গামছা জড়াইয়া একটি বোতলের মত কী লইয়া মাঠের পথ ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতেছে। নিজেই ডাকিলাম। কিন্তু চোখাচোখি হওয়ামাত্রই বোতলটি সে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

বলিলাম, ওতে কী লালমোহন?

—এতে? লালমোহন ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কিছু নয় ডাক্তারবাবু।

—তবু দেখিনা ওটা কী?

—দেখবেন? তা দেখুন। মানে এমন কিছু নয়—বিষ্ণুপুরের এক বোতল পাঁচন।

—পাঁচন! পাঁচন কি হবে লালমোহন?

বাড়ীতে খাওয়াবো। আমার মামাতো শালা সেদিন বাড়ীতে দেখতে এসেছিল, সেই বল্লে বিষ্টুপুরের পাঁচন খুব ভালো। তাই—

—তা টাইফয়েড্ সারে ওই পাঁচনে?

—আজ্ঞে হাঁ, যে কোন জ্বর···আচ্ছা নমস্কার!

লালমোহন আমাকে এড়াইয়া চলিয়া গেল।

পরের দিন ভগবান দাসের বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম, ভগবান মেয়েকে লইয়া সহরে তাহার মাসির বাড়ীতে গিয়াছে। এ ডাক্তার সম্বন্ধে সে যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে···

কেশব শুনিলাম, বিশ্বম্ভর ঠাকুরের পাঁচ টাকা মূল্যের মাদুলী স্ত্রীর গলায় ঝুলাইয়াছে।

কালু সেখ স্ত্রীকে রোজা দেখাইতেছে।

রাজেন নস্করের বিধবা ভগ্নী হৈমবতীর খবর পাই নাই।

দিন কাটিতে থাকে। ডিস্‌পেন্‌সারিতেই বেশীর ভাগ সময় রোগী দেখি। লোকের বাড়ীতে বড় একটা যাই না।

আজ এক বৎসর হইয়া গেল এখানে রহিয়াছি। নিরক্ষর পল্লীবাসীরা যেভাবে আমাকে গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা আমার কোনদিন হয় নাই।

মন ইহাদের সংকীর্ণ সত্য, শিক্ষা ইহাদের নাই সত্য, তবুও ইহাদের আমার ভালো লাগে এই জন্য যে, ইহারা সরল,—যাহা করে সোজাসুজিই করে। তাই শত অবহেলা, শত অনাদর উপেক্ষা করিয়াও ইহাদের ভালোবাসি। লোকমুখে প্রতিটি রোগীর সংবাদ খুঁজি।

নির্জ্জনে যখনই থাকি তখনই রোগীদের কথা ভাবি। কাহাকে কোন্ ঔষধ দিব, কে কবে পথ্য করিবে ইত্যাদি অনেক কিছু ভাবি। কিন্তু ইহাদেরই মাঝে আসিয়া পড়ে সেই মুখগুলি—বিনোদিনী, পারুল, নুরজাহান, হৈমবতী আর কেশবের স্ত্রী। ইহাদের নিকট আমি উপেক্ষিত, অপমানিত, অনাদৃত কিন্তু তবু ইহারা মরিবে ?

ঠিক করিলাম, উপেক্ষা, অনাদর, অপমানের কথা ভুলিব। তাছাড়া সেদিন বিনোদিনী সম্বন্ধে যে খবর পাইলাম, তাহাতে তো মনেই হয় না যে, সে আর বাঁচিবে। বিষ্টুপুরের পাঁচন খাইয়া সে নাকি শ্রীবিষ্টুর নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত। বিনোদিনী আমাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, না ?

থাকিতে পারিলাম না, সাইকেলে উঠিলাম।

এমন সময় আর একটি কাণ্ড ঘটিল।

বিশ্বম্ভর ঠাকুরের স্ত্রী অকস্মাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিয়া আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারির সামনে আছাড় খাইয়া পড়িল। জানা গেল, বিশ্বম্ভর মাদুলী আর চরণামৃত দিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুপথযাত্রী করিয়াছে। বিশ্বম্ভরকে লুকাইয়া সে আমাকে ডাকিতে আসিয়াছে।

বিশ্বম্ভর এই সময় সারা পল্লীতে আমার বিপক্ষে প্রচার চালাইতেছে, মিটিং করিয়া, চীৎকার করিয়া রাত্রি দিন সে খাটিতেছে। তাহাকে লুকাইয়া তাহার পুত্রকে···

বিশ্বম্ভরের স্ত্রী কিন্তু ছাড়িল না।

যাইলাম। দেখিলাম, ছেলেটি শুষিতেছে। গণ্ডা কয়েক মাদুলী গলায় লইয়া, কয়েকটি মাটীর পাত্রে চরণামৃত পাশে রাখিয়া সে মৃত্যুর তপস্যা করিতেছে।

নিজকে ভুলিয়া গেলাম। বিশ্বম্ভরের অনুপস্থিতিতেই একটি প্রয়োজনীয় ইন্‌জেকশাস তাহার পুত্রের অঙ্গে বিঁধিলাম।

আমি প্রতিদিন তাহার অনুপস্থিতিতে গিয়া ইন্‌জেক্‌শান্ এবং ঔষধ দিয়া আসি। ছেলেটি সারিয়া উঠিতেছে।

তারপর এখানেও সেই। বিশ্বম্ভর ঠাকুরের স্ত্রী একদিন বলিল, ছেলে আমার সেরে উঠেছে, আপনাকে আর না এলেও চল্‌বে। কারণ উনি যদি জানতে পারেন!

—কিন্তু ছেলে যে আপনার এখনও সম্পূর্ণ সারেনি!

—না সারুক। মার দয়ায় সেরে যাবে!

—ওর অম্বলশূলের ব্যথাটার কোনই চিকিৎসাই হয়নি।

—অম্বলশূলের একটা ভালো মাদুলী উনি জানেন।

ভালো! সরিয়াই আসিলাম।

ইতিমধ্যে বিনোদিনীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। একদিন 'মা' যাহাকে বলিয়াছিলাম সেদিন তাহাকে প্রতিমা দেখিয়াছিলাম, এবার দেখিলাম কাঠামো মাত্র। আমাকে দেখিয়া বিনোদিনী হু-হু করিয়া খানিকটা কাঁদিল মাত্র, কোন কথা বলিল না।

লালমোহনকে বুঝাইলাম। এমনভাবে হত্যা করিবার অধিকার তাহার নাই—তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম।

লালমোহন অনিচ্ছায় রাজি হইল।

চিকিৎসা করিতে সুরু করিলাম। সন্দেহের বিষ, অবহেলার বন্যা আর অপমানের তীব্র কষাঘাত পাইলাম, তবুও চিকিৎসা করিয়া চলিলাম।

বিনোদিনী আমার পা চাপিয়া বলে, আর জন্মে তুমি আমার বাবাই ছিলে!

মনে মনে ভাবি: উল্টা বোধ হয়! তোমার মত জননীর সন্তানই আমি ছিলাম।

বিনোদিনী বলে: সেরে উঠে তোমাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াবো, বাবা! আমার হাতের মোচার ঘণ্ট খেলে তুমি ভুলে যাবে!

হাসিয়া বলি: আচ্ছা!

হৈমবতী শুনিলাম, মরিয়া গেছে। বিধবা হৈমবতী সেদিন বলিয়াছিল না 'মৃত্যুই আমি চাই'? বোধহয় মৃত্যুই তাহাকে শান্তি দিয়াছে।

নুরজাহান এখনও সেইভাবে পড়িয়া আছে। দুনিয়ার রোজা আসিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া শুনিলাম, মারিবারই চেষ্টা করিতেছে।

পারুলের খবর শুনিলাম, মাসির বাড়ীতে সে গিয়াছে সত্য, কিন্তু ডাক্তার দেখাইতেছে না।

বিশ্বম্ভরের একমাত্র পুত্র নেপাল উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে সত্য, কিন্তু অম্লশূলের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কাটা ছাগলের মত ছটফট করে। বিশ্বম্ভর সারা গ্রামে বলিয়া বেড়াইতেছে, মৃতপ্রায় পুত্রটি তাহার সারিয়া উঠিয়াছে শুধু তাহারই মাদুলী আর চরণামৃতের জোরে।

কেশব মণ্ডলের স্ত্রী ক্ষান্তমণিকে সেদিন দেখিলাম, বাঁশের খাটে করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। সিঁথির মাঝে এক রাশ সিন্দুর লেপিয়া দুই পায়ে আলতা ভরাইয়া ক্ষান্তমণি চলিয়াছে। বিশ্বম্ভরের মাদুলী আর চরণামৃত তাহাকে এই উপকারটুকু করিল।

বিশ্বম্ভর বলিয়া বেড়াইতেছে : কেশবের স্ত্রী বেঁচে থাকুক এটা মা'র ইচ্ছে নয়। পুণ্যবতী তাই ড্যাং ড্যাং করে' স্বামীর কোলে মাথা রেখে গেল।

দুই চোখ আমার সজল হইয়া উঠে। এমনভাবে—এমন নৃশংসভাবে কেন মানুষ মানুষকে হত্যা করিতেছে?

বিনোদিনী ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতেছে।

লালমোহন কিন্তু গম্ভীর। বিশ্বম্ভর ঠাকুরের সঙ্গে দেখি সে খুব ঘুরিতেছে।

বিনোদিনী কাঁদিয়া বলে, আমার কেউ নেই বাবা! তুমিই আমার সব, তোমার দয়ায় আমি বেঁচে উঠলাম।

মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠে। সারা পল্লীর মধ্যে একটা মানুষ অন্ততঃ আমাকে একেবারে আপনার করিয়া লইয়াছে—এই আনন্দে আমি সত্যই আনন্দিত।

কাজ করিয়া যাই। মানসিক নানা অশান্তি থাকিলেও কাজে কোনদিন আমি অবহেলা করি নাই।

কিন্তু রোগী দেখিতেছি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

অনেকে আমাকে এড়াইয়া যাইবারও চেষ্টা করিতেছে।

বিশ্বম্ভর একদিন রাত্রে অকস্মাৎ আমার বাড়ীতে আসিয়া আঙ্গুল উঠাইয়া বলিয়া গেল : সাবধান ডাক্তার! মা'র দয়ায়—একেবারে হাঁ! হাত নাড়িয়া কি যেন দেখাইল।

বলিলাম, বুঝলুম না।

বিশ্বম্ভর বলিল, তুমি আমার শত্তুর! আমার অন্ন মেরেছো, বস্ত্র মেরেছো, আমাকে প্রাণে মেরেছো, তোমাকে আমি···হাঁ! সাবধান!

বিশ্বম্ভর আমাকে হত্যা করিবে?

গভীর অরণ্যপূর্ণ যে পল্লীকে আমি প্রাণপণ চেষ্টায় সুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছি, সেখানকার যে মানুষকে আমি প্রাণ দিয়া প্রাণ দিতেছি তাহারা আমাকে হত্যা করিবে?

বিশ্বম্ভরের নৃশংস-হত্যারীতিকে আমাকে সমর্থন করিতে হইবে? তাহার নির্ম্মম, অমানুষিক অত্যাচারকে আমাকে সহ্য করিতে হইবে? তিলে তিলে বিশ্বম্ভর প্রতিটি সরল গ্রামবাসীর প্রাণবায়ু বাহির করিয়া লইবে, আমি তাহা দেখিব?

বিশ্বম্ভর আমাকে হত্যা করিবে! মহেশকে বলিলাম।

মহেশ বলিল, আমিও ভোজালি শাণ দিয়ে রাখ্‌বো!

হাসিলাম।

মহেশ বলিয়াছিল না আমার জীবনের মূল্য হইতে ওই সব সরল নিরক্ষর গ্রামবাসীর জীবনের মূল্য অনেক বেশী?

তবে আমার জীবনের জন্য মহেশ—বৃদ্ধ মহেশ ভোজালি শাণ দিবে কেন?

মূল্যহীন এ জীবনের মূল্য আছে তাহা হইলে?

ইতিমধ্যে মহেশ আর একটা খবর আনিয়া দিল : বিশ্বম্ভর, লালমোহন, কেশব, রাজেন নস্কর, ভগবান দাস প্রভৃতি জনপঞ্চাশেক লোক একটা দরখাস্তের মত কি কাগজের উপর বসিয়া-বসিয়া টিপ-সৈ দিতেছে।

কিসের দরখাস্ত? ভাবিতেও হইল না।

দিনকয়েকের মধ্যেই বোর্ড হইতে আমার ট্রান্‌স্ফারের পত্র আসিল। অভিযোগ আমি নাকি এই পল্লীতে নিয়ম মত কাজ করিতেছি না,—অসদ্ব্যবহার করিয়াছি।

চমৎকার! সেই ভালো, চলিয়া যাওয়াই ভালো।

খবরটি বিনোদিনীকে দিতে গেলাম। বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, বাবা, তোমাকে যে আমার খাওয়ানো হ'লো না!

বিনোদিনীর অশ্রু দেখিয়া আমি মুখ ঘুরাইলাম।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে বাবা?

বলিলাম, পরশু।

—তবে কাল আর একবার পায়ের ধুলো দিও বাবা!

বিনোদিনী আবার কাঁদিল।

বলিলাম, কেঁদো না মা! বদ্লি হ'লেও তোমার-আমার মা-ছেলের সম্বন্ধ ঠিক রইলো! তুমি সেরে ওঠো, একদিন এসে খেয়ে যাবো!

বিশ্বম্ভর বগল বাজাইয়া তাহার জয়-ঘোষণা করিতেছে।

সব বাঁধাবাঁধি করিয়া লইলাম। যাহারা এতটুকুও ভালোবাসিত তাহাদের কাছে বিদায় চাহিলাম। অবহেলা, অনাদর আর উপেক্ষা পাইয়াছি সত্য, কিন্তু তবুও এই পল্লী আমাকে টানিতেছে. দুই হাত দিয়া যেন আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। বার বার মনে হইতেছে, কেমন করিয়া যাইব?

বিশ্বম্ভর এ শাস্তি না দিয়া আমাকে যদি হত্যাই করিত।

কিন্তু যাইতেই হইবে।

বিনোদিনী দেখা করিতে বলিয়াছিল না? একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। যাইবার দিন ভোরবেলাতেই ছুটিলাম। মনে হইল, অন্যায় করিয়াছি! ছুটিলাম।

কিন্তু এ কি? বিনোদিনীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ কি দেখিলাম? বিনোদিনী নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। মাথার নিকট লালমোহন বসিয়া কাঁদিতেছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া লালমোহন বলিল, কারুর কথা না শুনে কাল বিকেলে রাঁধতে গিয়েছিল। কেউ জান্তো না, আমি বাইরে ছিলুম। এসে দেখি উনুনের পাশে পড়ে' আছে, গা ঠাণ্ডা!

বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বিনোদিনী রান্না করিতে গিয়াছিল? নিজেরই অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথায় তোমাদের রান্নাঘর লালমোহন?

লালমোহন আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

উন্মাদের মত ছুটিয়া গেলাম রান্নাঘরে।

এই তো—এই তো! মোচার টুক্‌রাগুলি এই তো পড়িয়া রহিয়াছে! মা আমার······দেয়ালে মাথা খুঁড়িতে ইচ্ছা করিল! বাহিরে আসিয়া চিরনিদ্রিতা বিনোদিনীর পানে তাকাইলাম—মা আমার অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। যেন বলিতেছে সেই কথা: তোমাকে আমি খাওয়াবো—নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবো!

মূঢ়ের মত নির্ব্বাকভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি চোরের ন্যায় ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিলাম।

আর থাকিব না, এক মুহূর্ত্তও না। মোটঘাট ঠিক-ঠাক করিয়া মহেশের মাথায় চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিনোদিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি এমন সময় দেখিলাম, পথের পাশে এক বাঁশবনের ধারে অনেক লোকের ভিড়। স্বয়ং বিশ্বম্ভর ঠাকুর নিজে সেখানে চীৎকার করিতেছে। কি ব্যাপার?

ব্যাপার দেখিলাম, বাঁশবনের ভিতর একটা জামগাছের ডালের সহিত দড়ি বাঁধিয়া বিশ্বম্ভরের একমাত্র পুত্র নেপাল গলায় দড়ি দিয়াছে। আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বেচারা অম্লশূলের যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছে। বিশ্বম্ভর বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছে।

পুত্রশোকাহত বিশ্বম্ভরকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম, কিন্তু বিশ্বম্ভর আমাকে অভিশাপে জর্জ্জরিত করিল।

বিশ্বম্ভরের স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া অদূরে পড়িয়া আছে। সজ্ঞানে থাকিলে সে কি অভিশাপ দিত, কে জানে!

চলিলাম। খানিকদূর যাইতে না যাইতেই 'হরিবোল' শব্দটি কাণে আসিল। কে? মহেশ জানাইল: লালমোহনের স্ত্রীকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

থামিলাম।

মা আমার কেশবের স্ত্রীর মত কপালে সিন্দুর, পায়ে আলতা লেপিয়া স্বর্গে চলিতেছেন! মা'র পিছন-পিছন চলিলাম। বার বার মনে হইতেছে: বিনোদিনী যেন বলিতেছে: অনেক চেষ্টা করেও তোমাকে খাওয়াতে পারলুম না!

তাহার 'বাবা' ডাকটি এখনও কানে বাজিতেছে।

ষ্টেশনে গিয়া উঠিতেই শুনিলাম, ট্রেণের এখনও অনেক দেরী। বসিয়া রহিলাম। এমন সময় দেখি, ভগবান দাস নির্জ্জীবের মত যাইতেছে। ডাকিলাম, কি খবর ভগবান? পারুলের বিয়ে হয়েছে?

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভগবান একদিকে ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল, হয়েছে।

—কোথায় হ'লো ?

—স্বয়ং যমরাজের সঙ্গে !

ভগবান দাস চলিয়া গেল। পারুল মরিয়া গেছে ? বাঃ! ছুটি! সবাই ছুটি লইল!

বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিলাম। এক সময় ট্রেণ আসিল। উঠিয়া পড়িলাম।

ট্রেণ ছাড়িল। অশ্রুপূর্ণ চোখে পল্লীটিকে শেষ বিদায় জানাইলাম।

অকস্মাৎ আবার কানে আসিল, সেই 'হরিবোল'।

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, লালমোহনরা বিনোদিনীকে পুড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

বিনোদিনী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল ? সোনার প্রতিমা বিনোদিনীর সব শেষ হইয়া গেল! যাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিবার জন্য আমার সারা অন্তর কাঁদিয়া মরিত, যাহাকে দেখিয়া, যাহার মুখের কথা শুনিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতাম—সেই বিনোদিনীর সব শেষ হইয়া গেল! জীবনে তাহাকে আর কোনদিন দেখিতে পাইব না ?

দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

শ্মশানপ্রত্যাগত লালমোহনের দলকে আর দেখিতে পাইলাম না, জানালার খড়খড়িটা নামাইয়া দিলাম।

ট্রেণ একটা জংশন-লাইন ঝন্-ঝন্ করিয়া পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

শ্রীমতিলাল রায়

বিধিঃ বাধারণবৎ ॥ ২০ ॥

বা (অবধারণার্থে) বিধি (পরামর্শ নহে, পরন্তু বিধায়ক) ধারণবৎ (ধারণ শ্রুতির ন্যায়) অর্থাৎ ধারণ শ্রুতিতে যেমন পরামর্শ বোধক থাকিলেও, উহা বিধেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। অগ্নিহোত্র যাগে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যো ধারয়তি" অর্থাৎ নীচে সমিধ্ স্থাপন করিবে, কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিতে হইলে, সমিধ্ উপরিভাগে ধারণ করিতে হইবে। এখানে "ধারয়তি" এই পদ "ধারয়েৎ" এইরূপ বিধিবোধক বিভক্তির অভাবেও, উহা যেমন বিধিবোধক হইয়াছে, জৈমিনি মুনি এইরূপ সূত্রও রচনা করিয়াছেন, "বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" অর্থাৎ ধারণ-বাক্য বিধি-বাক্য, অনুবাদ-বাক্য নহে ; কেননা, ইহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ বাক্যান্তরপ্রাপ্ত নহে। পূর্ব্ব মীমাংসায় এই যেমন অনুবাদ-বাক্য, বিধি-বাক্যে গৃহীত হইয়াছে, উত্তরমীমাংসাতে তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠতা পরামর্শ, স্তুতিবাক্য বিধেয় বলিয়া কেন গৃহীত হইবে না ? আরও এক ন্যায়বাক্য আছে "যৎ স্তূয়তে তৎ বিধীয়তে" অর্থাৎ যাহার স্তুতি, তাহারই বিধান। জাবাল শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহস্থনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা-বনাদ্বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। যদি ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাও করিবে। গার্হস্থ্য অথবা বানপ্রস্থ উভয় আশ্রমেই যে দিন বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। এই শ্রুতিতে সন্ন্যাসের বিধি থাকা সত্ত্বেও, আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছিলেন, জাবাল শ্রুতির এই উক্তি বিধিবাক্যরূপে প্রতীত হইলেও, উহাও স্তুতিবোধক। এই হেতু জাবাল-শ্রুতির বিধান অস্বীকার করিয়া মহামুনি জৈমিনির বাক্যের দ্বারা প্রমান করা হইল—'পরামর্শবাদ ও বিধিবাদ'।

শ্রুতিতে যে কথিত আছে "জায়মানো বৈ বিপ্রঃ ত্রিভিং ঋণবান্ জায়তে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মমাত্র দৈব, পৈত্র ও আর্ষেয়, এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হন—ইহাকে "ঋণবোধক" শ্রুতি বলে। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ জীবনকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রাদি হোম করিবে। ইহা "যাবজ্জীব" শ্রুতি। আর এক শ্রুতি আছে তাহার নাম "অপবাদ।"

যথা "বীরহা বা এষ দেবানাং" অর্থাৎ যিনি অগ্নি বিসর্জ্জন করেন, তিনি দেবগণের বীর্য্যহানি করেন। এই সকল শ্রুতির অর্থে ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার কথা নাই। মানুষ যেন অতীতের ঋণশোধের জন্যই জন্মিয়াছে। দেবতারাই তাহাদের জীবনের অধিপতি। দেবতাদের প্রীতিসম্বর্দ্ধনের জন্য তাহাদের যজ্ঞাদি কর্ম্মে চিরজীবন নিযুক্ত থাকিতে হইবে। আচার্য্যগণের অভিমত, এই সকল শ্রুতি ব্রহ্ম-সংস্থ ব্যক্তিগণের জন্য নহে, প্রবৃত্তিমার্গীদের জন্য। পাঠকদের সতর্ক হইয়া দেখিতে হইবে, ব্যাসদেব সূত্রের পর সূত্র রচনা করিয়া প্রমাণ করিতেছেন—মানবের বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত আর এক আশ্রম আছে। এই প্রমাণ-সূত্রগুলি অনুধাবন করিতে গিয়া শ্রুতির পরস্পর-বিরোধী উক্তির বিচার আসিয়া পড়িয়াছে এবং ভাষ্য-বিশ্লেষণে চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রবর্ত্তন অপেক্ষা সন্ন্যাস আশ্রমের কর্ম্ম নাই, এইটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সন্ন্যাস যখন একটা আশ্রম এবং উহা জীবনেরই অভিব্যক্তি এবং জীবন থাকিলেই যখন তাহার গতি ও পরিণতি আছে, তখন উহা ক্রিয়াহীন হইবে কেমন করিয়া। ভাষ্যকারগণ কিন্তু দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মসংস্থ জনগণের দর্শপৌর্ণমাসী, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ-কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। কর্ম্ম বলিতে এই সকল অনুষ্ঠানই সবখানি নহে। গীতার "যৎ অশ্নাসি যৎ করোমি" এগুলি তো কর্ম্ম। "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু" এই সকল জীবনলক্ষণ কাহার? এই সকল দেখিয়া আমরা অনায়াসেই স্থির করিতে পারি—ব্রহ্মজ্ঞানের যে কর্ম্ম, ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে সেরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার সুযোগ আছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জগৎ-হিতের জন্য, লোককল্যাণের জন্য, আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও তাহার অনুষ্ঠান করেন, ইহার কারণ গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-জ্ঞানীর জ্ঞানলাভের জন্য কি কোনই কর্ম্মই নাই? কিন্তু আদর্শ ব্যক্তিগণের—আচারহীন জীবন দেখিয়া লোক সকল যদি জ্ঞানলাভের সোপানগুলির উপর অনাস্থা করিয়া উৎসন্নের পথ প্রশস্ত করে, এই জন্য কর্ম্ম করিতে হয়।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২২ শ্লোক দৃষ্টান্ত

"ন মে পার্থাঽস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন" অর্থাৎ হে পার্থ ত্রিলোকে আমার কিছু কর্ম্ম নাই, তবু যে তিনি কর্ম্ম করেন তাহা জগৎকল্যাণের জন্যই। ঈশ্বরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যখন এই উক্তি, "অন্যে পরে কা কথা।"

বেদ কর্ম্ম ও জ্ঞানমূলক। কর্ম্মশেষতত্ত্ব জ্ঞান। কর্ম্ম-প্রণালী মানবপ্রকৃতির পর্য্যায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। 'ঋণবোধক' 'যাবজ্জীব' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে মানুষকে কর্ম্মরত রাখিয়া কর্ম্মের দ্বারাই আত্মশোধন করাইয়া ব্রহ্মভাব ও গতি লাভ করার অমোঘ লক্ষ্যের সঙ্কেত দেয়। শ্রুতির বিচিত্র উক্তি এইগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া তখনই মনে হয়, যখন এক পর্য্যায়ের বিধিবোধক বাক্য অন্য পর্য্যায়ে আমরা সংগ্রহ করি। ব্যাসদেবের সূত্র আশ্রয় করিয়া ভাষ্যকারগণের চেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাই দেখিতে পাই, সর্ব্বজনসম্মত এই সিদ্ধান্তেই তাহারা উপনীত হইয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মাপেক্ষা নাই। বৈরাগ্যবিহীন মানুষ যেন মনে না করে, গার্হস্থ্য অথবা ইহার ভিত্তির উপর ব্রহ্মচর্য্য বা বানপ্রস্থ আশ্রমই—একমাত্র কথা নহে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ যখনই সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার অনুরাগ হয়, আর তখনই আশ্রমপর্য্যায়ের কোন কথা নহে—ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম গ্রহণ করিবে।

(ক্রমশঃ)

ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞান

শ্রীসুবোধচন্দ্র পাল বি.এ

বিজ্ঞান যথা তুলে ধরে উদ্ধত কৃপাণ,
ধর্ম্ম সেথা হেসে করে আত্মবলিদান।

শতাব্দীর কলঙ্ক

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী

কলিকাতা ১৮ই আগষ্ট—দুঃস্থা বাঙালী রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে ওয়েষ্টার্ণ আর্টিলারির তিনজন সৈনিক গতকল্য আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনার তদন্তসাপেক্ষ শুনানী মুলতুবী আছে।

দুই

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাঙলা স্বর্ণপ্রসূ। শ্যামল পল্লীর স্নিগ্ধশ্রী, সাম্প্রত সভ্যতার দাহ-বর্জিত অনাড়ম্বর সহজ জীবন-যাত্রা, মেক্-আপের কলঙ্কহীন সরল হাসি ও অশ্রু—ইতিবৃত্ত কথার মুখর ভাষণ। দু'শো বৎসরের সভ্য শাসন সহজ জীবন-যাত্রায় এনেছে দুর্ভেদ্য জটীলতা। পার্লামেন্টীয় নিয়মতান্ত্রিকতার আওতায় কৃষি ও জলসেচ বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। সংগে সংগে সৃষ্টি হয়েছে কোথাও সোনালী ধানের পরিবর্তে মারুভূমিক উষরতা আর কোথাও মৃত্যুবাহী প্লাবন। শিক্ষাবিভাগের কৃতিত্বে মহরমের মিছিল সশস্ত্র শাস্ত্রীর অপেক্ষা রাখে; আর রাম-নবমীর উৎসবতালিকা একশো চুয়াল্লিশ আর ঠ-চার্জ্জের সিভিলিয়্যানী আদেশে সমৃদ্ধ। বাংলার সমাজ-জীবনে শিক্ষা-শাখার অমূল্য দান, প্রতিকারহীন ক্ষয়িষ্ণুতা। অর্থবিভাগের করিৎকর্মতায় নিরুপায় দারিদ্র্য প্রতিটি জীবনে অনড় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিদেশী শাসিত দেশে জীবন-যাত্রার পথ রক্ত আর অশ্রুতে পিছল। মানব ও সমাজ-জীবন মেরুদণ্ডহীনের পদক্ষেপের মতো বিকৃত।

অনুরূপ বাংলার এক পল্লীগ্রাম। তা'রি এক ক্ষীয়মান গৃহস্থ। বৃদ্ধা জননী জগত্তারিনী, স্বামী-বিতাড়িতা কন্যা অষ্টাদশী সৌদামিনী আর বিংশবর্ষীয় পুত্র হরিমোহন। এ হেন গৃহস্থের জীবনযাত্রা সচরাচরের ব্যতিক্রম করে না—বিশেষতঃ সর্বপ্রথম আলোকপ্রাপ্ত বাংলায়। যৎকিঞ্চিৎ জমিজমা জমিদারের আয়ত্বে। ক্রমান্বয় অনুর্বরতায় তাঁহার প্রাপ্য স্ফীতান্বিত রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তী ধাপ ভিটা-বন্ধক। অতঃপর হাল-বলদ বিক্রয়। তারোপরে নেমে এসো···অর্দ্ধাহার···অনাহার···অলজ্জ আবরণ···অবতীর্যমান জীবনের ভয়াবহ কঙ্কাল···

কোটি কোটি ধন্যবাদ সভ্যতার অভিযাত্রী-বাহিনীকে; ভারত-সাম্রাজ্যের সাম্প্রত রক্ষাকর্তাদের; কালো সমাজের আলোদাতৃ অভিভাবকদের মহত্ব আর মহিমাকে—

—তুমি না বললেও মা এবার আমাকে বেরোতেই হ'বে রোজগারের ধান্ধায়। তোমাদের এ জঘন্য কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না। শেষে হয়তো কোনোদিন তোমাকে না ব'লেই পালিয়ে যাবো।

সাহারার আলোর মতো প্রখর হরিমোহনের দৃষ্টি।

—তাই যা' বাবা! আর বাধা দেবো না। এ দুঃখ-যন্ত্রনা আমার আর কী ক্ষতি করবে? আমার আর ক' দিনই বা বেঁচে থাকা? কিন্তু তোরা দু'টোতে যে দিন দিন শুখিয়ে যাচ্ছিস্। গা ঢাকতে পারে না ব'লে অভাগী মেয়েটা দিনের আলোয় বেরোয় না কারো সামনে।

অনাহারী বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

—আঃ···থামো মা। আর শুনতে পারি না।

—কিন্তু তুইও চ'লে যাবি বাবা! কী ভরসায় এখানে প'ড়ে থাকবো? আর তোকেই বা···

অশ্রু অবরোধ মানলো না। নিরুপায় মাতৃত্ব অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো।

তিন

হরিমোহনের গৃহত্যাগ দুই বৎসর পূর্বের ঘটনা। প্রথম দুই মাস হরিমোহনের অর্থ-অন্বেষণের অসফল ইতিহাস লেখা কয়েকখানা চিঠি জগত্তারিনী পেয়েছিলেন। তার পরের তিন কিম্বা চার মাস হরিমোহনের পরুষকারের নিদর্শন মাসিক গড়ে তেরো টাকার মণিঅর্ডার এসেছিলো। তারপর দুই মাস আর ওর কোন বার্তাই এ দারিদ্রক্লিষ্ট সংসার জানতে পারেনি। তারও পরে তিনমাস ভারতের যুদ্ধকর্তৃপক্ষ প্রেরিত মাসে কুড়ি টাকা করে মণিঅর্ডার এসেছিলো।

দু'খানা চিঠিও। হরিমোহন তখন সৈনিক; মহাযুদ্ধের লাভ-ক্ষতির এক নগণ্য হোতা; পরাধীন ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তাদের হাতে বিড়ালের থাবা। অবশ্য যুদ্ধ-প্রচার-বিভাগ বলে: ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান ওরা, মুক্তির অগ্রদূত, মানবতা ও শান্তির বার্তাবহ শ্বেত-কপোত।

তথাপি অভিশপ্ত বাংলার অখ্যাত গ্রামের দারিদ্র্য নিষ্পেষিত ওই সংসারে পঞ্চ ঋতুর পরিবর্তনের সংগে সংগে যে দুঃখের প্রপাত নেমে এসেছিলো তা' রীতিমতো প্রখর ও গভীর। সে স্রোতে পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠ ওই অনামী পরিবার ফেণার মতো ভেসে গেলো; ভেঙে খান্-খান্ হ'য়ে নেতির গর্ভে বিলীয়মান।

বণিক মানব চাইলে বাণিজ্যিক স্ফীতি; অধিকার-লিপ্সু জাতি চাইলে সাম্রাজ্যের বিস্তার; অপশক্তিদৃপ্ত মগজ চাইলে অপরকে অধীন রাখতে। ফলে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলো। তারপর···

যুদ্ধক্ষেত্রের নারকীয় বর্ণনা বৈদেশিক সংবাদ-সাহিত্য দেবে! স্নায়ু-দুর্বল বাংলার বাস্তব-অনভিজ্ঞ লেখকের বৈদেশিক সাহিত্যের অক্ষম অনুকরণ নিতান্তই ছেলেমানসি।

কিন্তু প্রকৃত রণাংগণের বহুদূরের প্রদেশ বাংলার ওই একদা শ্রীসম্পন্ন গ্রাম? বাঙালীর নির্বাধ জীবন-যাত্রা?

সেখানেও প্রসারিত মৃত্যুর ছায়া। কাঁচা রক্তের গন্ধ, বারুদের ধোঁয়া আর আত্মার আর্তনাদ। অন্ন অপ্রাপ্য, আজন্মের আশ্রয় যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের বৃহত্তর প্রয়োজনে ছেড়ে দিয়ে তোমায় প্রশস্ত পথে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াতে হ'তে পারে; প্রয়োজনীয় আবরণ-সংগ্রহ ব্যক্তিগত জীবনে মহাযুদ্ধের চেয়েও বড়ো সমস্যা। তারও পরে নেমে এসো·········ওষুধ থেকে জ্বালানি অবধি কণ্ট্রোল আর কিউইর ব্যংগচিত্র ·····

যুদ্ধে যা'রা প্রাণ দিলো রণদামামা সে ত্যাগে তাদের উন্মাদনা জুগিয়েছে। আর পৃথিবীর বুকে তাদের কয়েকটা পাথরের স্মৃতিস্তম্ভও খাড়া হ'য়ে থাকবে। কিন্তু পর-কৃপাভিক্ষু দেশের অসহায় যে অধিবাসীরা এই যুদ্ধে নিরন্ন, নিরাশ্রয় হ'য়ে প্রতিকারহীন মৃত্যুর উগ্র বিষ চুমুকে চুমুকে পান করলো? ইতিহাস লিখবে না সে দধীচিদের আত্ম-ত্যাগের কাহিনী! তারা তথাপি স্রেফ্ নিষ্প্রয়োজনীয়তার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে প্রয়োজন-সচেতন পৃথিবী থেকে বিদায় নিক্।

উপরন্তু তেরোশো-পঞ্চাশের মহামন্বন্তর—

শাসক পরিচালিত দেশের যে বৃহৎ জনসংখ্যার অন্নহীন, ঔষধহীন, অনাবরণ, অনাশ্রয় জীবন মৃত্যুর উলংগ বীভৎসতার চরম প্রচার ক'রে গেলো, তা'রা অভিযোগ রেখে যায় নি কারও বিরুদ্ধে। যা'রা বেঁচে রইলো তা'রা তীব্র সমালোচনা করলে বৈলাতিক গণতান্ত্রীয় শাসন-প্রণালীর। তা'র স্বচ্ছ উত্তরও মিল্‌লো ভগবান-নির্ভর ভারতসচিবের কাছ থেকে। সে সব অমানুষিক বাদ-প্রতিবাদ এ কাহিনীর প্রতিপাদ্য নয়।

বাংলার শ্যামল পল্লী পাথরের চেয়েও নীরস-কঠিন রূপ পরিগ্রহ করলো। জীবনের রস বিন্দুমাত্রও মেলে না সেখানে। ঝাঁকে ঝাঁকে অভুক্ত নর-নারী-শিশু—জীবনের প্রেত রূপ, দু'শো বৎসরের আকাশ-উদার শাসনের সৃষ্টি—অন্নসংস্থানের ব্যর্থ চেষ্টায় গ্রাম ছেড়ে ছুটলো গ্রামান্তরে··· তারপর সভ্যতার গোমুখী সহরে—ইংরাজ সাম্রাজ্যের গর্ব দ্বিতীয় মহানগরীতে।

দুর্যোগ-রাত্রির ওই আশ্রয়হারাদের সংগেই এলো মাতা ও কন্যা—জগত্তারিণী আর সৌদামিনী। পদ-পথ ওদের আশ্রয়; নকার-আধার ওদের খাদ্য-ভাণ্ডার। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আপ্রাণ চেষ্টা: দুয়ারে দুয়ারে ফ্যান-ভিক্ষা; প্রজাবৎসল শাসক আর কর্তব্যপরায়ণ পৌরসভার দয়ার দান অখাদ্য-খাদ্যসেবীদের তালিকায় আসন সংগ্রহের মর্মান্তিক প্রয়াস। তারপর সমস্ত সংগ্রামের নিশ্চিন্ত অবসান। পশুর মতো মৃত্যু—কর্দমাক্ত পথপ্রান্তে, সভ্য সমাজের নিরর্থক, সহানুভূতিসিক্ত দৃষ্টির সম্মুখে। তথাপি ভাগ্যবান তারা, যারা মুক্তি পেলো জীবন থেকে।

এই ভাগ্যবানদের তালিকায় জগত্তারিণীর স্থান হ'লো।

মরণোন্মুখ যৌবন নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ক'রে বেড়ায় সৌদামিনী। দানও পায়। সংগে সংগে পায় দাতার দেহলোলুপ দৃষ্টির লেহন। হিন্দুস্থানী দোকানদার

একখানা বাসি কচুরী ওর প্রসারিত আঁচলে ফেলে দিয়ে ডান চোখটাকে বিশেষ কোনো ভংগীতে সংকুচিত ক'রে বললে: আরে, রাতকো আস্‌বি। ভালো ভিখ্‌ মিল্‌বে। আঁধা-গলির দালাল দিলে প্রস্তাব: দেহের অবশিষ্টাংশ মূলধন নিয়ে কারবারে নেমে পড়তে। অভিজাত মার্কিণ খরিদ্দারের দৌলতে পাবে পেটভরা সুখাদ্য, উন্মাদনা জোগাবার জন্যে প্রয়োজন হ'লে পানীয়, সৌখীন বেশবাস্‌; ফিটন-ভ্রমণ, উপরন্তু অর্থের লোভনীয় সংখ্যা।

বেঁচে থাক অনাহারে মৃত্যু। ভারতীয়া নারী সৌদামিনী! সূর্যের রক্তিমা ওর রক্তকণায়। সীতা ও সাবিত্রী ওর আদর্শ। সৎ পিতা ও সতী মাতার সন্তান সে।

অতএব চললো ভিক্ষাবৃত্তির শিক্ষানবিশী। জীবন-মৃত্যুর মহাসংগ্রামে অবশেষে ও উত্তীর্ণ হ'লো। অনেকগুলো রৌদ্রদগ্ধ দিন, বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে সন্ধ্যা আর হিমাক্ত রাত্রি পার হ'য়ে।

সৌদামিনী এখন সহরের প্রত্যন্ত বেহালা অঞ্চলের এক জনবিরল পল্লীতে কোনো এক রুগ্না গৃহকর্ত্রীর গৃহস্থ সংসারে দিবারাত্রের দাসী।

ভাগ্যলাঞ্ছিতা হ'লেও সৌদামিনী ভারতের এক অসামান্যা মেয়ে।

চার

হতভাগ্য হরিমোহনের তারকা সুপ্রসন্ন। অন্নান্বেষণের যুদ্ধ ওর শেষ হয়েছিলো যেদিন ও যুদ্ধকার্যে যোগ দিলে। তারপর সামান্য চৌকিদারীর পদ থেকে ক্রমোন্নতি লাভ করে অধ্যবসায়ের চরম সুফল ও লাভ করলো ওয়েষ্টার্ণ আর্টিলারির সৈন্য নির্বাচিত হ'য়ে। হরিমোহনের এ অকল্পিত উন্নতির ইতিহাস প্রচার করলে ন্যাশ্‌ন্যাল্‌-ওয়ার ফ্রন্টের প্রচার-কর্তৃপক্ষ। বুভুক্ষু ভারতের নিরন্ন গৃহস্থদের সম্মুখে আত্মিক উন্নতির এই লোভময় ছবি অন্ন-সন্ধানী সন্তানদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে দলে দলে যোগ দেয় দেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব বোধে! অখণ্ডিত থাক বৃটেনের সসাগরা সাম্রাজ্য। অশিক্ষিত, অসভ্য ভারতবাসী শাসকজাতির কাছে সভ্যতার আলোক-ঋণে অনেক—অনেক ঋণী!

পাশ্চিমিক কায়দায় রীতিমতো দুরস্ত হ'য়ে উঠেছে হরিমোহন—সুসভ্য ইংলণ্ডদুলালদের সান্নিধ্যে এসে।

দেশ থেকে দেশান্তরে ও যুদ্ধ ক'রে বেড়িয়েছে। সংস্কৃতির প্রাচীনতম কেন্দ্র চীনের ধ্বংসলীলা ও দেখেছে স্বচক্ষে। সেখান থেকে বর্মা প্রত্যাবর্তনের পথে দীর্ঘ একুশ দিন দুর্গম গিরিপথ পায়ে হেঁটে পেরিয়েছে শুধু কলাগাছের শাঁস চিবিয়ে। উদার-অন্তঃকরণ আর আতিথেয়তার আদর্শভূমি পারস্যের যুদ্ধায়োজনে ও ছিলো বহুদিন। দেখেছে ইস্পাহানের শেকিঙ্‌-মিনারেট্‌; সিরাজের পার্‌সি-পোলিস—প্রাচীন সভ্যতার অধুনালুপ্ত প্রমাণের ক্রম-প্রকাশ। পান করেছে প্রচুর সিরাজী, ভোগ করেছে রূপবতী নারীদেহ। তারপর উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি। ধূসর বালুবিস্তৃতিতে প্রগতিশীল মার্কিণ ও গোঁড়া ইংরাজ জাতির সৈন্যদের পাশাপাশি ওরও পদ-চিহ্ন হয়তো এখনো বিলুপ্ত হ'য়ে যায় নি। অন্যায়ী অক্ষ-শক্তি-বিতাড়নে ওরও কিঞ্চিৎ দান সেখানে আছে। যুগ যুগ পূর্বের সভ্যতার নিদর্শন পিরামিড্‌কে ও বৈলাতিক দৃষ্টিভংগিতে য়্যাপ্রিশিয়েট্‌ করেছে। মার্কিন-ইংরাজ কাফ্রি সৈন্যদের উদগ্র উচ্ছৃঙ্খলতায় পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করেছে ও। তারপর পাশ্চিমিক সভ্যতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ। পোপের দেশ; দান্তের লীলাভূমি; য়ুরোপীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ খনি। ciazano-র কি অদ্ভুত স্বাদ! অভ্র-উজ্জ্বল নারীদেহের কি জীবন্ত লীলায়ন!

হ্যাঁ, হরিমোহন তখন উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রতীরে, যখন ও খবর পেয়েছিলো যে ওর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস —সে গ্রাম দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হ'য়ে গেছে। আর ঠিক তা'র পর-পর দুই মাস ওর প্রেরিত টাকা ও চিঠি "য়্যাড্রেসি নট্‌ ফাউণ্ড"-এর ওজুহাতে উপর্য্যুপরি ফেরৎ গিয়েছিলো। মন ওর হয়তো কেঁপে উঠেছিলো একবার। কিন্তু সাগর-পারের সতেজ চিত্তবৃত্তিতে ও তখন বলীয়ান!

হরিমোহনের পরিচিতি এখন 'হ্যারি' নামে। আর এই পরিবর্তনটুকুর মর্যাদা দিতে ওর কণামাত্র কার্পণ্য নেই। পাশ্চিমিক ছাঁচের নিঃখুঁত নিদর্শন কন্টিনেন্ট-ফেরৎ 'হ্যারি'!

ওয়েষ্টার্ণ-আর্টিল্যারীর হ্যারি-ভুক্ত য়ুনিট্‌ মাত্র তিন দিন

আগে ভারতের কোনো এক বন্দরে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে ট্রেইণে কলকাতায় এসে পৌঁছেচে পনেরোই আগষ্ট। তাদের সাময়িক শিবির স্থাপিত হ'য়েছে বেহালার এক নির্জন প্রান্তরের কয়েকটি ক্যামোফ্লেজ্‌ড্‌ তাঁবুতে।

পাঁচ

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট—গতকল্য সোমবার আদালতে দরিদ্র বাঙালী যুবতীর উপর ওয়েষ্টার্ণ আর্টিলারীর তিনজন সৈনিকের পাশবিক অত্যাচারের মামলাটি উঠে। ঘটনার তদন্তে প্রকাশ কোনও এক দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের মেয়ে সৌদামিনী দাসী (২১) বেহালার এক গৃহস্থ পরিবারে দাসীর কাজ করে। ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় দশটায় স্থানীয় এক পুষ্করিণীতে সৌদামিনী দাসী বাসন ধুইতেছিল। ওই সময় ওয়েষ্টার্ণ আর্টিল্যরির তিনজন সৈনিক পানোন্মত্ত অবস্থায় সৈন্য-তাঁবুতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সৌদামিনী দাসীকে ওই জনবিরল স্থানে দেখিতে পাইয়া বলপূর্বক এক ঝোপের আড়ালে লইয়া গিয়া তিন জনেই পর পর উহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সৈন্যদল সৌদামিনীর মুখ তৎপরতার সহিত বাঁধিয়া ফেলায় দুর্বৃত্তেরা কোন বাধা পায় নাই। ঘটনার অনতিবিলম্বেই স্থানীয় ভদ্রলোকদের চেষ্টায় ও পুলিশের সাহায্যে অত্যাচারীর দল ধরা পড়ে। অপরাধীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বাঙালি; নাম হরিমোহন—অধুনা স্বীয় য়ুনিটে 'হ্যারি' নামে পরিচিত। শুনানী মুলতুবী আছে।

শুভরাত্রি, মিস্ মেয়োর আণবিক শক্তিসম্পন্ন সুসভ্য জন্মভূমি! শুভরাত্রি গণতন্ত্রের প্রেতায়িত রূপব্যবসায়ী রক্ষণশীল ব্রিটিশ আইল্‌স্! শুভরাত্রি, মানবতার ব্যংগচিত্র পাশ্চিমিক্ সভ্যতা! তোমার প্রসারিত হাত টেনে নাও। তোমার প্রসাদ, তোমার আশীর্বাদ, তোমার আলোয় আর ঋণ বাড়িয়ো না এই ভাগ্যলাঞ্ছিত দেশের নিপীড়িত মানবাত্মার।

ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীর-শিল্প

অধ্যাপক শ্রীবিনয় সরকার

পৃথিবীর নয়টি শিল্প-প্রধান দেশের মধ্যে ভারতের সুনাম আছে সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীয় বনিয়াদে কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যা আদৌ আশাপ্রদ নয়। ১৯৩১ সালের আদমসুমারির বিবরণীতে দেখা যায় যে, মোট শিল্পশ্রমিকের শতকরা ১৫ ভাগ ছিল কারখানা-শ্রমিক। আবার এই কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে বাংলা এবং বোম্বাইতেই শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী শ্রমিক থাকার হিসাব পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রায়তন শ্রমশিল্প ও কুটীর-শিল্পের শ্রমিকের সংখ্যা সারা ভারতের প্রদেশসমূহে মোটামুটি প্রায় সমানভাবে ছড়িয়ে আছে।

বোম্বাই অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় জরিপ-কমিটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশকালে ব'লেছেন যে, যে সমস্ত শিল্পে শক্তি (power) ব্যবহৃত হয়, ৫০ জন শ্রমিকের বেশী কাজ করে না এবং বিনিযুক্ত মূলধন ৩০ হাজার টাকার বেশী নয়, সেই শিল্পগুলিই ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহা ছাড়া, যে সমস্ত শিল্পে কোন শক্তি ব্যবহৃত হয় না অথচ কারখানাতে নির্মানকার্য সাধিত হয় এবং নয়জনের বেশী শ্রমিক কাজ করে, সেই শিল্পগুলিকেও ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত শিল্প বিনা শক্তিতেই উৎপাদিত হয় এবং সাধারণত কারিগরের গৃহে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট ছোট কারখানায় নয়জন শ্রমিক-সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইগুলিকে কুটীর-শিল্প বলা যায়।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সর্বাগ্রে এই সাধারণ বিতণ্ডামূলক প্রশ্নের সমাধান হওয়া দরকার। এ বিষয়ে চিরাচরিত উত্তর এই যে, এই শিল্প কি পরিমাণ আর্থিক সুবিধা সৃষ্টি করে ও বৃহদায়তন বা কারখানাজাত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে

পারে বা দাঁড়ানোর উপযোগী, তারই উপরে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে সত্যই এদের স্থান আছে। তা'র কারণ হ'চ্ছে এই যে :

প্রথমতঃ, বর্তমানে সারা জগত জুড়ে পুরা নিয়োগ (full employment) সমস্যা আলোচিত হচ্ছে। আর ভারতে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার অথবা সাময়িক ভাবে বেকার, সেখানে এই সমস্যাটির গুরুত্ব অনেক বেশী। কম উৎপাদন-ব্যয়সমন্বিত বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে বেকার-সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর নয়। ফসল কাটার পরে ভারতে যে মৌসুমী বেকার দেখা যায়, তা'কে দূরীভূত ক'রতে হ'লে কোন কোন ক্ষেত্রে গৌণ বৃত্তির আশ্রয় লওয়া উচিত। এই সমস্ত সাময়িক পেশায় বেশী মূলধনের নিয়োগ বা অতি দক্ষতার প্রয়োজন নাই। নিজের ইচ্ছামতে পেশা গ্রহণ বা ত্যাগ করা যায়। বৃহদায়তন শিল্পে এ প্রকার সুযোগ নাই। ইহা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্পের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গত পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী কাল শিল্প-সাধনার ফলে ভারতে শিল্পজ দ্রব্যের রপ্তানীর অনেক হ্রাস হ'য়েছে, অথচ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ লক্ষ মাত্র দাঁড়িয়েছে। রপ্তানীকৃত শিল্পজ দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ হ'চ্ছে মূল বা উৎপাদন বস্তু। আবার ভোগ্য সামগ্রীর তুলনায় মূল বস্তুর উৎপাদনে অনেক কম শ্রমিক দরকার হয়। বৃহদায়তন শিল্পের আরও প্রসারের ফলে হয়তো-বা ২০ লক্ষ শ্রমিক কাজ পেতে পারে; কিন্তু তা' হ'লেও ভারতীয় জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ বেকার হ'য়ে থাকবে। সুতরাং এই বেকার-জ্বালা দূরীভূত ক'রতে হলে, আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রসার হওয়া প্রয়োজন—একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা ক'রতে গেলে শিল্পীদের ন্যায়সংগত আঞ্চলিক বণ্টনের (Regional distribution) কথাও এসে পড়ে। ভারতবাসীর ভাষা ও ধর্মগত বিভিন্নতা ইতিমধ্যেই ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত ক'রতে সুরু ক'রেছে। প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক স্বয়ংপূর্ণতাকে ও প্রাদেশিকতার সঙ্গে স্বদেশী মনোভাবকে সীমাবদ্ধ ক'রে একদল লোক ইতিমধ্যেই আন্দোলন আরম্ভ করেছে। ভারতের কয়েকটি স্থানে বৃহদায়তন শিল্পসমূহ কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, সেই কতিপয় শিল্পপ্রধান অঞ্চল অধিকাংশ কৃষি-প্রধান অঞ্চল থেকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; তারই ফলে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। এমন কি প্রদেশান্তর্গত সহরবাসী ও পল্লীবাসীর মাঝেও এই প্রকার বিরোধনীতি স্থান পেয়েছে। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী পল্লী-শিল্পের পুনরভ্যুত্থানের নির্দেশ অনেক আগেই দিয়েছিলেন। পল্লী-জনগণের হাতে রাষ্ট্রিক শক্তি যতই ন্যস্ত হ'বে এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ধর্মধ্বজী দলের শক্তি যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই এই বিরুদ্ধ মনোভাব উদগ্র হ'য়ে উঠবে। অতএব, সে ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পীয়-বনিয়াদকে বিকেন্দ্রীয়-করণের প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে; আর এই বিকেন্দ্রীয়-করণ ক'রতে গেলে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের সাহায্য নিতেই হ'বে।

তৃতীয়ত, শিল্পজ দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দিকে এমনই একটী সাম্প্রতিক প্রবণতা এসেছে যে, এতে ক'রে মজুরী ও মুনাফার অসামঞ্জস্য অত্যধিক বেড়েছে, যার ফলে অদূরভবিষ্যতে গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব-আন্দোলন দেখা দিতে পারে। এই জন্য উৎপাদন-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। মনে হতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সুসংস্কার সাধন করলেই শিল্পজ আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা প্রচলিত হ'বে। কিন্তু অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরখ ক'রে দেখা যায় যে, এরূপ ব্যবস্থা ক'রতে গেলেও রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ এবং একাধিনায়কত্বের যথেষ্ট সুযোগ র'য়েছে। কিন্তু যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্প অনায়াসেই চালনা করা যেতে পারে। এতে ক'রে নিরর্থক শ্রমশোষণ এবং অন্যায্য মুনাফা-বণ্টন আদৌ দেখা দেবে না।

চতুর্থত, বর্তমানকার এই সার্বিক যুদ্ধের প্রসার ও প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রাতন-শিল্প ও কুটীর-

শিল্প বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের অধিবেশনে সমর-প্রয়োজনীয় সামগ্রী কি ভাবে বাড়ানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য ভারতীয় শিল্প-অভ্যুত্থানের ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব ব্যাপার। ইহার ফলে ক্ষুদ্রায়তন-পদ্ধতি ও কুটীর-পদ্ধতিতে উৎপন্ন সমর-সামগ্রীর পরিমাণ অনেকটা বেড়েছে। ইহা ছাড়া অনেক কারিগর শান্তিকালীন বৃত্তি ত্যাগ ক'রে সমর-কালীন বৃত্তিতে যোগ দিয়েছে। আগ্রার যে কারিগর আগে তাজমহলের চমৎকার পাষাণ-আদর্শ তৈরী ক'রত, সে এই যুদ্ধের ফলে পাষাণ-নির্মিত সনাক্তিমূলক চাকতি নির্মাণ করে। এইভাবে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্প যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয়তাকে কত বিচিত্রভাবেই না মিটিয়েছে! সরকারী পরিসংখ্যানের অভাববশত এই জাতীয় শিল্পের উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যুদ্ধ যে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের কারিগরদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, ছোট-বড় সকল শিল্পায়তনকে এক সামঞ্জস্য সূত্রে গ্রথিত করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমরোত্তর কালে এই কারিগরদের রক্ষা না করলে দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

এই জন্যই ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ও কুটীর-শিল্প সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন র'য়েছে। ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্রে ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের সমস্যা নিতান্তই সাম্প্রতিক সমস্যা। এই শিল্পকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় :—প্রথম, বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প র'য়েছে ; যেমন,—তোলন-যন্ত্র (Picker), মোটরের গদি ইত্যাদি নির্মাণ ; দ্বিতীয়, মোটর মেরামতি, রেলের কল-কারখানা এবং ছোটখাট ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত মেরামতির যোগানমূলক ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প ; তৃতীয়, পাকা মালের উৎপাদন-সম্পর্কিত শিল্পাদি ; যেমন—পিতল, তামা, ও এলুমিনিয়মের তৈজসপত্রাদি, আসবাব-পত্র, চাল ও ময়দার কল, সাবান তৈরী, ঢালাইয়ের কাজ, কর্তরিকা নির্মাণ (Cutlery), মোজা-গেঞ্জির ব্যবসায় ইত্যাদি। শেষ বিভাগটির সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্পের বেশ প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু প্রথম দু'টি বিভাগ এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। দ্বিতীয় বিভাগে কাঁচা মালের সমস্যা নাই, কিন্তু অপর দু'টি বিভাগে আছে। সে যা'হোক, ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পাদির সাধারণ বিপত্তি ও তা'র নিরাকরণ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পসমূহ প্রধানতম বাধা পায় অর্থ-সরবরাহের দিক থেকে। বড় বড় মহাজন বা ব্যাঙ্ক নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য এই ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহকে টাকা সরবরাহ করে না। আবার এদের শেয়ারসমূহ বাজারে বিক্রয় ক'রে যৌথ কারবারী পদ্ধতিতে মূলধন পাবার আশা করাও বৃথা। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিল্পীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি ক'রে যদি তা'দেরই মারফতে কার্য্যকরী মূলধন ও উন্নতি-মূলক সরঞ্জাম যোগাড় ক'রবার উপযোগী পুঁজি দাদন দেওয়া যায়, তা'হলেই ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ঋণের আকারে প্রাদেশিক সরকারী সাহায্য আদৌ যথোপযুক্ত নয়। অবশ্য শিল্পীয় ব্যাঙ্কগুলিকে যে বে-সরকারী প্রয়াসজাত হ'তেই হবে,—এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পীয় ব্যাঙ্কসমূহকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে সরকার যদি আমানতকারীদের মূলধন ও ব্যাঙ্কের পুঁজির উপরে প্রয়োজন মতে ন্যূনতম সুদ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহ'লে সত্যিকারের রাষ্ট্রীয় সহায়তা রূপায়িত হ'য়ে উঠবে। অর্থসরবরাহ সমস্যার পরেই আসে শিল্পবিজ্ঞানীয় নৈপুণ্যের কথা। ইহার অভাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি আশানুরূপ উন্নতি ক'রতে পারে না। এই অসুবিধার কথা সিগারেট-উৎপাদকেরা একদা বোম্বাই অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় সার্ভে কমিটির কাছে পেশ ক'রেছিলেন। ১৯১৬ সালে একবার ভারতীয় শিল্প কমিশন এইরূপ অভিজ্ঞ শিল্পবিজ্ঞানীয় কর্তৃপক্ষদের প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রবার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উপদেশ সংবলিত বিষয়টি প্রাদেশিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে দ্বৈত শাসননীতির অছিলায় পরিত্যক্ত হ'য়েছিল। এই কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী সরকারের অধীনে শিল্প-বিজ্ঞানীয় উপদেষ্টা-সংসদ গঠিত হওয়া উচিত। এই সংসদ ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পাদির অনুকূল সস্তা উৎপাদন-পদ্ধতি উদ্ভাবন

ক'রবার জন্য গবেষণা করবে। এই প্রসঙ্গে জাপানী ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নৈপুণ্যের কথা স্বতই মনে হয়, যা এখন পর্য্যন্ত ভারতের বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিতরেও পাওয়া যায়নি। কিন্তু কেবলমাত্র নৈপুণ্য বিষয়ে গবেষণা হ'য়ে গেলেই শেষ কথাটি' হ'ল না। ব্যবসায়গত হালচালেরও একটা বিশেষ স্থান র'য়েছে। ভারতে অনেক বড় বড় কারবার আছে; কিন্তু কারবারীরা বাজারের গতিকে লক্ষ্য করে না বা পণ্যবিক্রয়সমস্যার গবেষণার উপরে বিশ্বাস রাখে না। ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা ক'রলেও ব্যবসায়গত খবর নিতে পারে না। বোম্বাই সরকার ব্যবসায়গত সংবাদ আদান-প্রদাননীতিকে মেনে নিয়েছেন এবং এই বিষয়ে কিছুটা কাজও ক'রেছেন। ইহার পরই আসে বিদেশী প্রতিযোগিতা এবং তথাকথিত 'ভারত লিমিটেডে'র ছদ্মবেশে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে এই ভারতেই পরিচালিত বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এতে করে ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান আদৌ উন্নতি লাভ ক'রতে পারে না। রপ্তানী-শুল্কের অভাবে ও শুল্কের অনিয়মিতত্বের জন্য ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের অবস্থা আরও নৈরাশ্যব্যঞ্জক হ'য়ে পড়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কাঁচা মাল বা আধ-পাকা মালের উপরে শুল্ক বেশী, অথচ সেই জিনিসেরই পাকা অবস্থায় শুল্ক কম। এই জাতীয় অসংগতিকে দূর ক'রতে হ'লে ভারত-সরকারকে ছোট ছোট শিল্পের দিকে তাকিয়ে সমগ্র শুল্ক-পরিস্থিতিকে আমূল সংশোধিত ক'রতে হবে। বিদেশী মূলধনে, আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানীয় নৈপুণ্যে ও অন্যান্য সম্পদে পরিপুষ্ট এই তথাকথিত 'ভারত লিমিটেড' যাতে ভারত-সরকারের ১৯৩৫ সালের আইনের বলে আমাদের দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ না ক'রতে পারে, সে বিষয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র-নেতাগণকে সচেতন থাকতে হ'বে। অতঃপর আরও কয়েকটি সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রেলওয়ে মাশুল পদ্ধতি সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা'র সাহায্যে বড় বড় শিল্প-ইউনিট সুবিধা ভোগ করে, পক্ষান্তরে ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে উচ্চহারে মাশুল দিতে হয়। অবশ্য ভারত-সরকার ইচ্ছা ক'রলে অনেক কিছুই ক'রতে পারেন। সরকারী জিনিসপত্র ক্রয়ের ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সুযোগদান, দেশের শক্তি-সম্পদের প্রতিষ্ঠা ও সড়কের উন্নতিসাধন, ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিরঙ্কুশ অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা দূর ক'রবার জন্য আইনপ্রণয়ন এবং আরও অনেক ব্যাপারে একমাত্র সরকারী শাসননীতিই ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ। এই জন্যই এদেশের হিতকামী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা এই সম্পর্কে এত বেশী করে মনে আসে।

এবার নিছক কুটীর-শিল্পের আলোচনায় ফিরে আসা যা'ক। কাঁচা মালের উপরে ভিত্তি ক'রে কুটির-শিল্পের যে বিভাগ করা যায়, তা'ই সর্বদিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য। বিভাগগুলি মোটামুটি এইরূপ :—প্রথম, তুলা পশম এণ্ডি মুগা ও রেশম-শিল্প; যেমন,—হস্তচালিত তাঁতে সুতা তৈরী ও বস্ত্রবয়ন, রঙ ছোপানো, ছাপা কাপড় ইত্যাদি: দ্বিতীয়, ধাতুশিল্প; যেমন,—পিতল তামা এলুমিনিয়ম কাঁসার বাসনপত্রাদি, ছুরি কাঁচি লাঙ্গলের ফলক পেরেক কাস্তে ইত্যাদি লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প: তৃতীয়, কাষ্ঠ-শিল্প; যেমন,—চর্ম্মশোধন, জুতা, চটি, চামড়ার ব্যাগ, ইত্যাদি নির্ম্মাণ; পঞ্চম বালুকা ও মৃৎশিল্প; যেমন—ইট ও টাইল নির্ম্মাণ, মৃৎপাত্রাদি গঠন: ষষ্ঠ, খাদ্য শিল্প; যেমন,—টিনের কৌটাতে খাদ্য-রক্ষণ, সবেদা মিষ্টান্ন তৈল ইত্যাদি তৈরী: সপ্তম—বিবিধ শিল্প; যেমন,—বিড়ি-তৈরী, সোনারূপার কাজ, বই-বাঁধাই, অলংকার-নির্ম্মাণ, ঝিনুকের বোতাম তৈরী, গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধনশিল্প, শিংয়ের বোতাম চিরুণী, কাগজ উৎপাদন ইত্যাদি।

কুটীর-শিল্পগুলির সমস্যা প্রধানত একই প্রকারের; সেইজন্য সমষ্টিগত ভাবেই এদের উন্নতির অন্তরায়গুলির আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, কাঁচা মালের দিক দিয়ে কারিগরদের খুবই অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। কারিগররা ভাল জিনিষ পায় না, আবার যা'ও পায় তা'ও নিকৃষ্ট ধরণের। কিনতেও হয় বেশ চড়া দামে। এই-জন্য সামূহিক বা সমবায় প্রথায় কাঁচা মাল কেনার ব্যবস্থা হওয়া সমীচীন। অবশ্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আপন ইচ্ছায় গ'ড়ে উঠবে না। প্রথম প্রবর্তনার ব্যাপারে

সরকারকে অনেকখানি উৎসাহ দিতে হ'বে। দ্বিতীয়ত, মান্ধাতা-আমলের যন্ত্রপাতির সাহায্যে বয়নকার্য, তেল-উৎপাদন, চামড়ার কাজ, মাটির জিনিস তৈরী ইত্যাদি হ'য়ে থাকে। উদ্ভাবক ও বৈজ্ঞানিকেরা বৃহদায়তন শিল্পাদি নিয়েই ব্যস্ত আছেন। এদিকেও যে যথেষ্ট সুযোগ র'য়েছে তা' ইতিমধ্যে নিখিল ভারত পল্লীশিল্প সমিতি ও নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের কার্যধারায় প্রমাণিত হ'য়েছে। তবে, উন্নত প্রণালীর নৈপুণ্যকে লোকপ্রিয় ক'রবার জন্য প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাসংস্থা, বৃত্তিদান ইত্যাদি প্রবর্তিত হওয়া দরকার। এ বিষয়েও রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও প্রবর্ত্তনার যথেষ্ট অবসর র'য়েছে। তৃতীয়ত, কাঁচা মাল কিনবার, মজুত ক'রবার ও পাকামাল বেশী দামে বিক্রয়ের জন্য কিছুদিন ধ'রে রাখবার উপযোগী অর্থ কুটীর-শিল্পীদের হাতে নাই। নিঃস্ব দরিদ্র কারিগরকে ধারই বা দেবে কে? তাই যে ফড়ে কারিগরকে দাদন দেয়, সে-ই পাকা মাল পাবার দাবিদার হ'য়ে কারিগরকে ফাঁকি দিয়ে মুনাফার সবখানিই ভোগ করে। কুটীর-শিল্পে অর্থ-সরবরাহের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তব্য অনেকখানিই র'য়েছে। চতুর্থত, পণ্যবিক্রয় সমস্যাই কারিগরদের পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে। কালের গতিতে মানুষের রুচি বদলায় সত্য, কিন্তু রুচি তো মানুষেরই ইচ্ছাজাত। তাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনে কুটীর-শিল্পের সর্বাগ্রগণ্যতা মেনে নিলে মানুষের রুচির মোড় এই দিকে অনেকখানি ঘুরে আসবে। সৌষ্ঠব, সুচারু পালিশ ও একই প্রকারের গুণের অভাবে কুটীর শিল্পের বিক্রয়ের বাধা জন্মে। উন্নততর সংগঠন ও সমবায়-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ভাল যন্ত্রপাতি কিনে এদিকেও খুব উন্নতি করা যেতে পারে। আবার বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় কুটির-শিল্পের দর বেশী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের বাজার একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে অথবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দর এমনভাবে কমাতে বাধ্য হ'য়েছে যে, এতে ক'রে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থও কারিগরদের ভাগ্যে জুটে না। সংগঠনের অভাবই ইহার মূলিভূত কারণ। সংঘবদ্ধভাবে কারিগরেরা যদি সজাগ না হয়, তবে এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের আশা নাই। এখানেও রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে। পঞ্চমত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের চুঙ্গী প্রভৃতি শুল্কের চাপে কারিগরেরা ভারাক্রান্ত। কেননা,—এই শুল্কের টাকা তা'দেরকে নিজেদেরই দিতে হয়, ভোগীর ঘাড়ে চাপানোর সুযোগ মিলে না।

এতদিন পর্যন্ত সরকারী ও বে-সরকারী উপেক্ষার ফলে কত কুটীর-শিল্পই যে লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায় হ'য়ে প'ড়েছে তার ইয়ত্তা নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জন-সাধারণের দৃষ্টি এদিকে কিছুটা পড়েছে। কুটীর-শিল্পের সমস্যা জাতীয় সমস্যা। জাতীয় শিল্প-বনিয়াদে কুটীর-শিল্পের স্থান দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হ'লে রাষ্ট্রের চিরাচরিত নীতির আমূল সংশোধন করা দরকার। গবেষণা, অর্থ সরবরাহ ও পণ্যবিক্রয়সমস্যা—এই তিনটি দিকে রাষ্ট্র যদি হস্তক্ষেপ করেন, তাহ'লে কুটীর-শিল্পের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। কুটীর-পদ্ধতিতে পণ্যের পর পণ্য যদি উৎপন্ন করা যায়, তাহ'লে কুটীর-শিল্পের একটা ব্যাপক প্রসার হ'তে পারে। এর জন্য গবেষণার প্রয়োজন। যদি সাধারণ পণ্য-উৎপাদনে সস্তা প্রণালী উদ্ভাবন এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন পণ্য উৎপন্নের কুটীররীতিকে সস্তা ক'রবার উপায় ও প্রণালী বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভাবন ক'রতে পারেন এবং রাষ্ট্র যদি এইরূপ গবেষক ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক বদান্যতা ক'রতে পারেন, তা'হ'লে কুটীর-শিল্প আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারে। আবার এই সমস্ত গবেষণার ফল জনসাধারণকে জানিয়ে তা'দের অভিমতও গ্রহণ ক'রতে হবে—ইহাও রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। ইহার পরেই আসে অর্থ-সরবরাহের কথা। ভাড়া ও ক্রয় পদ্ধতিতে (Hire purchase system) নূতন ও উন্নত যন্ত্রপাতি কারিগরকে দেওয়া দরকার। নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রদর্শনি-উদ্‌ঘাটন, এমন কি মেরামতির জন্যও মিস্ত্রীর ব্যবস্থা প্রথম প্রথম রাষ্ট্রকেই ক'রতে হবে। কারিগরি শিক্ষাসম্পর্কিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অংশবিশেষ কারিগর গ'ড়বার পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছে। অর্থ-সরবরাহের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের কর্তব্য অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু পণ্যবিক্রয় সমস্যাই কারিগরি সমস্যার মূল কথা। দেশীয় সরকার যদি নিজের প্রয়োজনে এই কুটীর-শিল্পের প্রতি মূল্য ও গুণ-পক্ষপাত দেখান তা'হলে

অনেক উপকার হয়। ইহা ছাড়া সরকারী চাকুরিয়াগণ ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কুটীর-শিল্পের ব্যবহার 'ফ্যাসানের' পর্যায়ে তুলে নিতে পারেন তো জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ ইহার অনুকরণ ক'রবে। অবশ্য রাষ্ট্রের অধীনে অথবা পৃষ্ঠপোষকতায় বাজারেব সংবাদ-বিভাগ থাকা দরকার। এই বিভাগ ক্রেতার রুচি-অনুসারে কারিগরকে নূতন নূতন প্যাটার্ণ ও নমুনা দিয়ে সাহায্য ক'রবে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে কাঁচা মালের ক্রয় ও কারিগরদের মধ্যে বণ্টন, পাকা মালের সংগ্রহ ও বৃহদায়তন ভিত্তিতে বিক্রয় হওয়া সমীচীন। এত সমস্ত ব্যবস্থা ক'রেও যদি কোন বিশেষ শিল্প অন্য প্রকার উৎপাদন রীতিতে উৎপন্ন সেই শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় চড়া দামে বিক্রীত হ'তে বাধ্য হয়, তাহ'লে উভয় রীতিতে একই শিল্পের উৎপাদন-ব্যয়ের অসাম্য থাকলেও কিছু কালের জন্য কুটীর পদ্ধতিতে শিল্পের উৎপাদন হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন-মতে সরকারী বদান্যতাও এই কুটীব-শিল্পের উপরে পড়া উচিত। তবে সংরক্ষণ-শুল্কের আকারে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের দর বাড়ানোর কাজে ইহা যেন নিয়োজিত না হয়। কৃষি-প্রধান ভারতের মৌসুমী বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কুটীর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

হয়তো বা এমন ধারণা হ'তে পারে যে, বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষতি ক'রে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীর-শিল্পের প্রচারের কথাই এই নিবন্ধে বলা হ'য়েছে। পক্ষান্তরে, বৃহদায়তন পদ্ধতিতে জাতীয় সম্পদ শোষণ ক'রতে হ'লেও, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রসার হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা র'য়েছে। শেষেরটির উন্নতি ক'রতে যেয়ে প্রথমটির সর্বনাশ সাধন—এ যেন নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা-ভঙ্গ ক'রবারই ন্যায়। আসল কথা হ'চ্ছে এই যে, ভারতের অদ্ভুত ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য আমাদের জাতীয় জীবনে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীর-শিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থান থাকবেই। সাময়িক বা দলীয় আর্থিক সুবিধার দিকে তাকিয়ে এদের উৎখাত করা চ'লবে না। শিল্পনীতিকে এমনভাবে সংস্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'বে, যা'তে ক'রে এই ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটীর-শিল্প অগ্রসর হ'য়ে জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদকে দৃঢ় ও সুরক্ষিত, জাতীয় জীবনকে সহজ ও সাবলীল, জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত ও পূর্ণ ক'রে তুলতে পারে—সেই বিষয়ে দেশীয় সরকার ও জনসাধারণের ভিতর সংঘবদ্ধ সমন্বয়-নীতির (Principle of Co-ordination) ব্যাপক বিস্তৃতির যথেষ্ট প্রয়োজন র'য়েছে।

হাসির গান

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হাস্‌ব না কি? হাস্‌ব না কি?
দেখ্‌বে, কেমন হাস্‌তে পারি?
হাস্‌তে গেলেই কেবল আমার
বেজায় কাশি সঙ্গে তারি।
হায়রে হাসি বলিহারি।
ঐ দেখ্‌ না বিপিন খুড়ো
একটি দাঁতে ছড়ান হাসি।
কালো হাসি হাসেন হোথায়
দেখিয়ে মিশি গদাই মাসী।

ছাঁটা গোঁফের পাশে হাসেন
বাঁকা হাসি রতন ভায়া।
নন্দমামার গোঁফের ঝোপে
উঠেই হাসি মিলায় ছায়া।
হায়রে হাসি বলিহারি।
চোখ নাচায়ে হাসি সারেন
বিলাত-ফেরত তুলসী বাবু।
চোপ্‌সানো গাল খেলিয়ে হাসেন
পটলদাদার শালা হাবু।

হায়রে হাসি বলিহারি।
রং-বেরঙের চটকদারী॥

কিশোর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকর্ণামৃত

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বালেন মুগ্ধ চপলেন বিলোকিতেন;
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তম্।
লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলা কিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্ম।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে কিশোর কৃষ্ণের যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, উদ্ধৃত শ্লোকটি তাঁহারই একটি সুন্দর নিদর্শন।

"সেই কিশোরের (কৃষ্ণের) মুগ্ধ চপল চাহনিতে আমাদের মনে কি অদ্ভুত চপলতা আনয়ন করিতেছে। এখন সেই লোচন-রসায়ন লীলা-কিশোরকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি।"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে এইরূপ বহু শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরম আস্বাদ্য নবকিশোর রূপ ধ্যান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও দেখিতে পাই রঘুপতি উপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন "বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।" কিশোর বয়সই ধ্যান করিতে হয়। মধুর রসাত্মক ভজনে শ্রীকৃষ্ণ পরম মধুর এবং তাঁহার কিশোর বয়সটিই মধুরাতি মধুর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার ধ্যানমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলেন:

"গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর"

এই মূর্ত্তি মাধুর্যের, ঐশ্বর্যের নহে। মধুর রসে অভিষিক্ত কিশোর কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাব্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের অসুরঘাতনাদিপরায়ণ ঐশ্বর্য-লীলাবিগ্রহের অপেক্ষা নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য রসবিগ্রহের কল্পনা! লীলাশুক যেমন এই কিশোর কৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিতার উপর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শ্রীচৈতন্য এই কর্ণামৃত রাত্রিদিন আস্বাদন করিতেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।

অর্থাৎ যে পাঁচটি কাব্য মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, তাহার মধ্যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত অন্যতম। মহাপ্রভু কৃষ্ণবেম্বাতীরে দেবমন্দিরে এই অমূল্য গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণ সব 'বৈষ্ণব চরিত'; সকল বৈষ্ণব কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ করেন। ইহা দেখিয়া তিনি গ্রন্থখানি পাঠ করিলেন এবং বুঝিলেন যে, এই গ্রন্থ প্রেমভক্তির রত্ন পেটিকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কর্ণামৃত সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
তাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমাজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

দক্ষিণ ভারত ছিল ভক্তি ধর্মের প্রিয় নিকেতন। কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুই মহামূল্য রত্নসদৃশ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত হইতে লইয়া প্রথমে রায় রমানন্দকে দিলেন এবং পরে তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণকে এই গ্রন্থের রসাস্বাদন করাইলেন।

'কর্ণামৃত' তখন বৈষ্ণবসমাজে যে কি আদরের বস্তু হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহাকে একখানি ধারাবাহিক গ্রন্থ বলা যায় কিনা সন্দেহ; কারণ, গ্রন্থের শ্লোকগুলির (সংখ্যা তিন শতের উপর) দ্বারা যে কোনও একটি বিশেষ লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও নহে। তথাপি প্রেমিক ভক্তের উচ্ছ্বাস বলিয়া ইহা সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। মনে হয় যেন কোনও তীব্র দৈব প্রেরণা হইতে এক একটি শ্লোকস্বরূপ মুক্তা জন্ম লাভ করিয়াছে—কর্ণামৃত সেই সকল মুক্তারই যেন এক ছড়া মালা। ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা'। অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থে এই টীকার উল্লেখ আছে:

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল।

এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রথমে হরিভক্তি বিলাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে ভাগবত সন্দর্ভ লিখিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই ষট্ সন্দর্ভ প্রথমে গোপাল ভট্ট গোস্বামীই আরম্ভ করেন। একথা শ্রীজীব

নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন" পদের দ্বারা তিনি যে গোপাল ভট্টকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। গোপাল ভট্টের 'শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা' টীকায় শ্রীরূপের গ্রন্থ হইতেও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, কর্ণামৃত দাক্ষিণাত্য দেশের গ্রন্থ হইলেও এবং গোপাল ভট্ট নিজে দাক্ষিণাত্যবাসী (দ্রাবিগবনি-নির্জরিঃ) হইলেও কর্ণামৃতের টীকা তিনি বৃন্দাবন আসিবার পরেই লিখিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে (মধ্য লীলা) যে, মহাপ্রভু যখন কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ স্বামীকে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাকে বেঙ্কট ভট্ট নামে এক বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া যান। এই বেঙ্কট ভট্টের গৃহে মহাপ্রভু চারি মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা রসে কাল কাটাইয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট এই বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভুর অলোকসামান্য চরিত্র সম্ভবতঃ গোপাল ভট্টের তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিবার কিছুকাল পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু নীলাচল হইতে তাঁহার জন্য ডোর বহির্বাস পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপল ভট্ট বৃন্দাবনে স্বীয় পাণ্ডিত্য, ভক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণে ষট্ গোস্বামীর মধ্যে একজন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

জয় রূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে গিয়া এই গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোপাল ভট্টের টীকা সাধারণের নিকট দুষ্প্রাপ্যই ছিল। বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ইহা ১৩২২ সালে প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল, গোপাল ভট্টের টীকাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্ণামৃতের একখানি টীকা প্রনয়ণ করেন; উহার নাম 'সারঙ্গ রঙ্গদা' টীকা। সারঙ্গ শব্দের অনেক অর্থ আছে, কিন্তু এখানে বোধ হয় কন্দর্প। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন। এই অর্থে সেই নবীনমদনের যাহা আনন্দবৰ্দ্ধিনী তাহাকে 'সারঙ্গ রঙ্গদা' বলা চলে। ঠাকুর যদুনন্দন ইহার সরল পদ্যানুবাদ করেন। ইনি কৃষ্ণদাসের গোবিন্দ লীলামৃতেরও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। যদুনন্দন ঠাকুরের 'কর্ণানন্দ' ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ।

কর্ণামৃত গ্রন্থে তিনশতের অধিক শ্লোক আছে। প্রথম শতকে ১১২টি, দ্বিতীয় শতকে ১১১ এবং তৃতীয় শতকে ১০৭টি শ্লোক। এতদ্‌ব্যতীত বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের একখানি কোষ বাক্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ৩০টি অতিরিক্ত শ্লোক আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বোধহয় প্রথম শতকের টীকা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম শতকেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের গ্রন্থ শেষ হইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ১১০ সংখ্যক শ্লোকে লীলাশুক ভনিতার ছলে যে শ্লোকটি দিয়াছেন, তাহা এই :

ঈশানদেব-চরণাভরণেন নীবী-
দামোদরস্থিরযশস্তবকোদ্‌ভবেন।
লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃত বহতু কল্পশতান্তরেঽপি।

হে ঈশান দেব, যিনি ঈশান অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও দেব (ক্রীড়া পরায়ণ), হে কৃষ্ণ (নীবী দামোদর), তোমার স্থির যশঃ রূপ কুসুমগুচ্ছ সম্পদে আমার (লীলাশুকের) দ্বারা রচিত এই কৃষ্ণকর্ণামৃত যেন কল্পশত ব্যাপিয়া তোমার ভক্তগণের চিত্তে প্রবাহিত হয়!

এইরূপ প্রার্থণার দ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তিই সূচিত হয়। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর টীকাও এইখানে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, পরবর্ত্তী শ্লোকশতকদ্বয় কি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃত? অথবা অন্য কেহ বিল্বমঙ্গলের অনুকরণে শ্লোকগুলি রচনা করিয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নামে চালাইয়া দিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে একখানি সম্পূর্ণ ও সটীক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের পুথি আছে; উহার টীকাকারের নাম পাপবল্লয় সুরি। মাদ্রাজ নিবাসী এই টীকাকার কতদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,

হা জানা যায় না। ইহার গ্রন্থখানিতে তিন শতকই আছে। কেহ এই পুথি লইয়া গবেষণা করিলে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইতে পারে।

বিল্বমঙ্গলের কবিত্ব জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং রূপগোস্বামীর স্তবাবলীর সহিত তুলনীয়। ব্রজগোপীদের বিরহবর্ণনায় তিনি যে অনুভূতি ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। তাঁহার 'হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈক বন্ধো' (৪০ শ্লোক) বা 'অমূল্যধান্যনি দিনান্তরাণি' বিরহগানে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোক দুইটি পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ইহার একমাত্র তুলনাস্থল বোধহয় মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসিদ্ধ শ্লোক 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।' —যে শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত কবির জীবনলীলার অবসান হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কর্ণামৃতের কবিতাগুলিতে যে লালসাপূর্ণ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মনে হয় এ যেন কবিত্বের জন্য কবিত্ব নয়—হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে একটি অনবচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা শ্লোকগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চিরনবকিশোর, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যে চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সেই অন্তশ্চক্ষু লইয়াই গোবিন্দদাস লিখিলেন—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

তাঁহার সেই তরুণ লাবণ্য গোপীদের 'ঘরসরবস্ব যৌবন' সকলই হরণ করিয়াছে। তাঁহার কটাক্ষ 'জগৎ অনঙ্গময়' করিয়া দেয়। মধুর তাঁহার বেণুরব; এই বেণুরবের মাধুর্য লীলাশুক যে ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতেও তাহা নাই, জয়দেবেও নাই। ত্রিভুবনের সকল মাধুর্য লুণ্ঠন করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ গঠিত হইয়াছে। তাই লীলাশুক কেবল মধুর মধুর মধুর বলিয়া তাঁহার বর্ণনার সীমা টানিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মকে কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, তাই বাক্য মন তাঁহার নাগাল না পাইয়া ফিরিয়া আসে। আর এই মধুর রূপের বর্ণনায়ও বাক্য অগ্রসর হইতে পারে না; কেবল মধুর মধুর বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হয়ঃ

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্। ১২ শ্লোক।

মধুর রসের এরূপ উন্নতোজ্জ্বল অভিব্যক্তি আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত মহাপ্রভুর এত প্রিয় হইয়াছিল। কৃষ্ণবেণা নদীতীরের মন্দির হইতে এই পুথি তিনি লেখাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমধর্মের অনুকূল এই গ্রন্থখানি যে তাঁহার নিকট কত মূল্যবান ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়; রাত্রিদিন জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক এবং চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিতার সহিত তিনি ইহা আস্বাদন করিতেন। সেই হইতে কৃষ্ণকর্ণামৃত বৈষ্ণব পদাবলীর উপরও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাগানুগা ভক্তির মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত দাক্ষিণাত্যদেশীয় বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্লোকেরও আলোচনা আবশ্যক হইবে।

আরতি-দীপ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি.এ., বাণীকণ্ঠ

আরতি-দীপ সব ক'টি মোর জ্বললো কি?
তাঁহার পূজার সব ফুলদল খুললো কি?
অপরূপ এই ধরণীতে, এসেছিলেম পূজা দিতে
সেই প্রাণেশের চরণতলে
আপন আমার ভুললো কি?
—ব্যথা ও বেদন সার্থক হয়ে
সোনার ফসল ফললো কি?

অন্তরায়

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১০

স্থানীয় কালীবাড়ীতে প্রতিবৎসর এই সময় বড় একটা মেলা হয়। এই মেলা সাতদিন থাকে। এই উপলক্ষে বহুদূর অঞ্চল হইতে লোক পূজা দিতে আসে এবং মোটের উপর শতাধিক পাঁঠা বলি হয়। গ্রামের অন্যান্য পুরোহিতের মত রসিকও স্থির করিল, এই সময়টা সে মন্দিরেই কাটাইয়া দিবে।

এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে সব পুরোহিত আছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্পাধিক অলস প্রকৃতির। জীবনে গতি ও বেগের সহিত কখনো তাহাদের পরিচয় হয় না। দাবা খেলিয়া, পাশা খেলিয়া, দিবানিদ্রা দিয়া, তামাক টানিয়া, অথবা বয়স হইলে কিছু সময়ের জন্য সন্ধ্যাপূজা করিয়া পরম নিশ্চিন্তে তাঁহারা জীবন কাটাইয়া দেন। এমনি নিয়মে হিন্দু-সমাজ বাঁধা যে, তাঁহাদিগকে ডাকিতেই হইবে। হয়তো সকল দিন ডাক আসে না। যখন ডাক না আসে, তখন স্ত্রী-পুত্র লইয়া উপবাস করেন, অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকেন। আবার যে দিন ডাক আসে সে দিন শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইয়া উঠে—স্ত্রীপুত্রের মুখে হাসি দেখা দেয়। এই ভাবেই তাঁহাদের জীবন গড়াইয়া চলে।

কিন্তু প্রতিবৎসর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই সময়টায়। মায়ের মন্দিরের আশেপাশে ঘুরিয়া মেলায় তাঁহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া লন।

মায়ের মন্দিরের পাশ দিয়াই গ্রামের ক্ষুদ্র নদটি বহিয়া গিয়াছে। সকলেই এই নদীতে স্নান করিয়া তবে মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে যায়। অন্যান্য পুরোহিতের মত রসিকও মন্দির ও ঘাটের আশেপাশে অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটি ভদ্রলোক মন্দিরে ডালা দিতে আসিয়াছিলেন। রসিক ও আর একজন পুরোহিত এক সঙ্গে তাঁহাকে যাইয়া ধরিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বলিলেন যে, অন্য পুরোহিতটি আগে ধরিয়াছে। সুতরাং রসিককে চলিয়া আসিতে হইল।

কিন্তু পরক্ষণেই রসিকও আর একটি লোক পাইল। সে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ—ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। রসিক তাহাকে দেখিয়াই বুঝিল, ইহার নিকট হইতে সে কিছু টাকা আদায় করিতে পারিবে। সাধারণ স্নানের ঘাটে স্নান করিতে না দিয়া, তাহাকে সে একটু দূরে লইয়া গেল। ঘাটে নিয়া তাহার হাত খানা মেলিয়া ধরিয়া কতক্ষণ তাহার দিকে চহিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার জীবনে বহু দুর্ভোগ আছে। শুধু স্নান পূজায় তা যাবে না। তুমি একটা অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করে নাও।

রসিকের এই অসীম ক্ষমতা দেখিয়া লোকটি ভীত হইয়া পড়িল। সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কত লাগবে?

—তিন টাকা সোয়া পাঁচ আনা।

লোকটি আর প্রত্যুত্তর করিল না। গুনিয়া টাকাটা বাহির করিয়া দিয়া পরকালের একটা সঙ্কট কাটাইয়া লইল।

স্নান শেষ করিয়া তাহারা মন্দিরের দিকে চলিল। মন্দিরের পথের দুই দিকে এই উপলক্ষে পাঁচ ছয় খানা ডালার দোকান বসিয়াছে। রসিক অগ্রসর হইতেই তাহাদের তিন চার জন তাহাকে ডাকিল। কিন্তু সে কোন দিকে না চাহিয়া একটি দোকানে যাইয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতে অনেক ডালা সাজান রহিয়াছে। একখানা চিনির সন্দেশ, দুখানা বাতাসা, একখণ্ড শসা, একটু ভেজান কাঁচা মুগ ডাল ও দুই টুকরা নারিকেল—ইহাই ডালার সজ্জা। লোকটি দুই আনা দাম দিয়া আবার রসিকের সঙ্গে চলিল। যাইবার সময়ে রসিক পিছন দিকে হাত বাড়াইয়া দোকানীর নিকট হইতে দুইটি পয়সা আদায় করিয়া নিল।

পথে ফুল ও মালার দোকানও ছিল। কিন্তু লোকটি ফুল কিনিল না। সে বাড়ী হইতে ফুল ও বেলপাতা লইয়া আনিয়াছিল। তাহা নিয়াই সে মন্দিরে চলিল।

রসিকের চক্ষু দুইটি সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘুরিতেছে। নূতন লোক দেখিলেই সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তিনি পূজা দিবেন কিনা। মন্দিরের কাছে একটি লোক মন্দিরের গায় মাথা রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতেছে এবং তাহার দুই চোখ দিয়া অঝোরে জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

রসিক তাহার দিকে একবার চাহিল, যেমন একজন পুরাতন নার্স একজন রোগক্লিষ্ট রোগীর দিকে তাকায়। কিন্তু রসিক তাহাকে পূজার কথা বলিল না।

মন্দিরের দুয়ারে মেয়েদের অত্যন্ত ভীড় হইয়াছে। তাহাদিগকে বাহিরে মিনিট খানেক দাঁড়াইতে হইল।

একটি মেয়ে তাঁহার ছোট একটা শিশু লইয়া মন্দিরে আসিয়াছে। মেয়েটি তাঁহার খোকার মাথা মন্দিরের দুয়ারে রাখিয়া বলিল, নমঃ করো খোকা, নমঃ করো। খোকা স্বেচ্ছায় মাথা নোয়াইল। মেয়েটি খোকার মাথা মন্দিরের দুয়ারে ঠোকাইতে ঠোকাইতে কহিল, নমঃ নমঃ নমঃ।

সঙ্গের লোকটি খোকার দিকে একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার পর রসিকের সহিত মন্দিরের ভিতর উঠিয়া গেল এবং ঠিক দুই এক মিনিটের ভিতরই পূজা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

রসিক আবার ঘুরিতে লাগিল। শিকারী যেমন শিকারের সন্ধানে চারিদিকে তাকায়, সে তেমনি ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। একটি মেয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে রসিক সূর্য্যস্তব পড়িয়া শুনাইল। মেয়েটি দু'টি পয়সা দক্ষিণা দিয়া চলিয়া গেলেন। রসিক তাঁহাকে ডালা দিবার কথা বলিল। কিন্তু তিনি ডালা দিবেন না। মন্দিরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই দিনটায় মন্দিরে যথেষ্ট পাঁঠা পড়ে। যাহাদের পাঁঠা মানত থাকে, তাহারা প্রায়ই এই দিনটায় বলি দিতে আসে। অনেকে পূজা ও দক্ষিণা সমেত পাঁঠার দাম পুরোহিতকে ফুরণ করিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে রসিক দুইটি চাষা শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে সমস্ত খরচসহ পূজা শেষ করিয়া দিবার চুক্তিতে পাঁচ টাকা হিসাবে নিয়াছে। দৈবক্রমে আর একটি ভদ্রলোক তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। সেই লোকটি আর একজন পুরোহিতের সহিত ছয় টাকায় পূজা শেষ করিয়া দিবার চুক্তিতে কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু পুরোহিতটি সম্মত হইতেছিলেন না। রসিক তাঁহাদিগের উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল। হঠাৎ পুরোহিতটি অন্য দিকে তাকাইতেই, রসিক চারিটি অঙ্গুলি তুলিয়া ভদ্রলোককে সঙ্কেত করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে কিনিল একটি মাত্র পাঁঠা এবং বলির সময় যখন মন্দিরের চারিদিকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, তখন মন্দিরের তিন কোণে তিন জনকে দাঁড়া করাইয়া দিল এবং তাহাদের প্রত্যেককেই সে বলিল যে, তাহারই পাঁঠা বলি হইতেছে। বলির পর আশীর্ব্বাদী আনিয়া সে হাতে দিবে। তাহার পর আর কোন দিকে না চাহিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতে হইবে। এই ব্যবস্থায় কোন গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। চাষা লোক দুইটি আশীর্ব্বাদী লইয়া চলিয়াও গিয়াছিল। কিন্তু গোলমাল বাধাইল প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিতটি। রসিক যখন অত অল্প টাকায় স্বীকার হইয়াছে, তখন যে ইহার ভিতর গোলযোগ আছে তাহা সে পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল। এইবার ব্যাপারটা কোন রকমে জানিতে পারিয়া ভদ্রলোকটিকে সব ঘটনা বলিয়া দিল। ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর রাগিয়া গেলেন। তিনি দেবকুমারের পরিচিত লোক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি রসিককে একরকম জোর করিয়াই দেবকুমারের কাছে লইয়া গেলেন।

রসিক প্রথমাবধিই ঘটনা অস্বীকার করিতেছিল। কারণ অপর দুইটা লোককে তখন আর সাক্ষ্য হিসাবে আনার কোনই সম্ভাবনা নাই। বাড়ী পৌঁছিয়া তাহার আর অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করিতে হইল না। সে বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিল, হঠাৎ দেবকুমার অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কয়বার ভেদবমি হইয়াছে এবং বাড়ীতে কেহ রোগের নাম উচ্চারণ করিতেও সাহস পাইতেছে না।

ইতিপূর্ব্বেই ডাক্তার ডাকিতে লোক গিয়াছিল। সে এখন বুদ্ধি করিয়া গীতা ও তাহার মাকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

অল্প কয়দিন পূর্ব্বেই কর্ম্মকার বাড়ীর ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দেবকুমারের উপর তখনো গীতার ক্রোধের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া সে সমস্ত রাগ ভুলিয়া গেল এবং তাহার মাকে লইয়া ছুটিয়া আসিল।

দেবকুমারের পেটের ভিতর তখন অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। গীতাকে দেখিয়া সে কহিল, আমাদের সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চেয়েছিলে। আমি চলে যাচ্ছি, এখন আর তার দরকার হবে না, গীতা।

গীতা তখন ভুলিয়া গেল যে, তাহার ও দেবকুমারের মা সম্মুখে রহিয়াছেন। সে দেবকুমারের শয্যার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, আমাকে ক্ষমা কর, আর কখনো জীবনে এ কথা বলবো না, বলিয়া হাতের উপর মুখ রাখিয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবু আসিলেন। তিনি আসিয়া রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং ঔষধ দিয়া আশ্বাস দিলেন, কোন ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন। এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের দিনলিপিতে যে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ অক্ষয় ও শ্রীমান্ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনার তত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনা দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেমসাধনের উপায়স্বরূপ পরমাত্ম পথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল ততই সত্য, জ্ঞান ও প্রেমময় গীতিসকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাঁহারা যতদুর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে ততদুর এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণী সকলেই প্রার্থনাসহকারে ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত যিনি যে কোন কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা, পবিত্রতা রহিয়াছে, অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃতকার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বঙ্গদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।

"আমি যে সময়ে এই অসহ্য যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতেছি, সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্ত-চূড়ামণি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া কুমারখালিতে আসিয়া কাঙ্গালের কুটীরে সপরিবারে অবস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে না বলিলেও, তিনি নিজ প্রভাবেই আমার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, সর্ব্বপ্রকার উত্তাপ সহ্য করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ও পরিষ্কার কর। অমৃত ফল ফলিবে।

"এই সময় একদিন আমার জ্বর বোধ হওয়ায় কুশাসনে শয়ন করিয়া আছি। ইহা ত শারীরিক কোন প্রকার জ্বর নহে; ইহা মর্ম্মাঘাত ও চিন্তাজ্বর, অনলদগ্ধের ন্যায় হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং নিদ্রা নাই। কিন্তু চক্ষু মুদিত এবং নিদ্রার ন্যায় অভিভূত। স্কন্ধদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত অব্যক্ত মহাদেবী জগন্মাতার একখানি অভূতপূর্ব্ব মুখ আমার মুখের উপরে প্রকাশিত হইল। শরীর চমকিত হইয়া উঠিল। এ কি ব্যাপার! ভাবিতে ভাবিতে চক্ষুর জলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হইতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। যিনি আমার মুখের উপর মুখ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ সকল তাঁহারই খেলা। তিনি অব্যক্ত হইয়াও, যে তাঁহার হয়, তাহার নিকট ব্যক্ত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন। তখন আমার

এই বিশ্বাস এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, আমি যে রূপ দেখিয়াছিলাম, সেই চিন্ময় রূপ দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলাম; এবং এক্ষণে সংসারের সকল প্রকারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বিরলে বসিয়া তাঁহার নিকটেই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমি কি ছিলাম, কে আমাকে এরূপ করিল? সংশোধন করিয়া আমার হৃদয়ফলক এমন নির্ম্মল করিল যে তাহা অব্যক্তের স্বরূপশক্তি প্রকাশের মত করিয়া তুলিল।"

সেই দিনের অবস্থা স্মরণ করিয়া কাঙ্গাল যে গানটী লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। গানটী এই:

"অপরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে প্রাণ যে আমার দিবানিশি।
১। কাঁদ্‌লে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ শত শত সূর্য্য শশী।
২। যদি রে চাই আকাশে মেঘের পাশে সেরূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।
৩। হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন এই রূপশশী;
ওরে, তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কু বাসনা মেঘ রাশি।
৪। কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে দয়া ক'রে দেখা দেয় রে ভালবাসি;
আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে, তাঁয় প্রাণভ'রে কৈ ভালবাসি।"

ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই গান শুনিবার জন্য চার পাঁচ ক্রোশ হইতে অনেক লোক আসিতে আরম্ভ করিল। এদিকে রেল-পথেও বহুদূর হইতে অনেকে আসিতে লাগিল। সকলেরই অনুরোধ তাঁহাদের গ্রামে একবার ফিকিরচাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে।

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়াই রাজসাহী চলিয়া গেলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে স্কুল-মাষ্টারী করি। আমিও কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম। কিন্তু ফিকিরচাঁদের এমন আকর্ষণ যে, প্রতি শনিবারের রাত্রিতে বাড়ী যাইতাম এবং যে একদিন থাকিতাম, সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া নূতন নূতন গান শুনিতাম। আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলের ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।

চারিদিক হইতে যখন নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, তখন কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, ফিকিরচাঁদের দল গ্রামেই হউক বা বিদেশেই হউক, যেখানেই যাইবেন, সেখানে কাহারও গৃহে অতিথি হইতে পারিবেন না, সামান্য এক ছিলিম তামাকও বাড়ী হইতে লইয়া যাইতে হইবে। তবে দলের লোকদিগের গৃহে গেলে এ নিয়ম খাটিবে না। পাছে ইহা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন।

এই সময় একদিন পরলোকগত মীর মশারফ হোসেন মহাশয় কুমারখালীতে আসিলেন। তিনি কাঙ্গালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী গৌরনদীর তটে লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশারফ হোসেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে উপদেশপ্রদান করিতেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালাসাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না —লিখিতেন "গৌরতটবাসী মশা"। এই মশার লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার "গৌরী সেতু", তাঁহার "উদাসীন ফকিরের মনের কথা", তাঁহার "গাজি মিঞা বস্তানি", আর তাঁহার অমূল্য রত্ন "বিষাদ-সিন্ধু" যে আমরা কতবার পড়িয়াছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক 'নোট' দিয়া যাইব, তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও। আমি এ বয়সে আর পারিলাম না।" আলস্যবশতঃ সে 'নোট'ও লওয়া হইল না। তিনিও আমাকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল

সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এত দিনের মধ্যে এমন একজন সাহিত্যসেবকের নাম কেহই করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ার সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় মীর মশারফ হোসেনের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

যাক্ সে কথা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর মশারফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙ্গালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরচাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙ্গাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলের লোকেরা সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন, তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবে না। মশারফ বলিলেন, "সে কি রকম কথা? তা কি হয়?" কাঙ্গাল বলিলেন, "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।" মশারফ হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত গান করিতে জানি না"। কাঙ্গাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জান না বটে, কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশারফ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন। আমরা সেই গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; মীর সাহেব এই দলের জন্য আর কোন গান পরে দেন নাই। গানটী এই :

"রবে না চিরদিন সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে!

১। এই যে আমার আমার সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটী রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।

২। সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী, সব কারসাজি ফুরাইবে;
তখন রে এক পলকে, তিন ঝলকে সকল আশা ঘুচে যাবে।

৩। তোমার এই আত্মস্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদবে সবে.
তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে।

৪। তোমার সব টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, ঘড়িগাড়ী পড়ে রবে;
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে পরের কাঁধে যেতে হবে।

৫। আগে রে ক'রে হেলা, গেল বেলা, সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে,
জগতের কার যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশার' ভরসা ভবে।"

তাহার পরই একদিন ফিকিরচাঁদের দল মীর সাহেবের লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে যাইয়া গান করিয়া আসিলেন। আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী এমন গ্রাম অতি অল্পই ছিল, যেখানে ফিকিরচাঁদের দলের গান করিবার জন্য যাইতে হয় নাই। (সমাপ্ত)

শেখ সাদীর উপদেশ

শ্রীকালিদাস রায়

বহু লোক এসে তোমার বাড়ীতে জ্বালাতন করে বড়,
তাড়াইতে চাও তবে এক কাজ কর।
তাহাদের মাঝে অভাবী যাহারা তাহাদের দাও ধার
দুই চার আনা, ফিরে আসিবে না আর।
সঙ্গতি আছে যার তার কাছে একবার চাও ঋণ,
তোমার পাড়ায় আসিবে না কোন দিন।

দরবেশ শুধু নিজেরে তরাতে চায়,
সাধনা তাহার নিজেরই তরণী গড়ে।
যতই প্রণাম কর তুমি তাঁর পায়
মাথা ব্যথা তাঁর নাইক কাহারো তরে।
আলেম হয়ত নিজে হাবুডুবু খায়
জানে না হয়ত পথারে সাঁতার দিতে,
উপদেশে তাঁর বহু লোক তরে' যায়,
যে তরী বানায় লাগে তা পরের হিতে।

এক মুঠা ভাত দাও ঘৃণ্যপশু কুকুর বিড়াল
ভুলিবে না উপকার, অনুগত র'বে চিরকাল।
কর শত উপকার, অকৃতজ্ঞ এমনি মানব
তুচ্ছ ত্রুটি ঘটে যদি, বৈরী হ'বে ভুলে গিয়ে সব।

আহারে যে জন লুব্ধ যত গুণ থাকুক তাহার
প্রত্যাশা ক'রো না কভু তার কাছে আত্মমর্য্যাদার।

মিছা কেন নিন্দা কর গালমন্দ দাও হিংসুকেরে
নিজের জ্বালায় সে যে নিশিদিন মরে জ্বলেপুড়ে।

চরণ লেহন করে যে রসনা সেই রসনার
কাছে যদি শিক্ষা লও কোন মূল্য নাই সে শিক্ষার।

দাম্পত্য জীবনে ফলিত জ্যোতিষ

শ্রীতিলক

["দাম্পত্য জীবনে ফলিত জ্যোতিষ" বিচারের প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং সাম্প্রতিক প্রচলিত পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছি, এবং এ জন্য দীর্ঘদিন গবেষণাও করিয়াছি, কিন্তু বহুবিধ অনিবার্য ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

যাহারা কোষ্ঠি বা ঠিকুজী বিচারের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী অবগত নহেন, তাঁহাদেরও যাহাতে বিষয়টি বুঝিতে কষ্ট না হয়, সেইভাবে সংক্ষেপে কতকগুলি প্রাথমিক নিয়মও লিপিবদ্ধ করা হইল।

মুহূর্ত্ত চিন্তামণি, শুদ্ধি দীপিকা, পারাশরী, ভৃগু সূত্র, লঘুজাতক, হোরাবিজ্ঞান, বিদগ্ধ তোষিণী, মানসাগরী পদ্ধতি প্রভৃতি মূল্যবান প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও মতামত এবং এলানলিও, লিলি, জ্যাডকিল, সেফারিয়াল প্রভৃতি কতিপয় বিখ্যাত লেখকের ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সারাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ হইবে।]

আজকাল বিবাহ ব্যাপারটাকে অধিকাংশ জনসমাজ মানবজীবনের শুধু একটা অতি সাধারণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মরূপে অবধারণ করিয়া থাকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে বিবাহ ব্যাপারটা আজকাল একটা বিলাসের অঙ্গ বলিয়া গণনীয়। যেন ইহার অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার বা কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের কিছু নাই। খাওয়া-পরা, বিশ্রাম বিলাসের উপকরণ, আদর্শের নামগন্ধহীন, সাংসারিক স্থূল ভোগ ছাড়া যেন ইহার আর কোনই মূল্য নাই। মানুষের স্বাস্থ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন ঔষধের প্রয়োজন হয়, আজকাল বিবাহ ব্যাপারটাও তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়াই কেহ কেহ মনে করেন।

কিন্তু নারীপুরুষের মিলিত জীবনের সুবৃহৎ গভীর অন্তর্ভূমিতে যে এক মহামন্ত্র শোধিত এই বিরাট বিশ্বসামাজিক আনন্দপূর্ণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদায়ক আদর্শ জড়িত আছে, তাহা মানব চরিত্রের ভ্রমাত্মিকতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপ মহান সত্য এবং নারী চরিত্রের মহনীয় বৈশিষ্ট্য সতীত্ব ধর্ম্ম প্রায়শঃ স্বেচ্ছাচার-প্রসূত প্রবৃত্তির বাজারে অনর্থের মূল্যে কেনাবেচার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাম ও কামনার বস্তু ইহলৌকিক এবং মোক্ষবিষয়ক আনন্দ মূর্খের অনুভূতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ফলে, দেশব্যাপী সমষ্টিগত অপকৃষ্টতা দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে। মানবের মানবত্ব পশুত্বে পরিণত হইতেছে। কালপ্রবাহের মৃত্যুরূপী তরঙ্গাবলী মানব ধর্ম্মতত্ত্বকে অবাধ গতিতে প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। মানবসমাজের রীতি, নীতি নিত্যনৈমিত্তিক পরা-ভাবের অন্তহীন আনন্দের পথকে বিকৃত করিয়া পাপচক্রের বিঘূর্ণনে পাক খাইয়া পাতাল পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছে।

পরম পবিত্র দাম্পত্যের অভাবে সমাজের নৈতিকতা ক্ষয় হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই চলে। বস্তুতঃ মানবসমাজে বংশানুক্রমিক দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘাতপ্রতিঘাত বাড়িয়া বাড়িয়া জাতীয় পরাধীনতার শৃঙ্খলও ক্রমশঃ দৃঢ়তরই করিতেছে।

পুরাকালে সামাজিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা শাস্ত্রাদি পাঠালোচনা গুরু গৃহেই সমাপ্ত হইত। বর্ত্তমান যুগে গুরুপরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যালাভের ও শ্রেণীগত শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে স্কুল-কলেজের পরানুকরণসুলভ ভাবধারাই সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যুগে রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির মূলে নৈতিকতা শিক্ষার প্রণালীগুলি ওতঃপ্রোতঃভাবে শাস্ত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে জ্যোতিশ শাস্ত্রও একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া আছে। উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও আলোচনার অভাবে এই মূল্যবান শাস্ত্রটির অস্তিত্ব পর্যান্ত এখনও যে লোপ পাইয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

উপরোক্ত রূপ বহুবিধ বাধা বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরের করুণায় ও ভারতবর্ষের মাটির মাহাত্ম্যে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত মানবমণ্ডলী এই অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রটির আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেছেন। এই শাস্ত্রে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে দৈন্য ও দারিদ্র্যের পীড়নে ইহার শিক্ষা-পরিপক্কতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই ইহার সাহায্যে ডাক্তার-কবিরাজের ন্যায় অর্থ রোজগারে মনোনিবেশ করিতে হইতেছে। শিক্ষা ও সাধনার প্রধান অন্তরায় অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে কঠিন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া থাকে। অভাবের পীড়নে এইরূপেই স্বভাব নষ্ট হইয়া শাস্ত্রটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার প্রতিকূলে বহু বাধা-বিপত্তি আসিয়া পড়ে। অর্থোপার্জ্জনের তাগিদে জ্যোতিষ শাস্ত্রটীকে অনেকক্ষেত্রে বিকৃত রূপও দেওয়া হইতেছে।

মানব জীবনে প্রধানতঃ যে কয়েকটি কর্ম্মস্তর গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ জীবন-রঙ্গমঞ্চে মানুষকে যে সব বিশিষ্ট অনুশীলনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়, সেগুলিকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিতে গেলে, আমরা জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বা জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু, এই তিনটি মাত্র ক্ষেত্র পাই। এই তিনটি মুখ্য ক্ষেত্রের মধ্যে বিবাহরূপ স্তরটি অন্যতম। মানুষের দাম্পত্য-জীবনের প্রেরণা ও প্রভাবকেই বিবাহের মূল উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করিতে হইবে। পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের

প্রভাব সামাজিক নিয়মানুবর্ত্তিতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলকে অটুট রাখিয়া তাহাকে বিশিষ্ট উন্নতি ও বিকাশের পথে পরিচালিত করে। ইহার গুরুত্বের বিষয় বিশ্লেষণ করিতে হইলে, সামাজিক রীতি-নীতি এবং শাসনপদ্ধতির কথা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। এবং এই প্রকার নানাদিকে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা থাকার জন্যই যাহাতে ইহার পটভূমিটি ত্রুটিহীন-ভাবে তৈরী হয়, তার জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিমূলক "বর-কন্যার ঠিকুজীগত" গ্রহ-নক্ষত্রের নৈসর্গিক মিলনের ব্যাপারে যেন কোন গলদ না থাকে, তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। সেটুকু করিতে হইলে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের গভীর অর্থপূর্ণ রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যদি তাহা না হইয়া গোড়াতেই, অর্থাৎ ইহার শিক্ষা ও বিচারের মধ্যে প্রমাদ থাকিয়া যায়, তবে মানবজন্মের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরণীয় বিকাশ, পরিণতি বা ধর্ম্মার্থ কামনার পূর্ণ মুক্তিরূপ আলোকক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায় না।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই ব্রহ্মসূত্র-বাক্যের অনুধাবন করিতে না পারিলে জন্মের সার্থকতা কোথায় থাকিল? মূর্ত্তিময় প্রকাশকের সংগাতে মূর্ত্তিময়ী হইতে হইলে, উর্দ্ধস্থিত এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূলে পৌছুবার জন্য তাহার নিম্নস্থ শাখাপ্রশাখারূপ পুরাণ ও শাস্ত্রাদিকেও বিশেষরূপে জানিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলেই এখন বুঝিতে কঠিন হইবে না যে, ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত নিয়মগুলি, তথা তাহার সাহায্যে বাস্তব জীবনের কর্ম্মপন্থা বিচার করিয়া বাছিয়া লওয়াও জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্ম।

দৈনন্দিন জীবনে দাম্পত্য-ভাবটির সুসঙ্গতি বজায় রাখিবার জন্য কি ভাবে নিজেকে পরিচালিত করিতে হয়, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহাও ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন।

ফলিত জ্যোতিষ-বিচার সম্বন্ধে যাহাদের কিছুই জ্ঞান নাই, তাহাদের জন্য প্রাসঙ্গিকক্রমে কতকগুলি প্রাথমিক সংজ্ঞানির্দ্দেশক, রাশি, গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থান, প্রকৃতি এবং গুণাগুণের আভাষ এখানে দেওয়া হইল।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন, এই দ্বাদশটি রাশি লইয়া রাশিচক্র কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর এই ছয়টি রাশি রাত্রিতে বলবান এবং মীন ভিন্ন অবশিষ্ট রাশিগুলি দিবাতে বলবান। মীন দিনে রাত্রে সমান বলবান্।

আবার, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীন, এই সাতটি রাশি শীর্ষোদয় বলিয়া কথিত এবং মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মীন এই ছয়টি পৃষ্টোদয়। মীন উভয়োদয় রাশি বলিয়া কথিত।

ও পৃষ্টোদয়ের অর্থ এই যে, গ্রহগণ রাশিচক্র-পরিভ্রমণ কালে, জাতকের জন্ম-সময়ে যখন যে রাশিতে থাকে, তখন সেই রাশি 'শীর্ষোদয়' হইলে ভাব বা দশা কালে তাহাদের (রাশ্যাধিষ্ঠিত গ্রহদের) দেয় ফলাফল নির্দ্দিষ্ট পরিমিত সময়ের প্রথমার্দ্ধে দান করে। ঐরূপ পৃষ্টোদয় সংজ্ঞক হইলে শেষার্দ্ধে ফলাফল দান করে, ইহাই বুঝায়।

উপরোক্ত দ্বাদশ রাশি, প্রত্যেকের এক একটি করিয়া অধিপতি গ্রহ আছে। অধিপতি গ্রহ মানে কি বুঝায় তাহা জানা দরকার। কোন একটি দেশের রাজা যেমন সেই দেশের অধিপতি, এবং দেশবাসী প্রজাগণ যেমন রাজার শাসননীতি মানিয়া চলে, সমগ্র দেশের মধ্যে যেমন রাজারই একাধিপত্য বজায় থাকে, তেমনই এক একটি রাশিরও এক এক জন রাজা বা অধিপতি গ্রহ থাকে এবং সেই রাশির উপর অধিপতি গ্রহের একাধিপত্য থাকে। রাশ্যাধিষ্ঠিত গ্রহের কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তির বলে কিরূপে জাতকের জীবন প্রভাবিত এবং পরিচালিত হয়, তাহা পরে জানা যাইবে।

এক একটি রাশির আবার দিক্ বর্ণ প্রভৃতি প্রকৃতিগত গুণাগুণ আছে। যথা, মেষ রাশি রক্ত বর্ণ, বৃষ রাশি শ্বেত বর্ণ, মিথুন হরিদ্রা বর্ণ, কর্কট পাটল বর্ণ, সিংহ পাণ্ডুর বর্ণ, কন্যা বিচিত্র বর্ণ, তুলা কৃষ্ণ বর্ণ, বৃশ্চিক নীল এবং পীত, ধনু পিঙ্গল, মকর বিচিত্র বর্ণ, মীন রাশি মলিন বর্ণ বিশিষ্ট।

মেষ, সিংহ ও ধনু রাশি পূর্ব্বদিকের অধিপতি, বৃষ, কন্যা ও মকর রাশি দক্ষিণ দিকের অধিপতি, মিথুন, তুলা ও কুম্ভ রাশি পশ্চিম দিকের অধিপতি, এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাশি উত্তরদিকের অধিপতি।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ইহারা ক্রূর, পুরুষ, ওজ এবং বিষম ভাব যুক্ত রাশি।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন ইহারা সৌম্য, স্ত্রী, যুগ্ম, ও সমভাব যুক্ত রাশি।

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর—ইহারা চর রাশি।

বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ—ইহারা স্থির রাশি।

মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন—ইহারা দ্ব্যাত্মক রাশি।

আবার, মেষ, সিংহ ও ধনু ইহারা অগ্নিরাশি। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ ইহারা বায়ুরাশি। বৃষ, কন্যা ও মকর ইহারা পৃথ্বীরাশি। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন ইহারা জলরাশি।

দ্বাদশ রাশিকে পুনরায় হ্রস্ব, দীর্ঘ ও সম এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা মেষ, বৃষ, কুম্ভ ও মীন, ইহারা হ্রস্ব; মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর, ইহারা সম এবং তুলা, বৃশ্চিক, সিংহ ও কন্যা, ইহারা দীর্ঘাবয়ব যুক্ত রাশি।

মিথুন, তুলা, কন্যা, কুম্ভ ও ধনুর প্রথমার্দ্ধ দ্বিপদ এবং ধনুর শেষার্দ্ধ, মকরের প্রথমার্দ্ধ, মেষ, বৃষ ও সিংহ ইহারা চতুষ্পদ রাশি। মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, ধনু অতিরব, কর্কট রাশি শান্ত, সাধারণতঃ নীরব। মীন রাশি জলদগম্ভীর সাধারণতঃ নীরব। কন্যা অল্পরব, তুলা রাশি গম্ভীর অল্পরব; বৃশ্চিক রাশি অল্পরব সাধারণতঃ শান্ত; মকর শান্ত, সাধারণতঃ নীরব; এবং কুম্ভ রাশি অল্পরব।

উপরে প্রত্যেক রাশির যে সব বর্ণ, দিক, স্বভাব, আকার, প্রকৃতি ও গুণাগুণ ব্যক্ত হইল, বলা বাহুল্য যে, ঐগুলি জানা থাকিলে, উহা হইতে বর-কন্যার ঠিকুজী দেখিয়া তাহাদের আকার-প্রকার, দেহের রং, স্বাস্থ্য এবং চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারা যায়।

দ্বাদশ রাশির কারকত্বের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এইবার উক্ত দ্বাদশ রাশির যে অধিপতি গ্রহ তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক: রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শনি এই সপ্ত গ্রহের গুণানুসারে জাতকের জীবন পরিচালিত হয়। উক্ত সপ্তগ্রহ ছাড়াও রাহু ও কেতু নামক দুইটি নামান্তরিত গ্রহের কথা আমরা বিশেষ করিয়া শুনিতে পাই এবং ইহাদের ফলবিকাশ জাতকের জীবনে উপলব্ধ হইয়া

সাময়িকী

পরমাণু-বোমার সত্ত্ব

পরমাণু-বোমার আবিষ্কার-রহস্য আজ আমেরিকা ও বৃটনের করপুটে। ইহার সত্ত্ব এই উভয় জাতিই বর্ত্তমানে নিজেদের মধ্যে সংগোপন রাখিতে কৃতসঙ্কল্প। অবশ্য ইহার ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণের ভার তাঁহারা সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের হাতে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইবেন না, কিন্তু তাহার উৎপাদন-রহস্য তাঁহারা জাতিসঙ্ঘকে দিতে প্রস্তুত নহেন।

এই মনোভাবের কারণ সহজেই বুঝা যায়। একথা অবশ্য সকলেই জানেন যে, বিশ্বের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, আবিষ্কৃত রহস্য পুনরাবিষ্কার করিতে বিরত হইবে না। ফলতঃ রুষের ন্যায় নবজাগ্রত জাতি এই দিব্যাস্ত্রের সন্ধানে এখন হইতেই যে গোপনে তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দেন নাই, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি জাপান বা জার্ম্মাণীর ন্যায় একান্ত বিপন্ন ও নিঃস্ব জাতিও যে মনে মনে এইরূপ অস্ত্রের উদ্ভাবনে বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকারের দুরাশা পোষণ করেন না, তাহাই বা কে বলিবে? কোনও বৈজ্ঞানিক রহস্যই চিরদিন বিশেষজাতির গোপন কুক্ষিগত হইয়া থাকিতে পারে না। আমেরিকা বা বৃটন ইহা জানিয়াও, বর্ত্তমানে এই রহস্যের চাবীকাঠি প্রকাশ করিয়া দিতে সম্মত নহেন, তাহার কারণ, আন্তর্জ্জাতিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা যত দিন না এতটা জাগ্রত ও নিবিড় হইয়া উঠিতেছে যে, সেই শুভ অভ্যাসের প্রভাবে আর পরমাণু-বোমার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিবে না, ততদিন আবিষ্কারক জাতিদ্বয় এই শক্তির সন্ধান বিশ্বের আলোয় ছাড়িয়া দিবেন না।

মার্কিণ লেখক মিঃ রস্কো ড্রামণ্ড বলেন, দুইটী সর্ত্তে এই আবিষ্কারের সন্ধান সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ পাইতে পারেন—(১) প্রত্যেক জাতি তাহার সকল গোপন তথ্য ইঙ্গ-আমেরিকার কাছে প্রকাশ করিবে; (২) বিশ্ব-জাতিসঙ্ঘ এক অখণ্ড শাসনতন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, যেখানে কোনও জাতির স্বকীয় স্বতন্ত্র প্রভুত্ব-রক্ষার আর প্রয়োজন থাকিবে না।

এই দুইটী সর্ত্ত যেদিন আন্তরিকতার সহিত প্রতিপালিত হইবে, সেই দিন মর্ত্ত্যে স্বর্গের শান্তি নামিয়া আসিতে সত্যই আর বিলম্ব থাকিবে না। তৎপূর্ব্বে পরমাণু-বোমার ভয়ই যদি বিশ্বজাতিসমূহের শান্তিরক্ষার প্রধান অনুপ্রেরক হয়, তাহাতে আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ঋণসমস্যা

যুক্তরাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যুদ্ধান্তেই ঋণ ও ইজারা নীতি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বৃটনকে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইয়াছে। আমেরিকায় ইহা লইয়া কম হৈ-চৈ বাধে নাই! এক শ্রেণীর সদস্য যাঁহারা এতকাল প্রতিপক্ষতার হেতু খুঁজিয়া পান নাই, তাঁহারা এই উপলক্ষে সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন —শুনা যাইতেছে, এই ব্যাপার লইয়া আমেরিকার একটা প্রথম শ্রেণীর ঘরোয়া দ্বন্দ্ব বাধিবারও সম্ভাবনা আছে।

বৃটনের রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এই সমস্যার মীমাংসার জন্য আমেরিকায় ছুটিয়া গিয়াছেন। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে যাহা হয় একটা স্বল্পকালস্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা করিতেই হইবে; ইহার কারণ, যুক্ত-রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি এতই চিন্তাজনক যে, একটা মীমাংসা না করিলে তাহার জীবনযাত্রাই চলিবে না। বৃটনের আমদানী খাদ্য ও অন্যান্য কাঁচামালের মোট পরিমাণ যেখানে ১,২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড, সেখানে তাহার মোট রপ্তানীর পরিমাণ বর্ত্তমান পরিস্ফীত মূল্যহারেও মাত্র ৫০০,০০০,০০০ হইতে ৬০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের বেশী নহে। এই দুস্তর মূল্য-ব্যবধান-পূরণের যে কোনও একটা ব্যবস্থা না করিলে, বৃটনের আর্থিক মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়ায়, ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বর্ত্তের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ভারতের অন্যতম ধনকুবের মিঃ জে আর ডি টাটা আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে বলেন, "ভারতের সম্পর্কিত এই বিপুল ষ্টার্লিং-উদ্বর্ত্ত লণ্ডনে আটক হইয়া থাকায়, যে

নদীতটে

শিল্পী : শ্রীহীরেন জোয়ারদার

সব দেশ ইংরাজের সহিত ষ্টার্লিঙে কারবার করে, তাহাদের সহিত আমেরিকার বাণিজ্যমূলক লেন-দেনের বড়ই বাধা হইতেছে। অতএব আমেরিকার বণিক্-মণ্ডলী কখনও এই ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারেন না। উহারই হেতু আমরা এই ষ্টার্লিং-প্রসঙ্গ লইয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে গুরুতর আলোচনার প্রত্যাশা করি।"

মিঃ টাটার মতে, বিলাতের ধনিকবৃন্দ, বিশেষতঃ তাঁহাদের পরিচালিত পত্রিকাগুলি এখন হইতেই খুব বেসুরা গাওনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা চাহেন—ভারতকে যে কোনও অছিলায় যুদ্ধের জন্যই তাহার অবদান-স্বরূপ এই প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইতে। এই অপচেষ্টার প্রভাবে ভারত যেন না ভুলে।

মিঃ কেসীর পরিকল্পনা ও কর্ম্মীর প্রয়োজন

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিছুদিন যাবৎ নানাবিধ সংগঠন-পরিকল্পনা বিরচিত ও আলোচিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-পরিকল্পনা সুবিখ্যাত সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনা নামে বহু প্রচারিত ও বিতর্কিত হইয়াছে। অন্যান্য পরিকল্পনা লইয়াও নানা প্রসঙ্গ চলিয়াছে। ভারতের অর্থনীতিক ধুরন্ধরগণের বিরচিত পরিকল্পনা "বোম্বাই-প্ল্যান" নামে সুপরিচিত। ইহার অন্যতম প্রণেতা স্যার আর্দ্দেশির দালাল স্বয়ং ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, সরকারী পরিকল্পনার সহিত আপনাকে বিজড়িত করিয়াছেন। ইহার ফল ভালই হইবে, আশা করা যায়। ধনিকগণের প্রতিপক্ষে র‍্যাডিকেল পার্টি কর্ত্তৃকও অন্য একটী সংগঠনপরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা "পীপল্‌স প্ল্যান" অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বলিয়া প্রচারিত। এই সব "প্ল্যানের" মধ্য দিয়া সংগঠনেরই প্রয়োজন ও প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। বাংলারও একটী সরকারী পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিয়াছি।

সেদিন ঢাকার বেতার কেন্দ্র হইতে বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিঃ কেসীর বক্তৃতায় এই গঠনমূলক চেষ্টারই আভাষ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার এই বক্তৃতাটীও অন্যান্য বক্তৃতার ন্যায় প্রণিধানযোগ্য। বাংলায় কালকাতা হইতে চট্টগ্রাম ও কলিকাতা হইতে আসাম পর্য্যন্ত ৩০০ মাইলব্যাপী সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী দীর্ঘ দুইটী রাজপথ, ব্রহ্মপুত্রনদের গতিনিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাকে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করার ব্যবস্থা প্রভৃতি গঠনমূলক কাজগুলির ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়া মিঃ কেসী চিন্তাপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আমার মনে হয় ইহা বলা মোটেই অতিশয়োক্তি হইবে না যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে সংস্কারকার্য্যে আমাদের অগ্রগতি-নিয়ন্ত্রণে অর্থের অপ্রাচুর্য্য যতটা না প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে, বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর অভাবই তাহাপেক্ষা বেশী পরিমাণে অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ গঠনমূলক সংস্কারকার্য্যে হাত দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে, বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর সংখ্যার উপরই তাহা নির্ভর করিবে।

"আমার বিশ্বাস, যুদ্ধসমাপ্তির পর অন্ততঃ আরও ১০ বৎসরকাল—এমন কি তাহারও বেশী সময় পর্য্যন্ত এরূপ বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর অভাব অনুভূত হইবে।"

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তব্য—যুদ্ধোত্তরকালে "বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরী-বিদ্যায় কার্য্যকরী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের জন্য বহু কর্ম্মখালি পড়িয়া থাকিবে—সে সময়ে কাজই উপযুক্ত লোকের সন্ধান করিবে, আগের মত কাজের সন্ধানে বেকার-বিভীষিকা আর দেখা যাইবে না।" এই অবস্থা সমগ্র বিশ্বে যেমন দেখা দিবে, তেমনি ভারতে এবং ভারতের মধ্যে আবার বাংলায় বিশেষভাবে ইহা অনুভূত হইবে বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন।

শিল্পী ও কারিগরীবিদ্যায় নিপুণ কর্ম্মী তো চাই-ই—গভর্ণর বাহাদুরের এই কথা খুবই খাঁটি ও সত্য। ইহার সঙ্গে আমরা ইহাও বলিব—এই সকল কর্ম্মীকে দেশ ও জাতির সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়া ও নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থদৃষ্টিকে ব্যাপক করিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্যই জীবন গড়িতে ও কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার ব্যবস্থার জন্যও একটা সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা চাই। এরূপ একটী প্রেরণা লইয়াই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি সঙ্ঘের এই আদর্শ বিচার করিয়া গ্রহণ করিলে প্রবুদ্ধ হইবে বলিয়াই আমরা প্রত্যয় করি। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরেরও উদার সহানুভূতির দৃষ্টি আমরা এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

শরৎ-সাহিত্য

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমাদের স্মরণ-মন্দিরে স্থাপন-যোগ্য অনেক বড় বড় কবি, মনীষী ও মহাত্মা আমরা পাইয়াছি; দুঃখ এই যে, ভিতরের ও বাহিরের অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, মুমূর্ষু আমরা সেই অমরগণকে স্মরণ করিবার অবকাশটুকুও আর পাই না, শুধু বাহিরের জীবনই নয়—মনের বাধাও কম নয়। তথাপি, আমাদের স্মরণশক্তি যেমনই হোক, ভাবনায় চিন্তায় আমরা যতই নব নব পন্থা ঘোষণা করি না কেন—আমরা অতিশয় ভাবপ্রবণ, সেজন্য দূরকে ভুলিলেও নিকটকে সহজে ভুলি না। যাহাদিগকে আমরা ভাল করিয়া দেখিবার—সাক্ষাৎ পরিচয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম—যতক্ষণ না আর এক যুগের যুগবন্ধুগণের আবির্ভাব হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের মূর্ত্তি আমাদের বেশ মনে থাকে, নূতনের সঙ্গে মিলন-সুখ যতদিন না হইতেছে, ততদিন পুরাতনের বিচ্ছেদ-ব্যথা আমরা ভুলিতে পারি না। আমরাই একদিন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জন্য কাতর হইয়াছিলাম—শোকসভা স্মৃতিসভাও কম করি নাই; এখনও তাঁহাদিগকে স্মরণ করি না, তাহা নয়—কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের স্মৃতি আমাদিগকে যেমন বিহ্বল করে তেমন আর কিছুতেই করে না। ইহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই; আমরা পিতৃপুরুষের তর্পণ করি বটে, কিন্তু তাহাতেও পিতাকে স্মরণ করিয়া যাহা অনুভব করি, পিতামহ বা প্রপিতামহকে স্মরণ করিয়া তাহা করি না; সকল স্মৃতিই পুণ্যস্মৃতি, তথাপি, সাক্ষাৎ পরিচয়ের স্মৃতি যে বড় গভীর! আবার, সেই পিতা যদি পরম স্নেহময় হন, তবে তর্পণকালে অশ্রুজলেই অঞ্জলি ভরিয়া উঠে।

শরৎচন্দ্র যে এত নিকট—এত আত্মীয় হইতে পারিয়াছেন তাহার কারণ শুধু ইহাই নয় যে, তিনি আমাদের এই যুগের বাঙালীর প্রাণের কথা, প্রাণ হইতে যেন বাহির করিয়া, এমন অনবদ্য বাণী-শিল্পে মণ্ডিত করিয়াছেন; সে কারণ আরও গভীর। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান যুগে শরৎচন্দ্রের মত এমন লোকপ্রিয় কথাশিল্পী বাংলা দেশে আর নাই; ইহার পূর্ব্বে আর একজন মাত্র এমন কথাশিল্পীর উদয় হইয়াছিল—ঠিক এমনিই লোকপ্রিয়; শুনিলে হয় ত' অনেকে এখন বিশ্বাস করিবেন না—তাঁহার নাম বঙ্কিমচন্দ্র। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব বোধহয় আরও বেশি; কারণ সেকালে এত বেশি শিক্ষাবিস্তার হয় নাই, বাংলাসাহিত্যের প্রতি এমন আকর্ষণও শিক্ষিতগণের ছিল না; একালে পাঠকের কথা ছাড়িয়া দিই, বিদুষী পাঠিকার সংখ্যা অগণিত বলিলেও হয়। তথাপি, সেই অক্ষরপরিচয়মাত্র-সম্বল সেকালের পাঠক-পাঠিকাদের বঙ্কিম-ভক্তি স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রকেও পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরাই অধিক ভক্তি করিতেন; তাঁহাদের নিকটে তিনি যেন অতি পরিচিত একজন ঘরের লোক হইয়াছিলেন—তিনি ছিলেন 'বঙ্কিমচন্দ্র' নয়, 'বঙ্কিম-বাবু'ও নয়, কেবলমাত্র 'বঙ্কিম', আমি আমার মাতা-মহীর কথা স্মরণ করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম, বাঙালীর মেয়েদের পর্য্যন্ত হৃদয় জয় করিতে এক পারিয়া-ছিলেন বঙ্কিম, আর এই শরৎচন্দ্র। মেয়েদের হৃদয় জয় করা সহজ নয়—মেয়েরা ক্রিটিক নয়, মতবাদী নয়, তাহারা অতিশয় রক্ষণশীল—জননী ও গৃহিণী; যতই বিদুষী হউন, নিছক কল্পনা বা অতি উচ্চ ভাবুকতার গৌরব বুঝিতে তাঁহারা অপারগ; তাঁহারাই সত্যকার বাস্তবের অনুরাগী, সে বাস্তব হৃদয়ের বাস্তব—এবং তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট মর্য়্যালিটি; এখানে তাঁহাদিগকে কেহই ঠকাইতে পারিবে না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎ-চন্দ্রের মধ্যে দৃষ্টি বা কল্পনার পার্থক্য যতই থাক্, কোন এক জায়গায় নিশ্চয় একটা গভীরতর মিল আছে—স্বীকার করিতে হইবে; আপনারা তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই খুঁজিয়া পাইবেন, আমি এখানে সে বিষয়ে কিছুই বলিব না, কেবল প্রসঙ্গক্রমে একটা ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

কিন্তু সে কথা যাক। আমি বলিতেছিলাম, আধুনিক কালে আর কোন ঔপন্যাসিক এমন করিয়া বাঙালীর একেবারে প্রাণের ভিতরটাতে অবাধে প্রবেশ করিতে

পারেন নাই; কেমন করিয়া, কোন্ দিক্ দিয়া, এবং ঠিক কোন্ গুণে পারিয়াছিলেন—শরৎ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-নিরূপণ এই কয়টি প্রশ্নের উত্তরের উপরে নির্ভর করে, যিনি তাহা যত ভাল করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহার সেই পরিচয়দান তত নির্ভুল হইবে। আমি অবশ্য আজ এইখানে সে চেষ্টা করিব না—সে সকল সূক্ষ্ম বিচারের স্থান ইহা নয়। আমি কেবল শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি জানা কথারই পুনরুল্লেখ করিব—কয়েকটি কথার উপরে জোর দিব মাত্র।

সর্ব্বপ্রথম—শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন। আপনারা তাঁহার শিবপুর, পানিত্রাস, বালিগঞ্জের জীবন ভুলিয়া যান; তখনকার সেই পৌর্ণমাসীর কথা নয়—যে-জীবনে তিনি কলায় কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিলেন সেই জীবনের কথা স্মরণ করুন। শরৎচন্দ্রের সেই জীবনই বাঙালীর সাহিত্যিক জীবনহিসাবে অতিশয় বিস্ময়কর। তাঁহার পূর্ব্বে বাংলাসাহিত্যের আসরে এমন অজ্ঞাতকুলশীল, সর্ব্ববিধ পরিচয়হীন কেহ এত বড় সাহিত্যিকপদ দাবী করিতে পারে নাই। বাংলাসাহিত্যে তখন একটা রীতিমত সামাজিক শৃঙ্খলা, সুরুচি ও সদাচারের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সে সমাজে প্রবেশলাভ করিতে হইলে বহুবিধ তপস্যার প্রয়োজন। অতএব সেই কালে সেই সমাজে শরৎচন্দ্রের মত একজন ব্যক্তির প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা-লাভ—সে যেন একটা অনৈসর্গিক ঘটনা! সমাজপতিরা স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্; তখন হইতেই সাহিত্যের সেই সুদৃঢ় আটচালাখানি দুলিতে আরম্ভ করিল, সে দোলা এখনও শেষ হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ হইল যে, যাহাকে প্রথমে ধূমকেতু বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা একটা বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ—তাহার রশ্মি যেমন স্থির তেমনই স্নিগ্ধ।

কিন্তু বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের সেই জীবন ও তাঁহার সেই সাহিত্যিক সিদ্ধিলাভের তাৎপর্য্য আরও গভীর। শরৎচন্দ্র হইতেই বাংলা উপন্যাসের জন্মান্তর হইল—খাঁটি আধুনিক সাহিত্যের পত্তন হইল। তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিতে কাব্যঘটিত উপাদান অল্প নহে, তাহার কথা পরে বলিতেছি; কিন্তু তাহাতে জীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের যে সাক্ষ্য আছে তাহাই আধুনিক বাংলাসাহিত্যে একটা নূতন বস্তু। ঠিক এই ধরণের জীবন-রস-রসিকতা বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম—ইহা বাস্তবতাও নয়, রোমান্সও নয়; ইহা যেন জীবনের ধূলি-মাটির মধ্যেই প্রাণের সত্যকে আবিষ্কার করা; ইহা সহজ নয়—ইহার জন্য জীবনের কাদা-মাটী ভাঙিয়া একেবারে প্রাণের সেই গোপন দুয়ারে পৌঁছিতে হইবে, গৃহ-বাতায়নে বসিয়া স্বপ্নাকুল চক্ষে পথের লোকযাত্রার পানে চাহিয়া থাকিলেই হইবে না। শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে কোন বাঙালী কবি বা ঔপন্যাসিক সেই পথের জনতারই একজন হইয়া মাঠে-ঘাটে বৃক্ষতলে এমন বাউলের বেশে জীবনের সেই সাধনা করেন নাই। অতঃপর শরৎচন্দ্র হইতেই একটি নূতন সাহিত্যিক বংশধারার উদ্ভব হইল; জীবনের পাঠশালাতেই যাহারা পাঠ গ্রহণ করিয়াছে তাহারাই অতঃপর কেবলমাত্র প্রতিভাবলে উপযুক্ত সাহিত্যিক মর্য্যাদা আদায় করিতে সুরু করিল; অতি দূর পল্লীভূমি হইতে নাগরিক সংস্কার বা মানস-প্রকর্ষহীন কেবলমাত্র প্রাণশক্তিমাত্র-সম্বল এক শ্রেণীর লেখকের অভ্যুদয় হইল; নাগরিক সাহিত্যসমাজ হঠাৎ অন্ধকারে পড়িয়া গেল। এই লেখকগোষ্ঠীর আদি পুরুষ শরৎচন্দ্র।

শরৎ-সাহিত্যের মূলে তাঁহার নিজস্ব জীবন-সাধনার যে প্রত্যক্ষ প্রেরণা রহিয়াছে তাহার কথা বলিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাস্তবের সহিত এমন বোঝাপড়া সত্ত্বেও সে সাহিত্য কাব্য-প্রধান। আমি এখানে বস্তুতন্ত্র ভাব-তন্ত্রের তর্ক তুলিব না—সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যমাত্রেই কবিশক্তি বা কল্পনাসাপেক্ষ। সেই কল্পনা নিছক অন্তর্মুখী বা ভাবমার্গী হইতে পারে, আবার বহির্মুখী বা বস্তুনিষ্ঠও হইতে পারে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনাকেও আবার দুই প্রকার ধরা যাইতে পারে, এক—অনাসক্ত, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপটি দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত, তাহার সহিত নিজ হৃদয়ের কোন সম্বন্ধ নাই; আর এক—সেই বস্তুর প্রতি নিজ হৃদয়ের অতি গভীর সহানুভূতি। কল্পনা উভয় ক্ষেত্রে সমান ক্রিয়াশীল না হইলে সাহিত্য সৃষ্টিই হইত না, তথাপি বস্তুর স্বরূপ আবিষ্কার, অনাসক্তভাবে জীবনের গভীরতর রূপটি প্রকাশিত করা খুব বড় কল্পনার কাজ; কবি সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিতে না পারিলে সে রূপ

তাঁহার চক্ষে ধরা দেয় না। শরৎচন্দ্রের কল্পনা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর। তিনি বস্তুর যে রূপ দেখিতেন তাহা তাঁহার হৃদয়কে অতিমাত্রায় স্পর্শ করিত, তাঁহার সেই অতি-অনুভূতিশীল হৃদয়ই তাঁহার প্রতিভার প্রধান সম্বল, তাহাতেই তাঁহার সেই কল্পনাশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইত যে, তিনি এত বড় স্রষ্টা কবি হইতে পারিয়াছিলেন। সেই কল্পনাবলেই তিনি এক দীনহীন বাস্তবের মধ্যেই এত বড় হৃদয়রাজ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। সে রাজ্য নিশ্চয় রূপকথার রাজ্য নয়; সেই রাজ্যের অসীম সম্পদ ও অপূর্ব্ব শোভাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে কাব্যশ্রী দান করিয়াছে। আপনারা সকলেই সে কাব্য পাঠ করিয়াছেন—আপনারাই হিসাব করিয়া দেখুন, যাহা এত গভীরভাবে মুগ্ধ করে, তাহার কতখানি বাস্তব, কতখানি কাব্য।

এইবার সেই এক কথার পুনরুক্তি করিব; ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র যেমন বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছেন, এমন আর কেহ পারেন নাই। ইহার কারণ কি? ইহাই কি তাঁহার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতারও প্রমাণ? তিনি যে কোন্ গুণে বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছেন, তাহা বাঙালীমাত্রেই জানে, যদিও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হয় ত পারে না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে রস খরস্রোতে বহিয়াছে—নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে তাহা একান্তভাবে বাঙালী জীবনেরই মর্ম্মান্তসঞ্চারী রস, সেই রস আর কাহারও রচনায় এমন প্রাণের প্রত্যক্ষ-রূপে মণ্ডিত হয় নাই; সে-জীবনের যত দুঃখ যত গ্লানি, লজ্জা ও লাঞ্ছনা কোন্ পরশমণির স্পর্শে সোণা হইয়া উঠে এই ভাবপ্রবণ জাতি তাহা নিজেও জানিতে পারে না। ইহার মূলে যে পিপাসা আছে তাহাকে কি নাম দিব? বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাকে মাধুরীর পিপাসা বলা যাইতে পারে; এই পিপাসা চরিতার্থ হইলে সে আর কিছুই চায় না। তাই হাসি-কান্না, মিলন-বিচ্ছেদ, রাগ ও বিরাগ সেই পিপাসার বারিরূপে তাহার জীবন-যাত্রার সেই অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাহাতে মহাকাব্যের কল্লোল নাই বটে, নাটকের ঘনঘটাময় ট্র্যাজেডির ঝটিকাবেগও তাহাতে নাই, কিন্তু তাহারই তাড়নায় হৃদয়ের সূক্ষ্মতম তন্ত্রী পীড়িত হইয়া যে গীতি-রস উথলিয়া উঠে—তাহার মত এমন প্রাণের পানীয় আর নাই। তাই সে যেমন কাঁদিতে, তেমনই কাঁদাইতে ভালবাসে; আদর করিয়া গালি দেয়; তাহার মিলনসুখ বিচ্ছেদের ব্যথার মতই দুঃসহ—লাখ লাখ যুগ বুকে বাঁধিয়াও তাহার বুক জুড়ায় না। এ পিপাসা বড়ই অদ্ভুত—বাঙালীই ইহার মর্য্যাদা বোঝে। শরৎচন্দ্র এই পিপাসাকে যেমন গাঢ় বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন এমন আর কেহ পারেন নাই। সেই এক রসকেই তিনি তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—প্রধানতঃ এই তিন ধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন; সেই রস পান করিবার সময়ে বাঙালীর মজ্জাগত বৈষ্ণব-সংস্কার তাহাকে যেন জাতিস্মরের মত আকুল করিয়া তোলে; বৃন্দাবন যে তাহার স্বপ্ন নয়, তাহার জীবনেরই বাস্তব, সবিস্ময়ে তাহাই অনুভব করে; গৃহাঙ্গনে সেই বাল-গোপাল ও যশোমতীকে, সেই কালিন্দীকূলবিহারিণী নারীশিরোমণিকে সে দেখিতে পায়; শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'চন্দ্রনাথ'ও যেমন, তেমনই 'রমা' ও 'রাজলক্ষ্মী', 'বিরাজ' ও 'অন্নদা দিদির' ইতিহাস বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্রকেই যেন জীবনের কাহিনীতে অনুবাদ করিয়াছে। তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সেই যে রস, তাহাতে বিলাতীর গন্ধমাত্র নাই, অথচ এমন রস ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কি এমনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন?

কিন্তু শুধুই বৈষ্ণব-সংস্কার নয়—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই রসপিপাসার সহিত আর একটি বস্তু সর্ব্বত্র উপকরণরূপে যুক্ত হইয়া আছে, এমন কি, সেই রসসৃষ্টিতে সমধিক সহায়তা করিয়াছে—সে বস্তু নারীচরিত্রের এক অপূর্ব্ব মহিমা; নারীই সেই মনোভাবের উৎস-স্বরূপিণী। এই নারী মহাশক্তি—তাহারই আত্মোৎসর্গে পুরুষের মোহ দূর হয়, সে-ই পুরুষের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার শাস্তি বহন করিয়া তাহাকে পাপমুক্ত করে। যে অমৃতের আশ্বাস সে কখনও পাইত না—নারীই তাহার নিজ হৃদয়-মন্থন করিয়া সেই নবনীত তাহার মুখে তুলিয়া দেয়, সে অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই নারীই সর্ব্বময়ী হইয়া আছে; সে যেন পুরুষের সখী নয়, প্রেয়সী নয়—তাহার গুরু; তাহার সেই দৃপ্ত

তপ...মূর্ত্তি পুরুষকে প্রকৃতিস্থ করে, তাহার বৈরাগ্য-লোলুপ চিত্তকেও নিমেষে জয় করিয়া এক অন্তহীন আনন্দের পথে তাহাকে সতীর্থ করিয়া লয়! নারীর এই শক্তি পুরুষের নাই; পুরুষ তাহার জ্ঞানের দম্ভ, তাহার ন্যায়-অন্যায়-বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও নারীর নিকটে অজ্ঞান শিশু, এবং নারীই স্নেহময়ী জননীর মত সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহার অকল্যাণ নিবারণ করে। নারীর ঐ শক্তিকেই আমাদের দেশের শক্তিসাধকেরা মাতৃরূপে আরাধনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, যেখানেই নারী তাহার প্রেমের পাত্রকে রক্ষা করিবার জন্য—হতাশপ্রেম বা অতৃপ্ত পিপাসার আক্ষেপে নয়—নিঃশেষে আত্মবিসর্জন করে, সেখানে তাহার সেই শক্তি যেমন পুরুষের শক্তিকে অতিক্রম করে, তেমনই সেই নারী যথার্থই মাতৃরূপা। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নায়িকার কঠোর আত্মোৎসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের সম্পর্কেই বটে, কিন্তু তাহাতেও এই অপর রসের বিকাশ হয় কেমন করিয়া? কোথাও ত কিছুমাত্র রসাভাস ঘটে না! একাধারে এই রাধা ও ম্যাডোনা—ইহা বাঙালীর ঘরেই সম্ভব হইয়াছে; বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার মূল উৎস যে একই, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

বাঙালী তাহার গৃহলক্ষ্মীর এই রূপ দেখিয়া ধন্য হইয়াছে—ইহার পর সে আর নিজেকে কাঙাল মনে করিবে না। নারীর প্রতি তাহার এই মনোভাব তাহার মজ্জাগত। সমাজে ও পরিবারে নারীর উপরে তাহার অত্যাচারের সীমা নাই, কিন্তু এক জায়গায় সে নারীকে যেমন পূজা করিয়াছে, এমন আর কেহ করে নাই—অতিবড় নিন্দুকেও স্বীকার করিবে যে, বাঙালীর মাতৃ-ভক্তির তুলনা নাই—ওই এক গুণে সে এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ মাতৃভক্তি তাহাকে এমনই অন্ধ করিয়াছিল যে, নারীর অপর মূর্ত্তির দিকে সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই—পত্নীকেও পুত্রকন্যার জননীরূপেই সে দেখিয়াছে। তাই তাহার হৃদয়বৃত্তি অলস হইয়া পড়িয়াছিল; তথাপি, যে পত্নী মৃত্যুকালেও তাহার অনুগমন করে, হাসিমুখে তাহার চিতায় উঠিয়া বসে, তাহার শক্তি সম্বন্ধে সে নিশ্চয় কখনো অচেতন ছিল না, বরং মনে হয়, ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্ত পিপাসা, একটা গোপন স্নেহের ধারা চিরদিন তাহার হৃদয়ে বহিয়াছে। অতিশয় অলস ও শান্তিপ্রিয় বলিয়াই সে তাহার জীবনে কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে দেয় নাই; নারী মাতারূপে তাহাকে স্নেহাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এবং পত্নীরূপে তাহার সকল দুর্ব্বলতার শাস্তি নিজে বহন করিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছে। ইহার ফলে সে যত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, নারী ততই শক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনের তলদেশে ইহার গ্লানি ও লজ্জা কখনও ঘোচে নাই। তার পর সহসা যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে বাতাস বহিতে সুরু করিল, তাহাতে সে তাহার মনের সেই রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত না করিয়া পারিল না, বাংলাসাহিত্যের নবজন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন নারী-বন্দনা আরম্ভ হইয়া গেল। কবি বিহারীলাল এই বন্দনাকারীদের অগ্রগণ্য। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র যে নারীপূজা প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাতে মাতা অপেক্ষা পত্নীর গৌরব বড় হইয়া উঠিল, তিনিই সর্ব্ব প্রথম ঘোষণা করিলেন—

"রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।"

সেকালের আর একজন শক্তিমান্ অখ্যাত কবি তাঁহার 'মহিলা'-কাব্যে নারীর যে প্রশস্তি পাঠ করিলেন, তাহার সেই ভাবুকতামণ্ডিত যুক্তিরাশির প্রয়োজন এখন আর নাই বটে—কিন্তু তাহাতে যে আক্ষেপ ও অনুশোচনার সুর আছে তাহা এখনও মিথ্যা হইয়া যায় নাই। তারপর, আমরা আর এক কবির কণ্ঠে এই অপূর্ব্ব নারী-স্তোত্র শুনিতে পাই—

নারি,
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড়-জগতের নিত্য নব ছলা,
উপচয়ে দশভুজা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসারবিহ্বলা।

তুমি শক্তিশান্তিদাত্রী অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,
শুভঙ্করী, পালয়িত্রী, তবদুঃখহরা।
আত্মমগ্না, স্বয়ংস্থিতা, দুন্দরে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষরূপা, বিশ্লেষকাতরা।

আমি জগতের ত্রাণ, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বান,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
শ্মশানে শ্মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়পাগল!

তুমি হেসে বসে' বামে সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর ;
তোমার প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস গেহ,
পাগলে করিলে গৃহী, ভূতে মহেশ্বর !

—এ সকল হইতে দেখা যাইবে যে, বাঙালী ইতিপূর্ব্বে নারী সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে এক নূতন উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেছিল। সেই উৎকণ্ঠার পূর্ণ তৃপ্তিসাধন করিলেন শরৎচন্দ্র, তিনিই তাহার প্রাণের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া দিলেন ; সে যেন তাহার জীবনের একটি পরম সত্যকে হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া, বহুদিনের তৃষিত আত্মার তর্পণ করিল। শরৎচন্দ্র যে কোন্ গুণে, কি মন্ত্রে বাঙালীর হৃদয় এমন করিয়া অধিকার করিতে পারিয়াছেন, সে প্রশ্নের অন্ততঃ একটা আংশিক উত্তর যথাসাধ্য দিবার চেষ্টা করিলাম।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি। উপরে বাঙালী নারীর সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি—নারীর যে শক্তিমূর্ত্তি শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে এমন ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন—গত ত্রিশ বৎসরে বাঙালীজাতির শিক্ষা-দীক্ষার, ও বাঙ্গালী-সমাজের যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে সেই 'নারী'ও বাঙালী-সমাজে দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে ; সে ছিল হাজার বৎসরের সাধনার ফল, সে সাধনাও এক্ষণে অচল।

আর একটি প্রশ্ন বাকি আছে—শরৎ সাহিত্যের যে লক্ষণগুলির কথা বলিয়াছি তাহাতে সে সাহিত্য কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে ? বাঙালীর যে কারণে, তাহা যতখানি ভাল লাগিবার কথা—সর্ব্বজাতির রসিকসমাজের পক্ষেও কি তাহা সম্ভব ? কোন সাহিত্য একান্তরূপে জাতীয় ভাবাপন্ন হওয়ার গুণও যেমন, দোষও তেমনই। কোন বিদেশী যদি বাংলা ভাষা অতি উত্তমরূপেও শিক্ষা করে, তাহা হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী বা রামপ্রসাদের গান কি তাহার তেমন ভাল লাগিবে ? কিন্তু সেই জন্য কি আমরাও তাহার কম আদর করিব ? না, বৈষ্ণব পদাবলী মূল্যহীন ? বিশ্বসাহিত্যে যদি তাহার উচ্চ স্থান নাও থাকে—তথাপি, বিশ্বমানব-সাধনার অঙ্গরূপে তাহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। শরৎ-সাহিত্য যে শিল্পহিসাবেও উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই—উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সব লক্ষণই তাহাতে আছে। তথাপি ঐ সাহিত্য বিশেষভাবে বাঙালীর। অতএব, তাহার সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, শরৎচন্দ্র এমন একটি সাহিত্য রচনা করিয়াছেন যাহা একান্তভাবে আমাদেরই, অথচ যাহা সাহিত্যহিসাবেও অনবদ্য ; অর্থাৎ তিনি, বাঙালীর জীবন, বাঙালীচরিত্র, বাঙালীহৃদয়ের সুখ দুঃখ, বাঙালীর বিশিষ্ট জাতিধর্ম্ম ও বহুকালাগত সংস্কৃতি—এই সকলের উপাদানে এক অভিনব ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন [illegible]ংলা ভাষায় তিনি যে বিশ্বসাহিত্য রচনা করেন নাই তার কারণ তাঁহার কল্পনা তাঁহার হৃদয়কে অতিক্রম করে নাই—এবং সে হৃদয় ছিল খাঁটি বাঙালী-হৃদয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা একটু উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতে পারে, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' তাঁহার উপন্যাসগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষ নিজের মুখই সব চেয়ে কম চেনে, তেমন একখানি মুকুর না হইলে সে মুখ দেখিবার সুবিধা হয় না। শরৎচন্দ্র বাঙালীর জন্য এই সাহিত্য-মুকুর রচনা করিয়া দিয়াছেন। তথাপি সেই মুকুরখানিতে নিজমুখ ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ এখনও তাহার হয় নাই, তার কারণ সেই মুকুর সে এখনও ধরিতে শেখে নাই—যে হৃদয়ের আলোকে সেই মুকুর আলোকিত, সেই হৃদয়টিকে সে এখনও যথাস্থানে স্থাপন করিতে পারে নাই ; এক কথায় শিল্পীর হৃদয়-শিল্পশালায় সে এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। [illegible] করিতে বলি। এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্র—তাঁহার বহির্জ্জীবন নয়, অন্তর্জ্জীবনের মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—কবি, শিল্পী ও সাধকের সেই জীবন, যে-জীবন একান্তই তাঁহার নিজের, যেখানে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই ; সে জীবনের যত কিছু ঘটনা অন্তরেই ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাদের মত সত্য আর কিছুই নহে। এই জীবন তাঁহার একার নহে—সমগ্র জাতির, অথচ তাহা ব্যক্তির জীবনও বটে ; এইজন্যই ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস হইলেও তাহার ঘটনার সাল তারিখ নাই। এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যের শুধুই শিল্প-সৌন্দর্য্য নয়, তাহার অন্তরালে যে হৃদয়-স্পন্দিত হইতেছে তাহার পরিচয় আরও ভাল করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে—সে সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে কোন্ স্থান অধিকার করিতে পারে, সে প্রশ্ন অপেক্ষা, সে সাহিত্য বাঙালীর কি পরিচয় বহন করিতেছে, আমি সেই জিজ্ঞাসাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।*

* সাহিত্য-সেবক-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্র-স্মৃতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

বাংলা সাহিত্যের শারীরক ভাষ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সাহিত্য-আলোচনার পক্ষে যে বিচার তুচ্ছ করা সম্ভব নয়, সে বিচার দুরূহ হলেও, সে পথে অগ্রসর হ'তেই হবে। বাংলার ইতিহাস এমনি শূন্যগর্ভ যে কতকগুলি ঘটনাসঞ্চয় ছাড়া তাতে অন্য রকমের দূরদৃষ্টিপ্রসূত কোন সাধারণ সত্যের সন্ধান বা সাধনা দেখা যায় না; অথচ তাহাকে ইতিহাস বল্‌তে কেউ ক্ষুণ্ণ হয় না। শুধু ইতিহাস নয়, বাঙালীজাতি সম্বন্ধে গবেষণাও যেন চুঙ-লিঙ-সাহেবের ভোজের বাজির মত! তা'তে সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। এ দোষ দেশের নয়, বিচারকের। বিচারক ঘটনাসংগ্রহের ভিতর দূরদৃষ্টির সাহায্যে কার্য্যকারণের কোন পথই খুঁজে পায় না, এটা লজ্জার কথা। শ্রীযুক্ত রমেশ মজুমদার স্পষ্টই বলছেন, বাংলার ইতিহাসের (এ যুগেও) মুখ্য সন্ধিগুলির কোন কারণ বোঝা গেল না। হয়তো সবই অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সংঘটিত হয়েছে।* এ যুগে ঐতিহাসিক গবেষণা-জগতের অন্য কোথাও এরূপ শিশুসুলভ উক্তি কেহ করেছেন কিনা, সন্দেহ। এই গ্রন্থেই নৃতত্ত্বের আলোচনা যাঁর হাতে ন্যস্ত (সূর্য্যের রথাশ্বের মত নানা দিকে ধাবিত বহু চালক কর্ত্তৃক এ গ্রন্থ রচিত) তিনি বলছেন—"আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে বাঙালী-জাতির উৎপত্তি বিষয়ে সমস্যার আজও সন্তোষজনক পূরণ হয়নি।"† এটা উচ্চতর মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়। সংখ্যা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহলানবিশ দেখছেন উচ্চতর বাঙালীজাতির ভিতর একটা বিশিষ্ট সাম্য। ওদিকে গবেষণাধুরন্ধর ভাণ্ডারকার বলছেন যে, বাংলার কায়স্থেরা নগরকোটের নাগর ব্রাহ্মণদের বংশধর। অপরদিকে কান্যকুব্জ হ'তে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূরের প্রভাবে আনীত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কায়স্থদের আগমনের কথাও একেবারে তুচ্ছ করবার ব্যাপার নয়। এতে বাঙালীর রক্তের পরিধি ব্যাপক বলেই প্রমাণিত হচ্ছে—সঙ্কীর্ণ বলে নয়। কিন্তু এ রক্তের ঐক্যতান কি রকমের—এটাই হ'ল সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন। সাহিত্যের গোড়াকার প্রেরণা রসবৈশিষ্ট্য ও বর্ণবিধি-বিচার এ ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে বিরোধ। বাংলা সাহিত্যের যা' প্রাপ্য তা' দাবী করছে হিন্দী ও অন্যান্য সহযোগী সাহিত্য। কাজেই বাংলা চিন্তা, রীতি ও ধ্বনির সূত্র খুঁজতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতিগত শোণিতপ্রভাবের দোহাই ওঠা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। Whitman-এর কবিতা কোন ইংরাজ কবির পক্ষে লেখা সম্ভব নয়—ইংরাজ জাতি-ই ভাবের ও-রকমের বাপীতটে চলাফেরা করে না। মলিয়ারকে জর্ম্মণ জাতির ভিতর খোঁজার কোন মানেই হয় না। তেমনি বাঙালী কবির রসভূষণও অন্যত্র পাওয়া কঠিন।

এর ভিতর আবার missing unit বা হারান কড়ার প্রশ্ন উঠেছে। মর্কট হ'তে মানুষ হয়েছে, এ বুলি সমর্থন করে হারাণ-কড়ার অন্বেষণ সম্বন্ধে জগতে খুবই একটা আন্দোলন উঠেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা' উল্টো সিদ্ধান্তই প্রবল করে তুলেছে।

তেমনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও পাওয়ার আগেই হারাবার প্রশ্ন উঠেছে। একাদশ শতাব্দীর চর্য্যাপদের পদগুলি পেতে না পেতেই পূর্ব্বতন শতাব্দীর রচনার প্রশ্নও উঠেছে। উত্তর বঙ্গের ধানাইদহে গুপ্তসম্রাট কুমারগুপ্তের যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, তা সবচেয়ে প্রাচীন বলে' অনুমিত হয়েছে। এর কাল হচ্ছে খ্রী: ৪৩২-৪৩৫। এর ভিতর অনেকগুলো বাংলা প্রাকৃত শব্দ পাওয়া গেছে। কাজেই এ সময় একটা কথিত ভাষা ব্যবহৃত হত যা' বাংলাভাষার উপর আলোকপাত করতে সমর্থ। অপর দিকে পাহাড়পুরেও যে সব বাংলা শব্দ ও নাম পাওয়া গেছে, তা'তেও এই অনুমানই সুদৃঢ় করে। এদিকে ৪র্থ হতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। যাকে মাগধী প্রাকৃত বলা হয়েছে তার কোন অপভ্রংশকেও বাংলাভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী হতে দেখা যাচ্ছে না।

এ সমস্ত কারণে প্রাক্‌ভারতের ভাষাগুলির উৎস ও পরম্পরা সাব্যস্ত করা দুরূহ হয়েছে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক

* R. C. Mazumder, History of Bengal, P. 229.

† "We must therefore admit that we cannot yet satisfactorily solve the problem of the origin of the Bengalee race."—History of Bengal, R. C. Masumdar p. 562.

পৃষ্ঠভূমি বাংলা সাহিত্যের শরীরগঠন বিষয়ে অনেক সূত্র আবিষ্কার করতে বাধ্য।

কথা হচ্ছে, গবেষকগণের ব্যর্থতা এ কাজকে আরও জটিল করে' তুলেছে। বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে রক্তের খাতির যতটা নয়, ততটা জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের ভাবসম্পুটের খাতির। কাজেই বাঙালী রক্তে কোন্ কোন্ নৃগোষ্ঠীর রক্তবিন্দুর ধারা বইছে, সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে ঠিক এ প্রশ্ন ওঠে না—ওঠে বাঙালীর মস্তিষ্কে চিন্তা ও ভাবের জালি-কাজ ও নক্সা কি রকমের এবং সে সবের গঙ্গোত্রীই বা কোথা? এ ক্ষেত্রে আমাদের নৃতাত্ত্বিক বংশপ্রেরণার সূত্রগুলিকে অধ্যয়ন করতে হবে—জাতিনির্ব্বাচানের জন্য নয়, চিন্তাবিশ্লেষণের জন্য। মঙ্গোলীয় জাতিগুলিও একান্তভাবে বর্ণশঙ্করত্ব হ'তে মুক্ত নয়, তবু আমরা জাপানী 'গেঞ্জিমনগোতরি'র বিলাস-বিভ্রম ও আয়েস, নো-নাট্যের ঘনঘটা স্বচ্ছ-সৌন্দর্য্য এবং নানা কবিতা হ'তে দুর্ভেদ্য জাপানী চিত্তের অন্তঃপুরে উপস্থিত হতে পারি। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এ কাজ সম্ভব না হ'লে বিরাট রূপসৃষ্টির প্রতি স্রোতোভঙ্গেই জাপানীশীলতা নিজেকে দুর্ল'ভ সোনার হরিণের মতই ধরা দেয়। পারস্য-চীন-রচনা সম্বন্ধেও এ রকম উক্তি করা যায়। কাজেই এ দেশেও আমাদের যদি প্রয়োজন হয়—এবং এই প্রয়োজন প্রতি সন্ধিস্থলেই হচ্ছে—সে পথে যেতেই হবে। ইউরোপের আধুনিক প্রতিটি সাহিত্য এ রকমের রূপসঙ্গমের সহিত বোঝাপড়া করে অগ্রসর হয়েছে। গ্রীক ও রোমক আদর্শ, মধ্য যুগের গির্জ্জাগুলির অঙ্গুলি সঙ্কেত, বৈজয়ন্তীয় (Byzantine) বিরূপতার দান সঙ্গীত, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিদ্যার ইঙ্গিত এবং উত্থান-যুগের ভোগাত্মক আয়োতনের বহুমুখী সম্ভারের সঙ্গে ইউরোপের জাতিগুলির শীলতাগত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই সম্বন্ধের বিচিত্র বর্ণসংগ্রহে অনুরঞ্জিত হয়েই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যগুলি লীলায়িত হয়েছে। কাজেই এ সমস্তের ভিতর প্রবেশ করলে সাহিত্যের মুখ্য পথে প্রচুর আলোকপাত হয়। ও-দেশের আধুনিক সাহিত্য-আলোচকেরা এ পথেই গেছে।

বাংলা সাহিত্যবিস্তৃতির প্রতি যুগেই এ রকমের বহু সঙ্কেত, ইঙ্গিত, আভাষ, গুঞ্জন ও রণন লক্ষ্য করা নয়, যাতে করে' বাঙালীজাতির রক্ত-সম্বন্ধও নির্ণীত হ'তে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে নৃতাত্ত্বিকগণের সাহিত্যের সহিত পরিচয় অতি সামান্য। কাজেই অরসিকের কাছে রসের নিবেদনের মত এ সমস্ত ভঙ্গী ও তিলক এদের কাছে ব্যর্থ হচ্ছে।

জাতির রক্তগত প্রেরণাই একমাত্র প্রেরণা নয়। ভাষারও বিরাট প্রেরণা আছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে পৃথিবীর ইংরাজশাসিত অংশের বিপুল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করার বিষয়। কাজেই আর্য্য না হলেও, আর্য্যভাষা যারা গ্রহণ, অধ্যয়ন ও ব্যবহার করেছে তাদের ভিতর সভ্যতার যে ক্রম উপস্থিত হয়েছে, তা'তে গভীর সাম্য লক্ষ্য করা যায়। বাঘের বিবরে লালিত মানব শিশুর হিংস্রতা কতকটা উপাখ্যানমূলক, কিন্তু এ তত্ত্বের ভিত্তি অমূলক নয়। ভারতবর্ষের আর্য্যভাষার প্রভাব সমগ্র মহাদেশের মানবজীবনে নূতন ভিত্তি স্থাপন করেছে। তা'কে জীর্ণ ও উৎখাত করতে বহু আয়েস ও উদ্যমের প্রয়োজন হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্য্য রক্তের বিশেষ বিস্তৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে সকলেই নীরব। নৃতাত্ত্বিকগণ এ রক্ত ও কাঠামো পেয়েছেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, সোয়াট, পঞ্জকোরা (Panjkora), কুনার, চিত্রল ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের কাফিরদের ভিতর। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রক্তে এর কিছু ছড়ানভাবে মিশ্রণ আছে মাত্র*। কাজেই বাঙালীর পক্ষে আর্য্যত্ব বা আর্য্যশীলতার বড়াইর বিশেষ কোন অর্থ নেই। আধুনিক বাঙালীর ভিতর পাওয়া যাচ্ছে "non-mongoloid Brachycephalic type"—গুজরাট, কানারাতেও এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এর সঙ্গে পূর্ব্ব ইউরোপীয় 'Dinaric' জাতিগুলির সমান ধর্ম্ম আছে। শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের তালিকায় বাঙালীকে ফেলা হয়েছে বহু পরিমাণে ভূমধ্যসাগরিক ও আল্পো-ডিনারিক শ্রেণীর ভিতর। আল্পোডিনারিকদের ভিতর পড়ে কাথিওয়ারের কাথি, গুজরাটের বানিয়া, আহমদাবাদের পার্শী, মহীশূরের ক্যানারি ব্রাহ্মণ ও বেওয়ার রাজপুত। কাজেই এদেশে ঘটেছে পুরীর শ্রীক্ষেত্রের মত এক

* B. S. Guha, Racial ethnology of India [Field sciences of India p. 136.]

আন্তর্জাতিক মিশ্রণ বর্ণক্ষেত্র। বহু শতাব্দীতে এই প্রক্রিয়ার পুটপাক হয়েছে—এ জন্য আমরা বংশ ও গোষ্ঠী বিচারে একটা বড় রকমের উচ্চ রব করতে পারছিনে। অপর দিকে আমাদের একটা বৃহত্তর পৃষ্ঠভূমিও আছে যাকে অষ্ট্রিক বলা যায়—সাঁওতাল, কোল, টুণ্ডা প্রভৃতির দ্বারা রচিত। কিন্তু বলেছি, এ ক্ষেত্রে এভাবে রক্ত-বিচার করাই শেষ কথা নয়। বিশিষ্ট আদর্শ, তত্ত্ব ও অনুধ্যানের সাহায্যে নানা জাতি জমাট হয়েছে এবং বিশিষ্ট ভাষা ও মূর্তিসংগ্রহও এই অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। কাফিরদের সহিত আমাদের ঐক্য লক্ষ্য করা সভ্যতা ও শীলতার দিক দিয়ে পথ কাটা সুগম করবে না, বরং সাহিত্য ও কলাগত রূপসৃষ্টি যেভাবে সকলকে সংহত করেছে সেদিকেই বিশেষভাবে চোখ ফিরাতে হবে।

অপর দিকে আর্য্য ও দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষাগুলির রূপসৃষ্টিগত বিস্তৃতি, বিক্ষেপ ও প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই অস্বীকার করা চলে না। মঙ্গোলীয় ভাষার সতীর্থতাও প্রাক্‌ভারতে কোন কালে তুচ্ছ করা হয়নি। এ সমস্ত ভাষা বিরাট ভাবের বাহন হয়েছে এবং সুসংস্কৃত জনগণের উন্নয়নে বার বার সহায়ক হয়েছে।

ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, রক্তবন্ধন ও শোণিতসম্পর্কের আনুগত্যে ভাষার বন্ধন ও ব্যাপ্তি হয়েছে বিরাট জাতি-গুলির। তা'তে করে' যে কয়টি ভাষার প্রবাহ ও বেগ প্রবলতম ছিল তারা চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলিকে অন্তর্ভূত করেই দিক্‌দিগন্তে ছুটে চলেছিল। ইতিহাসের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ এ সম্বন্ধে আছে। বাংলাদেশে দ্রাবিড়* প্রভাব কেউ অস্বীকার করে না। দ্রাবিড়-শীলনে বৈপরীত্য বোধ ছিল সুতীক্ষ্ণ—অতি ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ, এ দু'টি দিগন্ত সম্বন্ধে উগ্র ধারণা এ সভ্যতার উচ্চনীচ পংক্তি ভেদকে যেমন করেছে গভীর, তেমনি শিল্পক্ষেত্রেও অতি বিরাট কিছু রচনায় উদ্বোধিত করেছে। তা' ছাড়া ধারাবাহী ভূয়িষ্ঠ আক্ষরিক ও অনাক্ষরিক দ্রাবিড়রচনা পরীক্ষা করে' বল্‌তে হয়, এ সভ্যতা ছিল নির্ভয় ও দুর্ব্বার অসাধারণ উদ্যম ও শক্তিশালী ও পরিশ্রমে অকুতোভয়. অপরদিকে এরা ছিল রহস্য (mystic) বিশ্বাসী। এদের রচনায় এ ব্যাপারের বিশিষ্ট দিক লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড়স্থাপত্যে ক্ষুদ্র ও বৃহতের আলিঙ্গন আছে—গর্ভগৃহের রহস্য অনাদিকালের অজানার সহিত সূত্রবদ্ধ। বিরাটত্বের ভিতর পরিপাট্য ও শৃঙ্খলা এরূপ বিপুলভাবে কোথাও সজ্জীকৃত হয়নি। দ্রাবিড় সঙ্গীত এবং সাহিত্যেও এর প্রতিরূপ আছে—সব একই ছন্দ। এ ছাড়া দ্রাবিড় শীলতা ভারতে আরও বহু উপঢৌকন উপস্থিত করেছে। কিন্তু গোড়া হতেই এর উদ্দাম অত্যুক্তিকে ও বাহুল্যকে শিরোধার্য্য করেই অগ্রসর হয়েছিল। বাংলার রূপ-বিদ্যা ও সাহিত্যের অনুশাসন অন্যান্য প্রভাবের মত এ প্রেরণাকেও সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ তা'তে অন্যান্য আরও নূতন উপকরণ ছিল। তাতে করে' বাংলার বাণী হয়ে পড়ে অন্তর্মুখী গভীর প্রকাশকারুতার পক্ষপাতী। তুবড়ীর মত নিজকে বহিরঙ্গ বাহুল্যে উদ্ঘাটিত না করে' তা শমী বৃক্ষের মত রূপাগ্নিকে বিচিত্র ভাবে অন্তরে রক্ষা করেই প্রদীপ্ত হয়েছে। (ক্রমশঃ)

* Von Eickstedt এবং Von Luschan প্রমুখ জাতিতত্ত্ববিদেরা দ্রাবিড় জাতি বলে কোন বিশিষ্ট জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ ইহা একটা সভ্যতা ও শীলতার সাধারণ নাম।—লেখক।

মিলন-মন্ত্র

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

(অথর্ব বেদ হইতে)

পুত্র চলুক পিতার পিছে
চিত্ত মিলুক মায়ের সনে,
পত্নী তুষুক ভর্ত্তারে তার শান্তি-মধুর সম্ভাষণে।

ভাই কোরো না ভাইকে বিরাগ
বোন কোরো না বোনকে ঘৃণা,
সবাই মিলে একই ব্রতে প্রীতির ভাবে হোক্ সে চিনা।

(তৃতীয় খণ্ড : ২৭শ পরিচ্ছেদ)

যে কাজ সুরু হইয়াছিল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহার যবনিকা পড়িল। জীবনের নূতন অধ্যায় কিভাবে আরম্ভ হইবে, সেই চিন্তায় আত্মভোলার ন্যায় দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। আলো পাই না। প্রবর্ত্তক ছিল প্রাণ-প্রকাশের আশ্রয়, উহা বন্ধ হইল ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কালির আঁচড়ে। 'নব-সঙ্ঘ' বন্ধ হয় নাই, তাহারই আশ্রয়ে 'প্রবর্ত্তকের' ভাব-প্রচার চলিল। এত বড় বাধায়ও উৎসাহ-প্রদীপ নিভিল না। ফরাসী প্রজার অধিকার বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সে এক শক্তিশালী সংহতি ছিল, তাহার নাম 'লীগ দে দ্রোওয়া'। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট নিষ্ফল হওয়ায়, এই সমিতির সভাপতির নিকট আমার প্রতি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আচরণের কথা জানাইলাম। তিনি এই বিষয় ফরাসী ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপিত করিবেন, এই আশ্বাস প্রদান করিলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত নানা দিক্ দিয়া ফরাসী প্রজার অধিকার-রক্ষার আন্দোলন চলিল। বাংলার দৈনিক পত্রিকাগুলি এই সময়ে আমার পক্ষ লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করিলেন। দৈনিক হিতবাদী, বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, বৈকালী, মহম্মদী, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক আত্মশক্তি, বাঁশরী, সারথি প্রভৃতি পত্রে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইখানেই বাধার শেষ নহে বলিয়া আমার অন্তরাত্মা বুঝিয়া লইল। আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই আঘাত আমায় অবনত করিতে পারে নাই। এই বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়াই সংগঠনের পথে আমায় আগাইতে হইয়াছে। ভবিষ্যতের পথ নির্ণয়-হেতু কোনরূপ পরিকল্পনা স্থির করা আমার স্বভাবে নাই। আমার জন্ম ও কর্ম্ম সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল। জীবন দিয়া কি পরিমাণ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে, সে হিসাবের প্রয়োজন আমার নাই। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে লক্ষ্যে রাখিয়া দেশের জন্য আত্মদান করিয়া যাইব, এই সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই যে বিরত হইব না, সে বিষয় আমার আস্থা অটুট ছিল। আমি জানিতাম—এই নূতন পথের যাত্রী যাঁরা হইবেন, তাঁহাদের দুঃখের বোঝাই মাথায় বহিয়া চলিতে হইবে। সান্ত্বনার বস্তু—ঈশ্বরের সঙ্কেত মাত্র। তিনি দিশারী হইয়া প্রতি প্রভাতে যেরূপ নির্দ্দেশ দেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া চলা ছাড়া আমার অন্য বুদ্ধি সেদিনও ছিল না, আজিও নাই।

সম্ভবতঃ শ্রীপঞ্চমীর উৎসব সাঙ্গ হইয়াছে। আরও কঠোর বাধা অপেক্ষায় আছে। শীঘ্রই তাহার সাক্ষাৎকার পাইব। কিন্তু তাহা কিরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবে, তাহা ধারণাও করি নাই। সেদিন প্রত্যুষেই বিদ্যাপীঠে উপাসনায় বাহির হইয়া মনে হইল—সমস্ত অতীতের হিসাব নিকাশ আমায় শেষ করিতে হইবে। এই হিসাবের খাতায় শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র অঙ্কফলের ন্যায় মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করিল। সে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অমিয়প্রসূনকে পত্নী বলিয়া দাবী জানাইয়াছে। আমি তাহা অস্বীকার করিয়াছি। দুই বৎসরের অধিক কাল তাহার দাবীর গুরুভার আমায় বহু প্রকারে অতিষ্ঠ করিয়াছে। এই দায় হইতে মুক্তির প্রেরণা আমায় পাইয়া বসিল। আমার অন্তর-দেবতা যেভাবে আমার হৃদয়-বীণায় অলক্ষ্যে ঝঙ্কার তুলেন, আমি সেই ভাব তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করি। এইখানে কোন মানুষের বাধা বা যুক্তির অপেক্ষা রাখি না। আজিও অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশেই চলি। সেখানে মানব-বুদ্ধির বিচার থৈ পায় না। মানুষের কণ্ঠে শব্দোচ্চারণের নীতির ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্কেতও বুদ্ধিতে আসিয়া করাঘাত করে। সেই বুদ্ধি মণিপুরচক্রের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া অনাহত হৃদয়-পদ্মে স্পন্দন সৃজন করে। সে স্পন্দনের অর্থ বিশুদ্ধ মনশ্চক্রে ভাষান্তরিত হইয়া আদেশকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে। বাহিরের ডাকে

আপনাকে পরিচালিত করার মূলেও অলক্ষিতে এইরূপ প্রক্রিয়াই চলিয়া থাকে—কিন্তু সুগভীর সমস্যার সমাধানকল্পে অন্তরের এইরূপ নির্দ্দেশেরই প্রতীক্ষা করিতে হয়। নতুবা সিদ্ধ যোগীও আপাত সুবিধার লক্ষ্যে ভুল পথে ঈশ্বরচেতনা হইতে দূরে পড়িয়া যায়। জগতের দুঃখ ও বিপত্তি, অশ্রু ও ব্যথা এই ঈশ্বর-নির্দ্দেশের পথে গণনায় আসে না। দুর্গম হইতে দুর্গমতর পথের যাত্রী হওয়ার ধৈর্য্য ও সাহস এইরূপ অন্তর-সঙ্কেতেই মিলে। সিদ্ধান্ত স্থির হইল। অরুণের সহিত অমিয়প্রসূনের সম্বন্ধ লইয়া আমার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ এই মুহূর্ত্তেই করিয়া ফেলিব।

অর্দ্ধপথ হইতে শয্যাগৃহে ফিরিলাম। দ্বারের বাহির হইতেই শুনা গেল সুমধুর অস্ফুটকণ্ঠ। জীবন-সঙ্গিনী সঙ্গীতনিপুণা ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার কোন শিক্ষা ছিল না; তিনি প্রকাশ্যে কোথাও কণ্ঠস্বর বাহির করিতেন না। কিন্তু একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে তিনি আপন মনে গান গাহিতেন। যাহা তিনি শুনিতেন, তাহা হুবহু আয়ত্ত করার স্বভাবশক্তি তাঁহার ছিল। তিনি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আনীত কোন এক পেশাদার থিয়েটারে "জয়দেব" অভিনয় দেখিয়া একটী সঙ্গীত অতি প্রিয় বোধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে আজিকার প্রভাতে এই গানেরই প্রতিধ্বনি শুনিলাম:

> 'এই বলে' নূপুর বাজে—
> সাজ, সাজ, সাজ, ছাড়ি গৃহকাজ;
> কিবা ফল কাল ব্যাজে!'

গানটী অর্দ্ধ-সমাপ্ত না হইতেই আমি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আশ্রম যাওয়ার পথ হইতে অকস্মাৎ আমার এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি মনে করিলেন—নিশ্চয় আমি অসুস্থ হইয়া ফিরিয়াছি। আমাকে সম্মুখে রাখিয়া হাতে লোহা, মাথায় সিন্দুর মাখিয়া মরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই ঘরপোড়া গরুর আকাশে রাঙা মেঘ দেখিয়া শিহরিয়া উঠার ন্যায় তাঁহাকে অনেক সময়ে অকারণ আমার জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিত। তাঁহার এইরূপ দুর্ব্বল স্বভাবের পরিচয় অনেকেই জানিত। শ্রীমান্ কৃষ্ণধন একদিন সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন করিয়া আমার সন্ধান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অতি বিচলিত চিত্তে আমার সন্ধান দিবেন কি, নিশ্চয় কিছু অঘটন ঘটিয়াছে বলিয়া যেরূপ আকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণধনের মুখে সে আলোচনা আমি কয়েকবার শুনিয়াছি। আমাকে যেন তিনি চক্ষে চক্ষে রাখিতে পারিলেই সুখী হইতেন। চক্ষের আড়ালে কখন কি হইয়া যাইবে, এই আতঙ্ক তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। আমার মনে হয়—তাঁহার এই অকপট রক্ষামন্ত্রই আমাকে মহাবিপ্লবের দিনে বহু অশুভ ক্ষেত্র হইতে নিরাপদ্ রাখিয়াছে। সেই মহাসঙ্কটের যুগে তাঁহারই রক্ষা-কবচের আশ্রয়ে আমার মনে হয় আমি কোন নির্য্যাতনের অধীন হই নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে যেরূপ বিপৎসঙ্কুল পথে চলিয়াছি, তাহাতে অনেক দুর্ভোগ হইতে মুক্ত থাকার হেতু এই সতীসাধ্বীর আকুতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এ কথা আমি নিঃসংশয়ে স্বীকার করি।

তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "হঠাৎ ফিরিয়া আসিলে যে?" এই প্রশ্নের মধ্যে উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না—বুঝিবা অত্যন্ত অসুস্থ বোধেই ফিরিয়াছি—মাথার মধ্যে নিদারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে বা গত রাত্রির ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়ায় উদরের যন্ত্রণায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে এমন কত প্রশ্ন নিহিত ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম "ব্যস্ত হইও না। আমি ফিরিয়াছি—এখনই একটী কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে। তোমার সহিত তাহার পূর্ব্বে কিছু পরামর্শ করিব।" তিনি অপূর্ব্ব কিছু শোনার জন্য আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম, "অরুণ যদি বিদায়ের বস্তু হইত, সমস্যা ছিল না। প্রসূনের অবস্থাও এই একই প্রকারের। এই স্থানই তাহাদের জন্মগত অধিকারের ক্ষেত্র। আমার সমস্যা তাই অন্তহীন।"

তিনি অকস্মাৎ আমার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া যেন বিচলিত হইলেন। যে সমস্যার উপর আবরণ পড়ায় সংসারে শান্তির আলো আসিয়াছিল, আবার সেই সমস্যার পুনরাবির্ভাব যদি হয় তাহা হইলে আবার তিনি স্বস্তিহীন হইতে পারেন। তবুও উদাসীনের ন্যায় তিনি বলিলেন "অরুণ বিদায়ের বস্তু নয়, প্রসূনকে ধরিয়া না রাখিলে কি হয়

বলা যায় না। দিন অচল নাই, তোমার সব কিছুকে মানিয়া লইয়া আমি নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে গুছাইয়া লইতেছি, আবার তুমি কি করিবে বুঝিতে পারি না!"

আমি বলিলাম, "তুমি অনেক বিষয়ে ভুল বুঝিয়া থাক। তুমি নিশ্চয় জানিও—আমার কাজ আছে। এই কাজের জন্য যে মানুষ, তাহাকে আমি ধরিয়া রাখি আর নাই রাখি, সে থাকিবেই। এই দিক দিয়া প্রসূন সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি ভুল হয় নাই। আমি অরুণ ও প্রসূন সম্বন্ধীয় ব্যাপারের পরিসমাপ্তি করিতে চাহি। হঠাৎ এইরূপ প্রেরণা আমায় অস্থির করিয়াছে।"

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "কি করিতে চাহ তুমি?" আমি বলিলাম "অরুণের দাবী আমি আর বহন করিতে পারিব না। সম্মুখে গুরুতর বাধা উপস্থিত—আমার অন্তরসাধনার ক্ষেত্রে অরুণের দাবীটা কাঁটার ন্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আমি অরুণের হস্তে প্রসূনকে সমর্পণ করিয়া দিব। আমি এই দিক্ হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চাহি।"

আমার আকস্মিক এইরূপ মনোভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, তিনি আমায় হঠাৎ কিছু না করার জন্য বলিলেন "যাহা করিবে, স্থির হইয়া করা ভাল। বড় বড় ছেলেদের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ কর। তোমার মনে যখনই যাহা আসিবে, তখনই তাহা করিতে হইবে—এইরূপ কথা কি আছে?"

আমি বহু বিষয় বিনা পরামর্শে করি না। বিশেষতঃ নির্ম্মলচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্রের পরামর্শ লইয়াই সব কাজ করি। কিন্তু যেখানে দ্বিধাহীন অনুভূতি পাই, সেখানে নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োজন হয় না, অন্যের কথা আর কি বলিব? মানুষ বাহিরের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভাল-মন্দের বিচারক্ষম। ঈশ্বর যাহা চাহেন, তাহা কয় জন লোক বুঝে! আমি অতি শৈশবে খেলা-ধূলা ছাড়িয়া ঠাকুর গলায় ঝুলাইয়াছি—অন্য কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া নহে। নিরামিষাশি হইয়াছি, তাহার জন্য কাহার নিকট অনুকূল আচরণ পাই নাই। এইরূপ জীবনের প্রতি কর্ম্মমূলে ঈশ্বরের অভিসন্ধি বুঝিয়াই আগাইয়াছি। এ ক্ষেত্রেও ঘরের বাহির হওয়ার মুহূর্ত্তেও এই কথা ভাবি নাই। অর্দ্ধ-পথে তড়িৎ-শক্তির ন্যায় মনে কে যেন প্রশ্ন তুলিল! নির্দ্বন্দ্ব উত্তর পাইলাম—অরুণের হাতে প্রসূনকে অর্পণ করার। বলিলাম, "তুমি কি আমায় ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে বল?"

তিনি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "এমনও তো হইতে পারে—তুমি ভুল পথে নির্দ্দেশ পাইয়াছ!" আমি বলিলাম, "জন্মগত এইরূপ নির্দ্দেশ পাইবার অধিকার আমি অস্বীকার করিতে পারি না। উত্তম জ্ঞান ত্যাগভূমির উপরই জন্মায়। এই ক্ষেত্রে আমার কোন স্বার্থ নাই। অরুণকে কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি, সে ভোগ বা মোহের জন্য এই দাবী করে নাই।"

তিনি একটু হাসিলেন। আমি সে হাসির অর্থ বুঝিলাম। বলিলাম "তুমি হয়তো বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু আমার মূলধন বিশ্বাস। অরুণ জানাইয়াছে—ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ এই পরিণয়ের লক্ষ্য নহে। সে তার সত্যকে পাওয়ার জন্য জীবনান্তকাল প্রতীক্ষা করিতেও প্রস্তুত। এই অবস্থায় আমিই তার দাবীর ভার-বহনের আর প্রয়োজন না দেখিয়া নিষ্কৃতি চাহিতেছি, তুমি ইহাতে বাদ সাধিও না।"

তিনি বলিলেন "অরুণের কথাই বলিতেছ, প্রসূন সম্বন্ধে তোমার কথা কি?"

আমি বলিলাম "প্রসূন এই সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নহে। অরুণের আকুতি শুনিয়াই সে আমায় ইহা নিবেদন করিয়া দিয়াছে। অরুণকে আমি আমার আদর্শানুযায়ী গড়িতে চাহিয়াছি। সে হইবে বৈরাগ্যদৃপ্ত বীরেন্দ্র-কেশরী নরেন্দ্রনাথের ন্যায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী। এ স্বপ্ন আমার অপরিত্যজ্য। কিন্তু অরুণ যদি সে ভার-বহনে সম্মত না হয়, তবে তার স্বাধীন জীবনের পথে আমার স্বপ্ন বাধা হইবে কেন? আমার স্বপ্ন সার্থক হওয়ার নিশ্চয় স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে। তবে অরুণ চাহে না সাধারণ গার্হস্থ্যজীবন। সে অনাঘ্রাত ফুলের মতই দাম্পত্য-জীবনের ক্ষেত্ররূপে নিজেকে পাইতে চাহে। প্রসূন অরুণের এই পথে পরিপন্থী হইবে না। অরুণও প্রসূনের অটুট ব্রহ্মচর্য্যরক্ষায় বিঘ্ন হইবে না। অতএব অরুণের দাবী আমি পূর্ণ করিব।"

তিনি এই সকল কথা তলাইয়া বুঝিলেন কি না জানি না। আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটী জোর করিয়া ধরিলেন। বলিলেন "তোমার আজিকার এই কথা ভবিষ্যতে যে সত্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইহা ছাড়া খগেনের বিবাহকালে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তারপর তরুর বিবাহে ছেলেদের মনে যে বিরক্তির ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, এই বিবাহে নিজেদের মধ্যে এবং অরুণের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিরোধের আগুন জলিয়া উঠিবে। তুমি স্থির হও। এইরূপ কর্ম্মে অশান্তি বাড়িবে।"

আমি দেখিলাম—আমার অন্তর-বীণার সহিত গৃহদেবীর বীণার সুর এখনও সম্পূর্ণ এক নহে। এখানে পত্নীর সুরে সুর মিলাইতে হইলে, অন্তর্যামীকে দূরে ফেলিতে হয়; প্রতীক্ষায় কোন দিন সুফল হয় নাই। বেসুরার মাত্রাই প্রশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়। যেখানে যৌগিক সম্বন্ধে সংশয়, সেখানে নিরুপায় হইয়া প্রতীক্ষাই করিতে হয়। এখানে সে কথা নাই। আমি গুরু গৃহদেবী আমার অনুগতা শিষ্যা। এখানে সম্বন্ধভেদ যদি সত্য হয়, জীবনটা ব্যভিচারেরই নামান্তর হইবে। আমারই হৃদয় লইয়া তাঁহার প্রকাশ। ভিন্ন দেহ বলিয়া সম-সুর সহজ নয়, সাধ্য। তাঁহার আনুগত্যই যোগসিদ্ধ জীবনের পথ প্রশস্ত করিবে। এইবার আমার উন্মাদনা আসিল। আমি বলিলাম "ছাড়, আমার আঙ্গুল ছাড়। সময় বহিয়া যায়, আর আমি অপেক্ষা করিব না।"

কনিষ্ঠ অঙ্গুলী তাঁহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লওয়া সহজ হইল না। আমি শুক্র গ্রহের শক্তি লইয়া জন্মিয়াছি, বর্ষার উচ্ছ্বসিত নদীর ন্যায় প্রচণ্ড গতি। আর তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির প্রভাবাধীনা। তাঁর স্থির ও গভীর বুদ্ধি আমার প্রয়োজনে লাগে না। তিনি ভাবুন, আমার কর্ম্ম এই মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন করিতে হইবে। আঙ্গুল ছাড়াইয়া লইলাম, কিন্তু যে চিহ্ন রহিল তাহা চিরস্মৃতি রক্ষা করিবে। আজিও কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটীর দিকে চাহিয়া ভাবি—দেবি! চিরদিন তুমি আমায় এমনইভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছ। কিন্তু আমি চিরদিনই তোমায় ছাড়িয়াই চলিব। তুমি ও আমি সংসারে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকি। বিশ্বের বিরাট্ ক্ষেত্রে ভূমার চেতনা লইয়া যুগে যুগে তুমি আমার অনুসরণ কর।

আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলাম। অনেক বিলম্বে আসিয়াছি। সুপ্রাচীন রসাল তরুতলে আজ আর নারী-পুরুষের কণ্ঠে সে সুমধুর গীতলহরী শোনার সুযোগ হইল না। মনের বীণায় বাজিল—

"ধীর সমীরে প্রভাত আওলো
অলিকুল ছুটল কুসুম পরাগে।"

উপাসনা-গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, নবযুগের নারীপুরুষ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নিমীলিত নেত্রে স্থিরাসনে উপবিষ্ট। সে দিনও বর্ত্তমান উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই, প্রতিদিন প্রভাতে সমবেত কণ্ঠে একটী করিয়া উদ্বোধনসঙ্কীর্ত্তের পর এক ঘণ্টা ধ্যানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। ধ্যানের পর আমার উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকে স্ব-স্ব কার্য্যে রত হইত। সে দৃশ্য বড় মনোরম। অকপট-চিত্তে প্রায় ৫০টী তরুণ ও ১০।১২টী কিশোরী ও যুবতী ধ্যাননিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছে—দূরে বহিয়া চলিয়াছে কুলুনাদিনী ভাগীরথী, আম্রকুঞ্জে নব মুকুলের সৌরভ ছুটিয়াছে। অসংখ্য প্রকার বিহঙ্গের কূজনে আশ্রমে ঐক্যতান বাদন চলিয়াছে। সে অপূর্ব্ব অনুভূতির স্মৃতি আজও কেহ মুছিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অহঙ্কার ও বাসনার তাড়নায় কোথায় কে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই সাধনার অনুভূতির স্মৃতি কাহারও কি মুছিয়াছে? এমন হইলে, সে তাহার অতি বড় দুর্ভাগ্যই বলিব।

আমি ফিরিয়া দেখি—উল্কার বেগে মহাদেবী আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন। তিনি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ বজ্রধ্বনির ন্যায় আমার কণ্ঠরবে গৃহস্থিত সকলেই চমকিত হইল। অভাবনীয় আদেশ, এমন কেহ কল্পনাও করে নাই। আমি অরুণকে আহ্বান করিলাম। সে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি প্রসূনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম "উঠিয়া আইস। আজ তোমাদের পরিণয়।"

প্রসূন সামান্যক্ষণ ইতস্ততঃ করিল; সে করুণ নয়নে একবার আমার দিকে, একবার সঙ্ঘজননীর দিকে দৃষ্টিপাত

করিল। এই শুভ মুহূর্ত্ত আমি ব্যর্থ করিতে পারি না। প্রসূন কি আমার আদেশ অমান্য করিবে? আমি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না প্রসূন। উঠিয়া আইস।"

প্রসূন ব্রীড়াবনত মুখে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দীক্ষা-দিনের পূর্ব্ব প্রভাতে সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেবী যেমন আমার পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছিলেন, আজও তেমনই সমস্ত অশুভহরণের সঙ্কল্প লইয়া গৃহলক্ষ্মী আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তরুণ-তরুণীর দুইখানি হস্ত সংযুক্ত করিয়া আমার হস্তের উপর স্থাপন করিলাম—বলিলাম "এই পরিণয় সত্য সঙ্কল্পের পরিচয় মাত্র। তোমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগের আকর্ষণ দেবতা হরণ করিয়া লইবেন, তোমরা অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় সঙ্ঘের অভিযানে চিরযাত্রী হও।"

গৃহমধ্যে সে এক সত্যই অভাবনীয় দৃশ্য। অচিন্তনীয় ঘটনায় সকলেই বিমূঢ়, স্তম্ভিত। কাহারও মুখে কথা নাই। হঠাৎ গৃহকোণে একজনের কণ্ঠে বিকট আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সে তরুণের নাম উল্লেখ করিব না। ইহার কথা পরে বলিব। আমার অতর্কিতে তাহার অন্তরে যে রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে—পরবর্ত্তী জীবনে সে তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

এই পরিণয় ঘোষণা করার পর আমি সঙ্ঘের অন্যান্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশে মন দিলাম। চন্দননগর হইতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তি উপড়াইয়া দিতে বিরুদ্ধ শক্তি তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। আমি সেই মহা-দুর্য্যোগের মধ্যেই সৃষ্টিশক্তির সাধনায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে রূপ দিতে কঠোর তপস্যারত হইলাম। সেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সঙ্ঘ কিরূপে বর্ত্তমান আকৃতি গ্রহণ করিল, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সেই কথা লিখিতে বসিয়াছি। (ক্রমশঃ)

নব্য-নীতি

রায় বাহাদুর শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল

গুছিয়ে নাও গুছিয়ে নাও—
বর্ত্তমানের স্বর্ণ-সুযোগ নিজের কাজে লাগিয়ে দাও

আত্মীয় আর বন্ধু বলে'
আজ জগতে কেউ ত নাই,
সবার চেয়ে টাকাই আপন
স্বর্গমোক্ষ তবিলটাই।
চাকুরি কর? মনের সাধে কাজের ফাঁকি চালিয়ে দাও—
খাটতে খাটতে জানটা গেল, ওপরওলায় জানিয়ে যাও।
দোকানদারের দোকানটী সাফ্
সম্মুখে চাও কিছুই নাই,
ডবল-দামের গোপন offer
বার্ করে দেয় যাহাই চাই।

ব্যবসাদারের চোরা বাজার লুটছে টাকা অনর্গল
মিথ্যা কথার কারসাজি আর ধাপ্পাবাজির চরম ফল।
এমন লড়াই আর হ'বে না গাছের পাড়ো তলার খাও।
ধরম করম লজ্জা সরম গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দাও।
অন্নহীন আর বস্ত্রহীনের কাতর রোদন শ্রাব্য নয়
চিরকালই মরছে যারা মরবে তারা সুনিশ্চয়!
"চাঁদির জুতি" সহায় রেখো পড়লে হঠাৎ বেতাক্ chance,
কাটিয়ে যাবে বেবাক্ বিপদ ডি-আই-রূল্ আর ordinance.
আসবে যখন অবশেষে শমন রাজার এত্তেলা
বেপরোয়া পারবে তখন করতে তাঁহার হাত-তেলা।

ভিখারী

শিল্পীঃ ডি, দাশগুপ্ত

নৃত্যে দৃশ্যপটাদির স্থান

নৃত্যবিৎ মণিবর্দ্ধন

রূপসৃষ্টির সার্থকতা তখনই যখন সেই সৃষ্টি পূর্ণতায় সার্থকতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এই সমৃদ্ধিতেই তার প্রাণ—প্রকাশরীতি বা উপাদান যাই হোক। শিল্পী—তার যে মানসরূপের পরিকল্পনা মনে রেখে বাইরে প্রতিচ্ছবি আঁকেন এবং আপনার অন্তরের ঠিক সেই রূপ ও রস যখন দ্রষ্টার মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন আপনার রূপসৃষ্টির মধ্যস্থতায়, তখনই তার সৃষ্টি হয় সার্থক। তাই শিল্পকলাকে বলা হয় হৃদয়-হৃদয়ান্তরের রূপসেতু—যা স্থানকালের কোন বন্ধন মানে না; আপনার অন্তরের নিহিত বাণী যুগযুগান্তর ধরে সে বয়ে নিয়ে চলে ও পৌঁছে দেয় লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের গভীর রাজ্যে।

শিল্পকলা সম্বন্ধেই একথা চলে। নৃত্যকলা সম্বন্ধেও এ কথাই ঠিক খাটে। রসসৃষ্টির অপূর্ণতা অর্থাৎ বিভাব্য ভাব ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনার অভাব নৃত্যের স্বাভাবিক ছন্দ ও গতিকে নিশ্চল করে দিয়ে তাকে প্রাণহীন অর্থহীন কতকগুলো রূপবন্ধের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত করে। যেখানে স্রষ্টার মনেই তার সৃষ্টি ভাবোদ্রেক করতে পারে না, দ্রষ্টার মনে তা রেখাপাত করা দূরের কথা—বিন্দুমাত্র রসসঞ্চারও করতে পারে না। রসসৃষ্টির এ অক্ষমতা স্রষ্টার সৃষ্টিকে কুৎসিত করে তোলে।

তবে এ কথা সত্য যে, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রসে রূপকারের মনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ফুটে ওঠে। চিত্রকলায় রূপস্রষ্টা আপনার মনের যে দিকটি সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেন, যেমন ভাবে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেন, সঙ্গীতকলায় হয় তো তার সে দিকটিকে ছাপিয়ে অন্য বিশেষ কোন একটি দিক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আবার সঙ্গীতে যা এত সুস্পষ্ট, এমন সাবলীল, সাহিত্যের অক্ষরবন্ধনে তার রূপটি হয় তো ঠিক তেমনি প্রকাশ পায় না। বরং অন্য আর একটি বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তাই নৃত্যকলাকে সর্ব্বাঙ্গীন প্রকাশের বাণীতে বাণীময় করবার জন্য নৃত্যের আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে আবহ সঙ্গীত, আহার্য্য অভিনয় ইত্যাদির প্রচলন ছিল এবং আছেও। নৃত্যের বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগের জন্য নৃত্যশিল্পীর চাই অন্তর্মুখী মন, সূক্ষ্ম রসানুবোধ—পরিকল্পনার জন্য চাই তার কল্পনাশক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান, দেহভঙ্গীর জন্য প্রয়োজন তার ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার রেখাজ্ঞান, আহার্য্য অভিনয়ে চরিত্রোপযোগী পরিচ্ছদের জন্য থাকা চাই তার নানা রংএর বৈচিত্র্য জ্ঞান—প্রয়োজন তার তাল-লয়-ছন্দজ্ঞানের—হতে হবে তাকে সঙ্গীতজ্ঞ। মনের যে ভাব শুধু আঙ্গিক অভিনয়ে সম্পূর্ণ রূপ পেতে পারে না—সেখানেই সহায়ক হবে আহার্য্য অভিনয়, আবহ সঙ্গীত ও দৃশ্যপটাদি—যা আঙ্গিক অভিনয়ের এ অপূর্ণতাটুকু পূরণ করে দেবে। আহার্য্যের বিধান ও প্রয়োজন সে জন্যই। পূর্ণকে পূর্ণতর করে তুলতে, স্পষ্টকে আরো স্পষ্টতর করে তুলতে শিল্পী ভাবের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনায় বিভিন্ন আঙ্গিকের সংমিশ্রণে তার সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করে তুলবে। এ ধরণের বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণে অগৌরবের কিছুই নেই, যদি কিছু থাকেও বা, বিকাশের পূর্ণতায় সে অগৌরব, অক্ষমতা ঢাকা পড়বে।

ভারতের নৃত্যকলায় আহার্য্য ও বাচিক অভিনয়ের প্রচলন আজকের নয়, বহুদিনের। শাস্ত্রসৃষ্টির সেই সুদূর অতীতেও এর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল; তাই তার প্রচলনও ছিল, শাস্ত্রকারও সে সবের বিধান দিয়ে গেছেন। নাট্যশাস্ত্রের ত্রয়োবিংশতম অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে সুবিস্তৃত বিধি-নির্দেশ রয়েছে। তবে সে পরিচ্ছদের বিধানের সবটুকুই আমার আলোচ্য নয়। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—ভারতীয় নৃত্যে দৃশ্যপটাদির স্থান আছে কিনা, আর থাকলেও তার প্রয়োজন কতটুকু এবং তা রসসৃষ্টিরই বা কতটুকু অনুকূল।

বর্ত্তমানে প্রচলিত নৃত্যের যে রূপ—তাতে আহার্য্য অভিনয়ের এ দিকটা অর্থাৎ দৃশ্যপটাদি শিল্পী সম্পূর্ণই বাদ দিয়ে গেছেন। বিচিত্র দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা নাট্যরঙ্গমঞ্চে রয়েছে, কিন্তু নৃত্যে দৃশ্যপটাদি বা অভিনীয়মান ঘটনার স্থান-নির্দ্দেশক দৃশ্যাদির পরিবর্ত্তে মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণে, বামে কৃষ্ণবর্ণের যবনিকাই আজকাল দেখা যায়। শিল্পবিকাশে মধ্যযুগের নৃত্যরূপেও দেখতে পাওয়া যায়, নৃত্যাভিনয়ে এ দিকটা শিল্পী আগাগোড়াই উপেক্ষা করে গেছেন—হয়তো তাগিদও এর ছিল না।

মণিপুরে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নৃত্য-নাট্য হয় ঠাকুরঘরের সম্মুখে, নাট-মণ্ডপে আসর ক'রে;—আর সে আসর (রাসমণ্ডল) ঘিরে চারধারে বসে দর্শনার্থীর দল। উত্তর ভারতে কথক নৃত্যের চর্চা যেখানে হয়েছে সেখানে দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল নিষ্প্রয়োজন; আর তা ছাড়া নৃত্যের বিষয়-বস্তু যা থাকত তাতে আহার্য্যাভিনয়ের এ রূপসজ্জার কোন প্রয়োজনই থাকত না। দক্ষিণ ভারতে নৃত্যচর্চ্চার স্থান ছিল দেবতার মন্দির (দেবদাসী নৃত্য)। নৃত্যের অর্ঘ্যে দেবতার উপাসনা হচ্ছে আরতির ক্ষণে-ক্ষণে; দৃশ্যপটাদির প্রয়োজন সেখানেও হয় নি। কেরল অঞ্চলে কথাকলি নৃত্যনাট্যেও রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনামূলক আখ্যান নিয়ে নৃত্যনাট্য সংগঠিত হয়েছে—তারা অভিনয় করেছে সবার সম্মুখে—দৃশ্য-পটাদির প্রচলন সেখানেও দেখা যায় না বরং তাদের এ দিকের উপেক্ষা যেন অঙ্গসজ্জা ও বর্ণসজ্জায় তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তবুও আশ্চর্য্য এই, নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু এর দৃশ্যপটাদির বিধান দেখা যায়। অলঙ্কার, অঙ্গরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে মহর্ষি ভরতকৃত শাস্ত্রে পুস্তেরও নির্দ্দেশ আছে। পুস্ত অর্থাৎ মঞ্চে কৃত্রিম পর্ব্বত, বৃক্ষ ও দৃশ্যপটাদির সংস্থাপন হয়তো নাট্যেই প্রচলন ছিল অধিক। এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, তদানীন্তন প্রচলিত নাট্যনৃত্যকে উপলক্ষ্য করেই সে সময়ে এ নৃত্যশাস্ত্র সংরচিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতেও মঞ্চে দৃশ্যপটাদির সহায়তায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রথা ও প্রয়োজনবোধ ছিল—হয়তো নাট্যেই দৃশ্যপটাদির প্রয়োজন ছিল অধিক। নৃত্যনাট্য কতটা ছিল, কি করে সুপ্ত হ'ল, ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত ঠিক করে বলা শক্ত। তবে এটুকু অনুমিত হয় যে, ধীরে ধীরে যুগ-পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে বিশেষ করে মধ্যযুগে নৃত্য যখন দরবারে এল, তখনই সম্পূর্ণভাবে তা লুপ্ত হয়েছে।

বর্ত্তমানে ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই নৃত্যে বিশেষ করে নৃত্যনাট্যে (ব্যালে) দৃশ্যসজ্জা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নৃত্যনাট্যের (ব্যালে) অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা নানাভাবে উন্নত হতে উন্নততর হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে একে আরও কি ভাবে নৃত্য-নাট্যের সহায়ক হিসাবে উন্নততর বিকাশভঙ্গীর সাযুজ্যে কার্য্যকরী করে তোলা যেতে পারে, গবেষণামূলক প্রচেষ্টায় তারই আয়োজন চলেছে। অবশ্য একথাও সত্য সে দেশের নৃত্যনাট্যে দৃশ্যসজ্জা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। নৃত্যনাট্যের আখ্যানভাগই (যেমন রাশিয়ান ব্যালেতে) এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, দৃশ্যসজ্জায় তার আখ্যানের অনেকটুকু ফুটিয়ে তোলা হয়। তাই মঞ্চসজ্জাও তাদের নৃত্যনাট্যের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

ভারতে বর্ত্তমানে নৃত্যকলা প্রদর্শনকালে মঞ্চে যে কৃষ্ণ যবনিকা এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। অবশ্য এ কৃষ্ণপর্দ্দা যে রসসৃষ্টির প্রতিকূল বা এমনি একটা কিছু, আমি সে কথা বলছি না। বরং কোন কোন নৃত্যে কৃষ্ণপর্দ্দার প্রয়োজন অত্যধিক। পটভূমিকায় কালো পর্দ্দার সুবিধা এই যে, তাতে দ্রষ্টার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করিয়ে দেখার একাগ্রতাকে খণ্ডিত করে না। মনের সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে দর্শক দেখতে পারে। অচঞ্চল মনের কাছে তার রসোপভোগের কোন বিঘ্নই আর আসতে পারে না—দৃষ্টি তার থাকে অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ডিত। অনাবশ্যক দৃশ্যসজ্জার বিচিত্র আকর্ষণে দ্রষ্টার দৃষ্টি খণ্ডিত হয় না। এমন স্থলে দৃশ্যপটাদির অবতারণা করলে নৃত্যের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপটি ব্যাহত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়তে পারে এবং দ্রষ্টার হৃদয়ে তার রসের আবেদনও হয়তো অনেকটা হারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এ কথাও সত্য, বর্ত্তমানে নৃত্যনাট্য এমন সব বিষয় নিয়ে রচিত হচ্ছে, যা শুধু কালো পর্দ্দায় ফুটবে না—সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে হলে দৃশ্য পটাদির প্রয়োজন। শুধু বাস্তবের কথা নিয়ে গড়া আখ্যানভাগই নয়, এমন সব রূপাত্মক নৃত্য ও কাহিনীর পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে যা কৃষ্ণবর্ণের যবনিকার পরিবর্ত্তে নৃত্যরসানুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্যপটাদির পটভূমি করে অতি সহজে অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ পেতে পারে। যেমন ধরা যাক "অজন্তার জাগরণ-মূলক" কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে কল্পিত নৃত্যনাট্যটির কথা। জ্যোৎস্না রাতে অজন্তার গুহায় প্রাণহীন মর্ম্মর মূর্ত্তিতে জাগে প্রাণের স্পন্দন—বৌদ্ধ শ্রমণ এসে গাথা গায়—

গুহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এসে ঘুম ভাঙিয়ে যায় এদের—তারা জাগে—তারা নাচে।

এই আখ্যানভাগ নিয়ে পরিকল্পিত যে নৃত্যনাট্য তার অভিনয়কালে পিছনে কালো পর্দ্দা রেখে মূল ভাব ও রসের ব্যঞ্জনায় যতটুকু সাহায্য হবে—অজন্তা গুহারই একটি সুসংযত দৃশ্যসজ্জার সম্মুখে, একই ধরণের অভিনয়ে কি মূলগত ভাব ও রসের ব্যঞ্জনা অধিকতর হবে না? আবেদন আরও বেশী ব্যাপক হবে না? দৈনন্দিন সুখ দুঃখের কাহিনী নিয়েও যে নৃত্যনাট্য পরিকল্পিত—তাদের কোন কোনটির বেলায়ও ঠিক উপরোক্ত কথাটিই বলা চলে। অভিনয়ের পিছনে কালো পর্দ্দা অভিনীয়মান ঘটনার রূপের সীমা বেশ একটু ব্যাপক করেই ছড়িয়ে ধরে সত্য, কিন্তু পেছনের দৃশ্যপট সেই রূপের, সেই বিশাল ব্যাপ্তির বুকে যেন একটি সীমা টেনে তার পরিধিটীকে আরও ছোট করে আনে—নৃত্যভাব অনুধাবনের পক্ষে আরও সহজ সরল করে দেয়।

তা ছাড়া নৃত্যনাট্যে দৃশ্যপটাদির সংস্থাপন আরও একদিক থেকে অপরোক্ষভাবে নৃত্যশিল্পীকে তথা নৃত্য-নাট্যের মূল ভাব ও রসরূপায়নে কিছুটা সাহায্য করে। নৃত্যনাট্যের কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাত্রিতে অভিনয়ে (নৃত্যে যা অঙ্গমুখভঙ্গী, মুদ্রা ও যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে সম্পাদিত হয়) মাঝে মাঝে একটা ছন্দহীন স্থৈর্য্য রঙ্গমঞ্চেও দেখা যায়—এবং তা সময় সময় খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকে—এমন কি মাঝে মাঝে নৃত্যনাট্যের ছন্দপাত পর্য্যন্তও ঘটায়। তার এ রূঢ় দৃষ্টিকটুত্ব কৃষ্ণ যবনিকার সম্মুখে যতটুকু চোখে ঠেকবে—বিচিত্র দৃশ্যপটাদি পেছনে থাকলে ততটা লাগবে না—দুঃসহও সুসহ হয়ে যাবে।

আজ এ সম্বন্ধে ভাববার দিন এসেছে। এককালে কালো পর্দ্দা পিছনে রেখে নৃত্যের প্রচলন ছিল বলে বা আছে বলে, অনাদিকালই যে এ প্রচলনের জেরই টানতে হবে—এর কোন অর্থ নেই। পুরাতনের মোহে নূতনের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা চলে না; করা সুসঙ্গতও নয়। কাজেই প্রয়োজনানুসারে দৃশ্যপটাদির প্রচলন বর্ত্তমানে নৃত্যনাট্যে না হলেও, অদূর ভবিষ্যতে যে হবে না, একথা আজ নিঃসংশয়ে বলা চলে না। নূতন আপনার প্রয়োজনে আপনার স্থান আপনি করে নেবে। পুরাতনের অন্ধমায়া তার পথরোধ করতে পারবে না।

মুরুব্বি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী

নানাস্থানে উমেদারী করে জ্ঞাত অজ্ঞাত বহু ব্যক্তিকে বহুদিন ধরে খোসামোদ করে এবং প্রায় দিস্তাখানেক টাইপ ফুলস্কেপ কাগজ নষ্ট করবার পর স্বভাবতঃই চাকুরী প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটা নৈরাশ্য দেখা দিল।

যৌবনের সেই অশুভক্ষণে পরমারাধ্য পিতৃদেব হঠাৎ একদিন অভাবনীয় শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করলেন, 'শুনছ? আমাদের পুরোনো আমলের বন্ধু কুটবিহারীর সঙ্গে আজ দেখা। তার ছেলে বিলেত যাচ্ছে। লোকটার জানাশোনা খুব—তোমাকে একটাতে সে ঢুকিয়ে দেবে বলছে। কাল দেখা কোরো—'

এবম্বিধ সংবাদে একটু চাঙ্গাই হইয়া উঠিলাম। বাবা বলিতে লাগিলেন, 'ওর ছেলে তোমার চেয়ে কম 'কোয়ালিফায়েড' অথচ ছ্যাখ, ধরা-পাকড়া করে কি রকম বিলেত পাঠাচ্ছে। তুমি এ্যাদ্দিন বসে আছ শুনে ত অবাক! বল্লে, 'সে কি? এম, এ পাশ ছেলে, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি? আমি কত 'আণ্ডার গ্রাজুয়েটেদের' ভাল ভাল চাকুরী জুটিয়ে দিয়েছি।'

আমি উৎসাহের প্রাবল্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বলিলাম, 'কালই ওঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

পরদিনই অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। বন্ধুর ছেলে বলিয়া খুব আদর করিয়া বসাইলেন। বাবার অনেক নিন্দা করিলেন: আমাকে কেন এতদিন কোথায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তিনি নাকি বরাবরই আলসে প্রকৃতির—সেই জন্যই তার কিছু হোলো না ইত্যাদি।

...পর নিজের কথা পাড়িলেন। সামান্ত অবস্থা হইতে কি করিয়া আজ অফিসের ম্যানেজার হইয়াছেন। কত লোকের সঙ্গে খাতির! ছেলে বিলেত যাচ্ছে—ফিরে এসে হাজার টাকা মাহিনা হইবে। হেরম্বর ছেলে আমি তার ছেলেরই সমান। আগে এলে এতদিন আমি দুইশত টাকা রোজগার করিতে পারিতাম। এমনি আরও অনেক কথা।

বহুদিন আগে আমাদের বাড়ীতে মালপোয়া খাইয়া কি রকম তৃপ্তি পাইয়াছিলেন—সে কথাও বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজকাল সে রকম মালপোয়া হয় না বাড়ীতে?' বাড়ীর মালপোয়ার বিশেষত্বের কথা আমার জানা ছিল না, অথচ গৃহের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিতেও ইচ্ছা হইল না। বাধ্য হইয়া মিথ্যা কথা বলিতে হইল: হয় মাঝে মধ্যে।

কেন জানিনা, হুটবিহারী বাবুকে আমার খুব ভাল লাগিল। তাঁর মেদস্ফীত বর্ত্তুলাকার উদর এবং কৃষ্ণবর্ণ আকৃতির সঙ্গে অধিকাংশ খাবারের দোকানের মালিকের হুবহু সাদৃশ্য আছে। একটা দু'আনা দামের সন্দেশ মুখে পুরিয়া কথা বলিলে যেরূপ গলা আটকাইয়া অদ্ভুত চাপা স্বর নির্গত হয়—তাঁর কথাবার্ত্তা সব সময়েই সেই সুরে বাঁধা।

বোধ হয় তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন স্থুলত্বই আমাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। অফিসের ছুটি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। ছুটির পর সঙ্গে করিয়া একজন পদস্থ সরকারী চাকুরের বাড়ী লইয়া যাইবেন বলিলেন। তাঁর হাতে কয়েকটি ব্যাঙ্ক আছে—তিনি বলিলে একটির ম্যানেজার আমি দু'একদিনের মধ্যেই হইতে পারিব।

উৎসাহে, আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলাম। কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্বশুরালয় হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়াছিলাম। স্ত্রী লিখিয়াছেন: 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর তোমার চাকরী একই সময়ে হইবে বলিয়া মনে হয়। শুধু ক্ষোভ এই, বেকার স্বামীর স্ত্রী হইয়া পরাধীন ভারতেই আমার জীবনান্ত হইল।' এইবার স্ত্রীর চিঠির জবাব দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর দুইজনে বাহির হইলাম। গন্তব্যস্থান অনেকটা দূর। হুটবিহারীবাবু পদব্রজে যাওয়াই মনস্থ করিলেন। বলিলেন, চলনা, হাঁটতে হাঁটতেই যাওয়া যাক। বিকেলে একটু হাঁটা ভাল।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, না না সে কি? চলুন, ট্রামে যাই। আপনি কেন কষ্ট করবেন?

তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ট্রাম হইতে নামিয়া খানিকটা হাঁটিতে হইল। সরকারী চাকুরের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী একটা বিরাট গৃহের সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঈপ্সিত ব্যক্তির সন্ধান মিলিল না। হুটবিহারীবাবু খোঁজ লইলেন, তিনি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছেন—কয়েকদিন পরে ফিরিবেন!

আমি একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলাম। অস্ফুটস্বরে বলিলাম, আমার কপালই খারাপ! হুটবিহারী বাবু শুনিতে পাইয়া বলিলেন, ঘাবড়াচ্ছো কেন? একজন গেছে তাতে হ'ল কি? কাল অন্য লোকের কাছে নিয়ে যাব। একটার ভরসায় তোমার বাবাকে কথা দিয়েছি আমি?

সত্যই ত! মনে মনে লজ্জিত হইলাম। কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা তাঁর। ফিরিবার মুখে হুটবিহারী বাবু বলিলেন, একটু চা খেলে হ'ত, গলাটা শুকিয়ে গেছে।

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।—চলুন না কাছেই রেস্তোরাঁ আছে: তারপর সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, আপনি চা খান জানিনে ত—তাই বলিনি।

কলেজ স্কোয়ারের নিকট আমাদের প্রাত্যহিক আড্ডার একটি চায়ের দোকান ছিল—সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। দোকানের দরজার সামনে হুটবিহারী বাবু হঠাৎ থামিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বিপরীত দিকে ফুটপাথের ওপর একটা দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর গভীরভাবে নিবদ্ধ দেখিলাম। "সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—উৎকৃষ্ট ঘৃতের খাবার।" চলুন ভিতরে—আমি একবার তাগাদা দিলাম। হুটবিহারী বাবু ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। বলিলেন, থাক্—চা আর এ গরমে খাব না। চল খাবারের দোকানে খান কয়েক করে গরম লুচি খাওয়া যাক।

—বেশতো! চলুন না—

ততটা বিস্ময় বোধ করি নাই। অফিস-ফেরত ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। বরং তাঁহার চরিত্রের এই শিশুসুলভ সারল্যে মুগ্ধই হইলাম।

দোকানে ঢুকিয়া ঝুটবিহারী বাবু কাহার উদ্দেশ্যে নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—'কই হে ভূপতি—চারখানা করে লুচি দাও। আলাদা আলুর দম দিও।' বলিতে বলিতে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতে কলের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফিরিয়া আসিলে বিস্ময় প্রকাশ করিলাম, আপনার চেনা দোকান দেখ্‌ছি—

ঝুটবিহারী বাবু হাসিলেন: এ অঞ্চলের প্রায় সব দোকানদারই আমাকে চেনে। ভূপতি লুচি পরিবেশন করিয়া গেল। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী ভেজালের দিনে এই দোকানের খাঁটি ঘিয়ের অজস্র সুখ্যাতি করিয়া তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিঃশেষিত হইল। পুনরায় চারখানি আসিল। আমি বেলায় খাইয়াছি বলিয়া আর লইলাম না। ঝুট বিহারী বাবু দু'খানি লুচি এক সঙ্গে মুখে পুরিয়া ধরা গলায় বলিলেন, 'ভূপতি?—রাজভোগ হবে টাটকা?' তারপর আমার দিকে চাহিলেন, 'কি বল নিমাই? রাজভোগ খাওয়া যাক।'

—'বেশ তো! ওহে, রাজভোগ একটা দাও বাবুকে।

ঝুটবিহারীবাবু রাজভোগে কামড় দিয়া খুব তারিফ করিলেন। এ দোকানের বিশেষত্বই রাজভোগ। মুখে দিলে গলে যায়। তার পর স্মিত হাস্যে বলিলেন, 'এ সব জিনিষ একটা খেলে মুখে লাগেই না—কি বল?' বাধ্য হইয়া আর একটার অর্ডার দিলাম এবং দিয়াই ঘামিতে সুরু করিলাম। ইতি মধ্যেই পাঁচ সিকা হইয়া গিয়াছে, পকেটে আর মাত্র চার আনা অবশিষ্ট আছে। ঝুটবিহারীবাবুর সতৃষ্ণ নয়ন তখন খাবারের আলমারীর থাকগুলির ওপর ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁর যে সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখন তাহাই রীতিমত আশঙ্কার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। আমি বোধহয় উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, 'থাক্—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বিল এখানেই দিয়ে যাবে।'

মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ভিতর একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং তীব্র একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির প্রাবল্যে বলিয়া ফেলিলাম, 'বেশী পয়সা নেই কিনা, কত দাম হোল একবার…'

ঝুটবিহারীবাবু নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, 'সে জন্য আটকাবে না, চেনা দোকান। বাকীটা কাল দিলেও চলবে। কই হে ভূপতি? কড়াপাকের কিছু খাওয়াও দিকি—অমনি অমনি পোয়াটেক দই নিয়ে এস যা গরম—'

আমি হতভম্বের মত বসিয়া পড়িলাম। কড়াপাকের সন্দেশ দুইটি দধি সংযোগে গলাধঃকরণ করিয়া [illegible] গ্লাস জল খাইয়া ঝুটবিহারী বাবু যেন একটু প্রকৃতস্থ হইলেন। তৃপ্তির সঙ্গে বলিলেন, 'খুব খাওয়া হোল-আজ এই থাক্।'

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। ঝুটবিহারীবাবু উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। কয়েকমুহূর্ত্ত অত্যন্ত অধীরভাবে কাটিল। হঠাৎ মেঘনির্মুক্ত নির্ম্মল আকাশের মত প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি বলিলেন, মুখটা মিষ্টি হয়ে গেল হে ভূপতি! গরম খাস্তা কচুরি হবে? দাও ত একখানা।

ভূপতি অমায়িক হাস্যের সহিত ঘাড় নাড়িল এবং অবিলম্বে দু'খানি কচুরি আনিয়া প্লেটের ওপর রাখিল। ঝুটবিহারীবাবু সস্নেহে বলিলেন, নিমাই ত কিছুই খেলে না—

আমি শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম, অবেলায় খেয়েছি। পেট ভরাই আছে।

মনে মনে হিসাব কষিতে লাগিলাম। ইহাই যদি শেষ হয় তবে আগামীকল্য কত বাকী পরিশোধ করিতে হইবে।

কত হ'ল হে ভূপতি! ঝুটবিহারীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভূপতি একটুকরো কাগজ আনিয়া হাতে দিল—দু টাকা তের আনা। চোখের সম্মুখে অন্ধকার দেখিলাম। আমার বেকার অবস্থাকালীন এক মাসের ট্রাম ভাড়া!

কত আছে তোমার কাছে? ঝুটবিহারী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

মনিব্যাগ হইতে যথাসর্ব্বস্ব দেড় টাকা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম।

—ওহে ভূপতি, বিনোদবাবুকে বলে দিও বাকীটা কাল ইনি দিয়ে যাবেন। খাতায় 'নিমাই রায়' লিখে রেখো।

যে আজ্ঞে—ভূপতি পয়সা লইয়া ভেতরে প্রস্থান করিল।

রাস্তায় নামিয়া তৃপ্তির উদ্গার তুলিয়া ঝুটবিহারী বলিলেন, কোন ভাবনা নেই তোমার। আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা কোরো—একটাতে ঢুকিয়ে দেবোই—

বলা বাহুল্য পিতৃদেবের পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আর দেখা করিনি। দোকানের বাকী পয়সা পরদিনই দিয়া আসিয়াছিলাম।
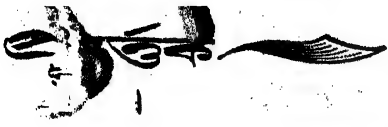
উপরে

অরণ্য — কাষ্ঠখোদাই

নীচে

বাংলার আলপনা

শিল্পী: সুধাংশু রায়
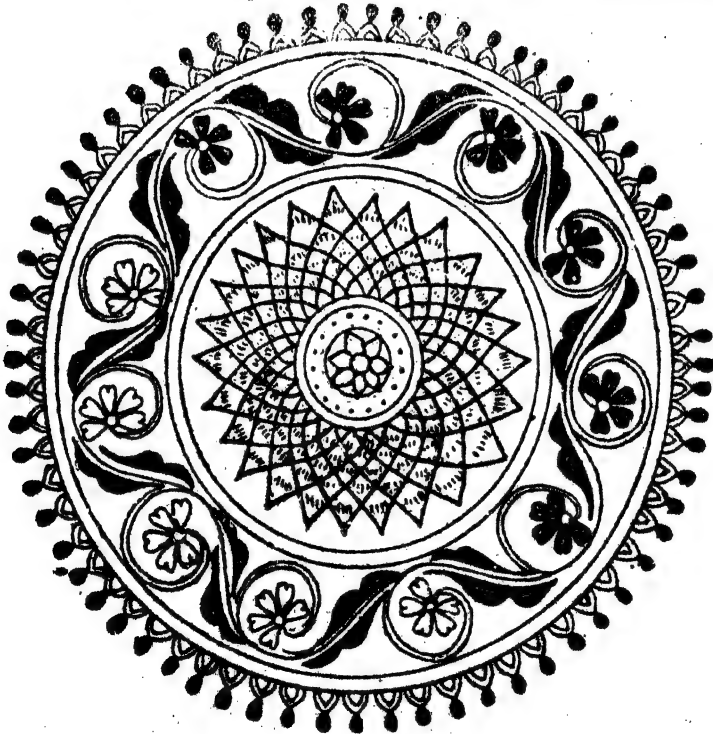
'যাহা ছিল ভারতে তাহা হবে ভারতে'

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার-এট-ল

'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভূ-ভারতে'—একথা একদা আমরা মনেপ্রাণে জানিতাম, জোর করিয়া দশ জনকে শুনাইতাম। তাহাতে আমাদের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিদ্যা-বুদ্ধির জাহাজ বনিয়া, প্রগতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের নিজস্ব ভাবের এই স্বরূপ অরূপে ডুবাইয়া দিয়াছি, অমরাই। সভ্যতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্যের শিখরে অধিষ্ঠিত পূর্ব্ব ভূখণ্ড এই সেদিনের অসভ্য বর্ব্বর পশ্চিমের সম্মুখে হেঁটমুণ্ড হইয়াছে এই ভাবে, তিলে-তিলে স্বদেশে পরবাসী হইয়াছে এই-ই কারণে। হেমচন্দ্রের বীরত্বব্যঞ্জক বাণী, দ্বিজেন্দ্রলালের কশাঘাত তাহা ঠেকাইতে পারে নাই। লর্ড কার্জ্জনের ভারতীয় কৃষ্টির পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা আমাদের আত্মস্থ করিতে পারে নাই। পশ্চিমের মনীষিমণ্ডলীর কেহ কেহ দেব-ভাষার আবরণে মণি-মুক্তার জৌলষ দেখাইয়া দিয়াও আমাদের মতিগতি ফিরাইতে পারে নাই। বসা-দাঁড়ান, বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা আমাদের সকলই প্রতীচ্যের তুলিকায় রাঙাইয়া, ইষ্টমন্ত্রস্বরূপ তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের 'ভাসাইয়া' দিয়াছি যে ভাবে, কুলের সন্ধান ইহার পরে আর মিলিবে কি!

প্রলয়ঙ্করী সমরানল লেলিহান রসনায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হওয়ার পর কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি; শুনিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। ট্যাঙ্ক, উড়ো জাহাজ প্রভৃতি আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। বোমার আতঙ্কের অবধি রাখে নাই 'ভি-টু' (V 2)। আনবিক বোমার ধ্বংস-লীলায় জগত হইয়াছে বিস্ময়ে নির্ব্বাক। শত শত 'ডিভিজন'-এর (Divison) বর্ণনায় সেই আমরাই দিশেহারা হইয়াছি যাহারা রামায়ণ, মহাভারতের বর্ণিত দিব্যাস্ত্র প্রভৃতির কথায় এক সময়ে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছি, কবি কল্পনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। কল্পনা বাস্তবকে ছাপাইয়া যায়—না, বাস্তবের প্রতিবিম্বে কল্পনার ঘটে, মনের কোণেও স্থান দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। 'বিদ্যা-বুদ্ধির জাহাজের' এই-ই বোধহয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অধীনতার প্রভাবে এমনই বুদ্ধি হয়! তাই বুঝি করুণ সুরে ভাবুক গাহে 'দোষ কারও নয়গো আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'।

'বৃথা বাগাড়ম্বর' না করিয়া রামায়ণের যুদ্ধকথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া যাক শারদোৎসবের উপলক্ষে। যুদ্ধ-যাত্রাকালে লঙ্কেশ্বরের সেনানী-সংবাদ—

> হস্তী ঘোড়া ঠাট ঠাট চলে যুড়ে যুড়ে।
> বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে।

সৈন্য-সংখ্যা পাঠকপাঠিকা কল্পনা করুন এবং বর্ত্তমান ডিভিশনাদির সহিত তুলনা করুন। যুদ্ধের বাদ্যভাণ্ডই একা—সাত অক্ষৌহিণী। যথা:—

> "একলক্ষ দগড় দুই লক্ষ করতাল।
> দ্বিসহস্র ঘণ্টা কিবা মৃদঙ্গ বিশাল।
> ভেউরী, ঝাঁজরি বাজে তিন লক্ষ কাড়া।
> চারি লক্ষ জয় ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥"

আরও বীণ-শঙ্খ ৮৪ লক্ষ, তাসা তিন লক্ষ (দামামার সঙ্গে), ঢেমচা, খেমচা, ঢোল ২লক্ষ, রাক্ষসী-ঢাক ৫০ হাজার, বাঁশী ১২ লক্ষ, কাঁসী ১০ লক্ষ। জয়ঢাক, রামকাড়া, দুন্দুভি, ডম্বুর, শিঙ্গা, তুরী, ভেরী, রণশিঙ্গা, টিকার, টঙ্কার প্রভৃতির 'সংখ্যা করা ভার'।

লঙ্কেশ্বর সেনানীর সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র খাণ্ডা, টাঙ্গী, শেল, শূল, মুষল, মুগদর, গদা, শাবল, কামান, ধনুর্ব্বাণ।

বিপক্ষ বানরসেনানী কোটি কোটি। অস্ত্রাদি পাহাড়, প্রস্তর, বৃক্ষাদি। বিশেষ অস্ত্রাদি আগ্নেয়, পারজন্য, বায়ব, পন্নগ, গরুড়, ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত, বৈষ্ণব, ইন্দ্র-অস্ত্র, সম্মোহন বাণ, ঐষিক। অন্যান্য অস্ত্রাদি শক্তি, তোমর, পাশ, রিষ্টি, গদা, মুদ্গার, চক্র, বজ্র, ত্রিশূল, শূল, অসি, খড়্গ, চন্দ্রহাস, পরশু, মুষল, কার্ম্মুখ বাণ, পরিঘা, ভিন্দিপাল, নারাচ, খুরপাশ, কর্ণিকা, সূচীমুখী, শিলীমুখী ও বিরেচন বাণ, সিংহদন্ত, বজ্রদন্ত, কালদন্ত, নীল ও হরিতাল বাণ। এই সকল অস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু আধুনিক বোমার অভ্যন্তরে দেওয়া হয়।

দিব্যাস্ত্র সকল মন্ত্রপূতঃ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উড়ো জাহাজ নিপাতনে যেমন এ্যান্টি এয়ার-গান্ ও বোমারু-ধ্বংসের কৌশল যেমন সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি প্রায় প্রতি দিব্যাস্ত্রের প্রতিষেধক দিব্যাস্ত্রের অভাব ছিল না। আগ্নেয় প্রতিরোধে পারজন্য ও পন্নগ প্রতিরোধে গরুড়াস্ত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। বৈষ্ণবাস্ত্রের প্রতিরোধ ছিল না। তবে প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে বৈষ্ণবাস্ত্র হইতে তাহার কোনও অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিত না। সম্মোহন বাণে সমস্ত বিপক্ষ বাহিনীকে স্তব্ধ করিয়া দিত। দিব্যাস্ত্রে আহত হইয়াও মন্ত্রপূত কমণ্ডলু-বারিতে আহত পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। লবকুশের যুদ্ধে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত। বর্ত্তমান ভয়াবহ অস্ত্রাদি বিজ্ঞানের সৃষ্টি, পরন্তু পুরাকালের নালীক অস্ত্রাদির ন্যায় দিব্যাস্ত্রের সৃষ্টি মহাবিজ্ঞানের পাদপীঠ হইতে। বৈজ্ঞানিক যুগের অস্ত্রাদির প্রকোপ দমনে দিব্যাস্ত্রজাতীয় অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা যে বর্ত্তমানে চলিতেছে, তাহা প্রমাণিত হয় আণবিক বোমার আগমনে। 'যাহা ছিল ভারতে, তাহা হবে ভারতে' আবার হইবার সম্ভাবনা সম্ভবে সাধনার উপর। সিদ্ধবস্তু আমরা হারাইয়াছি আমাদের কর্ম্মফলে। উদীয়মান জাতির নব সাধনায় যদি তাহারা তাহা লাভ করে, তাহাতে প্রমাণিতই হইবে 'যাহা ছিল ভারতে' তাহা আবার আসিয়াছে 'ভারতে'। সাধনা কিন্তু সম্পূর্ণ হইবে না, যতদিন মন্ত্রপূত কমণ্ডলু বারি মৃত সঞ্জীবনীর কার্য্য না করে।

পুষ্পক রথ ইন্দ্রজিতের বিমান-সমর ও বীর হনুমানের এ-আর-পি দক্ষতার কথা নাই তুলিলাম। মহাদেবীর করুণায় এ আত্মভোলা জাতির জ্ঞানচক্ষু পুনরুন্মীলিত হউক—

" ......শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী
নারায়ণী নমোঽস্তুতে।"

শরৎ-শিখা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল, এম-এ

আলোর বন্যা ভাসায়ে আজিকে
ভাতিছে শরৎ-রবি,
নদ-নদী-নীরে বনে-প্রান্তরে
ফুটেছে কনক ছবি।
সুন্দর নীল অসীম গগন
ফুটিয়া উঠেছে ফুলের মতন,
শুভ্র কাশের চামর দুলিছে
বিকশি' ধরণীতল,
কানন-কুঞ্জে ধবল স্বর্ণে
কাঁপিছে শেফালীদল।

ধ্বনিছে গভীরে আরতি-মন্ত্র
এসেছে জননী দ্বারে,
বাজিছে তাঁহার নূপুর ছন্দ
হৃদয়ের তারে তারে।
নয়নে হারায় দূর নভোতল,
ফুটিছে বক্ষে প্রেম-শতদল,
প্রাণ মন আজি পরম বিভল
এসেছে জীবন-আলো,
আজিকে শরৎ-শ্যামল-শিখায়
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।

প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচার:

গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচারের ৫ম বার্ষিক সমাবর্ত্তনোৎসব ও ৬ষ্ঠ বার্ষিক উদ্বোধনোৎসব সম্পন্ন হয়। এই দিন প্রাতে আশ্রমের দীক্ষাতীর্থে আশ্রমবাসীর সম্মুখে সঙ্ঘাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যতীর্থ কর্ত্তৃক হবন কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে সঙ্ঘগুরু নবাগত ছাত্রগণ শিক্ষালাভান্তে দীক্ষার মন্ত্রে জীবন সার্থক করুক, এই ঈশ্বর প্রসাদ কামনা করিয়া আশীর্ব্বাণী প্রদান করেন।

অপরাহ্নে বাংলার বরেণ্য সন্তান শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সমাবর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের

অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ৫ম বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। বিবরণীতে প্রকাশ, এই পাঁচ বৎসরে মোট ২৭ জন উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ১৫ জন ছাত্রই সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে এবং এবং এ পর্য্যন্ত মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় দশ হাজার টাকা। এই ৫ম বৎসরে সর্ব্বপ্রথম মহিলা কুমারী সুরুচি বসু বি, এ, অতিশয় নিষ্ঠার সহিত ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক পাঠ এই কলেজে সমাপ্ত করেন।

অতঃপর সঙ্ঘগুরু ছাত্রদের আশীর্ব্বাদপ্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় জীবন-ধারার তিনটি স্তরের মধ্যে পশুত্বকে পরিহার করিয়া ভারত দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের সাধনাই করিয়াছে। ইহাই ঈশ্বর-কোটী ও জীব-কোটী। সমাজ-জীবনে জীব-কোটীর সম্মুখে ঈশ্বর-কোটী আলোকস্তম্ভস্বরূপ। তিনি আরও বলেন, দেশে এইরূপ একশত ঈশ্বর-কোটীর সংহতি যদি সিদ্ধ হয়, তবে শুধু ভারতের মুক্তি নয়, মানবতার সত্যকার মুক্তি সম্ভব।

সভাপতির সুন্দর অভিভাষণটি আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব। সভায় এই কলেজের পৃষ্ঠপোষক স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পরলোক-গমনে শোক-প্রস্তাব সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন। সস্ত্রীক শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিশেষ সুখী ও উৎসাহিত হন।

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা:

গত ৯ই ভাদ্র রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের ত্রিসপ্ততিতম জন্মতিথি-উৎসব ধূপদীপ-গন্ধপূরিত সুদৃশ্য মণ্ডবতলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অতিশয় শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। বহু প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার এই উপলক্ষে রায় মহাশয়কে অভিনন্দিত করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে তাম্রফলকে মুদ্রিত এক মানপত্র প্রদত্ত হয়।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেবরায় মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাঁর অমায়িকতা, বিনয়নম্র আচরণ, সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্বে আমরা মুগ্ধ। সত্যই তাঁর কীর্ত্তির চেয়েও তিনি মহৎ। বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সর্ব্বাগ্রণী নেতা হিসাবে বাঙ্গলার চিত্তে তিনি চিরপ্রতিষ্ঠ থাকিবেন। আমরা তাঁর নিরাময় শতায়ু কামনা করি।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দান:

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের পরিচালনাধীন কার্সিয়াঙের 'শশীভূষণ দে স্বাস্থ্যনিবাসের' পরিবর্দ্ধনকল্পে গবর্ণমেণ্ট এককালীন ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বাংলা দেশে যক্ষ্মার যেরূপ দ্রুত প্রসার হইতেছে তাহাতে এই দান সমুদ্রে গোষ্পদ হইলেও, মন্দের ভাল।

সুভাষচন্দ্রের বাস্তু-ভিটা নিলাম:

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র নিখোঁজ হইবার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যে এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি (পৈতৃক বাসভবন) ক্রোক করিয়া লয়েন তাহা গত ১৫ই আগষ্ট নীলাম হইবার কথা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত ক্রেতার অভাবে এই নীলাম বিক্রয় বন্ধ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করিয়াছে যে, ইহাতেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্বদেশ-বাসীর শ্রদ্ধা ও তাঁর লোকপ্রিয়তা বেশ বুঝা যায়।

বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ গডার্ড:

বর্ত্তমান যুদ্ধের বহু শ্রুত ও প্রশংসিত রকেট বিমানের প্রধানতম আবিষ্কারক ডাঃ রবার্ট গডার্ড ৬২ বৎসর বয়সে আমেরিকার বাল্টিমোর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সুদীর্ঘ গবেষণার

তিনি ঘণ্টায় ৭০০ মাইল [illegible] একটি রকেট আবিষ্কার করেন। ডাঃ গডার্ড আশা করেন [illegible] এই রকেট সাহায্যে চন্দ্রালোক যাওয়াও সম্ভব হইবে [illegible] বহু উর্দ্ধের লঘু বায়ুস্তরের তথ্য সন্ধানেও গবেষণারত।

রবীন্দ্র-স্মৃতি সাহিত্যিক সমিতি :

রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারের পুষ্টিকল্পে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব। উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য ৩৫ জন সাহিত্যিককে লইয়া একটি প্রতিনিধিমূলক ও দলনিরপেক্ষ 'কর্ম্মি সংসদ'ও গঠিত হইয়াছে। স্মারক গ্রন্থ-প্রণয়ন, নাট্যাভিনয়, গ্রন্থস্বত্ব দান অথবা বিশেষ সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান, চাঁদা সংগ্রহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব হইয়াছে। সমিতির এই গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত সাহিত্যিকনির্ব্বিশেষের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

তিন হাজার মণ পচা আটা :

ইউ-পির এক সংবাদে প্রকাশ ফরিদপুরের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে তিন হাজার মণ আটা বিনামূল্যে বণ্টনের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে কোন দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীর সম্মুখে শুধু মৎস্যকে খাওয়াইবার জন্যই নাকি এই আটা ব্যবহৃত হইবে। সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বের এ এক চমৎকার নমুনা!

সুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী :

২৯শে আগষ্ট প্যারামাউণ্ট ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়ার বোম্বাইস্থ অফিসের শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহুমূল্যের সাজসরঞ্জামের সহিত অনেকগুলি মানুষও ভস্মীভূত হয়। ঐ সঙ্গে ম্যানেজার সুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলীও মারা যান। তাঁহার মাত্র ৩৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সামান্য কর্ম্মচারীরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি ম্যানেজাররের লোভনীয় পদে উন্নীত হন। কিছুকাল আগে মাত্র তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেরাদুন প্রবর্ত্তক আশ্রমে সম্মেলন :

সঙ্ঘকর্ম্মী শ্রীভোলানাথ ঘোষাল ও ডাক্তার শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দেরাদুন প্রবর্ত্তক আশ্রমে পল্লী উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত মহাবীর ত্যাগী এম-এল-এ সভায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় বলেন, পরোপকার বৃত্তি কার্য্যে রূপ না পাইলে মানুষের মধ্যে উচ্চ ও উন্নততর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এইরূপ গঠনমূলক কর্ম্মের প্রসারে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ও সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। করাচী করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুত খুরশেদ লালজী প্রমুখ বিভিন্ন বক্তাগণ জগৎকল্যাণে উৎসর্গীত এই সঙ্ঘের নিঃস্বার্থ গঠনমূলক কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ-জন্মোৎসব

বিগত ১৬ই হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী কলিকাতা ২৯নং রাসবিহারী এ্যাভিনিউ পার্কে পাবনা সৎসঙ্ঘের অধিনায়ক মহামানব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব অতি সুষ্ঠু ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দশ সহস্রাধিক লোকের স্থানোপযোগী সুসজ্জিত বিরাট মণ্ডপে দীর্ঘ চারি দিনের উৎসব এক অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার করে। প্রথম দিবস বিশ্বশান্তির কামনায় মহা স্বস্ত্যয়নী যজ্ঞ ও গুরু পূজা হয়। তৎপর অপরাহ্নে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং বলেন যে, বর্ত্তমান জগতের এই পরিস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব
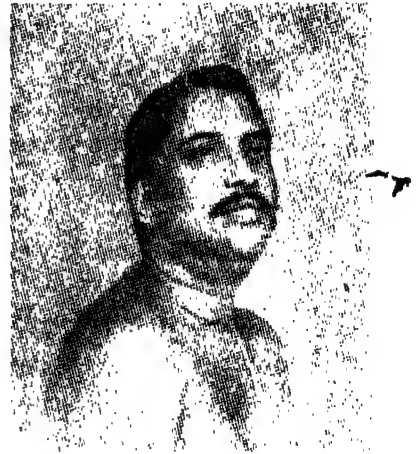
এক নতুন সৃষ্টির সূচনা করিয়াছে। মিঃ এস, সি, চাটার্জ্জী, মিঃ এস, এন, মোদক, আই, সি, এস্, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়বৃন্দের সভাপতিত্বে চারিদিনের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র হালদার, প্রফুল্লকুমার দাশ, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাবিত্রী দেবী, দৌলত মহম্মদ খাঁ মিঃ ই, জি, স্পেনসার, মিঃ ধীমান প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তাগণ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, কৃষিশিল্প প্রভৃতি বহু বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিনব অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভিত্তিতে জনকল্যাণের বিভিন্ন কর্ম্মপন্থায় বিশদ আলোচনা করেন। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া সৎসঙ্ঘের সংগঠনপ্রচেষ্টা সার্থক হউক, এই প্রার্থনা।

'হাতে-গড়ার' আলোচনা-সভা :

গত মহালয়ায় ১১ ভীম ঘোষ বাই লেনস্থ ভবনে সুসাহিত্যিক ও কবি ডাক্তার কালীশঙ্কর সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে 'হাতে-গড়া' সঙ্ঘের

প্রথম আলোচনা বৈঠক বসে। আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল 'পল্লী-সংগঠনে ছাত্রদের কর্ত্তব্য।' সঙ্ঘের ছাত্র-সভ্যের মধ্যে তিনজন এই বিষয়ে রচনা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কালীপদ সমাদ্দার, অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় ছাত্রদের উপযোগী করিয়া বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে তরুণ সভ্যেরা গীত ও আবৃত্তি দ্বারা সভাকে মুখরিত করে। অবশেষে সঙ্ঘের স্থায়ী সভাপতি শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে 'হাতে-গড়া' সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করেন।

ম্যাজিক উইজার্ড দেবকুমার:

বালক যাদুকর বলিয়া একদা খ্যাত অধুনা পরিণত-যাদুকর দেবকুমার বিগত এক বৎসর আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে যাদুনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। সম্প্রতি কাশ্মীর রাজদরবারের একটি রাজকীয় চায়ের আসরে তাঁর যাদুবিদ্যার নিপুণ অভিনয় দেখিয়া মহারাজা, মহারাণী এবং সমাগত পদস্থ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। দেবকুমার দীর্ঘদিন পরে কলিকাতায় (পাটবাড়ী আলমবাজার) ফিরিয়াছেন। এই উদীয়মান তরুণ যাদুশিল্পীর আমরা উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ:

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার কৃষ্ণা নবমীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অশীতিতম শুভ জন্মতিথি-উৎসব রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের বিশেষ পূজানুষ্ঠান, কথকতা, কীর্ত্তন, স্বামী অভেদানন্দজীর পুণ্য জীবন-কথা-আলোচনা এবং প্রচুর প্রসাদ বিতরণ হয়।

'কলগুঞ্জনে' রবীন্দ্রোৎসব:

গত ২৩শে ভাদ্র সন্ধ্যায় ১৭১।বি বিবেকানন্দ রোডস্থ ভবনে অধ্যাপক মৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর পৌরোহিত্যে ও বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকগণের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের সুষ্ঠু আবৃত্তি ও গীতের মধ্য দিয়া কলগুঞ্জনের সভ্যসভ্যাগণ ঐকান্তিকতার সহিত কবিগুরুকে স্মরণ করেন। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের বক্তৃতা ছাড়া একক সঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্ম্মসচিব শ্রীশোভেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এবং সম্পাদিকা কুমারী মানসী ঘোষাল সভাপতি ও সমাগতগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

রাখী-মিলনোৎসব:

বিগত ৬ই ভাদ্র গোপালে[illegible]নীপুর) রাখী মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে বাঙলার বিশিষ্ট সাহিত্যি[illegible]সম্পাদক, লেখক ও রাখীর পৃষ্ঠপোষকদের শ্রদ্ধাভিবাদন [illegible]" প্রেরণ করা হয়। হাটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার শর্ম্মা ও রাখী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ঘোষ কমল মিত্র, পদ্মলোচন বসু, শিল্পী অর্দ্ধেন্দু গুপ্ত প্রমুখ কর্ম্মীদের সাহায্যে একটী শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে সুসম্পাদিত লিপি-পত্রিকা, চিত্রসংগ্রহ, প্রাচীন মুদ্রাসংগ্রহ, চর্ম্মশিল্প, মৃৎশিল্প, সূচীশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, প্রভৃতি বহু বিচিত্র জিনিষ সমাহৃত হয়। শ্রীযুক্ত মহাদেব রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পরদিন বি, এন, আর-এর অফিসার মিঃ রাজননাথের উপস্থিতি ও আনুকূল্যে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে মিলনোৎসবের দ্বিতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট মনিষীগণ রাখীর উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষ শিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্য বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং ডিপ্লোমা প্রভৃতি প্রদান করেন। স্বদেশী যুগের পরে-রাখী উৎসব এইরূপ ব্যাপকভাবে আর কোথায়ও সম্ভবতঃ অনুষ্ঠিত হয় না।

সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।